ঐতিহাসিক চিত্র

মুর্শিদাবাদ-কাহিনী

"দিল্লী, মুর্শিদাবাদ হইবে এখন,
মুসল্মান-গৌরবের সমাধি-ভবন।"

শ্রীনিখিলনাথ রায়, বি. এল.

৯ এ্যান্টনি বাগান লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশক :
এইচ্. এল্. সাহা
পুথিপত্র
৯ এ্যান্টনি বাগান লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

সরকারী আনুকূল্যে প্রাপ্ত কাগজে মুদ্রিত

মুদ্রক :
বি. রায়
রায় প্রিন্টার্স
৯ এ্যান্টনি বাগান লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

ভূমিকা

মুর্শিদাবাদ বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার শেষ মুসলমান রাজধানী। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলার সমস্ত রাজনৈতিক ব্যাপারের সহিতই মুর্শিদাবাদের সম্বন্ধ। এইখান হইতেই বাঙ্গলার মুসলমানরাজত্বের অবসান ও ব্রিটিশরাজত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। এইজন্য মুর্শিদাবাদের ইতিহাসালোচনা অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ বলিয়াই বোধ হয়। প্রায় পাঁচ বৎসর অতীত হইল, আমি মুর্শিদাবাদের ইতিহাস-সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হই। তন্নিমিত্ত আমাকে অনেক প্রাচীন ফারসী ও ইংরেজী গ্রন্থ এবং পুরাতন কাগজপত্রাদি দেখিতে ও মুর্শিদাবাদের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মুর্শিদাবাদের নবাব-বাহাদুরের উপযুক্ত দেওয়ান মান্যবর শ্রীযুক্ত খন্দকার ফজল রব্বী খাঁ বাহাদুর ও শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু সান্যাল মহাশয় আমাকে উৎসাহ প্রদান করিয়া কোন কোন ঐতিহাসিক তত্ত্ব অবগত করাইয়াছেন। দেওয়ানবাহাদুর গুরুতর কার্যভার মস্তকে লইয়াও ইতিহাসচর্চায় আপনার জীবন সমর্পণ করিয়াছেন; তাঁহার অধ্যবসায়ের ফলে অনেক নূতন নূতন ঐতিহাসিক তত্ত্বের আবিষ্কার হইতেছে। দীনবন্ধু বাবু প্রায় দশ বৎসর পূর্বে মুর্শিদাবাদের ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু নানা কারণে তাঁহার যত্ন সফল হয় নাই। এই দুই মহাত্মার উৎসাহে আমি অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছি। মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের দুই এক খণ্ড লিখিত হইয়াছে, শীঘ্রই যন্ত্রস্থ করার ইচ্ছা আছে। ইতিহাসসঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়া আমি যে সকল প্রবন্ধ সংবাদ ও মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহাদের সহিত আরও কতকগুলি যোগ করিয়া 'মুর্শিদাবাদ-কাহিনী' নামে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। 'মুর্শিদাবাদ-কাহিনী' মৎপ্রণীত মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের একরূপ পূর্বাভাষ। সাধারণে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলার ইতিহাসের একটি চিত্র ইহাতে দেখিতে পাইবেন। কাহিনীর প্রবন্ধগুলি ধারাবাহিকরূপে নির্দেশ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। এই প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই মুর্শিদাবাদ-হিতৈষী, সাহিত্য, নব্যভারত, সৎসঙ্গ, ভারতী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সমস্ত প্রবন্ধ লেখার সময় সিরাজউদ্দৌলা প্রভৃতির প্রণেতা, মূর্তিমান্ অধ্যবসায়, সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রের সহিত পরিচয় হওয়ায়, আমরা পরামর্শ করিয়া ঐতিহাসিক চিত্র নামে একটি সংস্করণ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। সেইজন্য 'মুর্শিদাবাদ-কাহিনী' ঐতিহাসিক চিত্রের অন্তর্ভূত হইল। কোন কোন ঐতিহাসিক তত্ত্বের জন্য আমি অক্ষয়বাবুরও নিকট ঋণী আছি। তিনি কয়েকখানি চিত্র প্রদান করিয়া আমাকে আরও উপকৃত করিয়াছেন। আর কয়েকখানি চিত্রের জন্য আমার প্রিয়বন্ধু বহরমপুর কলেজের বিজ্ঞানাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু মোহিনীমোহন রায়, এম্. এ. এবং উক্ত কলেজের ড্রয়িংশিক্ষক শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস আমাকে

যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। সাহিত্য-সম্পাদক প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু সুরেশচন্দ্র সমাজ-পতির ঐকান্তিক যত্নে পলাশীযুদ্ধের মানচিত্র 'মুর্শিদাবাদ-কাহিনী'তে স্থান পাইয়াছে। বহরমপুর কলেজের আরবীর ও ফারসীর অধ্যাপক মৌলবী মহম্মদ মফীজুদ্দীনের নিকট আমি বিশেষরূপে ঋণী আছি। তাঁহার সাহায্য ব্যতীত কদাচ ফারসী গ্রন্থ ও কাগজাদি হইতে ঐতিহাসিক তত্ত্বের উদ্ধার করিতে পারিতাম না। জগৎশেঠ গোলাপচাঁদ ও বঙ্গাধিকারী প্রতাপনারায়ণ রায়মহাশয় তাঁহাদের ফার্মান পাঠাইয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন। জঙ্গীপুরের শ্রীযুক্ত বাবু অনাথবন্ধু চট্টোপাধ্যায়ের নিকট হইতে গিরিয়া যুদ্ধের গ্রাম্য-কবিতা, আমার প্রিয়বন্ধু বসন্তকুমার রায়ের নিকট হইতে পলাশীযুদ্ধের গ্রাম্য-গীত ও কাটোয়াযুদ্ধের গ্রাম্য কবিতার কিয়দংশ, ও বিধুপাড়ার শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস পালের নিকট হইতে কাটোয়াযুদ্ধের সম্পূর্ণ কবিতাটি প্রাপ্ত হইয়াছি। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আমার প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার বসু, বি. এল. কোন কোন ফর্মার প্রুফ সংশোধন করিয়া যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। মুর্শিদাবাদ-হিতৈষীর সম্পাদক শ্রীযুক্তবাবু বনওয়ারীলাল গোস্বামী 'মুর্শিদাবাদ-কাহিনী'র প্রকাশক হইতে ইচ্ছা করিয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন। এই সকল মহাত্মার নিকট আমি অন্তরের সহিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। ঐতিহাসিক বিবরণ সম্পূর্ণ হওয়া কঠিন; একজনের চক্ষে কখনও সমস্ত ঘটনা পড়িতে পারে না। এইজন্য যদি গ্রন্থের কোন কোন স্থানে ত্রুটি লক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন। ভরসা করি, ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক সে সমস্ত ত্রুটির সংশোধন করিয়া লইবেন। নানা কারণে প্রুফসংশোধনের গোলযোগ ঘটায়, স্থানে স্থানে দুই চারিটি ভ্রম লক্ষিত হইবে; তজ্জন্য পাঠকগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। এক্ষণে সাধারণের 'মুর্শিদাবাদ-কাহিনী'কে স্নেহের চক্ষে দেখিলে যারপরনাই আনন্দলাভ করিব। ইতি

বহরমপুর
১২ই শ্রাবণ,
১৩০৪ সাল

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

কিরীটেশ্বরী

বর্তমান মুর্শিদাবাদ নগরের প্রান্তদেশ বিধৌত করিয়া যে-স্থলে প্রসন্নসলিলা ভাগীরথী প্রবাহিতা হইতেছেন, যথায় নগরস্থ সহস্রদ্বার সৌধাদির প্রতিবিম্ব নদীবক্ষে পতিত হইয়া রমণীয় শোভা সংবর্ধন করিতেছে, তাহারই অপর পারে ডাহাপাড়া-নামক একটি পল্লীগ্রাম অবস্থিত। ডাহাপাড়া ভাগীরথীর পশ্চিমতীরস্থ। এককালে এই ডাহাপাড়া মুর্শিদাবাদ-রাজধানীর অন্তর্গত হইয়া, বহুসংখ্যক অট্টালিকায় বিভূষিত ছিল। তৎকালে মুর্শিদাবাদ ভাগীরথীর উভয় তীরে অবস্থিতি করিয়া, আপনার গৌরব ও সমৃদ্ধি সমগ্র জগতে ঘোষণা করিত। উক্ত ডাহাপাড়া হইতে প্রায় সার্ধ ক্রোশ পশ্চিমে একটি ক্ষুদ্র পল্লী দৃষ্ট হয়; তাহার নাম কিরীটকণা।[1] কিরীটকণা এক্ষণে জঙ্গল-পরিপূর্ণ। কিন্তু ইহার এমন একটি মোহিনী শক্তি আছে যে, তথায় উপস্থিত হইবামাত্র মনঃপ্রাণ শান্তভাবে পরিপূর্ণ হইয়া যায়,—কি এক অনির্বচনীয় রসে অন্তরাত্মা আপ্লুত হইয়া উঠে! স্থানটি জঙ্গলময় হইয়াও যেন শান্তিনিকেতন; শান্তিদেবী যেন ইহাতে চির আবাস-স্থান স্থাপন করিয়াছেন। মুর্শিদাবাদের মধ্যে এরূপ বৈরাগ্যোদ্দীপক স্থান অতি বিরল। এই স্থানে কতিপয় প্রাচীন মন্দির জীর্ণাবস্থায় থাকিয়া, মুর্শিদাবাদের পূর্বগৌরবের কথা স্মৃতিপথে জাগাইয়া দেয়। কিরীটকণা মুর্শিদাবাদের মধ্যে একটি প্রাচীন স্থান। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, দক্ষযজ্ঞে বিশ্বজননী পতিপ্রাণা সতী প্রাণত্যাগ করিলে, ভগবান বিষ্ণু তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে দেবীর কিরীটের একটি কণা এই স্থলে পতিত হয়; তজ্জন্য ইহা উপপীঠ মধ্যে গণ্য এবং ইহার অধিষ্ঠাত্রী কিরীটেশ্বরী বলিয়া এতদঞ্চলে কীর্তিতা।[2] কিরীটেশ্বরী যেন সমস্ত মুর্শিদাবাদেরই অধিষ্ঠাত্রীস্বরূপা ছিলেন। যত দিন তাঁহার গৌরব ছিল, তত দিনই মুর্শিদাবাদের শ্রীবৃদ্ধি, অথবা মুর্শিদাবাদের শ্রীবৃদ্ধি-লয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তিনিও এতদঞ্চল হইতে অন্তর্হিতা হইতে বসিয়াছেন। কিরীটকণা প্রথমাবস্থায় ঘোর জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল; কেবল একটিমাত্র সামান্য মন্দির ইহাতে ভগ্নাবস্থায় দৃষ্ট হইত; উহা কতদিনের নির্মিত, তাহা

১ এই কিরীটকণাকে রিয়াজুস্-সালাতীন-নামক গ্রন্থে 'তীরতকোণা' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। (Riyaz-us-salatin Asiatic Society's Edition. p. 343.) মেজর রেনেলের কাশীমবাজার দ্বীপের মানচিত্রেও Teretcoona লেখা আছে। কিন্তু ইহার প্রকৃত নাম কিরীটকণা; অদ্যাপি সে গ্রাম বর্তমান রহিয়াছে।

২ তন্ত্রচূড়ামণির পীঠনির্ণয়ে কিরীটে কিরীটপতনের কথা লিখিত আছে। উক্ত গ্রন্থের মতে কিরীটের দেবতার নাম বিমলা ও ভৈরবের নাম সম্বর্ত। কিরীট ৫১ পীঠের অন্যতম; কিন্তু তথায় কোন অঙ্গ পতিত না হইয়া অলঙ্কার পড়ায় কাহারও কাহারও মতে তাহা উপপীঠরূপে গণ্য। মহানীলতন্ত্রে কিরীটের দেবীর নাম কিরীটেশ্বরীই লিখিত আছে। মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

কাহারও জ্ঞানগোচর ছিল না।[৩] উপপীঠ ও জঙ্গলময় বলিয়া মধ্যে মধ্যে দুই-একজন সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী তথায় আগমন করিতেন; পরে ক্রমে ক্রমে মায়ের পূজার বন্দোবস্ত হয়। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সমসাময়িক মঙ্গলবৈষ্ণব এবং তাঁহার পূর্বপুরুষগণ কিরীটেশ্বরীর সেবক ছিলেন বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়।[৪] কিন্তু যৎকালে বঙ্গাধিকারিগণ বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশত্রয়ের প্রধান কাননগো পদে প্রতিষ্ঠিত হন, সেই সময় হইতে কিরীটেশ্বরীর মহিমা চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং কিরীটকণার প্রাচীন মন্দির সংস্কৃত হইয়া বর্তমান প্রধান মন্দিরগুলিও নির্মিত হয়।

বঙ্গাধিকারিগণের মতে তাঁহাদের আদিপুরুষ ভগবান রায়, মোগলকেশরী দিল্লীশ্বর আকবর শাহকে স্বীয় কার্যদক্ষতায় পরিতুষ্ট করিয়া বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার কাননগো পদ ও 'বঙ্গাধিকারী মহাশয়' উপাধি লাভ করেন। কিন্তু ভগবান রায় শাহ সুজার সময়ে উক্ত পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। ভগবানের মৃত্যুর পরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বঙ্গবিনোদ রায় কাননগো পদ ও সম্রাটের নিকট হইতে অনেক লাখেরাজ ও দেবোত্তর সম্পত্তি পারিতোষিক-স্বরূপ প্রাপ্ত হন, তাহার মধ্যে কিরীটেশ্বরী 'ভবানীনাথ' নামে লিখিত থাকে। বঙ্গবিনোদের পর ভগবানের পুত্র হরিনারায়ণ স্বীয় পিতার পদ ও সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হরিনারায়ণের পর তাঁহার পুত্র দর্পনারায়ণ উক্ত কাননগো পদ প্রাপ্ত হইয়া ঢাকায় অবস্থিতি করেন; সেই সময়ে ঢাকা বাঙ্গলার রাজধানী ছিল। দর্পনারায়ণের কার্যের শেষভাগে যৎকালে সম্রাট আরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম ওশ্বান বাঙ্গলার মসনদে অধিষ্ঠিত থাকেন, সেই সময়ে মুর্শিদকুলী খাঁ আরঙ্গজেবের আদেশক্রমে বাঙ্গলার দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইয়া ঢাকায় আগমন করেন। নবাব আজিম ওশ্বানের সহিত দেওয়ান মুর্শিদকুলীর মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়ায়, তিনি ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া মুখসুসাবাদ বা মুখসুদাবাদে (পরে মুর্শিদাবাদ) আগমন করিলে, সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ানী-সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মচারী মুর্শিদাবাদে আসিতে বাধ্য হন; অগত্যা দর্পনারায়ণকেও আসিতে হয়। এই সময়ে জগৎশেঠদিগের আদিপুরুষ শেঠ মাণিকচাঁদও মুর্শিদাবাদে আসিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাব, জগৎশেঠ ও বঙ্গাধিকারিগণ মুর্শিদাবাদের প্রাচীন ও সম্মাননীয় বংশ এবং উক্ত তিন বংশেরই বাঙ্গলার শাসন ও রাজস্ব-সম্বন্ধে একাধিপত্য ছিল। দর্পনারায়ণ মুর্শিদাবাদে আসিয়া ডাহাপাড়ায় স্বীয় আবাস-ভবন নির্মাণ করেন। এই সময়ে বঙ্গাধিকারিগণ কিরীটেশ্বরীর নিকট অবস্থিতি করায়, তাঁহার গৌরব-বৃদ্ধির অনেক চেষ্টা করিতে থাকেন এবং মুর্শিদাবাদ বাঙ্গলার রাজধানী ছিল বলিয়া,

---

৩ সম্ভবত: যে সময়ে গুপ্ত সম্রাটগণ বাঢ় দেশে রাজত্ব করিতেন, সেই সময় হইতে কিরীটেশ্বরীর মাহাত্ম্য বিস্তৃত হয়। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস দেখ।

৪ মঙ্গলবৈষ্ণব নবদ্বীপে মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাতের পর গদাধর প্রভুর নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বর্ধমান জেলার কাঁদরা নামক গ্রামের নিকট বাস করেন। তাঁহার পৌত্র বদনচাঁদঠাকুর প্রসিদ্ধ মনোহরসাহী সংকীর্তনের প্রবর্তক।

কিরীটেশ্বরীর প্রতি বাঙ্গলার সম্ভ্রান্তবংশীয়দিগের দৃষ্টি নিপতিত হয়। দর্পনারায়ণ কিরীটেশ্বরীর জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া গুপ্তমঠ নামে তাহার প্রাচীন মন্দিরটির সংস্কার এবং কিরীটেশ্বরীর বৃহৎ মন্দির, শিব ও ভৈরব মন্দির প্রভৃতি নির্মাণ করিয়াছিলেন। কিরীটেশ্বরীর মন্দিরাভ্যন্তরে কালীঘাটাদির ন্যায় কোন স্পষ্ট প্রতিমূর্তি নাই ; কেবল একটি উচ্চবেদী ও তাহার পশ্চাতে একখণ্ড বিশাল প্রস্তর ভিত্তির ন্যায় নানাবিধ শিল্পকার্যে অলঙ্কৃত হইয়া, উচ্চভাবে অবস্থিতি করিতেছে : দেবীর কেবল মুখমাত্র বেদীর উপরে অঙ্কিত। বেদীর নিম্নে বসিবার স্থান ও চতুষ্পার্শ্বস্থ গৃহভিত্তির কতক দূর পর্যন্ত কৃষ্ণমর্মর প্রস্তরমণ্ডিত ; মন্দিরের সম্মুখে একটি বিস্তৃত বারাণ্ডা আছে। শিবমন্দিরমধ্যে কৃষ্ণপ্রস্তরখোদিত শিবলিঙ্গ ও ভৈরবমন্দিরে কষ্টিপ্রস্তরনির্মিত ভৈরবমূর্তি অবস্থান করিতেছেন।[৫] এতদ্ভিন্ন আরও দুই-একটি মন্দির ইহার নিকট জীর্ণাবস্থায় বিদ্যমান আছে। এই সমস্ত মন্দিরের নিকট দর্পনারায়ণ রায় কালীসাগর নামে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করিয়া দেন। পুষ্করিণীটি যেমন বৃহৎ, সেইরূপ গভীরও ছিল ; মন্দিরের নিকট উহা কষ্টিপাথরনির্মিত সোপানাবলীর দ্বারা অলঙ্কৃত হয় ; এক্ষণে তাহাদেরও ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। পুষ্করিণী শৈবাল ও পঙ্কে পরিপূর্ণ, জলও অপেয়। দর্পনারায়ণ কিরীটেশ্বরী মেলার সৃষ্টি করেন। এই মেলা উপলক্ষে নানাস্থান হইতে যাত্রীর সমাগম হইত। দোকান-পসারিতে পরিপূর্ণ হইয়া, কিরীটকণা অত্যন্ত গৌরবময়ী মূর্তি ধারণ করিত। অদ্যাপি পৌষ মাসের প্রতি মঙ্গলবারে উক্ত মেলা বসিয়া থাকে , কিন্তু এক্ষণে তাহা প্রাণহীন। বর্ষাকালে কিরীটেশ্বরী গমনের পথ কর্দমে পরিপূর্ণ হওয়ায়, লোকের গমনাগমনের বিলক্ষণ অসুবিধা ঘটিত। সেই অসুবিধা নিবারণের জন্য দর্পনারায়ণের পুত্র শিবনারায়ণ পথের সংস্কার ও একটি সেতু নির্মাণ করিয়া দেন ; তাহার চিহ্ন অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে ; এক্ষণে তাহা জঙ্গলপূর্ণ ও বৃক্ষাদির দ্বারা আচ্ছাদিত। শিবনারায়ণ মন্দিরাদিরও সংস্কার করিয়াছিলেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলার রাজত্বকাল হইতে কোম্পানীর সময় পর্যন্ত শিবনারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ কাননগো ছিলেন, তিনি সাধ্যানুসারে কিরীটেশ্বরীর সেবার যত্ন করিতেন। তাহার পর মুর্শিদাবাদ রাজধানীর গৌরব অন্তর্হিত হইয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়, যে-সময় পলাশীর সমরক্ষেত্রে মুসলমান রাজলক্ষ্মীর কিরীট স্খলিত হইয়া ভূতলে পতিত হয়, সেই সময় কিরীটেশ্বরীরও কিরীট শিথিল হইতে আরম্ভ হয়। পরিশেষে বঙ্গাধিকারিগণের দুর্দশা উপস্থিত হওয়ায়, তাঁহারও গৌরবের হ্রাস হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে কিরীটেশ্বরীর গৌরব লোপ পাইতে পাইতে অধুনা তাঁহার নামটিকে বহুকালশ্রুত প্রবাদবাক্যের ন্যায় করিয়া তুলিয়াছে। যত দিন মুর্শিদাবাদ

৫ এই ভৈরব ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি , বুদ্ধ ভৈরবরূপে পূজিত হইতেছেন। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস দেখ।

বাঙ্গলার রাজধানী ছিল, ততদিন কিরীটেশ্বরীর গৌরবের সীমা ছিল না ; বাঙ্গলার রাজা-মহারাজগণ, বণিক-মহাজনবৃন্দ রাজধানীতে সমাগত হইলেই কিরীটেশ্বরী-দর্শনে গমন করিতেন। তৎকালে কিরীটেশ্বরী এতদঞ্চলে মহাতীর্থভূমি ছিল। এক্ষণে কলিকাতা ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী বলিয়া, কালীঘাটে যেরূপ অবিরত উৎসব হইয়া থাকে, মুর্শিদাবাদের গৌরবের সময় কিরীটেশ্বরীও তদ্রূপ নিত্যোৎসবময়ী ছিলেন। তখন রাজধানীর নহবতাদি বাদ্যধ্বনি কিরীটেশ্বরীর শঙ্খঘণ্টারোলের সহিত বিমিশ্রিত হইয়া প্রসন্নসলিলা ভাগীরথীকে তালে তালে নৃত্য করাইত। যেমন মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলে, লোকে আনন্দ-উৎসাহে পূর্ণ হইয়া উঠিত, সেইরূপ কিরীটেশ্বরীর দর্শনমাত্র তাহাদিগের হৃদয় শান্ত ভাবে ভরিয়া যাইত। এক দিকে যেমন রাজকর্মচারিগণ কার্যব্যপদেশে প্রতিনিয়ত নগরমধ্যে যাতায়াত করিতেন, সেইরূপ অপর দিকে দেবীর পাণ্ডাগণ যাত্রীর অন্বেষণ ও মায়ের সেবার আয়োজনে বহির্গত হইতেন। এইরূপ ঘোরকোলাহলময়, উদ্যমময়, উৎসাহময়, নগরের নিকটে কিরীটেশ্বরী অবস্থিতি করায়, তাহার মধ্যে ধর্মভাব ও শান্তভাব অনুপ্রাণিত করিয়া মুর্শিদাবাদকে মধুর করিয়া তুলিতেন। মুর্শিদাবাদের নবাবগণের নিকটও কিরীটেশ্বরীর মহিমা অবিদিত ছিল না। নবাব মীরজাফর খাঁ তাঁহার প্রিয় ও বিশ্বাসী মন্ত্রী মহারাজ নন্দকুমারের অনুরোধে অন্তিম সময়ে কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত পান করিয়া, চিরদিনের জন্য নয়ন মুদ্রিত করিয়াছিলেন।[৬] এখন আর সেদিন নাই,—মুর্শিদাবাদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও মহিমা যেন বিলীন হইতে চলিয়াছে। ভবানীর প্রিয়পুত্র নাটোররাজ রামকৃষ্ণ যে-সময়ে রাজকার্যোপলক্ষে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইতেন, সেই সময়ে তিনি সাধনার জন্য কিরীটেশ্বরীতে গমন করিতেন। এই সময়ে বঙ্গাধিকারিগণের অবস্থা হীন হইতে আরম্ভ হওয়ায়, তিনি মন্দিরাদির সংস্কার করিয়া দেন। বৈদ্যরাজ রাজবল্লভের স্থাপিত দুইটি শিবমন্দির এখনও বিদ্যমান আছে। কিন্তু কিরীটেশ্বরীর মন্দিরগুলি যেরূপ জীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে যে, সে-সমস্ত অচিরাৎ ভগ্নস্তূপে পরিণত হইবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বর্তমান সময়ে বঙ্গাধিকারিগণের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে ; বিশেষত, কিরীটেশ্বরী এক্ষণে তাঁহাদের হস্তে নাই। ইহার আর সংস্কার হইবে কিনা জানি না।[৭] যদি কখনও মুর্শিদাবাদ পূর্বগৌরবের ছায়ামাত্র প্রাপ্ত হয়, আবার যদি শিল্প-বাণিজ্যে তাহার গৌরবজ্যোতিঃ দেশবিদেশে বিকীর্ণ হইতে থাকে, তাহা হইলে কিরীটেশ্বরীর কিরীটভ্রষ্ট রত্ন পুনঃস্থাপিত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু সে আশা সুদূরপরাহত।

---

৬ Seir Mutaqherin (English Translation) Vol. II, p. 342.

৭ কাশীমবাজারের দেশহিতৈষী মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্র কিরীটেশ্বরীর মন্দির-সংস্কারের চেষ্টা করিতেছিলেন।

মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ মন্দিরের কিছু সংস্কার করিয়াছেন।

কাশীমবাজার

নেমিনাথের মন্দির

বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ বন্দর সপ্তগ্রামের ধ্বংসের পর যৎকালে কলিকাতার অভ্যুদয় সুদূর ভবিষ্যদ্‌গর্ভে অন্তর্নিহিত ছিল, সেই সময়ে কাশীমবাজার নিম্নবঙ্গে বাণিজ্যবিষয়ে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। মুর্শিদাবাদ বাঙ্গলার রাজধানী হওয়ায় পূর্ব হইতে কাশীমবাজারের নাম পাশ্চাত্য জগতে বিঘোষিত হয়। ইহাতে এবং ইহার নিকটস্থ অনেক স্থানে প্রধান প্রধান ইউরোপীয় জাতির কুঠী সংস্থাপিত ছিল। তন্মধ্যে কাশীমবাজারে ইংরেজদিগের, কালিকাপুরে ওলন্দাজদিগের, শ্বেতাখাঁর-বাজারে আর্মেনীয়-দিগের ও সৈয়দাবাদ-ফরাসডাঙ্গায় ফরাসীদিগের চিহ্ন অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। কাশীমবাজার ও কালিকাপুরে ইংরেজ ও ওলন্দাজদিগের এক-একটি সমাধিক্ষেত্র এবং শ্বেতাখাঁর-বাজারে আর্মেনীয়দিগের একটি উপাসনামন্দির অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। কাশীমবাজার-সমাধিক্ষেত্রে ভারতবর্ষের প্রথম গবর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রথমা পত্নী মেরী ও শিশু কন্যা এলিজাবেথের সমাধি আছে। আর্মেনীয়দিগের উপাসনা মন্দিরে তাহার নির্মাণাব্দ ১৭৫৮ খ্রীঃ অব্দ লিখিত রহিয়াছে।[১] ফরাসী-দিগের নির্মিত ফরাসডাঙ্গার প্রসিদ্ধ বাঁধের ভগ্নাবশেষ[২] আজিও ভাগীরথীর স্রোত প্রতিহত করিয়া, সমস্ত নগরকে রক্ষা করিতেছে; কিন্তু এক্ষণে তাহা মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত হইয়া পড়িয়াছে। ফরাসডাঙ্গায় কিছুকাল কূটনীতি-বিশারদ ডিউপ্লে বাস করিয়াছিলেন। সিরাজউদ্দৌলার সময় 'ল' সাহেব এইখানে অধ্যক্ষতা করিতেন; সিরাজের সহিত তাঁহার সবিশেষ পরিচয় ছিল। কাশীমবাজারের ইংরেজ কুঠী বা রেসিডেন্সীর চাতালের সামান্য অংশ ব্যতীত অন্য কোন চিহ্নই বর্তমান নাই। তৎকালে ভাগীরথী এই সকল স্থানের নিম্ন দিয়া প্রবাহিত হইতেন; কিন্তু তাঁহার গতি বক্র হওয়ায় কাশিমবাজার হইতে মুর্শিদাবাদে যাইতে অনেক সময় লাগিত। হলওয়েল সাহেব লিখিয়াছেন যে, অন্ধকূপ হত্যার পর যখন তাঁহাকে কলিকাতা হইতে বন্দী-অবস্থায় মুর্শিদাবাদে আনয়ন করা হয়, তখন তিনি প্রাতঃকালে সৈয়দাবাদ-

১ শ্বেতাখাঁর বাজারের গির্জা কাহারও কাহারও মতে খাজা মাইনাস এবং কাহারও কাহারও মতে পিটার আরাটুন-কর্তৃক নির্মিত হয়। গির্জা মেরীর নামে উৎসর্গীকৃত করা হইয়াছিল। ১৬৪৫ খ্রীঃ অব্দে আর্মেনীয়গণ দিনেমারদিগের সহিত মিলিত হন। ইহার ২০ বৎসর পরে আরঙ্গজেবের দরবার হইতে আর্মেনীয়গণ সৈয়দাবাদে এক খণ্ড ভূমির সনন্দ প্রাপ্ত হন এবং তথায় একটি গির্জা নির্মাণ করেন। সেই গির্জাই এতদ্দেশে প্রথম আর্মেনীয় গির্জা (Calcutta Review, January 1894)। ১৭৫৮ খ্রীঃ অব্দের গির্জা প্রথম নির্মিত গির্জার পূর্বদিকে নির্মিত হইয়াছিল।

২ কেহ কেহ উক্ত ভগ্নাংশকে ফরাসডাঙ্গার সেতুর অংশ বলিয়া থাকেন; কিন্তু সে কথা অনেকের মতে ঠিক নহে।

ফরাসডাঙ্গা হইতে যাত্রা করিয়া অপরাহ্ণ চারি ঘটিকার সময় মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হন।[৩] ১৭৮৮ খ্রীঃ অব্দে মুর্শিদাবাদ কারবালা হইতে ফরাসডাঙ্গা পর্যন্ত ভাগীরথীর একটি খাল নিখাত হওয়ায়[৪] নদীর গতি পরিবর্তিত এবং তন্নিবন্ধন কাশীমবাজার প্রভৃতি স্থানের নিম্নস্থ ভাগীরথীর অংশ বদ্ধ বিলে পরিণত হয় ; এই কারণেই ভীষণ মহামারী উপস্থিত হইয়া উক্ত স্থানসমূহকে মহাশ্মশানে পরিণত করে।

খ্রীস্টীয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাশীমবাজারের নাম ইউরোপখণ্ডে বিস্তৃত হয়। ভাগীরথীর যে-অংশ পদ্মা হইতে নিঃসৃত হইয়া জলঙ্গীর সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই ভাগকে সচরাচর ইউরোপীয়গণ কাশীমবাজার-নদী নামে অভিহিত করিতেন এবং পদ্মা, ভাগীরথী ও জলঙ্গীর মধ্যস্থিত ত্রিকোণ ভূভাগ 'কাশীমবাজার দ্বীপ' আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছিল।[৫] মেজর রেনেল কাশীমবাজার দ্বীপ নাম দিয়া উক্ত ত্রিকোণ-ভূভাগের একখানি মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে উক্ত মানচিত্র অঙ্কিত হয়, তাহাতে সৈয়দাবাদ-ফরাসডাঙ্গা হইতে কাশীমবাজারের নিম্ন দিয়া মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত ভাগীরথীর বক্রগতিই নদীর প্রবাহরূপে নির্দেশিত হইয়াছে।[৬] রেনেলের মানচিত্র হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক স্থানের অবস্থান সুন্দররূপে অবগত হওয়া যায়। কাশীমবাজার-নদীর সঙ্কীর্ণতার কথা বহুদিন হইতে প্রচলিত রহিয়াছে। ১৬৬৬ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বার্নিয়ার ও টেভার্নিয়ার সূতীতে পঁহুছিলে, বার্নিয়ার জলপথে আসায় অসুবিধাবোধে স্থলপথে কাশীমবাজারে উপস্থিত হন। টেভার্নিয়ার ইহাকে একটি ক্ষুদ্র খাল বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। হেজেস্ ১৬৮৬ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল মাসে নদীয়া হইতে মহুলায় উপস্থিত হইয়া, জলপথে আসিতে না পারিয়া স্থলপথেই কাশীমবাজারে আগমন করেন।[৭] হলওয়েল কলিকাতা হইতে মুর্শিদাবাদে আসার সময় জলাভাবে বজরা পরিত্যাগ করিয়া একখানি ক্ষুদ্র ডিঙ্গি-নৌকার সাহায্যে মুর্শিদাবাদাভিমুখে অগ্রসর হইতে বাধ্য হন।[৮] বরাবর সঙ্কীর্ণ থাকিলেও ভাগীরথীর এমন দুর্দশা আর কখনও ঘটে নাই।

---

৩ Holwell's India Tracts. p. 272.

৪ Proceedings of the Board of Revenue.

৫ Orme's Indostan (Madras Reprint) Vol, II. p. 2.

৬ যাহাকে এক্ষণে লোকে কাটীগঙ্গা বলে, সেই কাটীগঙ্গাই নদীর প্রাচীন প্রবাহ ছিল। তখন ভাগীরথী মুর্শিদাবাদ-কারবালা হইতে সৈয়দাবাদ-ফরাসডাঙ্গা পর্যন্ত এরূপ ঋজুগতি অবলম্বন করেন নাই। ১৭৮৮ খ্রীঃ অব্দে খাল নিখাত হওয়ায় ঐরূপ পরিবর্তন হয়। কাটীগঙ্গাই নদীর প্রাচীন প্রবাহ ছিল. গঙ্গার নূতন প্রবাহস্থান খনিত হওযায় তাহার পূর্বদিকের ভূভাগকে মহাল কাটীগঙ্গা বলিত। গঙ্গার প্রাচীন প্রবাহ উক্ত মহালের অন্তর্গত হওয়ায় তাহাকে জলকর কাটীগঙ্গা বলা হইত। এক্ষণে উক্ত প্রাচীন প্রবাহের সাধারণ নাম সেইজন্য কাটীগঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে।

৭ Calcutta Review, April 1892.

৮ Holwell's India Tracts, p. 269.

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কাশীমবাজার বহু পূর্ব হইতেই নিম্নবঙ্গের প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-স্থান বলিয়া পাশ্চাত্য জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১৬৩২ খ্রীঃ অব্দে ব্রুটান-নামক জনৈক ইউরোপীয় ইহাকে রেশম ও মসলিনের প্রধান বন্দর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ; তাঁহার বর্ণনায় কাশীমবাজারে ভিন্ন ভিন্ন ইউরোপীয় জাতির কুঠীর উল্লেখ দেখা যায়। ১৬৫৮ খ্রীঃ অব্দে জন কেন বার্ষিক ৪০ পাউণ্ড বেতনে কাশীম-বাজার ইংরেজ কুঠীর প্রথম অধ্যক্ষ এবং জব চার্ণক তাঁহার সহকারী নিযুক্ত হন। এই চার্ণকই কলিকাতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৬৮০ খ্রীঃ অব্দে জব চার্ণক কাশীমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে নবাব শায়েস্তাখাঁর কঠোর আদেশে বাঙ্গলার অন্যান্য স্থানের ন্যায় কাশীমবাজার কুঠীও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইহার পর ইংরেজরা পুনর্বার বাঙ্গলায় বাণিজ্য করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইলে, কাশীমবাজার কুঠীর পুনর্নির্মাণ হয়। সিরাজউদ্দৌলা যৎকালে কাশীমবাজার কুঠী আক্রমণ করেন, তৎকালে ওয়াট্‌স্ রেসিডেণ্টের ও ওয়ারেন হেস্টিংস একজন সামান্য কর্মচারীর কার্য করিতেন।[৯] কাশীমবাজার পূর্বে অগণ্য অট্টালিকায় পরিপূর্ণ ছিল। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, ইহার পরস্পরসংলগ্ন গগনস্পর্শী অট্টালিকার জন্য রাজপথে সূর্যালোক প্রবেশ করিতে পারিত না এবং দুই-তিন ক্রোশব্যাপিনী সৌধমালার অগ্রভাগ দিয়া লোকে অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারিত। ইহার পূর্ব বিবরণ এক্ষণে আরবের উপন্যাস বলিয়া বোধ হয়। কয়েকটি সমাধিক্ষেত্র ব্যতীত ইহার পূর্ব নিদর্শন কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না।

কাশীমবাজারের প্রাচীন কালের চিহ্নের মধ্যে একটি জৈন মন্দির মুর্শিদাবাদের জৈন মহাজনদিগের যত্নে অদ্যাপি সুরক্ষিত রহিয়াছে। লোকে এই মন্দিরকে নেমিনাথের মন্দির বলিয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন ইউরোপীয় বণিকদিগের ন্যায় কাশীমবাজার অনেক দেশীয় মহাজনের আবাসস্থানেও পরিপূর্ণ ছিল। যে-স্থানে নেমিনাথের মন্দির অবস্থিত, তাহার নাম মহাজনটুলি। ইহার চতুর্দিকে ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় মহাজনগণ বাস করিতেন। নেমিনাথের মন্দিরের সম্মুখে জগৎশেঠদিগের একটি ব্যবসায়-ভবন অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে।[১০] যতদিন হইতে কাশীমবাজার বাণিজ্যস্থল বলিয়া কথিত, ততদিন হইতে নেমিনাথ-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা। মন্দিরটি পশ্চিমমুখে অবস্থিত। প্রবেশদ্বার দিয়া একটি প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া দক্ষিণমুখে আর একটি প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে হয়। সেই প্রাঙ্গণের পূর্বদিকে মন্দির, মন্দিরের সম্মুখে একটি বারাণ্ডা এবং উত্তর, দক্ষিণ উভয় পার্শ্বে দুইটি দালান, পশ্চাতে একটি সঙ্কীর্ণ পথ আছে, সেই পথের মধ্যস্থলে মন্দিরের নিম্ন দিয়া প্রাঙ্গণ পর্যন্ত একটি সুড়ঙ্গ গিয়াছে, সুড়ঙ্গের

৯ এক্ষণে কান্তবাবুর ভ্রাতার বংশীয়েরা ইহাতে বাস করিতেছেন।
১০ কাশীমবাজারের বিস্তৃত বিবরণ মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে দেখ।

সোপানাবলী সুস্পষ্ট রূপেই দৃষ্ট হয়। মন্দিরমধ্যে নেমিনাথ, পার্শ্বনাথ প্রভৃতি শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ের চতুর্বিংশতি মহাপুরুষই অবস্থিতি করিতেছেন। নেমিনাথের মন্দির বলিয়া তিনি সর্বোচ্চ আসনে অবস্থিত। নেমিনাথের মূর্তি পাষাণময়ী এবং পার্শ্বনাথের মূর্তি অষ্টধাতু-নির্মিত। দক্ষিণ দিকের একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে দিগম্বর সম্প্রদায়ের কতিপয় দেবমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর দিকের দালানের পর আর একটি প্রাঙ্গণ; তথায় একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে জৈনযতিগণের চরণপদ্ম রহিয়াছে। সেই প্রাঙ্গণের একস্থলে জগৎশেঠদিগের বাসভবন মহিমাপুর হইতে নিত্যচন্দ্রজী-নামক জনৈক যতির কষ্টিপাষাণে অঙ্কিত চরণপদ্ম আনিয়া রক্ষিত হইয়াছে। মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগে অর্থাৎ পূর্বদিকে একটি উদ্যান; উদ্যানসংলগ্ন আর একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে শান্তশূর, কুশলগুরু প্রভৃতি যতিগণের চরণপদ্ম অঙ্কিত আছে। উদ্যানের পশ্চাতে একটি পুরাতন পুষ্করিণীর নাম মধুগড়ে; মধুগড়ে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত। মধুগড়ের চতুষ্পার্শ্বে জৈন মহাজনদিগের বাসভবন ছিল। চারিদিক সোপানাবলীর দ্বারা পরিশোভিত হইয়া মধুগড়ে সাধারণের আনন্দ বর্ধন করিত। যৎকালে মহারাষ্ট্রীয়গণ সমস্ত বঙ্গদেশ লুণ্ঠন করিয়া মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত ধাবিত হয়, সেই সময়ে, মধুগড়ের চতুষ্পার্শ্বের মহাজনেরা আপনাদিগের ধনসম্পত্তি চিহ্নিত করিয়া, তাহার গর্ভে নিহিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা অনেকে আপনাদিগের ধনসম্পত্তির উদ্ধার করিতে সক্ষম হন নাই। তদবধি এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, যক্ষদেব তৎসমুদায় অধিকার করিয়া ইহার গর্ভে বাস করিতেছেন। কাশীমবাজারের ধ্বংসের সহিত মধুগড়ে পঙ্ক পরিপূর্ণ হইয়া ক্রমে ক্রমে শৈবাল ও অন্যান্য জলজ উদ্ভিদের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। সেই আচ্ছাদন এরূপ ঘনীভূত ও কঠিন হইয়াছিল যে, তাহার উপর অনেক বৃক্ষাদিও জন্মে। ইহার গভীরতা অত্যধিক ছিল। একসময়ে একটি হস্তী ইহার পঙ্কে নিমগ্ন হওয়ায়, অনেক কষ্টে তাহার উদ্ধার সাধন হয়। মধুগড়ের চতুর্দিকে এক্ষণে জঙ্গলপরিপূর্ণ . ও ক্ষুদ্রকায় কুম্ভীরসকল ইহার গর্ভে বাস করিতেছে; তাহারা প্রায়ই তীরে উঠিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে রৌদ্র উপভোগ করিয়া থাকে।

নেমিনাথের মন্দির ব্যতীত কাশীমবাজার ব্যাসপুরে একটি সুন্দর শিবমন্দির আছে। এই মন্দির ব্যাসপুরের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চাননের পিতা রামকেশব-কর্তৃক ১৭৩৩ শক বা ১৮১১ খ্রীঃ অব্দে নির্মিত হয়। মন্দিরমধ্যে এক প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ অবস্থিত। মন্দিরটি নানাবিধ দেবদেবীর মূর্তিবিশিষ্ট ইষ্টকদ্বারা নির্মিত। বড়নগরস্থ রানী ভবানীর নির্মিত শিবমন্দিরের অনুকরণে ইহার নির্মাণ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। মন্দিরটি অধিক পুরাতন নয় বলিয়া আজিও দেখিবার উপযোগী আছে। কাশীমবাজারের অর্ধক্রোশ দক্ষিণে বিষ্ণুপুর-নামক স্থানে এক প্রসিদ্ধ কালীমন্দির বিদ্যমান আছে। এই মন্দিরে পূজোপলক্ষে মধ্যে মধ্যে অনেক লোকের সমাগম হইয়া থাকে। বিষ্ণুপুরের কালীমন্দির কৃষ্ণেন্দ্র হোতা নামক জনৈক

ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণের নির্মিত বলিয়া কথিত।[১১] কৃষ্ণেন্দ্র হোতা কাশীমবাজার ইংরেজকুঠীর গোমস্তা ছিলেন। হোতার অনেক সংকীর্তি এতদঞ্চলে দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে সৈয়দাবাদের দয়াময়ী ও জাহ্নবীতীরস্থ শিবমন্দিরই সর্বপ্রধান। খাগড়া-সৈয়দাবাদ হইতে বিষ্ণুপুরে আসিতে হইলে, একটি বিল অতিক্রম করিতে হয় বলিয়া, হোতা তথায় একটি সেতু নির্মাণ করিয়া দেন। অদ্যাপি তাহা হোতার সাঁকো নামে প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণেন্দ্র হোতা পলাশীর যুদ্ধ, দেওয়ানী গ্রহণ প্রভৃতি প্রধান প্রধান ঘটনার সময় বর্তমান ছিলেন। তাঁহার নির্মিত কোন কোন দেবমন্দিরের শিলালিপির সময় হইতে ঐরূপই অনুমান হয়। এইরূপ দুই-একটি মন্দির ও সমাধিক্ষেত্র ব্যতীত কাশীমবাজারের পুরাতন চিহ্ন কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। সর্বহারী কাল ইহার সমস্তই অপহরণ করিয়া কাশীমবাজারের পূর্বগৌরব কাহিনীতে পরিণত করিয়াছে।

---

১১ বিষ্ণুপুরের কালীমন্দির ভগ্নদশায় পতিত হওয়ায় কাশীমবাজারের প্রাতঃস্মরণীয়া রানী স্বর্গীয়া আর-না-কালী দেবী ইহার পূর্ণ সংস্কার করিয়া দিয়াছিলেন। পরে লালগোলার মহারাজ রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর আবার অতি সুন্দররূপে তাহার সংস্কার করিয়া দিয়াছিলেন।

রাজা উদয়নারায়ণ

খ্রীস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষের চতুর্দিকে ঘোর রাজনৈতিক বিপ্লব উপস্থিত। বিজয়ী সম্রাট আরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগল-গৌরব-সূর্য ধীরে ধীরে অস্তমিত হইতে বসিয়াছে; তদীয় পুত্রগণ পরস্পর কলহে উন্মত্ত; দাক্ষিণাত্যে বীরেন্দ্রকেশরী শিবাজী যে-বীরজাতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই মহারাষ্ট্রীয়গণ বিশ্ববিস্ময়কর প্রতাপে মোগল সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিবার জন্য ব্যগ্র; মধ্যস্থলে রাজপুতগণ রাজা রাজসিংহ প্রভৃতির অধীনতায় পুনর্বার আপনাদিগের স্বাধীনতা বদ্ধমূল করিতে প্রয়াসী। আবার পঞ্চনদের নদীবিপ্লাবিত প্রদেশ হইতে এক ধর্মপ্রাণ জাতির অভ্যুদয় হইতেছিল, যাহারা শিখ নামে অভিহিত হইয়া উত্তরকালে মোগল ও ব্রিটিশ রাজত্বে সমরাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিল; ভারতের চতুর্দিকে ইংরেজ, ফরাসী ও অন্যান্য বৈদেশিক বণিকগণ বাণিজ্য-বিস্তারচ্ছলে রত্নপ্রসবিনী ভারতভূমিকে করতলস্থ করিবার জন্য মনে মনে সঙ্কল্প করিতেছিলেন। এই সময় নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙ্গলার সিংহাসনে আসীন; প্রসন্নসলিলা ভাগীরথী-প্রান্তস্থিত মুর্শিদাবাদ তাঁহার রাজধানী। অল্পকাল হইল, তিনি নায়েব নাজিমীর ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন; আজিম ওশ্বান বঙ্গরাজ্যের শাসনকর্তা; তাঁহার পুত্র ফরখ্‌শের নামমাত্র প্রতিনিধি হইয়া বাঙ্গলায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। বস্তুতঃ, মুর্শিদকুলী খাঁ সর্বেসর্বা; এতদিন কেবল দেওয়ানীর ভারমাত্র তাঁহার হস্তে থাকায়, তিনি স্বীয় প্রভুত্ব অধিক পরিমাণে বিস্তার করিতে পারেন নাই। নায়েব নাজিমী পদলাভ করিয়া ও তৎ সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ানীর ভার থাকায়, তিনি বঙ্গদেশে আপন শাসন-নীতি প্রচারের আরম্ভ করিলেন। সর্বাপেক্ষা জমিদারগণ তাঁহার শাসনদণ্ডের কঠোরতা বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলেন। নিজের আদেশ থাকুক, আর না-ই থাকুক, তাঁহার কর্মচারিগণের আসুরিক ব্যবহারে বাঙ্গলার জমিদারগণ মৃতপ্রায় হইয়া উঠিলেন। ইহাদের মধ্যে নাজিম আহম্মদ ও সৈয়দ রেজা খাঁ সর্বপ্রধান। যাঁহার এক কপর্দক রাজস্ব বাকি পড়িত, অমনি তাঁহাকে নানাবিধ অত্যাচার ভোগ করিতে হইত। প্রচলিত ইতিহাসে দেখা যায় যে, কাহারও পাদদেশ রজ্জুবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে লম্বিত করিয়া রাখা হইত; জমিদারগণ গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে, শীতের প্রবল শীতে, সামান্য অপরাধীর ন্যায় নগ্নগাত্রে উন্মুক্ত স্থলে দিবারাত্র কষ্ট ভোগ করিতেন। সৈয়দ রেজা খাঁর অত্যাচারের কথা পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। একটি বিস্তৃত গর্ত খনন করিয়া তাহা নানাবিধ দুর্গন্ধময় আবর্জনা দ্বারা পরিপূর্ণ করা হইত, পরে অপরাধী জমিদারগণকে তাহার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া দীর্ঘকাল অবস্থানের জন্য আদেশ প্রদত্ত হইত। হিন্দুগণকে উপহাস করিবার জন্য, তাহার নাম 'বৈকুণ্ঠ' দেওয়া হইয়াছিল।[১] এতদ্ভিন্ন কারাবাস ও

---

১ তারিখ বাঙ্গলা ও Riyaz-us-salatin, p. 263. রেজা খাঁ মুর্শিদকুলীর দৌহিত্রী ও সুজা খাঁর কন্যা নেফিসা বেগমের স্বামী। মুর্শিদকুলীর সময় তিনি বাঙ্গলার দেওয়ানী করিতেন।

অর্থদণ্ডাদির তো কথাই নাই। এই বর্ণনা অতিরঞ্জিত হইলেও জমিদারগণ যে মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে যারপরনাই কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। এইরূপ অযথা অত্যাচারে হিন্দু জমিদারগণ অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। লজ্জায়, অপমানে, কষ্টে তাঁহারা প্রতিনিয়ত আপনাদিগের মৃত্যু কামনা করিতে লাগিলেন। মনুষ্য সহস্রগুণে বলহীন হইলেও, অত্যাচারের ঝটিকা যখন তাহাকে আক্রমণ করে, তখন তাহা অতিক্রম করিতে প্রাণপণে প্রয়াস পাইয়া থাকে ; তখন তাহার ক্ষীণ শক্তি দৃঢ়সংহত হয়। তাই মুর্শিদকুলী খাঁর রাজত্বে এই অত্যাচার অসহ্য হওয়ায়, বাঙ্গলায় দুইজন হিন্দুবীরের অভ্যুদয় হইল। যে-বাঙ্গলা দ্বাদশ ভৌমিকের জননী, রাজা প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি যাঁহার সন্তান, তাঁহা হইতে দুই-একজন পুরুষকারসম্পন্ন ব্যক্তির যে-অভ্যুদয় হইবে, ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। উক্ত দুই জনের মধ্যে একজন ভূষণার জমিদার রাজা সীতারাম রায় ; দ্বিতীয়, রাজসাহীর জমিদার রাজা উদয়নারায়ণ রায়। সীতারাম রায়ের বিবরণ অনেকেই সবিশেষ অবগত আছেন ; কিন্তু উদয়নারায়ণের বিষয় সকলে সম্যগ্‌রূপে জ্ঞাত না থাকায়, এ প্রবন্ধে তাঁহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। কিরূপে তিনি মুর্শিদকুলী খাঁর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়াছিলেন, ইহা হইতে অনেকেই তাহার অনুমান করিতে পারিবেন।

রাজা উদয়নারায়ণ রায় মুর্শিদাবাদের বড়নগরের নিকটস্থ বিনোদ-নামক গ্রামে জন্ম পরিগ্রহ করেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।[২] বড়নগর ভাগীরথী-তীরবর্তী এবং রানী ভবানীর প্রিয় বাসস্থান ছিল। বিনোদ তাহারই নিকটস্থিত। এই বড়নগরই আবার উদয়নারায়ণের রাজধানী। উদয়নারায়ণ বংশীয়দের উপাধি লালা ছিল ; এই লালা হইতে তাঁহাকে কায়স্থ-বংশসম্ভূত মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা শাণ্ডিল্যগোত্রীয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ; অন্য কোন্ কারণে তাহাদের লালা উপাধি হয়। উদয়নারায়ণ জঙ্গীপুরের সমীপবর্তী গণকরবাসী ভরদ্বাজগোত্রীয় ঘনশ্যাম রায়ের কন্যা শ্রীমতীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্রের নাম সাহেবরাম।[৩] যৎকালে মুর্শিদকুলী

গ্লাডউইন সাহেব উক্ত 'তারিখ বাঙ্গলার' অনুবাদ করেন। এই বৈকুণ্ঠের কথা গ্রাণ্ট ও স্টুয়ার্ট প্রভৃতির গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। মুর্শিদাবাদের বর্তমান কেল্লার দক্ষিণ তোরণদ্বারের সম্মুখে তাহার স্থান নির্দেশের চেষ্টাও হইয়া থাকে ; কিন্তু কেহ কেহ এই বৈকুণ্ঠনির্মাণের কথায় সন্দিহান হইয়া থাকেন। বৈকুণ্ঠে অবিশ্বাস করিলেও, কুলী খাঁর সময়ে জমিদারদিগের প্রতি অত্যাচার একেবারে অস্বীকার করা যায় না ; তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

২ কাহারও কাহারও মতে কিরীটেশ্বরীর নিকট বেনেপুর তাঁহার জন্মস্থান ; কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে।

৩ নাটোর রাজবাটী হইতে শ্রীকণ্ঠ ও নীলকণ্ঠ নামে উদয়নারায়ণের দুই পুত্র বৃত্তি পাইতেন বলিয়া শুনা যায়। কিন্তু সাহেবরাম ব্যতীত আমরা তাঁহার আর কোন পুত্রের বিশেষরূপ পরিচয় পাই নাই।

খাঁ বাঙ্গলার নবাব হইয়া মুর্শিদাবাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে উদয়নারায়ণের প্রতি এক বিস্তীর্ণ জমিদারি-শাসনের ভার ছিল। সমগ্র রাজসাহী চাকলা তাঁহার দ্বারা শাসিত হইত। তাঁহার জমিদারি পদ্মার উভয় পারে বিস্তৃত ছিল। বর্তমান মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, সাঁওতালপরগণা এবং রাজসাহীবিভাগস্থ দুই-একটি জেলার অধিবাসিগণ তাঁহাকে রাজস্ব প্রদান করিত। তাঁহার সমস্ত জমিদারির নামই রাজসাহী।[৪] এক্ষণে মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলায় রাজসাহী নামে এক-একটি পরগণা দৃষ্ট হয়, এবং তাহাও উদনারায়ণের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফলতঃ তাঁহার জমিদারী যে পদ্মার উভয় পারে বিস্তৃত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ মুর্শিদাবাদে তাঁহার জন্ম হওয়ায়, এতদঞ্চলের রাজস্ব তাঁহার দ্বারা সংগৃহীত হইত। জমিদারগণের প্রতি অত্যন্ত অবিশ্বাস থাকায়, নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ কতিপয় আমীন নিযুক্ত করিয়া, তাঁহাদের দ্বারা রাজস্ব আদায় করিতেন। কেবল দুই-একজন কার্যদক্ষ জমিদারের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া নবাব রাজস্ব সংগ্রহের ভার তাঁহাদের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। রাজা উদয়নারায়ণ তাঁহাদের অন্যতম। বহুদূর বিস্তৃত জমিদারী অবাধে শাসন করায় এবং শাসনকার্যে অত্যন্ত সুনাম থাকায়, নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁহার প্রতি প্রথমে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

নবাব মুর্শিদকুলী যাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইতেন, তিনি যে কিরূপ উপযুক্ত লোক, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র ; কারণ তাঁহার ন্যায় চতুর, সূক্ষ্মবুদ্ধি ও কার্যকুশল ব্যক্তি বাঙ্গলার নবাবদিগের মধ্যে বিরল বলিয়া ঐতিহাসিকেরা উল্লেখ করিয়া থাকেন। উদয়নারায়ণের সৌভাগ্য, তিনি যে মুর্শিদকুলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। উদয়নারায়ণ নবাব-কর্তৃক ভারপ্রাপ্ত হইয়া প্রাণপণে আপনার কার্য করিতে লাগিলেন ; দিন দিন তাঁহার কার্যদক্ষতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, বাঙ্গলার সমস্ত জমিদারগণের মধ্যে তাঁহারই নাম বিখ্যাত হইয়া উঠিল। নবাব আরও সন্তুষ্ট হইলেন। এই সময়ে উদয়নারায়ণের জমিদারীর মধ্যে কিঞ্চিৎ গোলযোগ উপস্থিত হয়। নবাব তাহা অবগত হইয়া, উদয়নারায়ণের সাহায্যার্থে জমাদার গোলাম মহম্মদ ও কালিয়া জমাদার নামে দুইজন কার্যদক্ষ সেনানীকে নিযুক্ত করিলেন, তাহাদের অধীন দুই শত সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। উক্ত দুইজনের প্রতি এইরূপ আদেশ দেওয়া হয় যে, তাহারা রাজার অধীন থাকিয়া সম্পূর্ণভাবে তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিবে ; যখনই যাহা আবশ্যক হইবে উদয়নারায়ণের আদেশপ্রাপ্তিমাত্র তদ্দণ্ডেই তাহা সম্পাদন করিবে। সৈন্যগণ রাজসাহী প্রদেশের চতুর্দিকে গোলযোগ নিবৃত্তি করিতে লাগিল, যে-যে স্থলে গোলযোগের সম্ভাবনা ছিল, অল্পকাল মধ্যে সেই সেই স্থলে শান্তি স্থাপিত হইল।

৪ যাঁহারা মেজর রেনেলের কাশীমবাজার দ্বীপের মানচিত্র দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, পদ্মার উভয় পারেই রাজসাহী চাকলা বিস্তৃত ছিল ; বর্তমান মুর্শিদাবাদের অধিকাংশই সেই রাজসাহী চাকলার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

রাজা উদয়নারায়ণের শাসনে এবং গোলাম মহম্মদের কার্যনিপুণতায় রাজসাহী বাঙ্গলার সকল জমিদারীর আদর্শ হইয়া উঠিল। অন্যান্য জমিদারগণ উদয়নারায়ণের পথানুসরণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহাতে নবাবও তাঁহাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী চিরদিন কাহারও প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন না। এই গোলাম মহম্মদ হইতেই উদয়নারায়ণের ভাগ্যলক্ষ্মীর অন্তর্ধানের সূচনা হইল। গোলাম মহম্মদের কার্য-দক্ষতায় উদয়নারায়ণ এতদূর সন্তুষ্ট হইলেন যে, তিনি তাহাকে অত্যন্ত প্রিয় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। এইরূপ অযথা বিশ্বাস হওয়াতেই তাঁহার অধঃপতনের সূত্রপাত হয়।

গোলাম মহম্মদের জন্য উদয়নারায়ণ ক্রমে ক্রমে দুর্ভাগ্যের ঘোর আবর্তে নিপতিত হইলেন। গোলাম মহম্মদ এতদূর কার্যকুশল ছিল যে, রাজা তাহাকে বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাহার অধ্যবসায় ও উৎসাহে রাজসাহী প্রদেশে উদয়নারায়ণের জমিদারী বদ্ধমূল হইতেছিল, সুতরাং গোলাম মহম্মদ-যে তাঁহার প্রিয় পাত্র হইবে, ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। উদয়নারায়ণ ও গোলাম মহম্মদের ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি হওয়ায়, নবাব মুর্শিদকুলী অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন। তিনি মনে ভাবিলেন, উদয়নারায়ণ যেরূপ উপযুক্ত রাজা, তাহাতে গোলাম মহম্মদের ন্যায় কার্য-কুশল যোদ্ধা তাঁহার সহায় হওয়ায় পরিণামে ঘোর বিপ্লবের সম্ভবনা। সুতরাং নবাব তাঁহাদের প্রতি কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন। সহসা এক ঘটনা উপস্থিত হইল। রাজার অধীনতায় যে-সমস্ত সৈন্য ছিল, অনেক দিন হইতে তাহারা বেতন প্রাপ্ত হয় নাই। তৎকালে এইরূপ নিয়ম ছিল যে, সৈন্যদিগের বেতন বাকি পড়িলে, তাহারা প্রজাগণের নিকট হইতে উহা গ্রহণ করিবার অনুমতি পাইত। উদয়নারায়ণের সৈন্যগণ তাহাই আরম্ভ করিল। কিন্তু সেই উপলক্ষে রাজসাহী প্রদেশে ঘোর অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত হইল। সৈন্যগণ নিরীহ প্রজাগণকে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। নিঃসহায় দরিদ্র প্রজাবর্গ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। সংবাদ নবাবের কর্ণগোচর হইলে, তিনি গোলাম মহম্মদ ও উদয়নারায়ণকে এই সুযোগে দমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

রাজা উদয়নারায়ণ গোলাম মহম্মদের এতদূর বশীভূত হইয়াছিলেন যে, তিনি সৈন্যগণের অত্যাচারের কোন প্রতিবিধান করেন নাই। নবাব এই ছল পাইয়া, উভয়কেই শাস্তি প্রদানের ইচ্ছা করিলেন; এতদ্ব্যতীত অনেক দিন হইতে রাজসাহী প্রদেশের রাজস্ব প্রেরিত হয় নাই। অচিরে মহম্মদ জান-নামক একজন সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনতায় একদল সৈন্য রাজসাহী প্রদেশে প্রেরিত হইল।[৫] রাজা উদয়নারায়ণ এই সংবাদে স্তম্ভিত হইলেন; তিনি কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। সামান্য কারণে তাঁহার প্রতি নবাবের বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্বলিত হওয়ায় তিনি আশ্চর্য

৫ Riyaz-us-salatin, p. 256. মহম্মদ জানের অগ্রে অনেক কুঠারধারী লোক যাইত বলিয়া ইহাকে 'কুড়ালী' বলিত। Ibid p. 281.

বিবেচনা করিলেন। গোলাম মহম্মদ তাঁহার দোলায়মান চিত্তকে উত্তেজিত করিবার জন্য নানা প্রকার উৎসাহবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। মুর্শিদকুলীর অন্যায় ব্যবহার ও জমিদারগণের প্রতি অত্যাচারের কথা স্মরণ করাইয়া, গোলাম মহম্মদ রাজাকে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিল। রাজার অন্যতম সৈন্যাধ্যক্ষ কালিয়া জমাদারও নিতান্ত নীরব ছিল না। রাজা উভয় সৈন্যাধক্ষের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হওয়ায়, নবাবের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন। বিশেষতঃ নবাব রাজাকে সৈন্যগণের অত্যাচার নিবারণ করিতে অনুরোধ না করিয়া, কিংবা সে বিষয়ে কিছুই জিজ্ঞাসা না করিয়া, যখন একেবারে তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন, তখন তিনি নবাবের গূঢ় উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার যে-যশোগরিমা দিন দিন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতেছিল, নবাব তাহারই ধ্বংসের জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া তিনি গোলাম মহম্মদের কথায় সম্মত হইলেন। হিন্দু জমিদারগণের প্রতি অযথা অত্যাচারের স্মৃতিও তাঁহার হৃদয়মধ্যে এক ঘোর বিপ্লব উপস্থিত করিল। তিনি তাহাতে উত্তেজিত হইয়া, অদম্য ভাগীরথী প্রবাহের ন্যায় নবাবসৈন্যের সমক্ষে সামান্য শৈলবৎ দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু সেই স্রোতে তাঁহাকে চিরদিনের জন্য ভাসিয়া যাইতে হইয়াছিল। উভয় সেনাপতির সহিত পরামর্শের অল্প কাল পরে উদয়নারায়ণ বড়নগর পরিত্যাগ করিয়া সুলতানাবাদের অন্তর্গত বীরকিটি-নামক স্থানে তাঁহার সুরক্ষিত বাসভবনে বাস ও তাহার নিকটবর্তী জগন্নাথপুরের গড়ে সৈন্য স্থাপন করেন। বীরকিটি এক্ষণে বর্তমান সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত।

ক্ষিতীশবংশাবলিচরিতে উদয়নারায়ণের সহিত যুদ্ধ-সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, এস্থলে তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। উক্ত পুস্তকে উদয়নারায়ণ, গোলাম মহম্মদ ও মহম্মদ জানের পরিবর্তে, উদয়চাঁদ, আলি মহম্মদ ও লহরীমাল লিখিত হইয়াছে।[৬] নবাব সেনাপতি লহরীমাল সসৈন্যে বীরকিটি[৭] গ্রামের নিকটস্থ হইলে, মহম্মদও তথায় শিবির সন্নিবেশ করে। আলি মহম্মদের সৈন্যগণের উৎসাহ ও অধ্যবসায় দেখিয়া লহরীমাল অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন। তিনি উদয়চাঁদ ও আলি মহম্মদ উভয়কেই উত্তমরূপে জানিতেন; উভয়ে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে, তাঁহার পক্ষে যে বিষম অনর্থ উপস্থিত হইবে, ইহা তিনি বিলক্ষণ রূপে বুঝিতে পারিলেন এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই সময়ে নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা রঘুরাম লহরীমালের সহিত উদয়চাঁদের বিরুদ্ধে রাজশাহী যাত্রা করিয়াছিলেন। রঘুরামের পিতা রাজা রামজীবন রাজস্বপ্রদানে অসমর্থ হওয়ায় বন্দী হইয়া মুর্শিদাবাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন; পুত্র রঘুরামও তাঁহার সমভিব্যাহারে

৬ প্রচলিত ইতিহাসে যে সমস্ত নাম দৃষ্ট হয়, আমরা তাহাই গ্রহণ করিয়াছি।
৭ এই বীরকিটি ক্ষিতীশবংশাবলিতে বারকাটি বলিয়া লিখিত আছে।

ছিলেন। যোদ্ধা বলিয়া রঘুরামের অত্যন্ত প্রতিপত্তি ছিল, সাধারণে তাঁহাকে রঘুবীর বলিয়া জানিত। রঘুনাথ নবাবের আদেশক্রমে লহরীমালের অনুবর্তী হন।

বীরকিটির নিকটে শিবিরসন্নিবেশের পর, তাহা হইতে বহুদূরে লহরীমাল পাঁচ-জন মাত্র সৈনিকপুরুষের সহিত রঘুরামকে লইয়া যুদ্ধসংক্রান্ত পরামর্শ করিতেছিলেন, এমন সময় আলি মহম্মদ অসিচর্ম ধারণ করিয়া, অশ্বারোহণে উনিশ জন সৈন্যের সহিত তাঁহাদিগের দিকে অগ্রসর হইল। ইহাতে লহরীমাল নিরতিশয় ভীত হইলেন। তৎকালে আপনাদিগের সৈন্য দূরে অবস্থান করায় তিনি আলি মহম্মদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করিলেন না। কিন্তু 'রঘুরাম' রণবিমুখ হইতে নিষেধ করিয়া লহরীমালকে সাহস প্রদান করিতে লাগিলেন। এমন সময় আলি মহম্মদ নিকটস্থ হইলে রঘুরাম তাহার প্রতি এক তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করেন। শর বর্ম ভেদ করিয়া আলি মহম্মদের হৃদয়ে বিদ্ধ হইল এবং তাহাকে তৎক্ষণাৎ ভূতলশায়ী করিল। আলী মহম্মদ পিপাসায় কাতর হইয়া উঠিল, রঘুরাম তাহাকে বারি প্রদান করিয়া শুশ্রূষার্থ আপনাদিগের শিবিরে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু অচিরকাল মধ্যে আলি মহম্মদের প্রাণবায়ুর অবসান হয়।[৮] তাহার সৈন্যগণ নেতৃবিহীন হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলে, নবাবসৈন্যগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। তাহাতে একটি সামান্য যুদ্ধমাত্র হয়; এই যুদ্ধে নবাবসৈন্যগণ তাহাদিগকে দলিত ও বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। তারিখ বাঙ্গালা, রিয়াজুস্ সালাতীন ও স্টুয়ার্টের বাঙ্গলার ইতিহাসে কেবল এইমাত্র লিখিত আছে যে, রাজবাটির নিকটে মহম্মদ জানের সহিত উদয়নারায়ণের সেন্যাদিগের একটি যুদ্ধ হয়; তাহাতে গোলাম মহম্মদ নিহত হয়। এই রাজবাটী তাঁহার বীরকিটিস্থ বাসভবন, তাহার নিকটে ও জগন্নাথ গড়ের সম্মুখে এক পার্বত্য প্রান্তরে উভয় পক্ষের যুদ্ধ হয়। এক্ষণে সে স্থানকে মুণ্ডমালা বা মুড়মুড়ের ডাঙ্গা কহিয়া থাকে। তাহার নিকটে অদ্যাপি দগ্ধ কন্দুকাদি পাওয়া যায়। উদয়নারায়ণের পুত্র সাহেবরাম এই যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

গোলাম মহম্মদের মৃত্যু-সংবাদ রাজা উদয়নারায়ণের কর্ণগোচর হইলে, তিনি অনন্যোপায় হইলেন। সেনাপতি ও যাবতীয় সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে; এরূপ অবস্থায় তিনি একাকী কি করিবেন, স্থির করিতে পারিলেন না; একবার মনে করিলেন, যে কিছু অল্প সৈন্য আছে, তাহা লইয়া সমরক্ষেত্রে আত্মবিসর্জন দেন; কিন্তু স্বীয় পরিবারবর্গের অবস্থা স্মরণ করিয়া তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তাঁহার এইরূপ বিশ্বাস ছিল, যে তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পরিবারবর্গ মুর্শিদাবাদে বন্দী হইয়া মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইবে।[৯] সেই বিশ্বাসে রাজা সপরিবারে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া যশোলাভ

৮ ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত—দশম অধ্যায়।

৯ প্রচলিত ইতিহাসে বন্দী জমিদারদিগের পরিবারবর্গকে মুর্শিদকুলী খাঁ-কর্তৃক মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার উল্লেখ দেখা যায়। Riyaz-us-salation, p. 256.

অপেক্ষা ধর্মরক্ষাকে গুরুতর মনে করিলেন। পুত্র সাহেবরামও যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহারা বীরকিটির রাজভবন হইতে বহির্গত হইয়া সপরিবারে অরণ্যে ও পর্বতময় দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।[১০] যেখানে গমন করেন, সেইখানে মনে হয়, যেন নবাবসৈন্যগণ তাঁহার অনুসরণ করিতেছে এবং তাঁহাকে মুসলমানধর্মে দীক্ষিত করিতে ইচ্ছা করিতেছে। এইরূপ ভয়ানক চিন্তায় তিনি কাতর হইয়া উঠেন ও অবশেষে দেবীনগর-নামক স্থানে উপস্থিত হন। দেবীনগরেও তাঁহার এক বাসভবন ছিল। প্রবাদ ও প্রচলিত ইতিহাস অনুসারে উদয়নারায়ণ দেবীনগরে হংস-সরোবর তীরে উপস্থিত হইয়া বিষপানে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি ও সাহেবরাম বন্দী হইয়া তথা হইতে মুর্শিদাবাদে নীত হন এবং কারাযন্ত্রণা ভোগে তাঁহার অবশিষ্ট জীবনকাল পর্যবসিত হয়। দেবীনগর সাঁওতাল পরগণা জেলার অন্তর্বর্তী। হংস-সরোবর অদ্যাপি বর্তমান আছে।[১১]

এইরূপে উদয়নারায়ণের জীবন-অবসান হয়। তাঁহার ন্যায় উপযুক্ত জমিদার তৎকালে অতি অল্পই দৃষ্ট হইত। সর্বাপেক্ষা তাঁহার ধর্মপরায়ণতাই প্রসিদ্ধ ছিল। হিন্দু ধর্মের শ্রীবৃদ্ধিসাধনের জন্য তিনি অনেক যত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নানা স্থানের দেববিগ্রহ তাঁহার ধর্মানুরাগের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সাঁওতাল পরগণা জেলাস্থ বীরকিটি-নামক স্থানের রাধাগোবিন্দ, বন-নওগাঁ গ্রামস্থ গিরিধারি-মূর্তি প্রভৃতি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত। রামপুরহাট উপবিভাগস্থ কনকপুর গ্রামে যে-অপরাজিতা মূর্তি আছেন, তিনি তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহারই স্থাপিত মদনগোপাল মূর্তি মুর্শিদাবাদ বড়নগরে নাটোর-রাজগণ কর্তৃক অদ্যাপি পূজিত হইতেছেন। উদয়নারায়ণের হস্ত হইতে নবাব রাজশাহী প্রদেশ গ্রহণ করিয়া, রামজীবন ও কুমার কালুকে তাহার ভার অর্পণ করেন। রামজীবন নাটোর রাজবংশের আদিপুরুষ রঘুনন্দনের ভ্রাতা।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমরা আর এক উদয়নারায়ণের বিবরণ অবগত হইয়া থাকি। শেষোক্ত উদয়নারায়ণ বঙ্গজ কায়স্থ মিত্রবংশসম্ভূত; পূর্ববঙ্গের উলাইল গ্রাম তাঁহার জন্মস্থান। তিনি দৌহিত্রসূত্রে বাকলা চন্দ্রদ্বীপের রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। মিত্র উদয়নারায়ণও অত্যন্ত পরাক্রান্ত ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক ঘটনা শুনিতে পাওয়া যায়। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, নবাব-শ্যালক খাজি মজুমদার তাঁহাকে

১০ কলিকাতা রিভিউ পত্রিকায় রাজসাহীরাজবংশের বিবরণে উদয়নারায়ণের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে। বাঙ্গলা ১১২০ সালে রাজসাহীর জমিদার উদিতনারায়ণ নবাবের কর্মচারিগণের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া, নিজ অনুচরবর্গ সমবেত করিয়া বিদ্রোহী হন, এবং সুলতানাবাদের পর্বতে প্রস্থান করেন। নাটোর রাজবংশের আদিপুরুষ রঘুনন্দন তাঁহাকে ধৃত করিয়া আনিলে, তাহার পুরস্কারস্বরূপ তাঁহার ভ্রাতা রামজীবনকে রাজসাহীর জমিদারী প্রদান করা হয়। (Calcutta Review, 1873.

১১ মুর্শিদাবাদের ইতিহাস দেখ।

রাজ্যচ্যুত করিলে তিনি নবাবের নিকট রাজ্য প্রার্থনা করেন। নবাব তাঁহার আবেদনে উত্তর দেন যে, তুমি একটি ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয় লাভ করিতে পারিলে, রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবে। উদয়নারায়ণ তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া, দ্বিতীয় ফরিদের ন্যায় মল্লযুদ্ধে এক "শের" নিহত করিয়া অক্ষত-শরীরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন; কিন্তু নবাবের বেগম তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির অন্তরায় হইয়া উঠেন। উদয়নারায়ণ অবশেষে কৌশলক্রমে রাজ্য হস্তগত করেন।[১২]

১২ চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ (ব্রজসুন্দর মিত্র), ৫৪-৫৫ পৃষ্ঠা, Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol. XI.III. J. Wise on the Barah Bhuyas of Eastern Bengal.

কাটরার মস্‌জেদ

জাহানকোষা তোপ

বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার শেষ মুসলমান-রাজধানী মুর্শিদাবাদের গৌরবচিহ্ন সমস্ত ধরণীপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া গিয়াছে। সর্বগ্রাসী কালের অনন্ত গর্ভে তাহারা চিরদিনের জন্য আশ্রয় লইয়াছে। দুই শত বৎসর অতীত হইতে না-হইতে, ভাগীরথীর উভয় তীরবর্তী তিন-চারি ক্রোশব্যাপী নগরের অধিকাংশ এক্ষণে মরুভূমিতে পরিণত। তাহার বিরাট সৌধমালা অণু-পরমাণুতে মিশিয়া গিয়াছে। দিল্লী, আগরা, এমন কি প্রাচীনতম গৌড় পর্যন্ত ভগ্ন-অট্টালিকাস্তূপ বক্ষে করিয়া আপন আপন পূর্বগৌরবের পরিচয় দিতেছে। কিন্তু তাহাদের বহু পরে নির্মিত মুর্শিদাবাদ শ্রীহীন, চিহ্নহীন, গৌরবহীন হইয়া ধ্বংসের শেষ আঘাতের অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। মুর্শিদাবাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আপনার মঙ্গলঘট ভাগীরথীবক্ষে বিসর্জন দিয়া যেন আর আসিবেন না বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রত্নরাজিমণ্ডিত মুকুট চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে; গজদন্তনির্মিত সিংহাসন শতখণ্ডে বিভক্ত; পরিধানের বহুমূল্য রেশমীবস্ত্র শতগ্রন্থিযুক্ত; বাদলার মালা বালকের ক্রীড়নক হইয়াছে। সেই অনন্ত ঐশ্বর্যময় চিত্র কে যেন মলিনতার ছায়া দ্বারা ঢাকিয়া দিয়াছে। মুর্শিদাবাদের ন্যায় এত শীঘ্র আর কোন স্থানের অধঃপতন ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। মুর্শিদাবাদের কত অট্টালিকার নাম শুনা যাইত,—চেহেলসেতুন, এম্‌তাজ্‌মহাল, মহালসরা, আর কত নাম করিব! এই সমস্ত এক্ষণে কালগর্ভে শায়িত। কোন-কোনটির স্থাননির্দেশ করা যায়,—কোন-কোনটির স্থানের চিহ্নমাত্রও অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। দুই-একটি সমাধিক্ষেত্র ব্যতীত ইহার পূর্বপরিচয়ের কোন কিছুই নাই। যাঁহারা মুর্শিদাবাদের নিজামতী আসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন তাঁহারা প্রায় সকলেই নূতন নূতন অট্টালিকায় ও উদ্যানে মুর্শিদাবাদকে পরিশোভিত করিতে চেষ্টা করেন। তদ্ভিন্ন নবাবের কর্মচারী ও জগৎশেঠ প্রভৃতি প্রধান প্রধান ধনাঢ্যবর্গের সৌন্দর্যময়ী সৌধমালায় ভূষিত হইয়া মুর্শিদাবাদ ভারতসাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লী নগরীর সহিতও সময়ে সময়ে স্পর্ধা করিত। জানি না, ভাগ্যলক্ষ্মী কেন মুর্শিদাবাদের প্রতি এরূপ বিরূপ হইলেন। রাজসম্মান সকলের ভাগ্যে চিরস্থায়ী হয় না, তাই বলিয়া একেবারে যে তাহার শোচনীয় দুর্দশা ঘটিবে, ইহাও বড় আক্ষেপের বিষয়। দিল্লী-আগরার যাহা আছে, তাহাতে এক্ষণেও তাহাদিগকে বিশাল সাম্রাজ্যের রাজধানী বলিয়া বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু কাহারও সাধ্য নাই যে, মুর্শিদাবাদকে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার শেষ মুসলমান রাজধানী বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারে।

১ গজদন্তের দ্রব্যাদি মুর্শিদাবাদ-শিল্পের নিদর্শন।

মুর্শিদকুলী জাফর খাঁ মুর্শিদাবাদে বাঙ্গলার রাজধানী স্থাপন করেন এবং তাঁহারই নামানুসারে ইহার নাম মুর্শিদাবাদ হয়। পূর্বে ইহাকে মুখসুসাবাদ বা মুখসুদাবাদ বলিত। মুখসুদাবাদ একটি সামান্য নগর মাত্র ছিল; মুর্শিদকুলী খাঁ ইহাতে রাজধানীর ও রাজকার্যের উপযোগী অট্টালিকাদি নির্মাণ করেন। ক্রমশঃ কেল্লা, দরবারগৃহ এবং অন্যান্য গৃহাদি নির্মিত হয়। সমস্তই এক্ষণে লোপ পাইয়াছে; কেবল তাঁহার নির্মিত এক বিরাট মসজেদ অদ্যাপি তাঁহার নাম প্রচার করিতেছে। মসজেদটি ধ্বংসমুখে পতিত; দুই চারি বৎসর মধ্যে তাহাও লয় প্রাপ্ত হইয়া মুর্শিদাবাদের সহিত মুর্শিদকুলীর নামের সম্বন্ধ ঘুচাইয়া দিবে। বিশেষতঃ গত ভূমিকম্পে[২] তাহা ভূমিসাৎ হইবার উপক্রম করিয়াছে। যদি কেহ মুর্শিদাবাদ-স্থাপয়িতার শেষ গৌরবচিহ্ন দেখিতে চাহেন, তাহা হইলে ধ্বংসমুখে পতিত সেই বিরাট মসজেদ একবার নয়ন ভরিয়া দেখিয়া আসিবেন। দেখিবেন যে, বিধ্বস্তপ্রায় সেই ভগ্নস্তূপ আজিও মুর্শিদাবাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শনীয় পদার্থ। কিন্তু কাল বোধহয়, অধিক দিন কুলী খাঁর কীর্তিস্তম্ভকে ধরণীবক্ষে অবস্থান করিতে দিবে না।

মুর্শিদাবাদের প্রায় অর্ধ ক্রোশ পূর্বে এই বৃহৎ মসৃজেদ অবস্থিত। যে স্থানে মসৃজেদ নির্মিত হয়, তাহাকে কাটরা কহে। কাটরা শব্দে গঞ্জ বা বাজার বুঝায়। কাটরা মসৃজেদ নির্মাণ সম্বন্ধে প্রচলিত ইতিহাসে যেরূপ বর্ণনা দেখা যায়, আমরা প্রথমতঃ তাহারই উল্লেখ করিতেছি। মুর্শিদকুলী জাফর খাঁর বার্ধক্য উপস্থিত হওয়ায় এবং শীঘ্র শীঘ্র স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতেছে জানিয়া, তিনি সমাধিমন্দির নির্মাণের আদেশ দেন। তথায় একটি মসজেদ ও কাটরা বা গঞ্জ স্থাপিত করিবার কথাও থাকে। উক্ত কাটরা হইতে এক্ষণে স্থানটির নাম কাটরা হইয়াছে। মোরাদ ফরাস নামে একজন সামান্য অথচ বিশ্বস্ত কর্মচারী সেই কার্যের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হয়। নগরের পূর্বদিকে খাস তালুকের অন্তর্গত একটি স্থান সেইজন্য নির্দিষ্ট হইলে, মোরাদ নিকটবর্তী হিন্দুমন্দির সকল ভূমিসাৎ করিয়া তাহার উপকরণ দ্বারা উক্ত কার্য আরম্ভ করে। জমিদার ও অন্যান্য হিন্দুগণ যথেচ্ছ পরিমিত অর্থ প্রদান করিয়া আপনাদিগের মন্দির রক্ষা করিতে পারিতেন, কিন্তু কোন প্রকার অনুনয় বা উৎকোচ কার্যকর হয় নাই। মুর্শিদাবাদ হইতে তিন চারিদিনের পথে কোথাও একটিমাত্র মন্দির অবস্থিতি করিতে পারে নাই! দূরবর্তী গ্রামসমূহের ধর্মার্থে উৎসর্গীকৃত হিন্দুমন্দির সকল ভাঙ্গিবার প্রস্তাব হইলে সেই সেই স্থানের অধিবাসিগণ অর্থ দিয়া সে সকল মন্দির রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। হিন্দুদিগের ভৃত্যবর্গকে সমাধি নির্মাণ-কার্যে নিযুক্ত করা হইত। যাহাদিগের প্রভুরা অর্থ প্রদান করিতেন, তাহারা নিষ্কৃতি পাইত। সকলকে মোরাদ ফরাসের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইত। এইরূপে এক বৎসরের মধ্যে সমাধিমন্দির নির্মিত হয়। কাটরা বা একটি গঞ্জ স্থাপন করিয়া তাহার আর সমাধিসংস্কারের জন্য নির্দেশ করা হইয়াছিল।

২ ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ভূমিকম্প।

ভগ্ন মন্দিরের উপকরণ লইয়া কাটরা মসজেদ নির্মাণ সম্বন্ধে প্রচলিত ইতিহাসের মতে অনেকে সন্দিহান হইয়া থাকেন।[৩] একেবারে মিথ্যা না হইলেও ইহার অধিকাংশ অতিরঞ্জিত বলিয়াই বোধ হয়। এইরূপ কথিত আছে যে, মোরাদকে এক বৎসরের মধ্যে মসজেদ নির্মাণের আদেশ দিলে, মোরাদ জাফর খাঁর নিকট হইতে অনুমতি লয় যে, তাহার কার্যে নবাব যেন কোনরূপ বাধা প্রদান না করেন। এক বৎসরের মধ্যে এই বৃহৎ মসৃজেদ নির্মাণ করা যে কতদূর দুঃসাধ্য তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। সুতরাং মোরাদ এক বৎসরের মধ্যে নূতন করিয়া ইষ্টকাদি প্রস্তুত করিয়া মসৃজেদ নির্মাণ করিতে গেলে, কখনও কৃতকার্য হইতে পারিত না। এইজন্য নিকটবর্তী মন্দিরাদি ভগ্ন করিয়া থাকিবে। কেবল মন্দির বলিয়া কেন, নিকটবর্তী অন্যান্য ইষ্টকনির্মিত গৃহাদিরও উক্তরূপ দশা হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। মুর্শিদকুলী খাঁ হিন্দুবিদ্বেষী বলিয়া ইতিহাসে পরিচিত ; কিন্তু আমরা সেরূপ মনে করি না ; তবে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদিগের প্রতি তাঁহার আনুরক্তি কিছু অধিক ছিল। তিনি যে ইচ্ছাপূর্বক মন্দিরভঙ্গের আদেশ দিয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। কারণ, তিনি নিজে সমাধিমন্দিরনির্মাণপ্রথার কোনরূপ আদেশ প্রদান করেন নাই এবং এক বৎসরের মধ্যে উক্ত প্রকাণ্ড মসজেদ ও সমাধির নির্মাণ অসম্ভব বলিয়া সম্ভবতঃ তিনি বাধ্য হইয়া মোরাদের অত্যাচারের প্রতি লক্ষ্য করেন নাই। কিন্তু মোরাদ ফরাসের অত্যাচার অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ মুর্শিদকুলীর জামাতা,

৩ "তারিখ বাঙ্গালা" গ্রন্থে প্রথমে এই মন্দিরভঙ্গব্যাপারের কথা লিখিত হয়। গ্ল্যাড-উইন সাহেবকৃত তাহার ইংরাজি অনুবাদ হইতে স্টুয়ার্ট প্রভৃতি মন্দিরভঙ্গের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। রিয়াজুস সালাতীনের অধিকাংশ "তারিখ বাঙ্গালা" হইতে গৃহীত হইলেও তাহাতে মন্দিরভঙ্গের কথা নাই। মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের দেওয়ান সুপ্রসিদ্ধ ফজ্‌ল রব্বী খাঁ বাহাদুর মন্দিরভঙ্গের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতেন না। বেভারিজ সাহেব উক্ত বিবরণ অযৌক্তিক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, প্রচলিত ইতিহাসে ৪ দিনের পথের সমস্ত হিন্দুমন্দির ভগ্ন হওয়ার কথা লিখিত আছে ; অথচ মুর্শিদাবাদ হইতে ১৷৷০ ক্রোশ দূরে কিরীটেশ্বরীর মন্দির সমভাবে অদ্যাপি বিরাজ করিতেছে। "The tale in its original form, is even more preposterous, for in Gladwin's translation of the Mahamadan narrative, and in Stewart, the prohibitory distance is given as four days" (Calcutta Review, October, 1892)। কিন্তু মুর্শিদাবাদের তৎকালিক সর্বশ্রেষ্ঠ হিন্দু তীর্থস্থান কীরিটেশ্বরীর সহিত বাঙ্গলার রাজস্ব-বিভাগের প্রধান কর্মচারী বঙ্গাধিকারী কাননগোগণের বিশিষ্টরূপ সম্বন্ধ থাকায় মোরাদের ন্যায় একজন নিম্নপদস্থ কর্মচারী তাহা ভাঙ্গিতে সাহস করে নাই, এরূপ অনুমানও করা যাইতে পারে। উক্ত মন্দিরভঙ্গের বিবরণ অতিরঞ্জিত হইলেও 'তারিখ বাঙ্গালা'র লিখিত বিষয় যে একেবারে সম্পূর্ণ মিথ্যা, এ কথা সাহস করিয়া বলা যায় না।

তাঁহার পরবর্তী নবাব সুজা উদ্দীন মোরাদ ফরাসের অত্যাচারের জন্য তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন।[৪]

হিজরী ১১৩৭ অব্দে[৫] মসজেদ নির্মাণ শেষ হয়। মক্কার সুপ্রসিদ্ধ মসজেদের অনুকরণে ইহার নির্মাণ হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। মসজেদের সঙ্গে মিনার, চৌবাচ্চা ও ইন্দারা প্রভৃতিও প্রস্তুত হয়। মুর্শিদকুলী খাঁ মসজেদ নির্মাণের পর এক বৎসরের কিছু অধিক কাল জীবিত ছিলেন। হিঃ ১১৩৯ অব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার আদেশে মসজেদের প্রবেশদ্বারের সোপানাবলীর নিম্নে একটি প্রকোষ্ঠ নির্মিত হয়; এই প্রকোষ্ঠেই তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। তিনি বিনয়সহকারে বলিয়াছিলেন যে, উপাসকদিগের পদধূলি যেন তাঁহার বক্ষস্থলের উপর পতিত হয়। সাধুদিগের পদধূলি পরলোকে তাঁহার কল্যাণসম্পাদন করিতে পারে বলিয়া, তিনি এইরূপ অনুরোধ করিয়াছিলেন। মুর্শিদকুলী খাঁ যেরূপ আনুষ্ঠানিক মুসলমান ছিলেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে এরূপ ইচ্ছাপ্রকাশ বড় বিচিত্র নহে।

কাটরার মসজেদ এক্ষণে ভগ্নদশায় উপস্থিত; তথাপি ইহার বিরাট্ গৌরবের নিদর্শন এখনও অনেক পরিমাণে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। আমরা ইহার বর্তমান অবস্থার একটি চিত্র প্রদান করিতেছি। মসজেদের পশ্চাতে অর্থাৎ পশ্চিমদিকে সদররাস্তা, রাস্তা হইতে মসজেদের দক্ষিণপার্শ্বে একটি পথ দিয়া মসজেদের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হয়। মসজেদ পূর্বমুখে অবস্থিত। প্রবেশদ্বারে উঠিতে হইলে চৌদ্দটি বৃহৎ সোপান অতিক্রমের প্রয়োজন। এই সোপানাবলীর নিম্নে, একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে মুর্শিদাবাদের স্থাপয়িতা ইতিহাসখ্যাত মুর্শিদকুলী খাঁ অনন্ত-নিদ্রায় নিদ্রিত। যাঁহার শাসনে সমগ্র বঙ্গভূমি সন্ত্রস্ত হইয়াছিল, এক্ষণে তিনি সোপানবলীর নিম্নস্থ অন্ধতমসাবৃত গহ্বরে শয়ান রহিয়াছেন। উত্তরদিকে একটি মাত্র দ্বার,—সেই দ্বার প্রায় রুদ্ধ থাকে; সময়ে সময়ে ক্ষণকালের জন্য উন্মুক্ত হয় মাত্র। দ্বারের পরই একটি ক্ষুদ্র গৃহ, তাহার পশ্চাতে সমাধি-প্রকোষ্ঠ; সেই ক্ষুদ্রগৃহ ও সমাধি-প্রকোষ্ঠের মধ্যে আর একটি দ্বার,—এ দ্বারের কোন কপাট নাই। কষ্টিপ্রস্তরগঠিত চৌকাঠ দ্বারা দ্বারটি নির্মিত। প্রকোষ্ঠমধ্যে শ্বেতবস্ত্রমণ্ডিত সমাধি কারুকার্যসমন্বিত মাল্যশোভিত হইয়া আছে। লোকে আপনাদিগের মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য সমাধির উপর এই সমস্ত মালা নিক্ষেপ করিয়া যায়। এই অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠে রাত্রিকালে একটি মাত্র দীপ আপনার ক্ষীণ শিখা বিস্তার করিয়া থাকে। সমাধির তত্ত্বাবধানের জন্য একটি লোক নিযুক্ত আছে। সোপানাবলীর উপরে একটি প্রকাণ্ড তোরণ-দ্বার; তোরণ-দ্বারের উপর দ্বিতল নহবতখানা এবং তোরণ-দ্বারের পূর্বসীমা অর্থাৎ সোপানাবলীর অব্যবহিত পর হইতে আরম্ভ করিয়া মসজেদের পশ্চাদ্ভাগ পর্যন্ত একটি বিশাল চত্বর। চত্বরটি সমচতুরস্র,

৪ Riyaz-us-salatin p. 292.

৫ ইংরাজী ১৭২৩।২৪

দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ১১০ হস্তেরও অধিক হইবে। মস্‌জেদ, তোরণ, সমস্তই এই চত্বরে অবস্থিত। তোরণ পার হইয়া প্রায় ৮০ হাত পরে মস্‌জেদ ; মস্‌জেদ ও তোরণের মধ্যস্থিত বিশাল প্রাঙ্গণ জঙ্গলে পরিপূর্ণ। কেবল তোরণ হইতে মস্‌জেদে যাইবার কৃষ্ণপ্রস্তর-মণ্ডিত পথটি আজিও দৃষ্ট হইয়া থাকে। চত্বরের পশ্চিমদিকে পঞ্চগম্বুজ-বিশিষ্ট বিরাট্‌ মস্‌জেদ অদ্যাপি দণ্ডায়মান থাকিয়া কালের আঘাত সহ্য করিতেছে। মস্‌জেদের ভিতর বসিয়া যাওয়ায় খিলানকরা গম্বুজগুলি বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে।[৬] গম্বুজ পাঁচটি ব্যতীত চারিকোণে চারিটি ক্ষুদ্র মিনার ছিল ; তাহার দুই একটি এখনও বর্তমান আছে। মস্‌জেদটি ইষ্টক-নির্মিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঙ্গলা ইষ্টক জমাইয়া কিরূপে এই বিশাল পঞ্চগম্বুজের খিলান নির্মিত করা হইয়াছিল, তাহা মনে করিতে গেলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়।

মস্‌জেদটি দৈর্ঘ্যে ৮৬।৮৭ হাত হইবে এবং প্রস্থে ১৬ হাতেরও অধিক। গম্বুজগুলির ধাতুনির্মিত চূড়া আজিও তাহাদের পতনোন্মুখ মস্তকে শোভা পাইতেছে। মস্‌জেদের প্রবেশদ্বারে প্রকাণ্ড কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত চৌকাঠ। দ্বারের উপর এক খণ্ড কষ্টি প্রস্তরে ফারসী ভাষায় এইরূপ লিখিত আছে,—"আরবের মহম্মদ উভয় জগতের গৌরব ; যে ব্যক্তি তাঁহার দ্বারের ধূলি নহে, তাঁহার মস্তকে ধূলিবৃষ্টি হউক।" ঢাকায় সায়েস্তা খাঁর কন্যা পরীবিবির সমাধি-মন্দিরেও ঐরূপ লিখিত আছে। মস্‌জেদের মধ্যস্থলে পশ্চিমদিকের ভিত্তিতে কলমী লেখা। ইহার উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বের জানালা দুইটি আজিও বাঙ্গলার পূর্ব শিল্পের পরিচয় দিতেছে। অনেকগুলি গম্বুজ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় উপর হইতে ক্রমাগত ইষ্টক খণ্ড পতিত হইতেছে। এই মস্‌জেদ মধ্যে প্রবেশ করিতে মনে ভীতির সঞ্চার হয়। কেবল কপোত ও মধুমক্ষিকাগণ আপনাদিগের উপযুক্ত আবাসস্থান বিবেচনায় মস্‌জেদটিকে অধিকার করিয়া রাখিয়াছে এবং নীরব ও নির্জন স্থানে সময়ে সময়ে আপনাদিগের কণ্ঠস্বরে আপনারাই মুগ্ধ হইয়া থাকে। চত্বরের চারিপার্শ্বে মোসাফের ও কারীদিগের (কোরাণাধ্যায়ী) জন্য বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ ছিল। গৃহগুলি সমস্তই খিলানের, একটিতেও তীর বরগা নাই। এখনও তাহাদের ভগ্নাবশেষ নয়ন পথে পতিত হইয়া মুর্শিদকুলী খাঁর বিশাল কীর্তির পরিচয় দিতেছে। মস্‌জেদের পশ্চাদ্ভাগের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দুইটি অত্যুচ্চ অষ্টকোণ মিনার যেন গগনস্পর্শ করিবার জন্য দণ্ডায়মান রহিয়াছে। উত্তর-পশ্চিমের মিনারে যাইবার সুবিধা নাই ; তাহার চারি দিক্‌ ভীষণ জঙ্গলে আবৃত। দক্ষিণ-পশ্চিমের মিনারে উঠিতে পারা যায়। সর্পগতিতে ৬৭টি সোপান অতিক্রম করিয়া মিনারের চূড়াতলে উঠিতে হয়। মধ্যে মধ্যে আলোক ও বায়ু প্রবেশের দ্বারও আছে। মিনারটি প্রায় ৪০ হস্ত উচ্চ হইবে ; চূড়াতল হইতে ভূমি পর্যন্ত অংশ প্রায় ৩০ হস্ত।

---

৬ এখনও প্রায় সেই অবস্থায় আছে ক্রমশঃ ঐ বিদীর্ণ অংশগুলি বিস্তার লাভ করিতেছে।

এই চূড়াতলে দাঁড়াইয়া পশ্চিমদিকে দৃষ্টিপাত করিলে, মুর্শিদাবাদ নগরের এক সুন্দর দৃশ্য নয়নপথে পতিত হয়। পূর্বে আরও সুন্দর বোধ হইত, এক্ষণে বৃক্ষাদির সংখ্যা অধিক হওয়ায়, মুর্শিদাবাদের সুন্দর চিত্রকে অনেকটা আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে। তথাপি এক্ষণে যাহা আছে, তাহাও বড়ই মনোরম বলিয়া বোধ হয়। বিস্মৃতির ছায়াময় স্তর হইতে অনেক দিনের স্মৃতির অস্ফুট আলোকের ন্যায় সেই বহুদূরবিস্তৃত শ্যামল পত্ররাজির মধ্যে মুর্শিদাবাদের প্রধান প্রধান প্রাসাদগুলির দৃশ্য বড়ই সুন্দর বোধ হইয়া থাকে। অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই মনোরম চিত্র দেখিতে ইচ্ছা হয়। গত ভূমিকম্পে[৭] এই মিনারের শীর্ষদেশ ভগ্ন হইয়াছে। হয়ত মুর্শিদকুলী খাঁর শেষ বিরাট কীর্তি অচিরকাল মধ্যেই ধূলিরাশিতে পরিণত হইবে। যাঁহা হইতে মুর্শিদাবাদের নাম ও গৌরব, যিনি মুর্শিদাবাদকে বাঙ্গলার রাজধানী করিয়া সমগ্র জগতে স্বীয় গৌরব প্রচার করিয়াছিলেন, মুর্শিদাবাদ হইতে যদি তাঁহার শেষ চিহ্ন চিরদিনের জন্য গাথা লয়প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। জানি না, কাটরার মসজেদের সংস্কার আর হইবে কিনা! যদিও অনেক অর্থব্যয়ের সম্ভাবনা বটে, তথাপি, মুর্শিদাবাদের স্থাপয়িতার শেষ চিহ্ন সর্বতোভাবে রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। এখন কেবল, তাঁহার সমাধিটির মধ্যে মধ্যে সংস্কার হইয়া থাকে।

কাটরা মসজেদ হইতে পশ্চিম দিকে কিছু দূরে আর একটা মসজেদ অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে ; তাহাকে ফৌতি মসজেদ কহে। মুর্শিদের দৌহিত্র নবাব সরফরাজ খাঁ উক্ত মসজেদ নির্মাণ করিতে করিতে আলিবর্দী খাঁর সহিত যুদ্ধার্থে গিরিয়া প্রান্তরে গমন করেন। কিন্তু তাঁহাকে আর জীবিত অবস্থায় প্রত্যাগমন করিতে হয় নাই। তদবধি মসজেদটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় অবস্থান করিতেছে। ইহা কাটরার পঞ্চ-গম্বুজ মসজেদের অনুকরণে নির্মিত হইতেছিল। ইহার পাঁচটি গম্বুজের মধ্যে দুইটি আজও বর্তমান আছে। সেই অসম্পূর্ণ মসজেদও ভগ্নদশায় পতিত ; বিশেষতঃ এক্ষণে জঙ্গলে আবৃত হইয়া ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর আবাসস্থান হইয়া উঠিয়াছে।

কাটরার দক্ষিণ-পূর্বদিকে দুইটি অশ্বত্থতরুর, অথবা একটি অশ্বত্থতরুর দুইটি সংলগ্ন কাণ্ডের মধ্যস্থলে এক বিশাল কামান অবস্থিতি করিতেছে। এই কামানের নাম জাহানকোষা বা জগজ্জয়ী। এই স্থানে মুর্শিদকুলী খাঁর কামানাদি রক্ষিত হইত বলিয়া কথিত আছে। সেইজন্য এই স্থানটিকে আজিও সাধারণে তোপখানা কহিয়া থাকে। এই তোপখানার উত্তর দিয়া একটি ক্ষুদ্র নদী সর্পগতিতে আপনার ক্ষুদ্র কলেবরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ তুলিয়া আপন মনে বহিয়া যাইতেছে। জাহানকোষা অনেকদিন পর্যন্ত ধরণীবক্ষে স্বীয় বিশাল বপু বিস্তার করিয়া অবস্থিতি করিতেছিল ; ইহার পার্শ্বে অশ্বত্থ বৃক্ষ জন্মিয়া জাহানকোষাকে ভূতল হইতে কতকটা ঊর্ধ্বে উত্তোলন করিয়াছে। কামানটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ১২ হাত হইবে। বেড় ৩ হাতের অধিক, মুখের

৭ ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্প

বেড়টি ১ হাতের উপর। অগ্নিসংযোগ-ছিদ্রের ব্যাস ১।। ইঞ্চি হইবে। কামানের গাত্রে ফারসী ভাষায় খোদিত ৯ খণ্ড পিত্তলফলক আছে। ৩ খণ্ড অশ্বত্থবৃক্ষের কাণ্ড মধ্যে প্রবিষ্ট, অবশিষ্ট কয়েকখানিও অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। পিত্তলফলকে বাঙ্গলার শাসনকর্তা ইস্‌লাম খাঁর গুণবর্ণনা ও কামানের নির্মাণাব্দাদি খোদিত আছে। এইরূপ লিখিত আছে যে, এই জাহানকোষা সাজাহানের রাজত্বকালে ও ইসলাম খাঁর বাঙ্গলা-শাসনের সময়, জাহাঙ্গীরনগরে দারোগা শের মহম্মদের অধীন হরবল্লভ দাসের তত্ত্বাবধানে জনার্দন[৮] কর্মকার কর্তৃক ১০৪৭ হিঃ ১১ই জমাদিয়স্‌ সানি মাসে নির্মিত হয়। ইহা ওজনে ২১২ মণ; ইহাতে ২৮ সের বারুদ লাগিয়া থাকে। জাহানকোষাকে এক্ষণে হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিই সিন্দুরাদি লেপন করিয়া পূজা করিয়া থাকে। ঢাকায় ইহা অপেক্ষা আরও একটি বিশাল তোপ ছিল; তাহা এক্ষণে নদীগর্ভে পতিত। বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানেও বৃহৎ তোপের কথা শুনা গিয়া থাকে।[৯] আমাদের দেশে পূর্বে যেরূপ শিল্পের উন্নতি হইয়াছিল, অনুসন্ধান করিলে, এখনও তাহার অনেক চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গলার শিল্পের দিন দিন যেরূপ অবনতি হইতেছে, তাহাতে লোকে ইহার পূর্বশিল্পের কথা প্রবাদ বাক্য বলিয়া মনে করিবে।

৮ এই জনার্দনকে বেভারিজ প্রভৃতি জনার্জ্জন বলিয়া লিখিয়াছেন। পিত্তল-ফলকের লেখা এক্ষণে অস্পষ্ট হইয়াছে, ভাল করিয়া পড়িবার সুবিধা নাই; কিন্তু উহা জনার্দন হওয়াই সম্ভব।

৯ Vide History of Bishnupur.

রোশনীবাগ
ফর্হাবাগ

মুর্শিদাবাদের বর্তমান নবাব-প্রাসাদের সম্মুখে, ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে একটি সুন্দর ছায়াময় ও শান্তিময় উদ্যান দৃষ্ট হইয়া থাকে ; এই উদ্যানটির নাম রোশনীবাগ। রোশনীবাগ ডাহাপাড়া গ্রামে অবস্থিত। উদ্যানটি আকারে বৃহৎ না হইলেও ইহার রমণীয়তা সর্বজন-প্রশংসনীয়। এই উদ্যানের সম্মুখে পূর্বে নবাবদিগের আলোকোৎসব হইত বলিয়া সাধারণতঃ সেই স্থানকে রোশনীবাগ বলে। আম্র প্রভৃতি বৃক্ষরাজি আপনাদিগের শ্যামপত্রপূর্ণ শাখা বিস্তার করিয়া পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া থাকায়, রোশনীবাগের অভ্যন্তরে সূর্যরশ্মি প্রবেশ করিতে পারে না ; এইজন্য স্থানটিকে অত্যন্ত ছায়াময় করিয়া রাখিয়াছে। নিদাঘের মধ্যাহ্ন-সময়ে এই রমণীয় উদ্যানের ছায়াতলে উপস্থিত হইলে, শরীর স্নিগ্ধ হইয়া যায় এবং ধীরে ধীরে মলয়সমীরণ প্রবাহিত হইয়া শরীরকে শীতল করিয়া তুলে। সেই সময় উদ্যানের চারি পাশ হইতে নানাবিধ সুকণ্ঠ বিহঙ্গের মধুরধ্বনি কর্ণকুহরে অমৃত ঢালিয়া দেয়। আবার উদ্যানের স্থানে স্থানে নানাবিধ প্রস্ফুটিত পুষ্প চারিদিকে সুগন্ধ বিস্তার করিয়া মনঃপ্রাণ প্রফুল্ল করিতে থাকে।

এই রমণীয় উদ্যানের ছায়াতলে মুর্শিদাবাদের দ্বিতীয় নবাব সুজা উদ্দীন চিরসমাহিত আছেন। সুজা উদ্দীন মুর্শিদকুলী জাফর খাঁর জামাতা। সুজা পূর্বে উড়িষ্যার শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত ছিলেন ; তাঁহার উড়িষ্যায় অবস্থানকালে, আলিবর্দী খাঁ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা হাজী আহাম্মদ সুজার অধীনতায় কার্যে নিযুক্ত হন ; পরে তাঁহার নিজামতী সময়ে তাঁহাদিগের আরও উন্নতি হয়। সুজা উদ্দীনের তুল্য ন্যায়পর নবাব অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহার ন্যায় পরোপকারিতা অমায়িক ব্যবহার ও ন্যায়ানুমোদিত শাসন মুর্শিদাবাদের কোন নবাবে দেখিতে পাওয়া যায় না। মুর্শিদাবাদের নবাবদিগের মধ্যে তিনিই প্রথমে হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিকে সমভাবে প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করেন। মুতাক্ষরীণকার[১] নওশেরোয়াঁর রাজত্বের সহিত তাঁহার রাজত্বের তুলনা করিয়াছেন। মুর্শিদকুলী খাঁ যে-সমস্ত জমিদারদিগকে বন্দী অবস্থায় রাখিয়া অশেষ কষ্ট প্রদান করিয়াছিলেন, সুজা উদ্দীন তাঁহাদিগকে মুক্ত করিয়া এবং মুর্শিদকুলীর হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচারী কর্মচারিদিগের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়া, সর্বাপেক্ষা ন্যায়পরতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার শাসনে হিন্দু-মুসলমান উভয়বিধ প্রজাই প্রীত ছিল।

১ Seir Mutaqherin. (Translation) Vol. I, p. 350, পারস্যদেশের নওশেরোয়াঁ সসাসেনীয়বংশসম্ভূত ; তিনি অত্যন্ত ধার্মিক রাজা বলিয়া কথিত ছিলেন। তাঁহারই রাজত্বসময়ে মহম্মদের জন্ম হয়।

সুজা উদ্দীন নানাবিধ সদ্‌গুণে সমলঙ্কৃত থাকিলেও তাঁহার কিঞ্চিৎ ইন্দ্রিয়দোষ ছিল। কাহারও কাহারও মতে যে ইন্দ্রিয়দোষের হস্ত হইতে মোগলকুলের আদর্শ সম্রাট্ আকবর শাহাও নিস্তার পান নাই, সুজা উদ্দীন যে তাহার দ্বারা আক্রান্ত হইবেন, ইহা বড় বিচিত্র নহে। সুজা মুর্শিদাবাদের মসনদে উপবেশন করিয়া অত্যন্ত বিলাসী হইয়া উঠেন। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর নির্মিত অট্টালিকাদি সুজার বিবেচনায় তাদৃশ মনোরঞ্জক না হওয়ায়, তিনি তৎপরিবর্তে অনেক সুন্দর সুন্দর অট্টালিকাদি নির্মাণ করেন। সর্বাপেক্ষা তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি একটি উদ্যান ; এই উদ্যানটির নাম ফর্হাবাগ বা সুখকানন। ফর্হাবাগ ডাহাপাড়াতেই অবস্থিত, এবং রোশনীবাগ হইতে কিছু উত্তরে। মুর্শিদকুলীর জনৈক অত্যাচারী কর্মচারী নাজীর আহম্মদ এই উদ্যানের নির্মাণ আরম্ভ করিয়া, তথায় মস্‌জেদাদির গঠন করিতেছিল। নবাব সুজা উদ্দীন তাহার অত্যাচারের প্রতিফলস্বরূপ প্রাণদণ্ডের বিধান করিয়া, পরে নিজে সেই উদ্যানটিকে সুশোভিত করিয়াছিলেন। মস্‌জেদটি সুন্দররূপে নির্মাণ করিয়া তিনি উদ্যানের রমণীয়তা চতুর্গুণ বর্ধিত করেন। ঐ উদ্যানের মধ্যে সুন্দর সুন্দর প্রমোদ-অট্টালিকা নির্মিত হয়। উহাতে নানাজাতীয় বৃক্ষ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শোভা পাইত। স্থানে স্থানে ফোয়ারা, চৌবাচ্চা ও নহর জলভরে টল টল করিয়া উদ্যানটিকে একখানি ছবির ন্যায় প্রতিপন্ন করিত। ঐ উদ্যানে পুষ্করিণী খনন করিয়া চারিদিকে সোপান দ্বারা সুশোভিত করা হইয়াছিল। নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া লোকের মনঃপ্রাণ কাড়িয়া লইত। মুসলমান লেখকগণ বলেন যে, ইহার রমণীয়তার নিকট কাশ্মীরের উদ্যানসকল লজ্জা পাইত, এমন কি, স্বর্গের উদ্যানও ইহার নিকট হইতে সৌন্দর্য ঋণ করিয়া লইত। উদ্যানের রমণীয় শোভায় মুগ্ধ হইয়া স্বর্গের পরীগণ ইহাতে ভ্রমণ করিতে আসিত, এবং ইহার চারুসোপানাবলীসমন্বিত পুষ্করিণীর স্ফটিক-শুভ্র স্বচ্ছজলে অবগাহন করিয়া, কুসুমগন্ধাপহারী মলয়সমীরে শরীর সুস্নিগ্ধ করিত। নবাব প্রহরীদের নিকট পরীদিগের আগমনের কথা অবগত হইয়া, ধূলিবৃষ্টিদ্বারা উদ্যানের সৌন্দর্য নষ্ট করিয়া তাহাদিগকে স্বৈরবিহার হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন।[২]

মুসলমান লেখকগণ এইরূপে ফর্হাবাগের অশেষ বর্ণনা করিয়া থাকেন। যখন বসন্তের মধুর স্পর্শে উদ্যানস্থ বৃক্ষরাজি নব-পল্লবে পরিশোভিত হইয়া শ্যামলতার ঢেউ খেলাইতে খেলাইতে আকাশের নীলিমার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হইত, নানাবিধ প্রফুল্ল কুসুম আপনাদিগের সুগন্ধ বিতরণে মলয়সমীরণের প্রত্যেক অণুকে অধিবাসিত করিয়া তুলিত, চূতমঞ্জরীর গন্ধে মাতোয়ারা হইয়া পিককুল অবিরত পঞ্চমে তান ছড়াইত এবং অন্যান্য সুকণ্ঠ বিহঙ্গগণের মধুর কাকলীতে চারিদিক মুখর হইয়া উঠিত, সেই সময় নবাব সুজা উদ্দীন কলকণ্ঠী গায়িকাগণের সহিত ফর্হাবাগে সমাগত হইয়া আমোদপ্রমোদে সময় অতিবাহিত করিতেন। ঝর ঝর

২ Riyaz-us-salatin, p. 292.

শব্দে অবিরত ফোয়ারাগুলি সলিলবৃষ্টি করিতে থাকিত, সলিলভরে পরিপূর্ণ পুষ্করিণী, চৌবাচ্চা, লহরগুলি ঈষৎ সমীরস্পর্শে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ তুলিয়া নৃত্য করিয়া উঠিত, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে বিহঙ্গমগণের কণ্ঠধ্বনির সহিত গায়িকাগণের মধুর কণ্ঠ মিশ্রিত হইয়া দিগন্তহৃদয়ে মধুর ধারা ঢালিয়া দিত। যদি স্বর্গের পরীগণ বাস্তবিকই পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতে আসে, তাহা হইলে ফর্হাবাগের ন্যায় উদ্যানে তাহাদের আগমন বড় বিচিত্র নহে। মধ্যে মধ্যে নবাব স্বীয় অন্তঃপুরবাসিনীদিগের মনোরঞ্জনের জন্য এই সুখকাননে সমবেত হইয়া, নানাবিধ পবিত্র আমোদপ্রমোদ উপভোগ করিতেন। বাস্তবিকই ফর্হাবাগে তিনি প্রকৃত সুখের আস্বাদ পাইতেন। এই সমস্ত আমোদপ্রমোদ ব্যতীত তিনি আর একটি প্রশংসনীয় আমোদ উপভোগ করিতেন। সুজা প্রতি বৎসর যাবতীয় বিদ্বান্ ও গুণীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া সকলকে সমাদরের সহিত ফর্হাবাগে লইয়া যাইতেন, এবং তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করাইতেন।[৩] নবাব সুজা উদ্দীন বিলাসী হইয়াও যে গুণের মর্যাদা করিতেন, ইহা হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

সুজা উদ্দীনের সাধের ফর্হাবাগ এক্ষণে হতশ্রী হইয়া ধূ ধূ করিতেছে। সে-সমস্ত শ্রেণীবদ্ধ সুন্দর বৃক্ষরাজির চিহ্নমাত্রও নাই। মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী শুষ্ক অবস্থায় রহিয়াছে। অল্পদিন হইল, ভাগীরথী মসৃজেদটিকে নিজ গর্ভে আশ্রয়দান করিয়াছেন। লহর চৌবাচ্চা এ-সকলের কোন নিদর্শন দেখা যায় না, মধ্যে মধ্যে অট্টালিকার ভিত্তির ভগ্নাবশেষমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ দিকের একটি তোরণদ্বারের এবং উত্তরদিগের প্রাচীরের কতকটা ভগ্নাবশেষ আজিও বর্তমান আছে। ফর্হাবাগের মধ্যে দুই-এক ঘর কৃষক বাস করিতেছে; তাহারা উদ্যানের ভূমি কর্ষণ করিয়া, তাহাতে সর্ষপাদি শস্য বপন করিয়া থাকে। স্থানটিকে আজিও ফর্হাবাগ বলে, নতুবা লোকে অনুসন্ধান করিয়াও সুজা উদ্দীনের প্রমোদকাননের স্থান নির্দেশ করিতে পারিত না।

সুজা উদ্দীন হিঃ ১১৩৯ অব্দে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, ১২৫১ অব্দে পরলোকগমন করেন। রোশনীবাগের ছায়াতলে তিনি বিশ্রামলাভ করিতেছেন। রিয়াজ প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে যে, তাঁহাকে কেল্লার সম্মুখে ডাহাপাড়ার মসৃজেদভবনে সমাহিত করা হয়। এই মসৃজেদ তাঁহার নিজ-নির্মিত কিনা বলা যায় না। রোশনীবাগে যে-মসৃজেদটি বিদ্যমান আছে, তাহাতে হিঃ ১১৫৬ অব্দ লিখিত আছে এবং লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, নবাব আলিবর্দী খাঁ মহাবৎজঙ্গ উক্ত মসৃজেদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। সুজা উদ্দীন হইতে তাঁহার যাবতীয় উন্নতির সূচনা হওয়ায়, আলিবর্দী স্বীয় পূর্ব-প্রভুর পরকালের কল্যাণোদ্দেশে তাঁহার সমাধিভবনে উক্ত মসৃজেদ নির্মাণ করিয়া থাকিবেন। রোশনীবাগের বর্তমান

৩ Riyaz-us-salatin, p. 307.

সমাধিভবনের উত্তর দিকে ইহার প্রবেশদ্বার। প্রবেশদ্বার অতিক্রম করিয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইলে সুজার সমাধিগৃহ দৃষ্ট হয়। প্রায় ৩ হাত উচ্চ একটি বিস্তৃত ভিত্তির উপর সমাধিভবন নির্মিত হইয়াছে। পূর্বের সমাধিভবন ধ্বংসমুখে পতিত হইলে, তাহারই ভিত্তিতে এই নূতন সমাধিভবন নির্মিত হয়। সমাধিভবনটি দৈর্ঘ্যে ১৪ ও প্রস্থে ১৩ হাত হইবে। সম্মুখভাগে তিনটি দ্বার; মধ্যদ্বারে উপরে কৃষ্ণপ্রস্তরফলকে ফারসী ফাষায় লিখিত আছে যে, "১১৫১ হিজরীর ১৩ই *জেলহজ্জ* মঙ্গলবার সুজা উদ্দৌলা সর্বোচ্চ স্বর্গের অধিবাসিপদ লাভ করেন।" গৃহাভ্যন্তরে সুজা উদ্দীনের বিশাল সমাধি বিরাজ করিতেছে। এরূপ বৃহৎ আকারের সমাধি মুর্শিদাবাদে আর দৃষ্ট হয় না। সমাধিটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৭ হাত। গৃহের পশ্চাতে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে একটি ক্ষুদ্র বারাণ্ডা, তাহাতে আর একটি সমাধি আছে। সমাধিভবন হইতে উত্তর-পশ্চিম দিকে এবং সমাধিগৃহ ও প্রবেশদ্বারের মধ্যে একটি ত্রিগম্বুজবিশিষ্ট মস্‌জেদ। এই মস্‌জেদে উপাসনাদি কার্য হইয়া থাকে। মস্‌জেদে হিঃ ১১৫৬ অব্দ লিখিত আছে; এইজন্য ইহা আলিবর্দীর নির্মিত বলিয়া বোধ হয়। মস্‌জেদটি উত্তর-দক্ষিণে দৈর্ঘ্যে ২৩ হাতের অধিক এবং পূর্ব-পশ্চিমে প্রস্থে ১২ হাত হইবে। উত্তরদিকের প্রবেশদ্বার ব্যতীত দক্ষিণদিকে আর একটি ক্ষুদ্র দ্বার আছে; উদ্যানের উত্তর-পূর্ব দিকে প্রহরীদের একটি অসংস্কৃত বাসস্থান রহিয়াছে। সমাধিভবনটির সংস্কার হওয়ায় ইহাকে অত্যন্ত সুন্দর বোধ হইতেছে। আম্র প্রভৃতির বৃক্ষসকল এই সমাধিভবন ও মস্‌জেদকে ছায়া দ্বারা আবৃত করিয়া অতীব মনোরম করিয়া রাখিয়াছে। মুর্শিদাবাদের মধ্যে এরূপ ছায়াময় ও শান্তিময় স্থান অতি বিরল। উদ্যানের স্থানে স্থানে পুষ্পসকল প্রস্ফুটিত হইয়া আছে। রোশনীবাগের সমাধি মন্দিরের নিম্ন দিয়া ভাগীরথী প্রবাহিতা হইতেছেন। বর্ষাকালে তাঁহার সলিলরাশি উদ্যানপ্রাচীরের অতি নিকটে উপস্থিত হয়। বৈদেশিক ভ্রমণকারিগণ ছায়াময় রোশনীবাগের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

এই সমাধি-উদ্যান মুর্শিদাবাদ কেল্লার সম্মুখস্থ; ইহার নিকটস্থ ভাগীরথীতীরে মুর্শিদাবাদের প্রধান প্রধান উৎসবোপলক্ষে নানারূপ আলোকক্রীড়া হইত, সেইজন্য ইহার নাম রোশনীবাগ। বংশ নির্মিত দ্বিতল, ত্রিতল প্রভৃতি গৃহ আলোকমালায় বিভূষিত করা হইত। ভাগীরথীর অপর পার হইতে নবাববংশীয় ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত জনগণ এই আলোকক্রীড়া দেখিতেন, এবং নদীবক্ষে অনেক লোকে পরিপূর্ণ হইয়া তরণীসকল বিরাজ করিত। যখন কোন প্রধান উৎসব বা পর্বের সময় আসিত, তখনই রোশনীবাগে আলোকের ক্রীড়া হইত। মুর্শিদাবাদে এক্ষণে আর সেরূপ আলোকোৎসব হয় না। কেবল রোশনীবাগের নামমাত্র রহিয়াছে। এক্ষণে কোন কোন সময়ে এই স্থানে সামান্যরূপ আলোকোৎসব দেখা যায়। মুর্শিদাবাদের সমস্ত উৎসব ও পর্ব এক্ষণে জীবনহীন হইয়া পড়িয়াছে। এই সমস্ত দেখিয়া বোধ হয়, মুর্শিদাবাদের গৌরব চির-অস্তমিত হইতে বসিয়াছে।

জগৎশেঠ

গৌরব-কিরীটভূষিতা অমিতৈশ্বর্যশালিনী সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর আশীর্মাল্য যাঁহাদের মস্তকে নিপতিত হয় সমগ্র জগতীতলে তাঁহারাই বরণীয় হইয়া থাকেন। তখন সদ্যঃপ্রকাশিত অরুণালোকের নিকট অমারজনীর গাঢ় তমোরাশির অপসরণের ন্যায় তাঁহাদের গৌরবপ্রভায় দুর্ভাগ্যের ঘনীভূত অন্ধকার দূরদূরান্তরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। ক্রমে সেই আলোকপ্রবাহ তরঙ্গায়িত হইতে হইতে দিগ্‌দিগন্তে চলিয়া যায়, এবং যাহাকে সম্মুখে পায়, তাহাকেই আলোকময় করিয়া তুলে। ঐন্দ্রজালিকের মত তাঁহাদের করস্পর্শে ধূলিমুষ্টি স্বর্ণমুষ্টিতে পরিণত হয়,—সামান্য উপলখণ্ড মহামূল্য হীরকের আকার ধারণ করে। তাঁহাদের প্রতি পদবিক্ষেপে মরুভূমিতে অযুত কুসুম ফুটিয়া উঠে,—মহাশ্মশানে চন্দনের গন্ধ অনুভূত হয়। জগতের সমস্ত পদার্থ তাঁহাদের নিকট মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় অবস্থিতি করে। কি জড়জগৎ, কি জীবজগৎ, উভয়ই তাঁহাদের আজ্ঞাবহ হইয়া উঠে। তাঁহাদের অঙ্গুলিসঙ্কেতে নীলাকাশের বিরাটবক্ষোবাসিনী সৌদামিনী রাজপথে সমস্ত রজনী প্রহরীর কার্যে নিযুক্ত থাকে এবং সলিলগর্ভে লুক্কায়িত বাষ্পলহরী সহস্র সহস্র মত্তমাতঙ্গের বল ধারণ করিয়া শকটবহনকার্যে নিযুক্ত হয়। আবার সামান্য পশুপক্ষী হইতে জগতের প্রত্যেক মনুষ্য, প্রত্যেক জাতি তাঁহাদের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান থাকে। সহস্র সহস্র রাজরাজেশ্বরের মণিমাণিক্যখচিত মুকুটমালা তাঁহাদের পদতলে বিলুণ্ঠিত হয় এবং তাঁহাদের ইঙ্গিতমাত্রে কত কত নবাব-বাদশাহের সিংহাসন পর্যন্ত টলিয়া যায়। যাঁহারা সৌভাগ্যলক্ষ্মীর প্রকৃত বরপুত্র, তাঁহাদের মোহিনী শক্তিতে জগতে এমন কোন কার্যই নাই যাহা সম্পাদিত হইতে না পারে। ঐন্দ্রজালিকের মায়ায় পদার্থের বাস্তব পরিণতি ঘটে না ; কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মীর বরপুত্রের শক্তিতে প্রতিনিয়ত সেই পরিণতি সংগঠিত হয়। পৃথিবীর যে-যে জাতি ও যে-যে ব্যক্তি ভাগ্যলক্ষ্মীর অনুগ্রহভাজন হইয়াছেন, তাঁহাদের গৌরবপ্রভায় বসুন্ধরা চিরপ্রভাময়ী থাকিবেন এবং অনন্তকাল ধরিয়া তাঁহাদের যশোগাথা দিগন্তহৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইবে।

ভাগ্যদেবীর অনুগ্রহের পাত্রবিচার নাই ; তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই জয়মাল্য পরাইয়া থাকেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলার ধনকুবের শেঠবংশীয়গণ প্রথমে দারিদ্র্যের কঠোর-চক্রে নিষ্পেষিত হইয়া, আপনাদিগের নিবাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গলারাজ্যে উপস্থিত হইলে, তাঁহাদের উপর সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর করুণা-দৃষ্টি নিপতিত হয়। সেই অনুগ্রহবলে তাঁহারা অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমগ্র ভারতবর্ষে এক অভাবনীয় কাণ্ডের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। বাদশাহ-নবাব হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা-জমিদার পর্যন্ত তাঁহাদের অজস্র অর্থবৃষ্টিতে অভিষিক্ত হইয়া উঠিতেন। বৈদেশিক ইংরেজ-ফরাসীগণ তাঁহাদের বিনা অনুগ্রহে বাণিজ্যকার্যপরিচালনে সমর্থ হইতেন না ; মুর্শিদাবাদের নবাবগণ সর্বদাই তাঁহাদের মুখাপেক্ষা করিতেন এবং

তাঁহাদের বলে বলী হইয়াই সমস্ত জগতে মুর্শিদাবাদের গৌরব ঘোষণা করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। কি বাণিজ্য, কি রাজস্ব, সমস্ত বিষয়ই সেই ধনকুবেরগণের সাহায্য ব্যতীত কদাচ সম্পন্ন হইত না। অষ্টাদশ শতাব্দীর যাবতীয় রাজনৈতিক কার্য তাঁহাদের পরামর্শের উপর নির্ভর করিত। তাঁহাদের কথায় নবাবের নবাবী রহিয়াছে, আবার তাঁহাদের ইঙ্গিতে নবাবের নবাবী গিয়াছে। তাঁহাদের কটাক্ষমাত্রেই বাঙ্গলার তৎকালীন রাষ্ট্রবিপ্লবসমূহ সংঘটিত হইয়াছে। যে ভয়াবহ বিপ্লবে মুসলমান রাজত্বের অবসান ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়, যাহার দিগ্দাহকারী অগ্নিকাণ্ডে হতভাগা সিরাজ পতঙ্গবৎ ভস্মীভূত হইয়া যান, এবং মীরজাফর ও মীরকাসেম বিশেষরূপে দগ্ধ হইয়া, কেহ অনন্তধাম কেহ বা ফকিরীপথ আশ্রয় করিয়া, শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হন, তাহারও মূলে জগৎশেঠদিগের অমোঘ শক্তি নিহিত ছিল। অর্থ ও প্রাণ দিয়া তাঁহারা ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাই ব্রিটিশ রাজলক্ষ্মীর উজ্জ্বল মুকুটপ্রভা সমুদায় ভারতবর্ষ আলোকিত করিয়া, সসাগরা বসুন্ধরাকে প্রভাময়ী করিবার জন্য অবিরত ধাবিত হইয়াছিল। এক জন ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে, হিন্দু মহাজনের অর্থ ও ইংরাজ সেনাপতির তরবারি বাঙ্গলায় মুসলমান রাজত্বের বিপর্যয় ঘটাইয়াছে।[১]

বাস্তবিক জগৎশেঠগণ অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলার সমুদায় রাজনৈতিক ব্যাপারেরই মূল ছিলেন। রাজস্ববিষয়ে জমিদারদিগের সহিত তাঁহাদেরই সম্বন্ধ ছিল, বাণিজ্য-বিষয়ে তাঁহারাই তত্ত্বাবধান করিতেন। এতদ্ভিন্ন শাসনকার্য তাঁহাদের পরামর্শব্যতীত কদাচ নির্বাহিত হইত না। রাজ্যের মুদ্রা তাঁহাদের মতানুসারে মুদ্রিত হইত।

শেঠদিগের ক্ষমতা ও অর্থের তুলনা ছিল না। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাঁহাদের গদী সংস্থাপিত থাকায়, বাদশাহ-নবাব, রাজামহারাজ ও বণিগ্‌মহাজনগণ সেই সকল গদী হইতে প্রয়োজনানুসারে অর্থ গ্রহণ করিতেন। প্রতিনিয়ত কোটি কোটি অর্থে তাঁহাদের কোষাগার পরিপূর্ণ থাকিত। তৎকালে এইরূপ প্রবাদ ছিল যে, শেঠেরা ইচ্ছা করিলে, সূতীর নিকট ভাগীরথীর মোহনা অনায়াসে টাকা দ্বারা বাঁধাইয়া দিতে পারিতেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ তাঁহাদের গদী লুণ্ঠন করিয়া কিছুই করিতে পারে নাই। হিন্দুস্থানে অথবা দাক্ষিণাত্যে তাঁহাদের ন্যায় অর্থশালী মহাজন তৎকালে দৃষ্ট হইত না। ভারতবর্ষে এমন কোন মহাজন বা বণিক্ ছিল না, শেঠদিগের সহিত যাহাদের তুলনা হইতে পারে। বাঙ্গলার প্রায় সমস্ত গদীয়ান তাঁহাদের প্রতিনিধি অথবা স্ববংশীয় ছিলেন। অর্থ ও ক্ষমতায় কেহই তাঁহাদের ন্যায় শ্রেষ্ঠ পদ অধিকার করিতে পারেন নাই। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মীর অনুগ্রহ চিরদিন সমানভাবে থাকে না। যে-জগৎশেঠগণ হীনাবস্থা হইতে গৌরব ও সমৃদ্ধির উচ্চতম শিখরে অধিরূঢ় হইয়া-

---

১ "The rupees of the Hindu banker, equally with the sword of the English colonel contributed to the overthrow of the Mahamadan power in Bengal."

ছিলেন, আবার এক্ষণে তাঁহাদের ঘোর দুর্দশা উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহাদের পূর্ব-গৌরবের কিছুমাত্র নিদর্শন নাই। শেঠদিগের বিশাল ভবন এক্ষণে ভগ্নস্তূপে পরিণত। তাঁহাদিগের বংশধর জীবিকা-নির্বাহের জন্য বৃত্তির আশায় ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের দ্বারস্থ হইয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন। যাঁহারা অর্থ ও প্রাণ দিয়া ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-স্থাপনের পূর্ণ সহায়তা করিয়াছিলেন, পরে তাঁহাদের বংশধর ভিক্ষাভাণ্ড হস্তে লইয়া ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের দ্বারে উপস্থিত হইলেন; গবর্নমেণ্ট একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না! এ দৃশ্য দেখিতে বড়ই কষ্টকর বোধ হয়। যাঁহাদিগের অর্থে কত লোক বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়াছিল, পরে তাঁহাদের বংশধর পথের ভিখারী! ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে? এক্ষণে শেঠবংশীয়দের যেরূপ দুর্দশা ঘটিয়াছে, তাহাতে অধিক দিন যে জগৎশেঠদিগের নাম ধরণীবক্ষে বিরাজ করিবে, সেরূপ আশা করা যায় না। সমস্তই সেই পরিবর্তনশীল কালের খেলা বলিতে হইবে।

শেঠবংশীয়দের আদিনিবাস যোধপুরের অন্তর্গত নাগর প্রদেশ। তাঁহারা পূর্বে শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন; পরে বৈষ্ণব-ধর্ম অবলম্বন করেন। আবার তাঁহারা জৈন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। যতদূর অবগত হওয়া যায়, তাহাতে এইরূপ সিদ্ধান্ত হয় যে, হীরানন্দ নামে তাঁহাদের জনৈক পূর্বপুরুষ নাগর হইতে ভাগ্য-পরীক্ষার্থে পাটনায় উপস্থিত হন। হীরানন্দের সম্বল তাদৃশ অধিক ছিল না; কাজেই বাণিজ্য-ব্যাপারে তিনি ভালরূপ সুবিধা করিতে পারেন নাই। এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, ভাগ্যলক্ষ্মীর অনুগ্রহভাজন হইতে না পারিয়া, হীরানন্দ সর্বদাই বিষণ্ণ থাকিতেন। এক দিন তিনি ব্যথিতচিত্তে নগরের বহির্ভাগে একটি ক্ষুদ্র বনমধ্যে প্রবেশ করেন। সন্ধ্যা হইল, তথাপি হীরানন্দ বন হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না। সহসা একটি আর্তনাদ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল; তিনি কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া একটি ভগ্ন অট্টালিকা দেখিতে পাইলেন। তাহার একটি প্রকোষ্ঠে জনৈক বৃদ্ধ মৃত্যুযাতনায় অধীর হইয়া আর্তনাদ করিতেছিল। বৃদ্ধের তথাবিধ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া, হীরানন্দের হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি যথাসাধ্য তাহার সেবা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টায় কোনরূপ ফলোদয় হইল না। অচিরকালমধ্যে বৃদ্ধ ইহজীবনের লীলা শেষ করিল। হীরানন্দের সেবায় তুষ্ট হইয়া বৃদ্ধ মৃত্যুর কিছু পূর্বে গৃহের একটি কোণে অঙ্গুলিসঙ্কেত করিয়া যায়। হীরানন্দ সেই স্থান হইতে প্রচুর ধন লাভ করেন। এইরূপে তাঁহার ভাগ্যোদয় ঘটে। অল্পকাল মধ্যে হীরানন্দ বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়া, আপনার সাত পুত্রকে ভারতের সাত স্থানে গদীয়ানের কার্যে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র মাণিকচাঁদ হইতে মুর্শিদাবাদের জগৎশেঠদিগের উৎপত্তি।

যৎকালে ঢাকা নগরী বাঙ্গলার রাজধানীপদে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই সময়ে মাণিক-চাঁদ ঢাকায় আগমনপূর্বক আপনার গদী সংস্থাপন করেন। এই সময়ে মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙ্গলার দেওয়ান হইয়া ঢাকায় উপস্থিত হন। রাজস্বসম্বন্ধে মুর্শিদের হস্তে সমুদায়

ভার অর্পিত হওয়ায়, অর্থের প্রয়োজনবশতঃ মাণিকচাঁদের সহিত তাঁহার বিলক্ষণ সৌহার্দ্য ঘটে। তাহার পর নবাব আজিমওশ্বানের সহিত মুর্শিদের মনোবিবাদ উপস্থিত হইলে দেওয়ান মুর্শিদকুলী ১৭০৪ খ্রীঃ অব্দে ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া, মুর্শিদাবাদে আপনার বাসস্থান নির্দেশ করিলে, রাজস্ববিভাগের যাবতীয় কর্মচারী ও শেঠ মাণিকচাঁদও মুর্শিদাবাদে আসেন। মাণিকচাঁদ মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া ভাগীরথীর পূর্বতীরে মহিমাপুর নামক স্থানে আপনার বাসভবন নির্মাণ করেন। অদ্যাপি তাঁহার বংশীয়েরা মহিমাপুরেই বাস করিতেছেন। মুর্শিদকুলী খাঁর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মাণিকচাঁদেরও শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। মাণিকচাঁদ মুর্শিদকুলীকে সমস্ত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করিতেন। এইরূপ কথিত আছে যে, মুর্শিদকুলী বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার নিজামতী পদ প্রাপ্ত হইলে, মুর্শিদাবাদে যে-টাঁকশাল স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা মাণিকচাঁদের পরামর্শানুসারেই করেন। মহিমাপুরের শেঠদিগের বাসভবনের সম্মুখে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে আজিও সেই টাঁকশালের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার সমস্তই এক্ষণে ভাগীরথীগর্ভস্থ। নবাবের অনুমতিতে বৎসরের প্রথমে প্রতি বারই পুণ্যাহ হইত। এই সময়ে যাবতীয় জমিদার অথবা তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত হইয়া আপন-আপন দেয় রাজস্ব প্রদান করিতেন। সেই রাজস্ব দিল্লীতে প্রেরিত হইত। কিন্তু নগদ টাকা প্রেরণে, সময়ে সময়ে অসুবিধা ঘটিত বলিয়া, শেঠগণ রাজস্বপ্রেরণের ভার গ্রহণ করেন। দিল্লী ও আগরাতে শেঠ মাণিকচাঁদের অন্যান্য ভ্রাতাদের যে কুঠি ছিল, তাহাতেই হুণ্ডী পাঠান হইত ; পরে তাঁহারা বাদশাহ-সরকারে সমস্ত টাকা উপস্থিত করিতেন। এইরূপে বাঙ্গলার সমস্ত রাজস্ব দিল্লীর রাজকোষে নিরাপদে উপস্থিত হইত।[২] মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা রাজস্বপ্রেরণের কথা শুনা যায়।[৩] সরকারী অর্থ ব্যতীত নবাবের নিজ অর্থও শেঠদিগের হস্তে ন্যস্ত থাকিত। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, মুর্শিদকুলীর মৃত্যুসময়ে তাঁহাদের নিকট নবাবের প্রায় ৭ কোটি টাকা গচ্ছিত ছিল, এবং মুর্শিদের পরবর্তী কোন নবাব তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হন নাই।

মুর্শিদকুলী খাঁর সহিত মাণিকচাঁদের বিশিষ্টরূপ সৌহার্দ্য থাকায়, নবাব ১৭১৫ খ্রীঃ অব্দে বাদশাহ ফরখ্‌শেরের নিকট হইতে শেঠ উপাধি আনাইয়া তদ্দ্বারা মাণিকচাঁদকে ভূষিত করেন। আবার শেঠদিগের বংশবিবরণীতে এইরূপ শুনা যায় যে, আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর বাঙ্গলার নিজামতিপ্রাপ্তির জন্য মাণিকচাঁদ মুর্শিদকুলীকে যথেষ্ট অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ইহা হইতে বেশ বুঝা যায়, সময়ানুসারে উভয়েই উভয়কে সাহায্য করিতেন। ১৭২২ খ্রীঃ অব্দে মাণিকচাঁদ পরলোক গমন

---

২ রিয়াজুস্ সালাতীন গ্রন্থে ১ কোটি ৩০ লক্ষের স্থলে ১ কোটি ৩ লক্ষ লিখিত আছে। (Riyaz-us-salatin, p. 259.)। ফারসী 'সে' শব্দে তিন ও 'সি' শব্দে ৩০ বুঝায় ; 'স' লেখার গোলযোগে এইরূপ ঘটিয়া থাকিবে।

৩ Stewart's History of Bengal (New Edition), p. 234.

করেন। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে দয়াবাগে তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভ অনেকদিন পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল ; এক্ষণে ভাগীরথী তাহাকে নিজ গর্ভে স্থান দান করিয়াছেন।

মাণিকচাঁদ অপুত্রক থাকায় স্বীয় ভাগিনেয় ফতেচাঁদকে আপনার পোষ্যপুত্র ও উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। বারাণসীর প্রধান শেঠ উদয়চাঁদের সহিত মাণিকচাঁদের ভগিনী ধনবাঈ-এর বিবাহ হয়। ফতেচাঁদ তাঁহাদেরই পুত্র। মাণিকচাঁদের জীবিত অবস্থায় ফতেচাঁদ মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হন এবং তাঁহার গদীর কার্য পরিদর্শন করিতে আরম্ভ করেন। মাণিকচাঁদের মৃত্যুর পর হইতে তিনি প্রকৃত গদীয়ান হইয়া উঠেন। শেঠবংশীয়দের মধ্যে ফতেচাঁদই প্রথম "জগৎশেঠ" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। রিয়াজুস্ সালাতীন গ্রন্থে লিখিত আছে যে, যৎকালে সম্রাট্ ফরখ্‌শের দিল্লীর সিংহাসন অধিকারের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি বারাণসীর বিখ্যাত মহাজন নগরশেঠের নিকট হইতে অর্থসাহায্য গ্রহণ করেন। সম্রাট্ হওয়ার পর তিনি প্রত্যুপকারস্বরূপ নগরশেঠের ভাগিনেয় ও গোমস্তা ফতেচাঁদকে "জগৎশেঠ" উপাধিতে ভূষিত করিয়া বাঙ্গলার রাজস্বের ফোতদারী (পোদ্দারী) পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।[৪] কিন্তু ফতেচাঁদ মাণিকচাঁদেরই ভাগিনেয় ; তাঁহার পিতা উদয়চাঁদ বারাণসীতে বাস করিতেন। রিয়াজের নগরশেঠ মাণিকচাঁদ কিনা বুঝা যায় না। দুইজনে এক ব্যক্তি হইলেও মাণিকচাঁদ বারাণসীতে বাস করিতেন না। ফতেচাঁদের পিতা উদয়চাঁদই তথায় থাকিতেন। আবার ফতেচাঁদের ফার্মান হইতে জানা যায় যে, তিনি মহম্মদ শাহার নিকট হইতে ১৭২৪ খ্রীঃ অব্দে "জগৎশেঠ" উপাধি প্রাপ্ত হন। জগৎশেঠ উপাধির সঙ্গে ফতেচাঁদ সম্মানের চিহ্নস্বরূপ মতির কুণ্ডল ও হস্তী প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শেঠদিগের বংশবিবরণী হইতে এইরূপ জানা যায়, সম্রাট্ মহম্মদ শাহ ফতেচাঁদের প্রতি এরূপ সন্তুষ্ট ছিলেন যে, এক সময়ে কোন কারণে তিনি মুর্শিদকুলী খাঁর উপর বিরক্ত হওয়ায়, তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া ফতেচাঁদকে বাঙ্গলার নবাবী প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন। ফতেচাঁদ নবাবীগ্রহণে অস্বীকৃত হইয়া বাদশাহকে অবগত করান যে, নবাব মুর্শিদকুলীর অনুগ্রহেই তাঁহারা দেশ-মধ্যে ধনী ও সম্মানী হইয়া উঠিয়াছেন ; সুতরাং তাঁহাদের এরূপ উপকারী বন্ধুর পদ গ্রহণ করিতে তিনি কদাচ ইচ্ছুক নহেন। তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা যে, বাদশাহ ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া নবাবের প্রতি পুনর্বার পূর্বের ন্যায় কৃপাদৃষ্টি করেন। বাদশাহ ইহাতে ফতেচাঁদের উপর অত্যন্ত প্রীত হইয়া, নবাবকে এইরূপ আজ্ঞাপত্র লিখিয়া পাঠান যে, এখন হইতে সমস্ত রাজকার্যে শেঠদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে। বাদশাহ-দরবার হইতে বাঙ্গলার নাজিমকে সময়ে সময়ে যে-সমস্ত খেলাত প্রদত্ত হইত তত্তুল্য আর একটি শেঠদিগকে পাঠাইতে সম্রাট্ কখনও বিস্মৃত হইতেন না।

১৭২৫ খ্রীঃ অব্দে মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যু হইলে, সুজা উদ্দীন বাঙ্গলার সুবেদারী

৪ Riyaz-us-salatin, p. 274

পদ লাভ করেন। তিনি জগৎশেঠ ফতেচাঁদ, প্রধান মন্ত্রী হাজী আহম্মদ ও রায়রায়ান আলমচাঁদের পরামর্শানুসারে সমস্ত রাজকার্য নির্বাহ করিতেন। শেঠেরা বাঙ্গলার রাজস্ববিভাগের পোদ্দারী পদে নিযুক্ত থাকায়, সুজা উদ্দীন ফতেচাঁদের দ্বারা ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার রাজস্ব দিল্লীতে প্রেরণ করেন।[৫] যতদিন সুজা উদ্দীন জীবিত ছিলেন, ততদিন ফতেচাঁদের পরামর্শ ব্যতীত কোন কার্যই করেন নাই। তিনি মৃত্যুকালে স্বীয় পুত্র সরফরাজ খাঁকে জগৎশেঠ ও রায়রায়ানের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া যাবতীয় রাজকার্য পরিচালনের উপদেশ দিয়া যান।

সরফরাজ ১৭৩৯ খ্রীঃ অব্দে মুর্শিদাবাদের মস্‌নদে উপবিষ্ট হন। তিনি অত্যন্ত অস্থিরচিত্ত ও ইন্দ্রিয়াসক্ত হওয়ায়, জগৎশেঠ বা রায়রায়ানের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন না। অধিকন্তু তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া সময়ে সময়ে অবমানিত করিতে চেষ্টা পাইতেন। সুজা উদ্দীনের সময় হইতে হাজী মহম্মদ প্রধান মন্ত্রীর ও তাঁহার ভ্রাতা আলিবর্দী খাঁ আজিমাবাদের শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত ছিলেন। সকলে অবমানিত হওয়ায়, হাজী আহম্মদ, আলমচাঁদ ও জগৎশেঠ পরামর্শ করিয়া, সরফরাজের পরিবর্তে আলিবর্দীকে সিংহাসন প্রদানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরামর্শ অবশেষে কার্যেও পরিণত হয়।

শেঠবংশীয়েরা ফতেচাঁদের সহিত নবাব সরফরাজের মনোবিবাদের এইরূপ কারণ নির্দেশ করিয়া থাকেন। মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যুসময়ে শেঠদিগের নিকট তাঁহার নিজের যে ৭ কোটি টাকা গচ্ছিত ছিল, এ পর্যন্ত তাহা প্রত্যর্পিত না হওয়ায়, সরফরাজ ফতেচাঁদকে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন; এমন কি, তাঁহার প্রতি অপমানসূচক বাক্য পর্যন্ত প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য সেই বৃদ্ধ জগৎশেঠ দুর্মতি নবাবকে পদচ্যুত করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। কিন্তু ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ এই বিবাদের অন্য কারণ নির্দেশ করেন। তাঁহারা বলেন যে, বৃদ্ধ ফতেচাঁদ স্বীয় পৌত্র মহাতপ রায়ের[৬] সহিত একটি কিঞ্চিন্ন্যূন একাদশবর্ষীয়া বালিকার পরিণয় প্রদান করিয়াছিলেন। তাহার ন্যায় রূপবতী কন্যা তৎকালে এতদঞ্চলে দৃষ্ট হইত না। বালিকাবয়সেও তাহার রূপের ছটা জ্যোৎস্নালহরীর ন্যায় ক্রীড়া করিয়া বেড়াইত। তাহার সৌন্দর্যের কথা সরফরাজের কর্ণগোচর হওয়ায়, তিনি কৌতূহল-পরবশ হইয়া সেই বালিকাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। নবাব প্রথমতঃ, জগৎশেঠকে তজ্জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠান। নবাবের অনুরোধ শুনিয়া, সেই অশীতিপর বৃদ্ধের মস্তকে যেন অশনিপাত হইল। তিনি নবাবকে বিরত হইতে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন। এরূপ করিলে, তাঁহার বংশে কলঙ্ক ঘটিবে ও তাঁহাকে জাত্যংশে হেয় হইতে হইবে

৫ Riyaz-us-salatin, p. 290.

৬ অর্মে ফতেচাঁদের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু হলওয়েলের গ্রন্থে ফতেচাঁদের পৌত্র মহাতপ রায়ের বিবাহের কথাই আছে।

এ কথাও বুঝাইয়া বলিলেন। নবাব তাঁহার কথা শুনিয়া প্রথমে বিরত হইয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে অদমনীয় কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া, লোক পাঠাইয়া জগৎশেঠের বাটী অবরোধপূর্বক সেই বালিকাকে নিজ বাটীতে আনয়ন করেন, এবং দর্শনপিপাসা মিটাইয়া তাঁহাকে পুনঃপ্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাকে স্পর্শপর্যন্ত করেন নাই।

জগৎশেঠের গৃহলক্ষ্মীকে নিজ ভবনে লইয়া যাওয়ায়, সরফরাজের সিংহাসন কম্পিত হইয়া উঠে বলিয়া ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ নির্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা আবার এরূপ ভাবও প্রকাশ করেন যে, সরফরাজের ইন্দ্রিয়লালসা পরিতৃপ্তির আশায় তাহাকে নিজ অধিকারস্থ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন।৭ আমরা কিন্তু তাঁহাদের নিজের লিখিত বর্ণনানুসারে একটি কিঞ্চিন্ন্যূন একাদশবর্ষীয়া বালিকার প্রতি কু-অভিপ্রায় প্রকাশের কোন অর্থ বুঝিতে পারি না। যে দেশে বিংশতির অধিক বয়স্কা রমণীও বালিকাপদবাচ্য হইয়া থাকে, সে দেশের ঐতিহাসিকগণ একটি দশবর্ষীয়া বালিকার প্রতি জনৈক অধিকবয়স্ক পুরুষের কু-অভিপ্রায়ের কথা কেমন করিয়া ব্যক্ত করিলেন, তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। তাহার পর, তাঁহাদের লিখিত ঘটনা সায়র মুতাক্ষরীন বা রিয়াজুস্ সালাতীন প্রভৃতি দেশীয় কোন গ্রন্থেই দৃষ্ট হয় না। সুতরাং এ বিষয়ের সত্যাসত্য যে সবিশেষ অনুধাবনীয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা যে-স্থানে দেশীয় শাসন-কর্তৃগণের কোনরূপ ছিদ্র পাইয়াছেন, সেইখানে তাহা অতিরঞ্জিত করিতে ত্রুটি করেন নাই।

---

৭ He (Futhaah Chund) had about this time married his youngest grandson named Seet Mohtab Roy to a young creature of exquisite beauty, *aged about eleven years.* The fame of her beauty coming to the ears of the Soubah he *burned with curiosity and lust for the possession of her*, and sending for Jaggaut Seet demanded a sight for her." (Holwell's Interesting Historical Events. Pt. I. Chapt. II. p. 70.) অর্মে প্রথমতঃ *lust for possession* না লিখিয়া কেবল curiosity-ই লিখিয়াছেন। কিন্তু তাহার পর লিখিয়াছেন,—"The young woman was sent to the palace in the evening, and after staying there a short space, returned, *unviolated* indeed, but dishonoured to her husband. (Orme. Vol. II, p. 30.) *unviolated* কথায় তাঁহারও মনোগত ভাব বেশ বুঝা যাইতেছে। এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া বাবু নবীনচন্দ্র সেন পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলাকে জগৎশেঠের অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইয়াছেন, এবং জগৎশেঠের মুখ দিয়া তাহা প্রকাশও করাইয়াছেন। ইংরেজ ঐতিহাসিকদিগের মতে সরফরাজ নবীনবাবুর জগৎশেঠের পরিণীতা ভার্য্যাকেই নিজ প্রাসাদে লইয়া যান, তাঁহারই নাম মহাতাপ রায়। সিরাজ ঐরূপ কোন গর্হিত কার্য করেন নাই। দুঃখের বিষয় মুর্শিদাবাদের নবাবদিগের মধ্যে যাহার যে-কোন সত্য বা মিথ্যা দোষ ছিল, সমস্তই হতভাগ্য সিরাজের স্কন্ধে আসিয়া পড়িয়াছে।" মৎপ্রণীত "মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে" ইহার বিস্তৃত আলোচনা সাধারণে দেখিতে পাইবেন।

যাহা হউক, সরফরাজকে পদচ্যুত করিবার জন্য এক ষড়যন্ত্রের আয়োজন হইল। হাজী আহম্মদ, আলমচাঁদ ও জগৎশেঠ সকলেই অবমানিত হওয়ায়, নিজ নিজ অবমাননার প্রতিশোধার্থ পাটনা হইতে আলিবর্দী খাঁকে আহ্বান করিলেন। আলিবর্দী সসৈন্যে মুর্শিদাবাদাভিমুখে অগ্রসর হইয়া নিজ যাত্রার কথা জগৎশেঠকে ও নবাবকে লিখিয়া পাঠান। নবাবকে চতুরতাপূর্বক তিনি যে-পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাও জগৎ-শেঠের নিকট প্রথমে প্রেরিত হয়। জগৎশেঠ পরে তাহা নবাবকে প্রদান করেন। গিরিয়ার প্রান্তরে সরফরাজের সহিত আলিবর্দীর ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সায়র মুতাক্ষরীনে লিখিত আছে যে, নবাবপক্ষ-কর্তৃক জগৎশেঠ আলিবর্দী খাঁর সৈন্যাধ্যক্ষ-দিগের নিকট টিপ[৮] প্রেরণ করিতে নিযুক্ত হন। টিপ প্রেরণের এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল যে, আলিবর্দীর কর্মচারিগণ অর্থ পাইয়া তাঁহাকে ধৃত করিয়া সরফরাজের নিকট উপস্থিত করিবে। কিন্তু মুতাক্ষরীনের অনুবাদক বলেন, আলিবর্দী খাঁ নিজেই ঐরূপ কৌশল করিয়া স্বীয় বন্ধু জগৎশেঠের দ্বারা সরফরাজের কর্মচারিগণকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং ইহাই সাধারণ লোকে অবগত ছিল। অনুবাদকের সময় সরফরাজের একজন কর্মচারী জীবিত ছিল। সে এইরূপ প্রকাশ করিয়াছিল যে, তাহাকে ৪ হাজার টাকার একখানি টিপ দেওয়া হয়। তাহা পাইয়া সে বারুদের পরিবর্তে ধূলামাটি পূর্ণ করিয়া তোপ ছাড়িতে ইচ্ছা করিয়াছিল। অনুবাদক বলেন, অনেকে বাস্তবিকই ঐরূপ ধূলামাটি পূর্ণ করিয়া কামান ছাড়িয়াছিল।[৯]

গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজ নিহত হইলে, আলিবর্দী খাঁ বাঙ্গলার সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। কিন্তু ইহাতে জগৎশেঠ প্রভৃতির প্রশংসা করা যায় না। ফতেচাঁদের ন্যায় একজন বার্ধক্যদশায় উপনীত লোকের বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের দ্বারা নিজ অবমাননার প্রতিশোধ লইতে ইচ্ছা করা কদাচ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ, শেঠ-বংশীয়দের প্রবাদানুসারে বাস্তবিক যদি মুর্শিদকুলীর গচ্ছিত অর্থ প্রত্যর্পণ না করায় সরফরাজের সহিত তাঁহার মনোবিবাদ ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে, তাঁহার ব্যবহার যে নিতান্ত নিন্দনীয়, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। যদি সরফরাজের প্রতি তাঁহার বিশিষ্টরূপ বিরক্তি জন্মিয়া থাকিত, তিনি অনায়াসে তাহার অন্য উপায় করিতে পারিতেন। বাদশাহ-দরবারে তাঁহাদের যেরূপ প্রতিপত্তি ছিল, তাহাতে তাঁহারা নবাবের অত্যাচার বাদশাহের কর্ণগোচর করিয়া, প্রকাশ্যভাবে তাঁহার পদচ্যুতি ঘটাইতে পারিতেন। ফলতঃ, ফতেচাঁদের ঈদৃশ ব্যবহার আমরা কোনরূপে সমর্থন করিতে পারি না।

৮ বর্তমান নোট বা চেকের ন্যায় কাগজ, তাহাতে টাকা দিবার আদেশ লিখিত হইত।

৯ Mutaqherin (Trans.), Vol. I, p. 363. রিয়াজুস্ সালাতীন গ্রন্থেও সরফরাজের তোপখানার কর্মচারী সুজা খাঁর বিশ্বাসঘাতকতায় তোপখানা হইতে গোলাবারুদের পরিবর্তে অনেক ঢিল পাটকেল বাহির হইবার কথা লিখিত আছে। (Riyaz-us-salatin, p. 310.)

আলিবর্দী খাঁ সিংহাসনে আরোহণের পর, জগৎশেঠ ফতেচাঁদকে বিশিষ্টরূপ সম্মান প্রদর্শন করিয়া সমস্ত কার্যেই তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। নবাব আলিবর্দী খাঁর রাজত্বকালে মহারাষ্ট্রীয়গণ বারংবার বাঙ্গলা আক্রমণ করেন। তাঁহারা বাঙ্গলার ভিন্ন ভিন্ন স্থান লুণ্ঠন করিয়া গৃহে ও শস্যস্তুপে অগ্নিপ্রদানপূর্বক সাধারণ প্রজাবর্গের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছিলেন। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী কাটোয়া প্রভৃতি প্রদেশ অনেক দিন পর্যন্ত তাঁহাদের অধিকারস্থ থাকে। ১৭৪২ খ্রীঃ অব্দে নবাব উড়িষ্যা হইতে মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমনকালে যে-সময়ে ভাস্কর পণ্ডিতের অধীন মহারাষ্ট্রীয়গণ-কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া কাটোয়ায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে সুজা উদ্দীনের জামাতা, উড়িষ্যার ভূতপূর্ব শাসনকর্তা দ্বিতীয় মুর্শিদকুলীর জনৈক কর্মচারী মীর হাবীব মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যোগ দিয়া, এক দল মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের সাহায্যে মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করে। তৎকালে মুর্শিদাবাদ প্রাচীরাদির দ্বারা বেষ্টিত না থাকায়, তাহাদের প্রবেশের বিলক্ষণ সুবিধা ঘটিয়াছিল। কেহই তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিতে সাহসী হয় নাই। মীর হাবীব মুর্শিদাবাদের অন্যান্য স্থানের লুণ্ঠনের সঙ্গে শেঠদিগের গদীও লুণ্ঠন করে এবং পূর্ণ দুই কোটি আর্কট মুদ্রা ও অন্যান্য অনেক দ্রব্য লইয়া যায়।[১০] কিন্তু ইহাতে শেঠদিগের কোনই ক্ষতি হয় নাই। মুতাক্ষরীনকার বলেন যে, সেই দুই কোটি মুদ্রা তাঁহাদের নিকট দুই গুচ্ছ তৃণের সমান ছিল। ইহার পরও তাঁহারা সরকারে পূর্বের ন্যায়ই প্রতিবারে এক কোটি টাকার দর্শনী প্রদান করিতেন।[১১]

১০ Seir Mutaqherin (Trans.), Vol. I, p. 426. Also. Vol. II, p. 226 Stewart ভ্রমক্রমে ৩ লক্ষ টাকা লুণ্ঠনের কথা লিখিয়াছেন।

১১ জগৎশেঠের সম্বন্ধে মুতাক্ষরীনে এইরূপ লিখিত হইয়াছে ঃ "Their riches were so great, that no such bankers were ever seen in Hindustan or Deccan ; nor was there any banker or merchant that could stand a comparison with them, all over India. It is even certain that all the bankers of their time in Bengal, were either their factors, or some of their family. Their wealth may be guessed by this only fact. In the first invasion of the Marhattas, and when Moorshoodabad was not yet surrounded by walls, Mir-habib, with a party of their best horse, having found means to fall upon that city, before Aly-verdy qhan could come up, carried from Djagat Sett's house two crores of rupees in Arcot coin only ; and this religious sum did not affect the two brothers, more than if it had been two trusses of straw. They continued to give afterwards to Government, as they had done before, bill of exchange, called *dursunnies*, of one crore at a time, by which words is meant, a draft, which the acceptor is to pay at sight, without any sort of excuse. In short, their wealth was such that there is no

১৭৪৪ খ্রীঃ অব্দে ফতেচাঁদের মৃত্যু হয়। ফতেচাঁদের আনন্দচাঁদ, দয়াচাঁদ ও মহাচাঁদ নামে তিন পুত্র জন্মে। আনন্দচাঁদ ও দয়াচাঁদ, পিতার জীবদ্দশাতেই পরলোক-গমন করায়, পৌত্র মহাতপচাঁদ ও স্বরূপচাঁদকে ফতেচাঁদ উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। মহাতপচাঁদ আনন্দচাঁদের ও স্বরূপচাঁদ দয়াচাঁদের পুত্র। বাদশাহের নিকট হইতে মহাতপচাঁদ "জগৎশেঠ" ও স্বরূপচাঁদ "মহারাজ" উপাধি লাভ করেন। এই সময়ে শেঠদিগের উন্নতি চরমসীমায় উপনীত হয়। তাঁহাদের ঐশ্বর্যের সীমা ছিল না। শেঠদিগের গদীতে অনবরত ১০ কোটি টাকার কারবার চলিত। জমিদার মহাজন ও অন্যান্য ব্যবসায়ী সকলেই অর্থের জন্য শেঠদিগের নিকট উপস্থিত হইতেন। ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি বৈদেশিক বণিকগণ তাঁহাদের নিকট হইতে টাকা কর্জ লইতেন। ফতেচাঁদের মৃত্যুর পর নবাব আলিবর্দী খাঁ জগৎশেঠ মহাতপচাঁদকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন, এবং ফতেচাঁদের ন্যায় তাঁহারও পরামর্শ গ্রহণ করিতে ত্রুটি করিতেন না। এই সময় হইতে শেঠদিগের সহিত ইংরেজদের সম্বন্ধ প্রগাঢ় হইতে আরম্ভ হয়। ১৭৪৯ খ্রীঃ অব্দে ইংরেজগণ কতকগুলি আর্মেনীয় বণিকের প্রতি অযথা অত্যাচার করায়, নবাব ইংরেজদিগকে দমন করার জন্য কতকগুলি সৈন্য প্রেরণ করিয়া-ছিলেন। তাহারা কাশীমবাজার কুঠী অবরোধ করিলে, ইংরেজরা নবাবের নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করেন। নবাব তাঁহাদিগের ১২ লক্ষ টাকা জরিমানা করায়, ইংরেজরা শেঠ-দিগের নিকট হইতে উক্ত টাকা লইয়া নবাবের ক্রোধ শান্ত করিতে বাধ্য হন।[১২] ডিরেক্টরগণ অনেকদিন হইতে কলিকাতায় একটি স্বতন্ত্র টাঁকশাল নির্মাণের জন্য তথাকার অধ্যক্ষকে বারংবার লিখিয়া পাঠাইতেছিলেন। উক্ত টাঁকশাল স্থাপনের জন্য যত টাকা ব্যয়ের আবশ্যক, তাহা প্রদান করিতে তাঁহারা সম্মত ছিলেন। ১৭৫৩ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতার তদানীন্তন অধ্যক্ষ তাহার এইরূপ উত্তর দেন যে, "এ কার্য অতি গোপনভাবে সম্পন্ন করাই কর্তব্য। নবাবের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলে, তিনি এ বিষয়ে জগৎশেঠদিগের মতামত জিজ্ঞাসা করিবেন। আমরা যতই কেন অর্থ ব্যয় করি না, জগৎশেঠ কিছুতেই সম্মতি প্রদান করিবেন না। মুদ্রা নির্মাণের জন্য যে-সমস্ত সোনারূপার আমদানি হয়, তৎসমস্তই জগৎশেঠগণ একাকী ক্রয় করিয়া থাকেন এবং তজ্জন্য তাঁহাদের যথেষ্ট লাভও হয়। এ প্রস্তাবে তাঁহাদের লাভের ব্যত্যয় ঘটিবার সম্ভাবনা; সুতরাং তাঁহারা স্বীকৃত হইবেন বলিয়া বোধ হয় না। তবে তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে যদি দিল্লীর দরবার হইতে অনুমতি লওয়া যায়, তাহা হইলে কিয়ৎ-

---

mentioning it without seeming to exaggerate, and to deal in extravagant fables. Thousands of their agents and factors have acquired such fortunes in their service, as have enabled them to purchase large tracts of land, and other astonishing possessions." (Seir Mutaqherin. Trans. Vol. II, pp. 226-227.)

১২ Long's Selection of Unpublished Records, Vol. I, p. 19.

পরিমাণে কার্যসিদ্ধির সম্ভাবনা আছে। ইহাতে দুই লক্ষেরও অধিক অর্থব্যয় হইতে পারে। কিন্তু জগৎশেঠগণ জানিতে পারিলে সেখানেও বাধা দিতে পারেন। কারণ সম্রাট্‌দরবারেও তাঁহাদের ক্ষমতা বড় কম নহে।”[১৩] নবাব ও বাদশাহ উভয়ের দরবারে শেঠদিগের প্রাধান্য থাকায় তাঁহাদের ক্ষমতা প্রতিহত করা অত্যন্ত দুষ্কর হইত।

নবাব আলিবর্দী খাঁকে মহারাষ্ট্রীয়গণের অত্যাচার নিবারণের জন্য তাঁহাদের সহিত বারংবার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয়। তজ্জন্য যখনই তাঁহার অর্থের প্রয়োজন হইত, শেঠেরা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সাহায্য করিতেন এবং তিনি শেঠদিগের পরামর্শ ব্যতীত কখনও রাজকার্য নির্বাহ করিতেন না। আলিবর্দী তাঁহার প্রিয়তম সিরাজকে শেঠ-দিগের পরামর্শানুসারে কার্য করিতে উপদেশ দিয়া যান। সিরাজ কিছুদিন পর্যন্ত মাতামহের উপদেশপালনে চেষ্টা করিয়াছিলেন।[১৪] ১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল মাসে আলিবর্দীর মৃত্যু হইলে, সিরাজ বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার সিংহাসনপ্রাপ্তির পূর্ব হইতে এক ভীষণ ষড়যন্ত্রের আয়োজন হইতে-ছিল। জগৎশেঠ মহাতপচাঁদও অবশেষে এই ষড়যন্ত্রে যোগদান করেন। সিরাজ অত্যন্ত অস্থিরবুদ্ধি ও চঞ্চলপ্রকৃতি ছিলেন। যাঁহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করা উচিত, তিনি সকল সময়ে তাহা করিয়া উঠিতে পারিতেন না। তাঁহার কটুবাক্য-প্রয়োগে প্রধান প্রধান কর্মচারিগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন। এই সময়ে কতকগুলি স্বার্থপর লোকও আপনাদিগের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সিরাজকে পদচ্যুত করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিল। ক্রমে এক ষড়যন্ত্রের আয়োজন হইলে, জগৎশেঠ তাহাতে লিপ্ত হইয়া পড়েন।

পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, সিরাজ চাপল্যবশতঃ সময়ে সময়ে অনেককে অযথা বাক্য প্রয়োগ করিতেন। জগৎশেঠ মহাতপচাঁদের প্রতিও সেইরূপ বাক্য প্রযুক্ত হইত। মুতাক্ষরীনে লিখিত আছে যে, সিরাজ মহাতপচাঁদকে প্রায়ই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিতেন, এবং সময়ে সময়ে মুসলমানী করার ভয় দেখাইতেন।[১৫] এই সমস্ত কারণে জগৎশেঠ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। ব্যাপার ক্রমশঃ অত্যন্ত গুরুতর হইয়া উঠে।

পূর্বে নিয়ম ছিল যে, কোন নূতন নবাব মসনদে উপবিষ্ট হইলে, জগৎশেঠ দিল্লী হইতে তাঁহার সনন্দ আনাইয়া দিতেন। সিরাজের সিংহাসনারোহণের সময় সনন্দ আনীত হয় নাই। সিরাজ সনন্দ না পাওয়ায়, তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত সৈয়দ আহম্মদ ও মাতৃষ্বসার পুত্র পূর্ণিয়ার নবাব সওকতজঙ্গ বাঙ্গলার সুবেদারীলাভের চেষ্টা করিতে-

১৩ Report of the Select Committee. Appendix VI, Pt. I. Also Long's Selection, p. 47.

১৪ Orme, Vol, II. p. 53. Also, Mill's India, VII. p. 236.

১৫ Seir Mutaqherin (Trans.),. Vol. I, p. 759.

ছিলেন। সিরাজ মোহনলাল, মীরজাফর প্রভৃতিকে সওকতজঙ্গের দমনে পাঠাইয়া জগৎশেঠকে সনন্দ না আনার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু জগৎশেঠ তাহার কোন সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না। এই অবহেলার ক্ষতিপূরণের জন্য সিরাজ জগৎশেঠকে বণিগ্‌মহাজনদিগের নিকট হইতে তিন কোটি টাকা সংগ্রহ করিবার জন্য আদেশ দিলেন। জগৎশেঠ পীড়িত লোকদিগকে পুনঃপীড়ন করিয়া অর্থশোষণ করা সঙ্গত মনে করিলেন না। তিনি নবাবের আদেশের প্রতিবাদ করায় সিরাজ ক্রোধোন্মত্ত হইয়া তাঁহার মুখে এক মুষ্ট্যাঘাত করেন।[১৬] পরে তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিতে আদেশ দেন।[১৭] মীরজাফর প্রভৃতি প্রত্যাবৃত্ত হইয়া জগৎশেঠকে মুক্ত করার জন্য নবাবকে অনুরোধ করেন। নবাব তাঁহাদের কথায় প্রথমে কর্ণপাত করেন নাই; পরে ক্রোধের উপশম হইলে জগৎশেঠকে নিষ্কৃতি দিয়াছিলেন। এই রূপে অবমানিত হইয়া জগৎশেঠ সিরাজের উচ্ছেদসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। দিল্লীর বাদশাহ যাঁহাদিগকে বংশানুক্রমে সম্মান প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা সিরাজের ন্যায় চঞ্চলমতি নবাবের কৃত অপমান কদাচ সহ্য করিতে পারেন না। সিরাজকৃত অযথা অবমাননার জন্য তাঁহার মনোমধ্যে প্রতিহিংসার অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং সেই অগ্নি ক্রমে বর্ধিতায়তন হইয়া, সিরাজের সহিত সমস্ত মুসল্‌মানরাজ্য ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। কিরূপে তিনি সিরাজের প্রতি তৎকৃত অবমাননার প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করেন তাহা ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছে।

যৎকালে জগৎশেঠ প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ সিরাজের দমনার্থ সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার সহিত ইংরেজদিগের বিবাদ উপস্থিত হয়। জগৎশেঠ, মীরজাফর ও রায়দুর্লভ প্রভৃতি একমত হইয়া ইংরেজদের সাহায্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পূর্বে বলা হইয়াছে, আলিবর্দী খাঁর সময় হইতে শেঠদিগের সহিত ইংরেজদিগের সম্বন্ধ গাঢ়তর হইতে আরম্ভ হয়। ইংরেজদের সহিত বিবাদারম্ভের প্রথমে, জগৎশেঠের বিশেষরূপে অবমাননার পূর্বে, কলিকাতার অধ্যক্ষ হল্‌ওয়েল সাহেব ইংরেজদের প্রতি সিরাজের ক্রোধোপশমের জন্য জগৎশেঠকে অত্যন্ত অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। নবাবের কলিকাতাক্রমণের পর, যখন ইংরেজরা পলায়ন করিয়া ফলতায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন তাঁহারা জগৎশেঠকে সম্মানসহকারে পত্র লিখিয়া, নবাব-দরবারে তাঁহাদের পক্ষ হইয়া কার্য করিতে অনুরোধ করেন। ২২শে জুন কলিকাতা অধিকৃত হয়, ইংরেজরা ২২শে আগস্ট জগৎশেঠকে

১৬ Long's Selection, p. 77.

১৭ Gleig's Memoirs of Warren Hastings. Vol. I, p. 40.

জগৎশেঠকে মুষ্ট্যাঘাত অথবা বন্দী করার কথা দেশীয় কোন ইতিহাসগ্রন্থে দেখা যায় না। অর্মে বলেন যে, সিরাজউদ্দৌলা শেঠদিগের সহিত বরাবরই সদ্ব্যবহার করিতেন। আলিবর্দীর মৃত্যুর পর তাঁহাদের ধনসম্পত্তি নিরাপদে থাকিবে না এই আশঙ্কা করিয়া তাঁহারা মীরজাফরের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন।

উক্ত পত্র লিখিয়াছেন। তাঁহারা জগৎশেঠের প্রতিনিধি আমীরচাঁদ বা আমীন চাঁদের (উমিচাঁদ) দ্বারা পত্রাদি পাঠাইতেন। ৫ই সেপ্টেম্বর ইংরেজেরা জগৎশেঠকে আর এক পত্র পাঠাইতে চান। কিন্তু আমীরচাঁদ নিজের কোন কারণবশতঃ তাহা পাঠাইতে অস্বীকৃত হন। ২৩শে নবেম্বর ফল্‌তা হইতে মেজর কিল্‌প্যাট্রিক পুনর্বার জগৎ-শেঠকে লিখিয়া পাঠান যে, তাঁহারই উপর সমস্ত বিষয় নির্ভর করিতেছে এবং একমাত্র তাঁহারই দ্বারা তাঁহারা নবাবের সহিত বিবাদনিষ্পত্তির আশা করেন। এই সময়ে ওয়ারেন্ হেস্টিংস কাশীমবাজার কুঠী হইতে বন্দী হইয়া মুর্শিদাবাদে অবস্থিতি করিতে-ছিলেন। তিনিও আপনাদিগের উদ্ধারার্থ গোপনে জগৎশেঠের সহিত পরামর্শ করিতেন ; ইংরেজদিগের ন্যায় ফরাসীদিগের সহিতও জগৎশেঠগণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তাঁহারাও জগৎশেঠের দ্বারা আপনাদের সমুদায় আবেদনাদি নবাব-দরবারে প্রেরণ করিতেন। এই সময়ে চন্দননগরের ফরাসী গভর্নমেণ্টের নিকট জগৎশেঠ-দিগের ১৫ লক্ষ টাকা পাওনা ছিল।[১৮]

কলিকাতা আক্রমণে ইংরেজদিগের যে-দুর্দশা উপস্থিত হয় তাহার সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছিলে, তথা হইতে ক্লাইব ও ওয়াট্‌সন আসিয়া কলিকাতার পুনরুদ্ধার এবং চন্দন-নগর ও হুগলী অধিকার করিয়া নবাবের সহিত সন্ধিস্থাপন করেন। নবাবের সহিত সন্ধিস্থাপনের জন্য ক্লাইব জগৎশেঠকে পত্র লিখিয়াছিলেন। ইংরেজেরা নবাবের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন বটে, কিন্তু গোপনে গোপনে তাঁহার সর্বনাশের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এদিকে সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রও গুরুতরভাব ধারণ করিল। এই ষড়যন্ত্রের মন্ত্রণা ও মন্ত্রণাস্থল লইয়া নানারূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। কোন কোন প্রবাদানুসারে জগৎশেঠের বাটীতে এই মন্ত্রণা-সভার অধিবেশন হয়। সেই সভায় রাজা মহেন্দ্র (দুর্লভরাম), রাজা রামনারায়ণ, রাজা রাজবল্লভ, কৃষ্ণদাস, মীরজাফর প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। সভাতে অনেক তর্কবিতর্কের পর কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত না হওয়ায়, নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অপেক্ষায় সে দিবস সভা-ভঙ্গ হয়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট সংবাদ পাঠাইলে, তিনি প্রথমে স্বীয় দেওয়ান কালীপ্রসাদ সিংহকে প্রেরণ করেন। কালীপ্রসাদ তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া, রাজাকে সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিলে, রাজা তৎপরে নিজেই মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হন। পুনর্বার জগৎশেঠের বাটীতে মন্ত্রণা-সভার অধিবেশন হয়। সভাতে কেহ কেহ যবনাধি-কারের পরিবর্তে হিন্দুশাসনের প্রস্তাব করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রথমে এ বিষয়ে কোন উত্তর দেন নাই ; পরে তিনি বলিলেন যে, যে মন্ত্রণাসভায় মীরজাফর একজন নেতা, সেখানে যবনাধিকার নিরাকৃত হওয়া সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। আমার মতে মীরজাফরকে সহায় করিয়া ইংরেজদিগের সহিত যোগ দিয়া সিরাজকে পদচ্যুত করা যাইতে পারে। ইংরেজদিগের সহিত আমার বিলক্ষণ পরিচয় আছে ; সুতরাং

১৮ Orme's Indostan, Vol. II, p. 138.

এ বিষয়ে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে পারিব। জগৎশেঠ কহিলেন, ব্যবসায় সম্বন্ধে তাঁহাদের সহিত আমারও বিলক্ষণ পরিচয় হইয়াছে।[১৯] অতএব মহারাজ কৃষ্ণ-চন্দ্রের প্রস্তাবই সঙ্গত।

তৎপরে সকলেই একবাক্যে সেই প্রস্তাবে সম্মতিপ্রদান করিলে, ক্লাইব সাহেবকে সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করা হয়।[২০] কিন্তু ইতিহাসে এই মন্ত্রণা-সভার উল্লেখ দেখা যায় না। মন্ত্রণা-সভা হউক বা না হউক, পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণ সিরাজের পদচ্যুতির জন্য যে যারপরনাই চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, জগৎশেঠ আমীরচাঁদের দ্বারা সিরাজের বিরুদ্ধে ইংরেজদিগকে ক্রমাগত উত্তেজিত করিতেন।[২১] ক্রমে ক্রমে যখন এই সমস্ত ষড়যন্ত্রের কথা নবাব কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে সক্ষম হন, সেই সময়ে জগৎশেঠও সতর্কতা অবলম্বন করেন। তিনি ইংরেজদের পক্ষ হইয়া নবাব-দরবারে আর কোন বিষয়ের উল্লেখ করিতে সাহসী হইতেন না। তাঁহারা রণজিৎ রায় নামে আপনাদিগের একজন প্রতিনিধি দ্বারা ইংরেজদিগের কথাবার্তা নবাব-দরবারে উপস্থিত করিতেন।[২২]

ইয়ারলতিফ খাঁ নামে নবাবের একজন সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার অধীন দুই সহস্র অশ্বারোহী শেঠদিগের প্রদত্ত বৃত্তির দ্বারা রক্ষিত হইত। নবাব শেঠদিগের অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা করিলে, ইয়ারলতিফ শেঠদিগের বৃত্তির জন্য তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হন। উক্ত খাঁ ইংরেজদিগকে গোপনে সংবাদ দেন যে, যদি ইংরেজেরা তাঁহাকে নবাবী প্রদান করিতে অঙ্গীকার করেন, তাহা হইলে তিনি সিরাজের বিরুদ্ধে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে পারেন এবং তজ্জন্য শেঠেরা তাঁহার সাহায্য করিতে স্বীকৃত আছেন। এই সময়ে মীরজাফরও নবাবীর আশায় ইংরেজদিগকে সাহায্য করিতে ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। তিনিও জগৎশেঠ ও রায়দুর্লভের নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন বলিয়া ইংরেজদিগকে অবগত করান। ইংরেজরা মীরজাফরের প্রস্তাবই সঙ্গত মনে করেন; কিন্তু ইয়ারলতিফকেও হস্তচ্যুত করেন নাই। তাহার পর

১৯ ইতিহাসে কিন্তু ইহার পূর্ব হইতে জগৎশেঠের সহিত ইংরেজদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখা যায়।

২০ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রচরিত, ৪র্থ সংস্করণ, ৪৫-৫৩ পৃঃ, এবং ক্ষিতীশবংশাবলী রচিত ত্রয়োদশ অধ্যায়।

২১ "Djagat-seat was one of the foremost of them, and he had also the best opportunities by the means of his mercantile agent Amin chund, one of the principal bankers of Calcutta, he was perpetually exciting the English to a rupture." (Seir Mutaqherin, Vol. I, p. 793.) এই আমীনীচাঁদই প্রচলিত ইতিহাসের উমিচাঁদ। ইঁহার প্রকৃত নামই আমীরচাঁদ; মুতাক্ষরীন প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি আমীনচাঁদ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। উমিচাঁদ বাঙ্গালী নহেন, তিনি একজন পাঞ্জাবী মহাজন।

২২ Orme's Indostan, Vol. II, p. 128.

পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজরা জয়ী হইয়া, মীরজাফরকে মসনদে বসাইলে, সিরাজ রাজমহলের নিকট হইতে ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদে আনীত হন। তাহার পর মহম্মদী বেগের তরবারির আঘাতে তাঁহার দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হয়। কোন দেশীয় গ্রন্থকার বলেন যে, জগৎশেঠ ও ইংরেজ সর্দার সিরাজের হত্যাকাণ্ডের জন্য মীরজাফরকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন।[২৩] ইহার সত্যাসত্য সাহস করিয়া বলিতে পারা যায় না। যদি এ ঘটনা সত্য হয়, তাহা হইলে, জগৎশেঠ মহাতপচাঁদের নাম যে চিরকলঙ্কিত হইয়া থাকিবে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যে-হতভাগ্য রাজ্যহারা, সর্বস্বহারা হইয়া অবশেষে আপনার প্রাণভিক্ষার জন্য প্রত্যেকের পদতলে বিলুণ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার প্রাণদানের পরিবর্তে যদি প্রাণনাশে কেহ সম্মতিমাত্র দিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার ন্যায় ঘৃণিত ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক যে সর্বথা নিন্দনীয়, এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে। ক্লাইবের ন্যায় কঠোরপ্রকৃতি ইংরেজ-সর্দারের এ প্রবৃত্তি শোভা পাইতে পারে, কিন্তু জগৎশেঠের ন্যায় উচ্চবংশসম্ভূত ব্যক্তির এ প্রবৃত্তি কদাচ সাধুজনপ্রশংসনীয় হইতে পারে না। ক্লাইব যে ঐরূপ ঘৃণিত কার্য করিয়াছিলেন, তাহাতেও আমাদের ঘোরতর সন্দেহ আছে।

পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফর মুর্শিদাবাদের মসনদে উপবিষ্ট হন। তাঁহার সিংহাসনারোহণের পরেই সন্ধির প্রস্তাবানুযায়ী অর্থাদির নিষ্পত্তি আরম্ভ হয়। পলাশীর যুদ্ধের সাত দিবস পরে ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দের ৩০শে জুন মহিমাপুরে শেঠদিগের বাটীতে সমস্ত বিষয়ের মীমাংসার জন্য সকলে সমবেত হন এবং সেইখানে ক্লাইব আমীরচাঁদকে জাল লোহিত সন্ধিপত্রের কথা প্রকাশ করিয়া বলেন। শুনিয়া, আমীরচাঁদ মূর্ছিত হইয়া পড়েন। তাহার পর তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়ায়, ক্লাইব তাঁহাকে তীর্থযাত্রার পরামর্শ প্রদান করিয়াছিলেন। ষড়যন্ত্রে শেঠদিগের লাভালাভের কথা বিশেষ কিছু বুঝা যায় না।

মীরজাফরের সিংহাসনে উপবেশন করার পর ইংরেজরা বাঙ্গলার একরূপ সর্বময় কর্তা হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে তাঁহারা আপনাদিগের লাভালাভের বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগী হইলেন। আপনাদের সুবিধার জন্য তাঁহারা ১৭৫৮ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতায় একটি টাঁকশাল স্থাপন করিলেন। কলিকাতা টাঁকশালের মুদ্রিত মুদ্রা প্রচলিত করিবার জন্য তাঁহারা যথেষ্ট চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন ; কিন্তু প্রথমে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। তখনও সমস্ত বঙ্গদেশে এবং বাদশাহের নিকট পর্যন্ত জগৎশেঠদিগের ক্ষমতা সমভাবেই বিরাজ করিতেছিল। কলিকাতায় টাঁকশাল হওয়ায় মুর্শিদাবাদ টাঁকশালের ক্ষতি হইতে আরম্ভ হয় ; কাজেই জগৎশেঠদিগেরও লাভে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু সমস্ত বঙ্গদেশে মুদ্রাপ্রচলনের ভার জগৎশেঠের হস্তে থাকায়, প্রথম প্রথম কেহ মুর্শিদাবাদের মুদ্রিত টাকার পরিবর্তে কলিকাতার মুদ্রিত টাকা গ্রহণ করিতে

২৩ Riyaz-us-salatin, p. 373.

সাহসী হইত না। আমরা জানিতে পারি যে, ১৭৫৮ খ্রীঃ অব্দে ডগলাস নামে কোম্পানীর একজন উত্তমর্ণ কলিকাতা টাঁকশালের টাকা লইতে অস্বীকৃত হইয়া বলেন যে, কলিকাতার মুদ্রিত মুদ্রা লইলে, তাঁহাকে শতকরা ৫ হইতে ১০ টাকা পর্যন্ত ক্ষতি-স্বীকার করিতে হইবে। কারণ মুদ্রাপ্রচলনের ভার জগৎশেঠের উপর নির্ভর করিতেছে। তিনি ইচ্ছা করিলে, নিজের সুবিধানুযায়ী সমস্তই পরিবর্তন করিতে পারেন। এই সময়ে জগৎশেঠ বাটা দিয়া মুর্শিদাবাদ টাঁকশালে নিজের সমস্ত মুদ্রা মুদ্রিত করিতেন। ১৭৬০ খ্রীঃ অব্দে, কাশীমবাজারের অধ্যক্ষ ব্যাট্‌সন সাহেব কলিকাতায় লিখিয়া পাঠান যে, জগৎশেঠ শতকরা এক-দ্বিতীয়াংশ বাটা দিয়া আপনার মুদ্রা মুদ্রিত করিতেছেন। তজ্জন্য তাঁহার বিলক্ষণ লাভ হইতেছে। নবাব তাঁহার নিকট ঋণপাশে বদ্ধ থাকায়, তাঁহাকে ঐরূপ অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। পলাশীর যুদ্ধের পরও জগৎশেঠের সহিত ইংরেজদের অর্থসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। অনেক দিন পর্যন্ত সে সম্বন্ধ দৃঢ়ভাবেই ছিল। ১৭৬০ খ্রীঃ অব্দে মার্চ মাসে ঢাকার ইংরেজ অধ্যক্ষ কলিকাতায় লিখিয়া পাঠান যে, তাঁহাদের ঢাকার কোষাগারে অর্থের এরূপ অভাব উপস্থিত হইয়াছে যে, মাসিক ব্যয়নির্বাহ হওয়া সুকঠিন। এরূপ স্থলে কোম্পানীর কার্যের জন্য টাকা না পাঠাইলে, অথবা জগৎশেঠের নিকট হইতে টাকা লইবার অনুমতি না দিলে, অত্যন্ত বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।[২৪] ইংরেজরা জগৎশেঠকে বরাবরই সম্মানপ্রদর্শন করিতেন। অনেক স্থলে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৭৫৯ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে নবাব জাফর আলি খাঁ (মীরজাফর) কলিকাতায় উপস্থিত হইলে, সঙ্গে জগৎশেঠ ও অন্যান্য কর্মচারিগণও গমন করেন। ইংরেজরা তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য যথেষ্ট যত্ন করিয়াছিলেন। নবাবের বাসস্থান ও কলিকাতার দুর্গ প্রভৃতি উজ্জ্বল আলোকমালায় সুসজ্জিত এবং পতাকাশোভিত কৃত্রিম তোরণাদি দ্বারা সমস্ত কলিকাতা নগরীকে শোভাময়ী করা হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন পান, ভোজন, নৃত্যগীত ও অন্যান্য আমোদ-প্রমোদেরও সুবন্দোবস্ত করা হয়। এই অভ্যর্থনায় প্রায় ৮০ হাজার টাকা ব্যয় হওয়ার কথা শুনা যায় এবং কেবল জগৎশেঠের সমাদরের জন্য ১৭,৩৭৪ টাকা আর্কট মুদ্রা ব্যয় করা হইয়াছিল।[২৫]

জগৎশেঠের সবিশেষ সাহায্যে মীরজাফর বাঙ্গলার মসনদে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি ইংরেজদের অর্থপিপাসা মিটাইবার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হন; তজ্জন্য শেঠদিগের নিকট হইতে তাঁহাকে প্রতিনিয়ত ঋণ করিতে হইত। অর্থের জন্য অবিরত শেঠদিগকে পীড়াপীড়ি করায়, ক্রমে নবাবের সহিত তাঁহাদের মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। এই সময়ে শাহজাদা শাহ আলম বাঙ্গলা রাজ্য অধিকারের জন্য বিহারে উপস্থিত হন। শাহজাদার বিহারে অবস্থিতিকালে জগৎশেঠ মহাতপচাঁদ ও মহারাজ

২৪ Proceedings of the Council of Calcutta, 10th March, 1760.
২৫ Hunter's Statistical Account of Murshidabad, p. 260.

স্বরূপচাঁদ ভ্রাতৃদ্বয় আপনাদিগের তীর্থস্থান পরেশনাথে যাইতেছিলেন। তাঁহাদের সহিত তাঁহাদেরই বৃত্তিভোগী দুই সহস্র সৈন্য গমন করিতেছিল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতে নবাব তাঁহাদের গমনে বাধা প্রদান করেন। তৎকালে এক প্রবাদ রাষ্ট্র হয় যে, জগৎশেঠরা নবাবের বিরুদ্ধে শাহজাদার সহিত যোগদান করিতেছেন। নবাব এই প্রবাদে বিশ্বাস করিয়া, তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা পান। শেঠেরা নবাবের কথায় কর্ণপাত না করিয়া, সেই দুই সহস্র সৈন্যকে বশীভূত করিয়া ফেলেন এবং তাহাদিগকে যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিয়া তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া তীর্থাভিমুখে অগ্রসর হন। নবাব আপনার ভবিষ্যৎ অমঙ্গল ভাবিয়া তাঁহাদিগকে পুনঃপ্রতিনিবৃত্ত বা তাঁহাদিগের গদী লুণ্ঠন করিতে সাহসী হন নাই।[২৬] ইহার পরে আবার শেঠদিগের সহিত নবাব জাফর আলি খাঁর সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়।

১৭৬০ খ্রীঃ অব্দে মীরজাফর সিংহাসনচ্যুত হইলে, তাঁহার জামাতা কাসেম আলি খাঁ (মীর কাসেম) বাঙ্গলার মসনদে উপবিষ্ট হন। সিংহাসন-প্রাপ্তির পূর্বে কাসেম আলি ইংরেজদিগের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের ও জগৎশেঠের পরামর্শানুসারে শাসনকার্য নির্বাহ করিবেন। বাণিজ্যের শুল্কঘটিত ব্যাপার লইয়া ক্রমশঃ ইংরেজদিগের সহিত মীর কাসেমের ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়। জগৎশেঠ বরাবরই ইংরেজদিগের পক্ষ ছিলেন। এক্ষেত্রেও যে তাঁহাদের পক্ষ অবলম্বন না করিয়াছিলেন, এমন নহে। মীর কাসেম অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি মীরজাফরের ন্যায় ভীরু-প্রকৃতি অথবা সিরাজউদ্দৌলার ন্যায় অত্যধিক চঞ্চলমতি ছিলেন না। ইংরেজদের সহিত বিবাদ উপস্থিত হইলে' তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, জগৎশেঠ ইংরেজদিগের পূর্ণ সহায়তা করিতেছেন। এই সময়ে জগৎশেঠ মীর কাসেমের বিরুদ্ধে ইংরেজদিগকে ও জাফর আলি খাঁকে যে-সমস্ত পত্রাদি লেখেন, তাহার কতকগুলি পত্র মীর কাসেমের হস্তগত হয়।[২৭] এজন্য নবাব জগৎশেঠ মহাতপচাঁদকে বন্দী করিয়া মুঙ্গেরে পাঠাইবার জন্য বীরভূমের ফৌজদার মহম্মদ তকী খাঁর প্রতি আদেশ পাঠান। তকী খাঁ তাঁহাদিগকে কোনরূপ অবমানিত না করিয়া হিরাঝিলের প্রাসাদে বন্দী করিয়া রাখেন। পরে নবাবের সেনাপতি আর্মেনীয় মার্কার নবাবের আদেশে সসৈন্যে তাঁহাদিগকে লইতে উপস্থিত হইলে, তকী খাঁ তাঁহাদিগকে মার্কারের হস্তে সমর্পণ করেন। এই সময়ে নবাব কাসেম আলি খাঁ মুঙ্গেরে অবস্থিতি করিতেন। মার্কার তাঁহাদিগকে লইয়া মুঙ্গেরে উপস্থিত হন। নবাব শেঠদিগের প্রতি অত্যন্ত সদ্ব্যবহার করিয়া মুঙ্গেরে একটি কুঠী সংস্থাপন করিবার জন্য তাঁহাদিগকে নির্বন্ধসহকারে অনুরোধ করেন। অতঃপর তিনি তাঁহাদিগকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন ; কিন্তু পাছে ইংরেজদিগের সহিত পুনর্বার

২৬ Malcolm's Life of Lord Clive.
২৭ Riyaz-us-salatin, p. 385.

শেঠদিগের মন্ত্রণা আরম্ভ হয়, তজ্জন্য যাহাতে তাঁহারা অধিক দূর ভ্রমণ করিতে না পারেন, সে বিষয়ে স্বীয় অনুচরদিগকে সতর্ক করিয়া দেন।[২৮]

তৎকালে ভান্সিটার্ট সাহেব কলিকাতার গবর্নর ছিলেন। তিনি বরাবরই মীর কাসেমকে শ্রদ্ধা করিতেন। ইংরেজদিগের সহিত বিবাদে ভান্সিটার্ট প্রথম প্রথম মীর কাসেমের পক্ষ সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু ক্রমে যখন বিবাদ গুরুতর হইয়া উঠে, তখন তিনি নবাবকে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করেন।

নবাব জগৎশেঠকে বন্দী করিলে, ভান্সিটার্ট বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে এক পত্র লিখিয়া পাঠান। তিনি আমিয়ট সাহেবের নিকট হইতে জগৎশেঠদিগের সংবাদ অবগত হইয়াছিলেন। আমিয়ট তৎকালে কাশীমবাজারে অবস্থিতি করিতেছিলেন। গবর্নর ১৭৬৩ খ্রীঃ অব্দের ২৪শে এপ্রিল নবাবকে লিখিয়া পাঠাইলেন,—"আমি এইমাত্র আমিয়টের পত্রে অবগত হইলাম যে, মহম্মদ তকী খাঁ ২১শে রজনীতে জগৎশেঠ ও স্বরূপচাঁদের বাটীতে প্রবেশ করিয়া, তাঁহাদিগকে বন্দী অবস্থায় হীরাঝিলে আনিয়া রাখিয়াছে। এই ঘটনায় আমি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইয়াছি। যখন আপনি শাসনকার্যের ভার গ্রহণ করেন, তখন আপনি, জগৎশেঠ ও আমি সমবেত হইয়া এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম যে, শেঠেরা, বংশমর্যাদায় দেশের মধ্যে সর্বপ্রধান; অতএব শাসনকার্যের বন্দোবস্তে আপনাকে তাঁহাদিগের সাহায্যগ্রহণ করিতে হইবে এবং তাঁহাদিগের কোনরূপ অনিষ্ট না করিতে আপনি স্বীকৃত হন। মুঙ্গেরে আপনার সহিত সাক্ষাৎকালে আমি শেঠদিগের কথা আপনাকে বলিয়াছিলাম এবং আপনিও তাঁহাদিগের কোন ক্ষতি করিবেন না বলিয়া আমাকে নিশ্চিন্ত করেন। তাঁহাদিগকে এরূপভাবে গৃহ হইতে আনয়ন করা অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে; ইহাতে তাঁহাদিগের যৎপরোনাস্তি অবমাননা করা হইয়াছে। আপনার এরূপ ব্যবহারে আমাদের সন্ধি ভঙ্গ হইয়াছে এবং আপনার ও আমার সুনামে কলঙ্ক পড়িয়াছে। ভূতপূর্ব কোন নাজিম তাঁহাদিগের প্রতি এরূপ ব্যবহার করেন নাই। সুতরাং আপনি সৈয়দ মহম্মদ খাঁ বাহাদুরকে (মুর্শিদাবাদের ফৌজদার) তাঁহাদিগের মুক্তির জন্য লিখিয়া পাঠাইবেন।"

নবাব ২রা মে তাহার এক সুদীর্ঘ প্রত্যুত্তর লিখিয়া পাঠান। তাহাতে অনেক কথা লিখিত থাকে; তন্মধ্যে শেঠদিগের সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহার মর্ম এই রূপ,—"শেঠেরা ইংরেজদিগের সহিত যোগ দিয়াছে বলিয়া আমি তাহাদিগকে আনিতে পাঠাই নাই। যখন আমি শাসনভার গ্রহণ করি, তখন শেঠেরা আমায় সাহায্য করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হয়। কিন্তু তিন বৎসর তাহারা আমার কোনরূপ সাহায্য করে নাই এবং আপনাদিগের কারবারও সুন্দররূপে নির্বাহ করে নাই। আমি যখনই তাহাদিগকে আহ্বান করিয়াছি, তখনই তাহারা আমার আদেশ অমান্য করিয়াছে এবং আমাকে তাহাদের শত্রু ও রাজ্য হইতে বিতাড়িত মনে করিয়াছে। এক্ষণে

২৮ Seir Mutaqherin (Trans.), Vol. II. p. 226.

আমার কার্যনির্বাহের জন্য তাহাদিগের বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে বলিয়া, আমি তাহাদিগকে আহ্বান করিয়াছি। আশ্চর্যের বিষয় যে, আপনারা প্রতিদিন সিপাহী পাঠাইয়া আমার আমীন ও অন্যান্য কর্মচারিদিগকে ধৃত করিয়া অযথা অত্যাচারের সহিত তাহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখিতেছেন। আপনাদের ঐরূপ ব্যবহারে সন্ধিভঙ্গ হয় না, অথচ আমি আমার অধীন লোকদিগকে নিজের প্রয়োজনের জন্য আহ্বান করিলে, অমনি সন্ধিভঙ্গ হইয়া যায় !! আমি তাহাদিগকে সরকারের ও তাহাদের নিজের কার্যনির্বাহের জন্য মুঙ্গেরে আনয়ন করিয়াছি ; তাহাদিগকে এখানে আনিবার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।"[২৯] ইহার পর ক্রমে ইংরেজদিগের সহিত মীর কাসেমের বিবাদ গুরুতর হইয়া উঠিলে, নবাব কাটোয়া, গিরিয়া, উধুয়ানালা প্রভৃতি স্থানে পরাজিত হইয়া মুঙ্গেরে জগৎশেঠ ও অন্যান্য বন্দী কর্মচারী এবং রাজা ও জমিদারদিগের বিনাশ সাধন করেন। জগৎশেঠ মহাতপচাঁদকে অত্যুচ্চ দুর্গশিখর হইতে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করা হয়। মহারাজ স্বরূপচাঁদও ঐ সঙ্গে ইহজীবনের লীলা শেষ করিতে বাধ্য হন।[৩০]

জগৎশেঠ মহাতপচাঁদ ও মহারাজ স্বরূপচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁহাদের জ্যেষ্ঠপুত্র খোশালচাঁদ ও উদায়ৎচাঁদ তাঁহাদের উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করেন। ১৭৬৬ খ্রীঃ অব্দে বাদশাহ শাহ আমলের নিকট হইতে খোশালচাঁদ জগৎশেঠ ও উদায়ৎচাঁদ মহারাজ উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহারা মহাতপচাঁদ ও স্বরূপচাঁদের ন্যায় এক সঙ্গে কারবার চালাইতেন। এই সময় হইতে তাঁহাদের ব্যবসায় মন্দীভূত হইতে আরম্ভ হয়। ১৭৬৫ খ্রীঃ অব্দের মে মাসে তাঁহারা ক্লাইবকে আপনাদের দুরবস্থার কথা লিখিয়া পাঠান। তাহাতে তাঁহাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের শোচনীয় অবস্থার কথা আরও বিশেষ রূপে উল্লিখিত থাকে। খোশালচাঁদ ও উদায়ৎচাঁদ ব্যতীত মহাতপচাঁদের গোলাপচাঁদ ও স্বরূপচাঁদের মিহিরচাঁদ নামে পুত্র ছিল। যৎকালে মহাতপচাঁদ ও স্বরূপচাঁদ বন্দী অবস্থায় মুঙ্গেরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে গোলাপচাঁদ ও মিহিরচাঁদ তাঁহাদের সহিত তথায় বন্দী-অবস্থায় কালযাপন করেন। মহাতপচাঁদ ও স্বরূপচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁহারা মীর

২৯ Vansitart's Narrative, Vol. I, pp. 206-212.

৩০ মহাতপচাঁদকে জলমগ্ন করার কথা মুতাক্ষরীনের অনুবাদক উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু স্বরূপচাঁদের কি প্রকারে মৃত্যু হয়, তাহার কোন কথা তিনি বলেন নাই। মুতাক্ষরীনের অনুবাদক সেই স্থানে আর একটি চমৎকার ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন ; চুণী নামক জগৎশেঠের জনৈক ভৃত্য প্রভুর সহিত একত্র বদ্ধ হইয়া জলমগ্ন হইতে, অথবা তাঁহার পূর্বে প্রাণ বিসর্জন করিবার জন্য অশেষ প্রকার অনুনয় বিনয় করিতে থাকে। কিন্তু তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করা হয় নাই। অবশেষে সে নিজেই দুর্গশিখর হইতে পতিত হয়। জগৎশেঠ তাহাকে নিরস্ত হইবার জন্য অতিশয় অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন ; কিন্তু সে তাঁহার কথায় মনোযোগ দেয় নাই। অনুবাদক বাবুরাম নামে চুণীর জনৈক আত্মীয়ের নিকট হইতে এই সংবাদ অবগত হন।
(Seir Mutaqherin Vol II p, 268.)

কাসেমের সহিত মুঙ্গের হইতে গমন করিতে বাধ্য হন। মীর কাসেমের দুরবস্থার পর তাঁহারা বাদশাহ শাহ্ আলম ও অযোধ্যার নবাব-উজীরের হস্তে পতিত হইয়াছিলেন। মীরজাফর দ্বিতীয় বার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, তাঁহাদিগকে মুর্শিদাবাদে আনয়ন করিবার জন্য নবাব উজীরকে বারংবার অনুরোধ করিয়া পাঠান। কিন্তু তিনি মীরজাফরের অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। খোশালচাঁদ ও উদায়ৎচাঁদ অনেক অর্থ দিয়া তাঁহাদিগকে মুর্শিদাবাদে আনয়ন করেন। মুর্শিদাবাদে আসিয়া তাঁহাদিগকে অত্যন্ত হীন অবস্থায় জীবিকা নির্বাহ করিতে হইয়াছিল।

১৭৬৫ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে মীরজাফরের দেহত্যাগ হইলে, তাঁহার পুত্র নজম উদ্দৌলা ইংরেজদিগের অনুগ্রহে মুর্শিদাবাদের মসনদে উপবিষ্ট হন। কলিকাতার কাউন্সিলে তাঁহাকে সিংহাসন প্রদান করা স্থিরীকৃত হইলে, জনস্টন, মিডলটন ও লেসেস্টার নামে কাউন্সিলের তিনজন সভ্য তাঁহাকে মসনদে বসাইতে মুর্শিদাবাদে আগমন করিয়াছিলেন। এই সময়ে কোম্পানীর কর্মচারিগণের অর্থলালসা অত্যন্ত বলবতী হওয়ায়, নবাবকে তাহা মিটাইবার জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করিতে হয়। নজম উদ্দৌলার সহিত বন্দোবস্তের সময় ইংরেজরা জগৎশেঠকেও তাঁহার কার্যের সহায়তার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে উক্ত সভ্যত্রয় জগৎশেঠের নিকট হইতে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা প্রার্থনা করেন। জগৎশেঠ প্রথমে তাহা দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার উক্ত টাকা প্রদানে বিলম্ব হওয়ায় কোম্পানীর মহাপ্রভু কর্মচারিগণ জগৎশেঠকে নানারূপ ভয় প্রদর্শন করিয়া উক্ত টাকা আদায় করিয়াছিলেন। নজম উদ্দৌলা প্রথমত, মহম্মদ রেজা খাঁকে নায়েব সুবা নিযুক্ত করেন। তাহার পর, মে মাসে ক্লাইব ভারতবর্ষে পুনরাগমন করিলে, নজম উদ্দৌলা রাজস্ব ও সৈন্যসংক্রান্ত যাবতীয় ভার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কেবল শাসনকার্যের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত থাকে এবং তিনি মহম্মদ রেজা খাঁ, রাজা দুর্লভ রাম ও জগৎশেঠের পরামর্শে সমুদায় কার্য নির্বাহ করিতে অনুরুদ্ধ হন।

১৭৬৫ খ্রীঃ অব্দের আগস্ট মাসে কোম্পানী দেওয়ানী গ্রহণ করিয়া, দেশের সর্বময় কর্তা হইয়া উঠিলেন; দেওয়ানী গ্রহণের পর ক্লাইব জগৎশেঠ খোশালচাঁদকে কোম্পানীর 'সরফ' বা গদীয়ানের পদে নিযুক্ত করিলেন। খোশালচাঁদ, তৎকালে অত্যন্ত অল্পবয়স্ক ছিলেন। তাঁহার বয়স তখন অষ্টাদশ বয়সমাত্র ছিল বলিয়া শুনা যায়। এই সময় হইতে শেঠদিগের দুর্দশার আরম্ভ হয়। খোশালচাঁদ ১৭৬৫ খ্রীঃ অব্দের নভেম্বর মাসে ক্লাইবকে আপনাদিগের দুরবস্থার কথা জানাইলে, ক্লাইব এইরূপ কর্কশভাবে তাহার উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন—"আপনি অজ্ঞাত নহেন যে, আপনার পিতার প্রতি আমি কিরূপ সদয় ব্যবহার ও তাঁহাকে সর্বদা কিরূপ ভাবে সাহায্য করিয়া আসিয়াছি, এবং আপনার ও আপনার পরিবারস্থ সকলের প্রতি এক্ষণেও সেইরূপ আন্তরিক যত্ন দেখাইতেছি। দুঃখের বিষয়, আপনি নিজের সম্মানের ও সাধারণের প্রতি কর্তব্যকার্যের বিষয় কিছুমাত্র চিন্তা করেন না; পূর্বে যেরূপ

বন্দোবস্ত হইয়াছিল, তদনুযায়ী রাজকোষের সমস্ত অর্থ তিনটি বিভিন্ন চাবির দ্বারা রক্ষিত না হইয়া, দেখিতেছি কেবলই আপনাদের নিকটই জমা হইতেছে এবং আপনারা প্রকারান্তরে অল্প রাজস্বে বাঙ্গালা রাজ্য ইজারা লইতে সম্মতি দিতেছেন। আমি আরও অবগত হইলাম যে, যে-সময়ে জমিদারদিগের নিকট সরকারের রাজস্ব পাওনা রহিয়াছে, সেই সময়ে আপনারা আপনাদিগের পূর্বপুরুষগণের প্রাপ্য অর্থের জন্য তাহাদিগকে পীড়াপীড়ি করিতেছেন। আপনাদের এরূপ ব্যবহার কদাচ সমর্থন করা যাইতেছে না। আপনারা এখনও পূর্বের ন্যায় ধনী আছেন, এইরূপ ধনতৃষ্ণার প্রবৃত্তিতে কেবল যে আপনাদের অসুবিধা হইতেছে এরূপ নহে, কিন্তু সাধারণের হিতেচ্ছু বলিয়া আপনাদের প্রতি আমার যে-বিশ্বাস আছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহাও অন্তর্হিত হইবে।"

যিনি সামান্য অর্থের জন্য হতভাগ্য আমীরচাঁদকেও উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, তিনি যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যস্থাপনের প্রধান সহায় জগৎশেঠের পুত্রকে এরূপ ভাবে উত্তর প্রদান করিবেন, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? ১৭৬৬ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল মাসে জগৎ-শেঠেরা আপনাদিগের প্রাপ্য ৫০ হইতে ৬০ লক্ষ টাকা কোম্পানীর নিকট চাহিয়া পাঠান। তন্মধ্যে ৩০ লক্ষ টাকা জমিদারদিগকে ও ২১ লক্ষ মীরজাফর ও ইংরেজ-দিগের সৈন্যরক্ষার জন্য দেওয়া হয়। ১৪ই এপ্রিলে কাউন্সিলে স্থির হয় যে, জমিদারদিগের টাকার জন্য কেহ দায়ী নহেন। কিন্তু উক্ত ২১ লক্ষ টাকা কোম্পানী ও নবাব সমান ভাগে দিবেন, এবং ১০ বৎসরে তাহা ক্রমে ক্রমে পরিশোধ করা হইবে।

নজম উদ্দৌলার পর সৈফ উদ্দৌলা, তাহার পর মোবারক উদ্দৌলা মুর্শিদাবাদের মসনদে বসিয়াছিলেন, তাঁহারাও জগৎশেঠ, দুর্লভরাম ও রেজা খাঁর পরামর্শে সমস্ত কার্য নির্বাহ করিতে প্রতিশ্রুত হন। ক্রমে শেঠদিগের অবস্থা আরও হীন হইতে আরম্ভ হইলে, ক্লাইব জগৎশেঠ খোশালচাঁদকে বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকা বৃত্তি দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু খোশালচাঁদ তাহা লইতে অনিচ্ছুক হন। তিনি এইরূপ উত্তর দিয়াছিলেন যে, আমার মাসিক ব্যয় ন্যূনকল্পে ১ লক্ষ টাকা, তিন লক্ষ টাকায় আমার কোনই উপকার হইবে না; সুতরাং তাহা লইবার প্রয়োজন নাই। ইহার পর ওয়ারেন হেস্টিংস গবর্নর জেনারেল-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, খাল্‌সা বা রাজস্ববিভাগ মুর্শিদাবাদ হইতে স্থানান্তরিত করায়, জগৎশেঠদিগের আয়ের অত্যন্ত লাঘব হয়। দুর্ভাগ্য যখন খোশালচাঁদের জীবনের উপর কালিমাচ্ছায়া বিস্তার করিতে আরম্ভ করে, সেই সময়ে তিনি ওয়ারেন হেস্টিংসকে এইরূপ লিখিয়া পাঠান যে, তাঁহাদের পূর্বপুরুষেরা বরাবরই খাল্‌সা বিভাগের তত্ত্বাবধান করিতেন, এক্ষেত্রে তাঁহাদের সহিত উক্ত বিভাগের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, তাঁহাদিগকে অনেক কষ্ট পাইতে হইতেছে। তাঁহার অনুরোধ এই যে, গবর্নর জেনারেল অনুগ্রহপূর্বক তাঁহাকে পুনর্বার খাল্‌সা বিভাগের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করেন। হেস্টিংস তাহার উত্তরে এইরূপ লিখিয়াছিলেন যে, তিনি উত্তমরূপে

অবগত আছেন যে, জগৎশেঠের পিতা ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-স্থাপনের জন্য বিশিষ্ট-রূপ সহায়তা করিয়াছেন এবং তিনি কোম্পানীরও যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে প্রত্যাগমনের পর তিনি তাঁহাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে চেষ্টা পাইবেন। কিন্তু হেস্টিংসের প্রত্যাগমনের পূর্বেই ৩৯ বৎসর বয়সে সহসা কণ্ঠরোধ হইয়া খোশালচাঁদের মৃত্যু হয়।

খোশালচাঁদ অমিতব্যয়ী ছিলেন ; কিন্তু তাঁহার অধিকাংশ অর্থ সৎকার্যেই ব্যয়িত হইত। পরেশনাথ পাহাড়ের কতকগুলি জৈনমন্দির খোশালচাঁদের নির্মিত। তাঁহার পূর্বপুরুষেরা সম্রাট মহম্মদ শাহের নিকট হইতে পরেশনাথের অনেক ভূভাগ নিষ্কররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; সম্রাটপ্রদত্ত ভূভাগের ফার্মান অনেক দিন পর্যন্ত জগৎশেঠদিগের নিকট ছিল ; এক্ষণে স্থানান্তরিত হইয়াছে। পরেশনাথ পাহাড়ের মন্দির ও গুমটি অদ্যাপি খোশালচাঁদের নাম কীর্তন করিতেছে। সেই সমস্ত মন্দির এক্ষণে জৈন বণিকসম্প্রদায়-কর্তৃক রক্ষিত হইয়াছে। খোশালচাঁদের অনেক সৎকীর্তির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এরূপ কথিত আছে যে, কোন জগৎশেঠ পত্নীর ধর্মার্থে ১০৮টি পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। কাহার সময় সে পুষ্করিণী খনন করা হয়, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। আমাদের বিবেচনায় সে-সকল খোশালচাঁদেরই কৃত হওয়া সম্ভব। জগৎশেঠদিগের বাটীর নিকট একটি সুন্দর উদ্যান আছে ; তাহাও খোশালচাঁদের নির্মিত ; সেইজন্য তাহাকে খোশালবাগ বলিয়া থাকে। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, খোশালচাঁদের যে-সমস্ত অর্থ ছিল, তাহা ভূগর্ভে প্রোথিত থাকায় এবং সহসা তাহার মৃত্যু হওয়ায়, তিনি কাহারও নিকট সে কথা প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই ; বোধ হয়, সেইজন্য তাঁহার পর হইতে শেঠদিগের ঘোর দুর্দশা উপস্থিত হয়।

খোশালচাঁদ অপুত্রক হওয়ায়, ভ্রাতুষ্পুত্র হরকচাঁদকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। খোশালচাঁদের মৃত্যুতে হেস্টিংস অত্যন্ত দুঃখিত হন। তিনি ১৭৮২ খ্রীঃ অব্দে বালক হরকচাঁদকে খেলাত ও জগৎশেঠ উপাধি প্রদান করেন। এই সময় হইতে কোম্পানী নিজেই উপাধি প্রদানাদির ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। হেস্টিংস এই কথা ব্যক্ত করেন যে, হরকচাঁদ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, খোশালচাঁদের প্রার্থনার বিষয় বিবেচনা করিবেন। কিন্তু তাহার পরই তাঁহাকে ইংলণ্ডে গমন করিতে হয়। খোশালচাঁদের সময় অনেক অর্থের ব্যয় হওয়ায়, হরকচাঁদ প্রথমতঃ অত্যন্ত অর্থকষ্টে পতিত হইয়াছিলেন। তাহার পর পিতৃব্য গোলাপচাঁদের উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করায়, তাঁহার কষ্টের কথঞ্চিৎ লাঘব হয়। হরকচাঁদ আপনাদিগের পূর্বপুরুষগণের জৈন ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া, বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণের একটি কারণ শুনিতে পাওয়া যায়। হরকচাঁদ নিঃসন্তান হওয়ায় সর্বদা, অত্যন্ত বিষণ্ন থাকিতেন। তিনি সন্তানলাভের আশায় জৈন মতে অনেক ধর্মানুষ্ঠান করেন ; কিন্তু তাহাতে পুত্রমুখ দর্শন করিতে পান নাই। এই সময় একজন বৈষ্ণব সন্ন্যাসী তাঁহার গৃহে উপস্থিত হন। তিনি হরকচাঁদের

অপুত্রকাবস্থার ও তজ্জন্য তাঁহার মনঃকষ্টের কথা শুনিয়া তাঁহাকে বৈষ্ণবমতে যাগযজ্ঞ করিবার পরামর্শ প্রদান করেন। তাঁহারই পরামর্শানুযায়ী ক্রিয়ায় হরকচাঁদের সন্তান লাভ হয় ; এজন্য তিনি উক্ত সন্ন্যাসীর আদেশে জৈনধর্ম পরিত্যাগপূর্বক বৈষ্ণবধর্ম অবলম্বন করেন। তদবধি জগৎশেঠবংশীয়েরা বঙ্গদেশে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত ছিলেন। এক্ষণে আবার তাঁহারা জৈন হইয়াছেন। হরকচাঁদ বৈষ্ণবধর্মানুরাগের জন্য আপনার বাসভবনের সংলগ্ন একটি ঠাকুরবাটী নির্মাণ করিয়া তাহাতে গোবিন্দদেবজী নামক কৃষ্ণমূর্তির প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ চীনমৃত্তিকানির্মিত ইষ্টক-খচিত। গৃহতল মর্মরপ্রস্তরমণ্ডিত। জগৎশেঠবংশীয়েরা বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিলেও তাঁহাদের আচার-ব্যবহার অনেক পরিমাণে জৈনদিগের ন্যায়ই ছিল এবং জৈনদিগের সহিতই তাঁহাদের আদান-প্রদানও হইত। জগৎশেঠবংশীয়েরা অদ্যাপি জৈনসমাজের অধিপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং সাধারণ জৈনগণ তাঁহাদের সহিত আদান-প্রদানে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিয়া থাকেন। ওয়ারেন হেস্টিংস হরকচাঁদকে যে অনুগ্রহ দেখাইবেন বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছিলেন, লর্ড কর্নওয়ালিস্ তাহা অবগত হইয়া হরকচাঁদের উপকার করিতে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, হরকচাঁদেরও সহসা মৃত্যু হওয়ায়, কর্নওয়ালিস হরকচাঁদের অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রদিগের প্রতি কোন কার্যের ভার প্রদান করিতে সাহসী হন নাই।

হরকচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁহার দুই পুত্র ইন্দ্রচাঁদ ও বিষণচাঁদ পিতৃসম্পত্তি তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া লন। ইন্দ্রচাঁদ ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের নিকট হইতে জগৎশেঠ উপাধি লাভ করেন। তিনিই শেষ জগৎশেঠ। তাঁহার পর আর কাহাকেও জগৎশেঠ উপাধি দেওয়া হয় নাই। ইন্দ্রচাঁদ উপাধিপ্রাপ্তি উপলক্ষে অনেক ধুমধাম করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য তাঁহাকে অনেক অর্থ ব্যয় করিতে হয়। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে জগৎশেঠ-দিগের গৌরব একেবারে অন্তর্হিত হয়।

ইন্দ্রচাঁদের পর, তাঁহার পুত্র গোবিন্দচাঁদ শেঠদিগের গদীতে আরোহণ করেন। তিনি অত্যন্ত অমিতব্যয়ী ছিলেন। পৈতৃক যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল গোবিন্দচাঁদ তৎসমস্ত অপব্যয়ে নষ্ট করিয়া ফেলেন। ক্রমে তিনি আপনাদিগের বহুকালের রক্ষিত রত্নালঙ্কারাদি বিক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। তাহাতেও জীবিকানির্বাহ কঠিন হইয়া উঠিলে, বৃত্তির জন্য ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের শরণাগত হন। ডিরেক্টারগণ অনেক নাসিকা-কুঞ্চনের পর মুর্শিদাবাদের এজেণ্ট মেজর জেনারেল রেপারের ও ভারত গবর্নমেণ্টের অনুরোধে ১৮৪৩ খ্রীঃ অব্দে গোবিন্দচাঁদের জীবনাবধি মাসিক ১২০০ শত টাকা বৃত্তি নির্দিষ্ট করিবার অনুমতি প্রদান করেন।[৩১] তাহার পর

৩১ গোবিন্দচাঁদের আবেদনে ডিরেক্টারগণ কিরূপ ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন নিম্নে তাহার একটু দৃষ্টান্ত দেখান যাইতেছে—"The petitioners are the representatives of the family and mercantile firm of Jagat Seth Mahatab Rao, whose

বিষণচাঁদের পুত্র কিষণচাঁদ স্বতন্ত্র বৃত্তির জন্য আবেদন করিলে, ডিরেক্টারগণ উত্তর প্রদান করেন যে, যখন গোবিন্দচাঁদকে বৃত্তি দেওয়া হয়, তখন তাঁহারা এইরূপ মনে করিয়াছিলেন, ইহা ব্যক্তিগত বৃত্তি নহে, পরিবারস্থ সকলের প্রতিপালনের জন্যই তাহা প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং কিষণচাঁদকে স্বতন্ত্র বৃত্তি প্রদান করিতে তাঁহারা সক্ষম নহেন। গোবিন্দচাঁদের মৃত্যুর পর তিনি জীবিত থাকিলে সে বিষয়ে বিবেচনা করা যাইবে।[৩২] গোবিন্দচাঁদ নিজ জীবদ্দশায় গোপালচাঁদকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই গোপালচাঁদের বিবাহের সময় নিজামত তহবিল হইতে গোবিন্দচাঁদকে ৫০০ টাকার সাহায্য প্রদান করা হয়। ১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দে বঙ্গের তৎকালীন লেপ্টেনাণ্ট গবর্নর হেলিডে সাহেব গোবিন্দচাঁদের বৃত্তি হইতে ৩০০ টাকা কিষণচাঁদকে দিতে আদেশ করেন। এই আদেশে মুর্শিদাবাদের এজেণ্ট আপত্তি করিলে, গোবিন্দচাঁদ এই আদেশের বিরুদ্ধে ভারত গবর্নমেণ্টের নিকট আবেদন করেন। ভারত গবর্নমেণ্ট উক্ত আবেদন স্টেট সেক্রেটারি সার চার্লস উডের সমীপে পাঠাইয়া দিলে, তিনি গোবিন্দচাঁদের ১২ শত টাকা অক্ষুণ্ন রাখিয়া লেপ্টেনাণ্ট গবর্নরের আদেশ অগ্রাহ্য করেন। ১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে গোবিন্দচাঁদ বার্ধক্যদশা প্রাপ্ত হইয়া, স্বীয় পত্নী জগৎশেঠানী প্রাণকুমারী ও দত্তকপুত্র গোপালচাঁদকে রাখিয়া পরলোকে গমন করেন।

গোবিন্দচাঁদের মৃত্যুর পর, গোপালচাঁদ ও কিষণচাঁদ এই মর্মে আবেদন করেন যে, গোবিন্দচাঁদকে ১২ শত ও কিষণচাঁদকে ৫ শত টাকা দেওয়া হউক। কিন্তু গবর্নমেণ্ট সে আবেদন না শুনিয়া, কিষণচাঁদকে জীবনাবধি ৮ শত টাকা বৃত্তি নির্দিষ্ট করিয়া, গোবিন্দচাঁদের বিধবা পত্নী ও পরিবারবর্গের প্রতিপালনের জন্য আদেশ প্রদান করেন। গোপালচাঁদ পুনর্বার আবেদন করিলে, তাঁহাকে কিষণচাঁদের প্রদত্ত ৮ শত টাকা হইতে ৩ শত টাকা দিবার আদেশ হয়। কিন্তু তিনি উক্ত অল্পপরিমাণ বৃত্তি লইতে স্বীকৃত হন নাই। গোপালচাঁদের আবেদন অগ্রাহ্য হইলে, তিনি অত্যন্ত অর্থ-কষ্টে পতিত হইয়া, অবশেষে হতাশ-হৃদয়ে ইহজীবনের লীলা শেষ করেন।

attachment to British interest and whose service to our government in times when such services were peculiarly valuable are matter of History. *It does not appear that the present applicants have personally any peculiar claim* upon us, and the decline of the family seems to have been owing to mismanagement as to any unavoidable cause." তাহার পর তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণের উপকারে ও তদপেক্ষা মুর্শিদাবাদের এজেণ্ট ও ভারত গবর্নমেণ্টের অনুরোধে গোবিন্দচাঁদের জীবনাবধি ১২০০ শত টাকা বৃত্তি নির্দিষ্ট হয়। (Despatch of the Court of Directors, No. 14 of 1843.) Dated 30th May.

৩২ Despatch of the Court of Directors, No. 42 of 1844.

অনন্তর কিষণচাঁদের মৃত্যু হইলে, গোবিন্দচাঁদের বিধবা-পত্নী বিবি প্রাণকুমারী গবর্নমেন্টের নিকট হইতে ৩ শত টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। গোপালচাঁদ প্রাপ্তবয়স্ক হইলে, প্রাণকুমারী নিজ বৃত্তি বৃদ্ধির জন্য, অথবা গোলাপচাঁদকে একটি স্বতন্ত্র বৃত্তি প্রদান করিতে গবর্নমেন্টের নিকট বারংবার আবেদন করেন। তাঁহার শেষ আবেদন লেপ্টেনাণ্ট গবর্নর সার চার্লস এলিয়েটের নিকট করা হয়। কিন্তু গবর্নমেণ্ট তাঁহার কথায় কর্ণপাত করেন না। প্রাণকুমারীর মৃত্যুর পর গোলাপচাঁদ পুনর্বার বেঙ্গল গবর্নমেণ্ট ও ভারত গবর্নমেণ্ট উভয়ের নিকটই আবেদন করেন। কিন্তু কোন স্থানে তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য হয় নাই।[৩৩] গবর্নমেণ্ট তাঁহার বাটীনির্মাণের জন্য কেবল ৫ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। গোলাপচাঁদ অতি দীনভাবে জীবিকা নির্বাহ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। এক্ষণে তাঁহার দুই পুত্র ফতেচাঁদ ও উদয়চাঁদ বিদ্যমান আছেন। তাঁহাদের হীনাবস্থা সত্ত্বেও সেই সুপ্রসিদ্ধ জগৎশেঠগণের বংশধর বলিয়া এবং মুর্শিদাবাদের জৈনসম্প্রদায়ের নেতা বলিয়া আজিও মুর্শিদাবাদবাসিগণ তাঁহাদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে। যে জগৎশেঠগণ মধ্যাহ্নভাস্করতুল্য প্রদীপ্ত প্রভাবে সমগ্র জগতে গৌরবজ্যোতি বিকীর্ণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদের বংশধর সামান্য দীপশিখার ন্যায় আপনার ক্ষীণরশ্মি বিকীর্ণ করিতেছেন। দুর্ভাগ্যের প্রবল ঝটিকা অতঃপর এই রশ্মি চিরনির্বাপিত করিবে কিনা তাহা কে বলিতে পারে ?

জগৎশেঠদিগের সুদূরবিস্তৃত বাসভবন এক্ষণে ভগ্নদশায় পতিত। অনেক স্থানের চিহ্নমাত্রও নাই। ভাগীরথী ইহার অধিকাংশই গর্ভস্থ করিয়াছেন। ঠাকুরবাটীর প্রাঙ্গণে অনেক বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। তন্মধ্যে পার্শ্বনাথের মন্দিরের কয়েকটি বহুমূল্য স্তম্ভ ও চৌকাঠের শিল্পনৈপুণ্য আজিও বিস্ময়োৎপাদন

৩৩ From H. Luson Esq. Under Secretary to the Government of Bengal, to the Commissioner of the Presidency Division :—14th December 1891.

"Sir, with reference to your memo No. 135 R. G. dated the 2nd instant forwarding a memorial from *Babu Fagat Seth* Golap Chand the adopted son of the late Jagat Setani Pran Koomari Bibi in which he prays for a pension, I am to request that you will inform the memorialist that the Lieutenant Governor is unable to comply with the request."

From F. R. Stanley Collier, Collector of Murshidabad, to Sett Golap Chand. (8th June 1892.) Nizamat Dept.

"With reference to his memorial to the address of his Excellency the Viceroy praying for the grant to him of a pension of Rs. 1200 a month, the undersigned has the honor to inform him that the Govt. of India is unable to accede to his request." (Memorial of Jagat Seth Golap Chand.)

করিয়া থাকে। এই পার্শ্বনাথের মন্দির ভাগীরথীতীরে অবস্থিত ছিল। ভাগীরথী-গর্ভস্থ হওয়ার উপক্রম হওয়ায়, তাহা ভগ্ন করিয়া ঠাকুরবাটীর প্রাঙ্গণে ফেলিয়া রাখা হইয়াছে। জগৎশেঠগণ বৈষ্ণব হওয়ার পূর্বে সেই মন্দিরে পূজোপাসনাদি করিতেন। অন্তঃপুর হইতে পার্শ্বনাথের মন্দির ও বর্তমান গোবিন্দদেবের মন্দিরে যাইবার জন্য সুড়ঙ্গ ছিল; এক্ষণে তাহার পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বর্তমান ঠাকুরবাটী পূর্বমুখে অবস্থিত এবং সদর রাস্তার উপরে। ইহার একটি প্রকাণ্ড তোরণ-দ্বার অদ্যাপি বর্তমান আছে। ঠাকুরবাটীর পশ্চাতে কতকগুলি উচ্চ ভিত্তি দৃষ্ট হয়। তথায় জগৎশেঠগণের উপবেশনালয় ছিল। সেই সমস্ত ভিত্তি এক্ষণে জঙ্গলে পরিপূর্ণ; তথায় একটি ফোয়ারার হ্রদ বা চৌবাচ্চা দেখা যায়। তাহার কিয়দংশ আজিও কষ্টিপ্রস্তরমণ্ডিত আছে। এই বৈঠকখানার পশ্চাতে ভাগীরথীতীরে কতকগুলি আম্রবৃক্ষের শ্রেণী। শুনা যায়, সেই স্থানে জগৎশেঠদিগের গদী বা কারখানা ছিল। তাহার ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে ভিন্ন ভিন্ন দেশের মুদ্রা রক্ষিত হইত এবং অবিরত অধমর্ণগণে পরিপূর্ণ থাকিত। এক্ষণে তাহার ভিত্তিরও চিহ্নমাত্র নাই। ইহাদের নিকটে একটি অর্ধভগ্ন চৌদুয়ারী আছে; এই চৌদুয়ারীর উত্তর দ্বার দিয়া জগৎশেঠদিগের ভবনে, পূর্ব দ্বার দিয়া ঠাকুরবাটীতে, দক্ষিণ দ্বার দিয়া খোশালবাগে এবং পশ্চিম দ্বার দিয়া ভাগীরথী-তীরে গমন করা যায়।

দক্ষিণ দিকে যেরূপ অর্ধভগ্ন চৌদুয়ারটি রহিয়াছে, শুনা যায়, উত্তর দিকে ঠিক এইরূপ আর একটি চৌদুয়ারী ছিল। ঠাকুরবাটীর উত্তর-পশ্চিমে, একটি বাটীর ভিত্তির ভগ্নাবশেষ আছে, তাহাকে সুখমহাল বলিত; ইহার নিকট রংমহাল নামে আর একটি বাটী ছিল। উৎসবকালে সুখমহাল ও রংমহাল সুসজ্জিত হইত এবং নবাব ও তদ্বংশীয়-গণ সুখমহলে উপবেশন করিয়া উৎসবের গৌরব বৃদ্ধি করিতেন। খোশালবাগে এক-খানি সুন্দর বাঙ্গলা আছে। ঠাকুরবাটী ব্যতীত জগৎশেঠদিগের অন্তঃপুরের সামান্য কিয়ংদশ এক্ষণে বর্তমান। জগৎশেঠ গোলাপচাঁদ সেইখানেই অবস্থিতি করিতেন; গত ভূমিকম্পের[৩৪] পর হইতে তিনি নূতন বাটীতে বাস করেন। জগৎশেঠদিগের বাটীর উত্তরে একটি মন্দির দৃষ্ট হয়; তাহাকে সতীস্থান কহে। সেই স্থানে কোন সতী সহগমন করায় তাঁহার স্মৃতির জন্য মন্দিরটি নির্মিত হয়। জগৎশেঠবংশীয় বলিয়া কেহ কেহ সেই সতীর পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। এবং তৎসম্বন্ধে অন্য বিবরণও শুনা যায়। ফলতঃ, সতীস্থান সম্বন্ধে কোন প্রামাণিক বিবরণ পাওয়া যায় না। মহিমাপুরের অপর পারে ডাহাপাড়ার উত্তরে সিরাজউদ্দৌলার ভগ্ন প্রাসাদাদির নিকট হইতে একটি খাল বহু দূর পর্যন্ত গমন করিয়াছে। এই খালটি জগৎশেঠগণ খনন করাইয়া বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন। ইহাকে শেঠের লহর কহে। শেঠেরা তথায় নৌবিহার করিতেন। এক্ষণে বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময়ে তাহার অধিকাংশ স্থান

৩৪ ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্প।

শুষ্কাবস্থায় অবস্থিত করে। মহিমাপুরের পরপারে জগদ্‌বিশ্রাম নামে তাঁহাদের এক সুরম্য উদ্যান-বাটিকা ছিল ; এক্ষণে তাহাও ভাগীরথীগর্ভস্থ হইয়াছে।

যে-জগৎশেঠদিগের নাম ও গৌরব এক কালে সমগ্র জগতে বিঘোষিত হইয়াছিল আজ তাঁহাদের সে নাম ও গৌরবের সহিত তাঁহাদের বাসভবনের ও অন্যান্য কীর্তির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। তাহাদের সমস্তই এক্ষণে ভগ্নস্তুপে পরিণত। চতুর্দিকে বিস্তৃত সেই ভগ্নস্তুপের মধ্যে বসিয়া জগৎশেঠদিগের বংশধর কালের বিস্ময়করী লীলা সন্দর্শন করিতেছেন !

বঙ্গাধিকারী

খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গলারাজ্য দিল্লীসাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। তাহার পর সুপ্রসিদ্ধ শেরশাহ বাঙ্গলা ও দিল্লী অধিকার করিয়া সমস্ত উত্তর ভারতবর্ষে আপনার জয়পতাকা উড্ডীন করেন। শেরশাহের পর বাঙ্গলা আবার কিছুদিন স্বাধীন ভাব অবলম্বন করে। অবশেষে মোগলকেশরী আকবরশাহ তাহাকে দিল্লীসাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত করিয়া লন। শেরশাহ হইতে বাঙ্গলার রাজস্বসম্বন্ধীয় বন্দোবস্তের কথা বিশদরূপে অবগত হওয়া যায়; আকবরের সময়ে ইহা পূর্ণতা লাভ করে। আকবরের রাজস্ববন্দোবস্ত শেরশাহের প্রথা হইতে গৃহীত বলিয়া বিবেচিত হয়।[১] রাজা তোডরমল্ল এই বন্দোবস্তের অধিনায়ক। তিনি ১৫৮২ খ্রীঃ অব্দে বাঙ্গলার জমিদারদিগের সহিত রাজস্বের বন্দোবস্ত করিয়া সমস্ত বঙ্গভূমি ১৯ সরকার ও ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত করেন। তাঁহার রাজস্ববন্দোবস্ত বা আসল তোমর জমা, খালসা ও জায়গীরসমেত প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকায় ধার্য হইয়াছিল। তোডরমল্লের পরে শাহসুজা-কর্তৃক আর একবার বাঙ্গলার রাজস্বের বন্দোবস্ত হয়; তৎপরে মুর্শিদকুলী খাঁর সময়ে ইহা উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হয়। এই রাজস্ব-সংক্রান্ত বন্দোবস্তের জন্য তোডরমল্ল ভিন্ন ভিন্ন কাননগো নিযুক্ত করিয়াছিলেন; তাহাদের উপরে এক এক জন প্রধান কাননগোও নিযুক্ত হন। কাননগো পদ তোডরমল্লের নূতন সৃষ্টি নহে। তাঁহার পূর্ব হইতেও বাঙ্গলাদেশে কাননগো পদের উল্লেখ দেখা যায়।[২] তাঁহার সময়ে উক্তপদের কার্যবিভাগ অতি সুচারুরূপে নির্দিষ্ট হয়।

যে বঙ্গাধিকারিগণ বাঙ্গলার প্রধান কাননগো পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বঙ্গরাজ্যের রাজস্বের কার্য অতি দক্ষতার সহিত নির্বাহ করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদ আছে যে, তাঁহাদের পূর্বপুরুষ ভগবান্ রায়, রাজা তোডরমল্লের রাজস্ববন্দোবস্তের সময় প্রধান

১ Elphinstone's History of India (5th edition), p. 541.

২ বাঙ্গলায় দ্বাদশ ভৌমিকগণের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা প্রতাপাদিত্যের পূর্বপুরুষগণ কাননগোবিভাগে কার্য করিতেন। বলা বাহুল্য, তাঁহারা বাজা তোডরমল্লের অনেক পূর্ববর্তী। তাঁহাদের আদিপুরুষ রামচন্দ্র রায় প্রথমতঃ সপ্তগ্রামে কাননগো-দপ্তরে নিযুক্ত হন। তথা হইতে তিনি গৌড়ে গমন করিলে, তথায়ও কাননগো-দপ্তরে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শিবানন্দ স্বীয় কার্যদক্ষতাগুণে গৌড়ের বাদশাহ সোলেমানের অনুগ্রহে কাননগো-দপ্তরের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। সোলেমানের পুত্র দায়ুদের সময় শিবানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র, শ্রীহরি ও জানকীবল্লভ যথাক্রমে প্রধান মন্ত্রীর ও রাজস্ববিভাগের সর্বোচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়া বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় উপাধি লাভ করেন। বিক্রমাদিত্যই রাজা প্রতাপাদিত্যের পিতা। দায়ুদের ধ্বংসের পর তোডরমল্ল, বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়ের নিকট হইতে রাজ্য-সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সরকারের কার্য করিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, তোডরমল্ল বাদশাহের নিকট হইতে রাজোপাধি আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে ভূষিত করেন। (রামরাম বসু প্রণীত প্রতাপাদিত্যচরিত।)

কাননগো পদে নিযুক্ত হন এবং তিনি তোডরমল্লকে উক্ত কার্যে সহায়তা করিয়াছিলেন। ভগবান্ কার্যোপলক্ষে দিল্লিতে অবস্থিতি করায়, আকবরশাহের অনুকূল দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া উক্ত পদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু এই প্রবাদে বিশ্বাস করা কঠিন। কারণ, ভগবানের পরবর্তী তদ্বংশীয়গণের নিয়োগের সময় হইতে, ইহার মীমাংসা করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। যদি ভগবান্ বাঙ্গলার রাজস্বসম্বন্ধীয় কোন বন্দোবস্তের সময় বিশিষ্টরূপ কার্যদক্ষতা দেখাইয়া থাকেন, তাহা হইলে শাহসুজার সময়ে দেখাইয়াছিলেন বলিয়া আমাদের বিবেচনা হয়।[৩] ভগবান্ রায় বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটস্থ খাজুরডিহি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ ও মিত্রবংশসম্ভূত।

ভগবান্ বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার প্রধান কাননগো পদে নিযুক্ত হইয়া অত্যন্ত কার্যদক্ষতা প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। প্রধান কাননগো পরগণা-কাননগোদিগের নিকট হইতে ভূমিসংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র তলব করিয়া রাখিতেন। কাননগো-দপ্তরে ভূমিসংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্রই পরম যত্নে রক্ষিত হইত। পরগণা-কাননগোগণ জমির পরিমাণ, নিরিখ, সাধারণ হস্তবুদ, সরকারের প্রাপ্য কর ও অন্যান্য আবওয়ার এবং মাল, লাখেরাজ জায়গীর, ইস্তমুরারী, মোকররী, উর্বর, অনুর্বর

৩ বঙ্গাধিকারিগণের যে-দুইখানি ফার্মান বর্তমান আছে, তন্মধ্যে একখানি ভগবানের পুত্র হরিনারায়ণের কাননগো পদে নিযুক্ত হওয়ার সময়ে দেওয়া হয়। ভগবানের পর তাঁহার ভ্রাতা বঙ্গবিনোদ, তৎপরে তাঁহার পুত্র হরিনারায়ণ উক্ত পদ প্রাপ্ত হন। আরঙ্গজেব বাদশাহ হরি-নারায়ণকে এই ফার্মান প্রদান করেন। তাঁহার রাজত্বের ২২শ অব্দে হিজরী ১০৯০ (১৬৭৯ খ্রীঃ অব্দে) উক্ত ফার্মান দেওয়া হয়। তাহাতে এই রূপ লিখিত আছে যে, বর্তমান বর্ষের প্রথমে বিনোদের মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র হরিনারায়ণকে সুবা বাঙ্গলার অর্ধাংশের কাননগোকার্য দেওয়া গেল। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে তোডরমল্লের রাজ্যসংক্রান্ত বন্দোবস্ত হয়। ১৫৮২ হইতে ১৬৭৯ খ্রীঃ অব্দের ব্যবধান ৯৭ বৎসর। ভগবান্ তাহার ২।১ বৎসর পূর্বে কার্যে নিযুক্ত হইলে, তাঁহার কার্যগ্রহণ হইতে হরিনারায়ণের নিয়োগের ব্যবধান প্রায় ১০০ বৎসর হইয়া উঠে। ১০০ বৎসরের মধ্যে ভগবান্ ও বঙ্গবিনোদ কেবল দুই ভ্রাতার কার্য করা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়; এবং উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের বয়সের পার্থক্যও যৎপরোনাস্তি অধিক হয় এবং উভয়কেই দীর্ঘকাল ধরিয়া কার্য করিতে হয়। আবার দেখিতে পাওয়া যায় যে, ১৬৭৯ খ্রীঃ অব্দের পর হইতে ১০০ বৎসরের মধ্যে বঙ্গাধিকারিগণের প্রায় ৪ পুরুষের অন্তর্ধান ঘটিয়া আসিয়াছে। সেইজন্য আমাদের নিকট পূর্ব ১০০ বৎসরের মধ্যে কেবলই দুই ভ্রাতার কার্য করা অসম্ভব বোধ হইতেছে। ঐরূপ ঘটনার সমর্থন করিতে গেলে, অনেক কষ্টকল্পনা করিতে হয়; কোন বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত তাহা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। আকবরশাহের রাজত্বের শেষ ভাগে, ভগবান্ অল্পবয়সে কার্য গ্রহণ করিলে, এই প্রবাদ কতকটা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা যায়। কিন্তু তাহাদের কষ্টকল্পনার যথেষ্ট প্রয়োজন হইয়া উঠে। এই কারণে শাহসুজার রাজস্ব-বন্দোবস্ত-সময়ে আমরা ভগবানের কার্যদক্ষতার কথা উল্লেখ করিতে চাই। ভগবান ও বঙ্গবিনোদের নিয়োগসম্বন্ধীয় ফার্মান থাকিলে ইহার সিদ্ধান্ত হইত। কিন্তু এক্ষণে যখন তাহাদের অভাব, তখন যাহা নিতান্ত অসম্ভব বোধ না হয়, সেইরূপ সিদ্ধান্ত করাই যুক্তিযুক্ত।

প্রভৃতি ভূমির তালিকা, সীমাসম্বন্ধীয় কাগজপত্র ও আদায়-অনাদায়ের হিসাব প্রস্তুত করিয়া প্রধান কাননগোর নিকট প্রেরণ করিতেন। প্রধান কাননগো এই সমস্ত সতর্কতার সহিত রক্ষা করিতেন। প্রধান কাননগোর অধীন একজন করিয়া নায়েব কাননগো নিযুক্ত হইতেন। সরকার হইতে যে-সমস্ত কর নির্ধারিত হইত, তাহাদের রসিদাদি নায়েব কাননগোগণের নিকট থাকিত; সমস্ত ভূমির সীমাসম্বন্ধীয় কাগজপত্র রাখিবার ভারও তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত ছিল। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক স্থানের সদর কাছারি হইতে সামান্য ইজারাদারদিগের রাজস্বের হিসাব ও অন্যান্য অনেক হিসাবপত্র তাঁহাদিগকে রাখিতে হইত। প্রধান কাননগো নায়েব কাননগোদিগকে তাঁহাদের কার্যের উপযোগী কাগজপত্র প্রদান করিতেন। নায়েব কাননগোকে অনেক বিষয়ে প্রধান কাননগোর সাহায্য করিতে হইত এবং কাননগো-দপ্তরে অনেক প্রধান প্রধান কার্যে তিনি লিপ্ত থাকিতেন।

কেহ কেহ বলেন, আকবরের সময় হইতে সম্ভবতঃ নায়েব কাননগো পদের সৃষ্টি হয়।[৪] সুজার সময় রাজমহল বাঙ্গলার রাজধানী ছিল। তাহার পর পুনর্বার ঢাকায় রাজধানী হয়। কথিত আছে যে, ভগবান্ কাননগো কার্য দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করায়, তিনি বঙ্গাধিকারী উপাধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে বঙ্গাধিকারিগণ মালদহ জেলার শিবগঞ্জ পুখুরিয়া নামক স্থানে আপনাদের আর একটি বাসবাটী নির্মাণ করেন। তথায় একটি কালীবাটী ও অতিথিশালা স্থাপন করা হয়। তাহার ভগ্নাবশেষ আজিও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ভগবানের পর তাঁহার ভ্রাতা বঙ্গবিনোদ প্রধান কাননগো-পদ প্রাপ্ত হইয়া, দক্ষতা-সহকারে রাজস্ববিভাগের কার্য সম্পাদন করিতে থাকেন। তিনি মালদহ জেলায় বিনোদনগর নামে এক গ্রাম পত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে ঢাকা বাঙ্গলার রাজধানী ছিল। কথিত আছে, ঢাকার রায়বাজার তাঁহারই স্থাপিত বলিয়া উক্ত রায়-বাজারে তাঁহার গড়খাইবিশিষ্ট বাসভবনের চিহ্ন অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। ১৬৭৯ খ্রীঃ অব্দে সায়েস্তা খাঁর বাঙ্গলারাজ্য শাসন করার সময় বঙ্গবিনোদের মৃত্যু হয়। বঙ্গবিনোদ সায়েস্তা খাঁকে রাজস্বসম্বন্ধে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন।

বঙ্গবিনোদের পর ভগবানের পুত্র হরিনারায়ণকে কাননগো পদ প্রদান করা হয়। ১৬৭৯ খ্রীঃ অব্দে ১০৯০ হিজরী আরঙ্গজেবের রাজত্বের ২২শ তম বৎসরে হরিনারায়ণ সুবা বাঙ্গলার অর্ধাংশ কাননগোর ভার প্রাপ্ত হন, তাঁহার নিয়োগপত্রে এইরূপই লিখিত আছে। হরিনারায়ণ হইতেই সুবা বাঙ্গলায় দুইজন প্রধান কাননগোর নিয়োগ দেখা যায়। তাহার পূর্বে একজন প্রধান কাননগোই কার্য করিতেন। হরিনারায়ণের ফার্মানের পরপৃষ্ঠায় এইরূপ লিখিত আছে যে, পূর্বে বিনোদ সুবা বাঙ্গলার কাননগোর

৪ Minutes of Evidence taken in W. H's Trial. (David Anderson's evidence, p. 1217.)

কার্য করিতেন এবং বিনোদের নিকট হইতে ৩ লক্ষ টাকার পেস্কশ স্বীকার করা হয়। বাদশাহ্ আরঙ্গজেবের রাজত্বের দশম বৎসরে রঘুনাথ নামক এক ব্যক্তি কাননগোই ফার্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার নিকট হইতে ত্রিশ হাজার টাকা পেস্কশ লইয়া অর্ধাংশ কাননগোর ভার প্রদান করা হয়।

আরঙ্গজেবের রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষে রামজীবনের আবেদনে জানা যায় যে, দেবকীর প্রদত্ত অর্ধাংশ কাননগোর ভার আজিও তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। এইজন্য রামজীবন দেবকীর প্রকৃত উত্তরাধিকারী কিনা জানিয়া, তাঁহাকে অর্ধাংশ কাননগোর ভার প্রদানের আদেশ হয়। সুতরাং একই ফার্মান হইতে আমরা উভয় কাননগোর নিয়োগের আদেশ জানিতে পারিতেছি। এই দেবকী ও রামজীবন ভট্টবাটীবংশীয় কাননগোগণের আদিপুরুষ। তাঁহারা পূর্বে রাজস্ববিভাগের কোন উচ্চতম পদে অভিষিক্ত ছিলেন। হরিনারায়ণ অর্ধাংশ কাননগোর ভারপ্রাপ্ত হইলেও তাঁহার সময় হইতেই বঙ্গাধিকারিগণের শ্রীবৃদ্ধি বিশিষ্টরূপে আরম্ভ হয়, এবং তাঁহাদের ক্ষমতাও অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। রাজস্ববিভাগের ভার একরূপ তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত ছিল। জমিদারগণ বঙ্গাধিকারীকে অত্যন্ত ভয় করিয়া চলিতেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে, একের জমিদারী অন্যকে প্রদান করিতে পারিতেন। নবাব তাঁহাদের পরামর্শসম্বন্ধে কোনরূপ আদেশ দিতেন না। রাজস্ববিষয়ে দেওয়ান প্রধান কর্মচারী হইলেন তাঁহাকে বঙ্গাধিকারিগণের পরামর্শানুসারে চলিতে হইত। ফলতঃ রাজস্ববিষয়ে বঙ্গাধিকারিগণ যাহা ইচ্ছা করিতে পারিতেন। ঢাকায় অবস্থানকালে তাঁহাদের ক্ষমতার একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

একদিন বঙ্গাধিকারী রাজকার্য শেষ করিয়া সন্ধ্যাকালে একখানি সুন্দর তরণীতে অধিরূঢ় হইয়া নদীবক্ষে বায়ুসেবন করিতেছিলেন। সেই সময়ে ঢাকা জেলার অন্তর্গত চাঁদপ্রতাপ প্রভৃতি পরগণার জমিদাগণের পূর্বপুরুষ সেইরূপ শোভাশালিনী অন্য এক তরণীতে আরোহণপূর্বক মহাড়ম্বরে সেই স্থান দিয়া গমন করিতেছিলেন। দৈববলে উক্ত জমিদারের নাবিকগণের ক্ষেপণীনিক্ষিপ্ত জল বঙ্গাধিকারীর গাত্রে পতিত হয়। ইহাতে বঙ্গাধিকারী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উক্ত জমিদারের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতে আদেশ দেন। সেই সময়ে ঢাকার উলাইল গ্রামের মিত্রবংশীয়েরা রাজস্ব-বিভাগের কার্য করিতেন। তাঁহাদের অনুরোধে উক্ত জমিদার অবশেষে বঙ্গাধিকারীর ক্রোধাগ্নি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন।[৫]

হরিনারায়ণের সময় হইতে বঙ্গাধিকারিগণের সংকীর্তি বঙ্গভূমিকে অলঙ্কৃত করিতে আরম্ভ করে। হরিনারায়ণ আপনাদিগের আদিবাসস্থান খাজুরাডিহি গ্রামে হরি-সাগর নামে এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করান; অদ্যাপি তাহা বর্তমান আছে। প্রসিদ্ধ পীঠস্থান ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যাদেবীর সেবার বন্দোবস্তের জন্য তিনি ১৬শত

৫ চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ (ব্রজসুন্দর মিত্র), ৪৪-৪৫ পৃঃ

টাকার ভূসম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন এবং জ্ঞাতি ও ব্রাহ্মণদিগকেও অনেক টাকার ভূসম্পত্তি প্রদান করেন। এইরূপ কথিত আছে যে, কেবল জ্ঞাতিদিগকে তিনি ১৬ হাজার টাকার ভূসম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, সে সময়ে তাঁহারা উন্নতির কত উচ্চ সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। বঙ্গাধিকারিগণের অধিকাংশ সৎকীর্তি হরিনারায়ণের সময় হইতে সূচিত হয় এবং ক্ষমতার প্রাবল্যহেতু এই সময় হইতে তাঁহারা প্রকৃত বঙ্গাধিকারী হইয়া উঠেন।

হরিনারায়ণের পর তাঁহার পুত্র দর্পনারায়ণ কাননগো পদে নিযুক্ত হইয়া ঢাকায় অবস্থিতি করিতে থাকেন। নবাব আজিম ওশ্বানের সময় মুর্শিদকুলী জাফর খাঁ বাঙ্গলার দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইয়া ঢাকায় আগমন করেন। তথায় নবাবের সহিত দেওয়ানের বিশিষ্টরূপ মনোবিবাদ সংঘটিত হওয়ায় দেওয়ান মুর্শিদকুলী রাজস্ববিভাগের সমস্ত কর্মচারী লইয়া ১৭০৪ খ্রীঃ অব্দে মুর্শিদাবাদে আসিতে বাধ্য হন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে দর্পনারায়ণও আগমন করিয়া ডাহাপাড়ায় আপনার নিবাসস্থান স্থাপন করেন। কিন্তু তিনি পুখুরিয়াকে আপনার প্রকৃত বাসস্থান বলিয়া পরিচয় দিতেন। দ্বিতীয় কাননগো জয়নারায়ণ ভট্টবাটীতে অবস্থান করিতে থাকেন। মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙ্গলার রাজস্ব-সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র প্রস্তুত করিয়া দাক্ষিণাত্যে সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের শিবিরে উপস্থিত হওয়ার জন্য আয়োজন করেন। সম্রাট্ সেই সময়ে দুর্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দমন করিবার জন্য দক্ষিণে অবস্থান করিতেছিলেন। রাজস্ব-সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্রে কাননগোর স্বাক্ষরের আবশ্যক হইত। দেওয়ান মুর্শিদকুলী প্রথম কাননগো দর্পনারায়ণকে সেই সমস্ত কাগজপত্রে স্বাক্ষর করিতে বলিলে, দর্পনারায়ণ কাননগোর রসুম বাবদে ৩ লক্ষ টাকার দাবী করেন। দেওয়ান দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাগত হইয়া তাঁহাকে এক লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু দর্পনারায়ণ তাহাতে সম্মত হন নাই। দেওয়ান তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া দ্বিতীয় কাননগো জয়নারায়ণের দ্বারা স্বাক্ষর করাইয়া লন।[৬] অবশেষে দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়া সম্রাটের নিকট সমস্ত কাগজপত্র প্রদান করেন। পরে দাক্ষিণাত্য হইতে পুনর্বার মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হন।

আরঙ্গজেবের মৃত্যু হইলে, গৃহবিচ্ছেদে যখন মোগলসাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হওয়ার

৬ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, নাটোরাজবংশের আদিপুরুষ রঘুনন্দনও সেই সমস্ত কাগজপত্রে স্বাক্ষর করিতেছিলেন। রঘুনন্দন সেই সময়ে নায়েব কাননগোর কার্য করিতেন এবং ঐরূপ স্বাক্ষর করায়, তিনি মুর্শিদকুলী খাঁর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। রঘুনন্দনের স্বাক্ষরসম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। রিয়াজ প্রভৃতি গ্রন্থে কেবল দ্বিতীয় কাননগো জয়নারায়ণের স্বাক্ষর করার কথাই আছে। বেভারিজ সাহেব ভট্টাচার্যবংশীয় জয়নারায়ণের সহিত পুঁটিয়ার রাজা দর্পনারায়ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জয়নারায়ণের গোল করিয়াছেন। তৎকালে ভট্টবাটীবংশীয় জয়নারায়ণ সিংহই দ্বিতীয় কাননগোর কার্য করিতেন। পুঁটিয়ার দর্পনারায়ণের ভ্রাতা জয়নারায়ণের কাননগোর কার্য করার কোন উল্লেখ নাই।

উপক্রম হইয়াছিল, সেই সময়ে মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙ্গলার নবাবীপদ লাভ করিয়া মোগলসম্রাটের ক্ষমতাহীনতাপ্রযুক্ত নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করিতে থাকেন। ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, দর্পনারায়ণ তাঁহার কথা অমান্য করায়, তদবধি দর্পনারায়ণের প্রতি মুর্শিদকুলীর ঘোর বিদ্বেষ জন্মে। এই সময়ে খালসা বা রাজস্ববিভাগের পেস্কার ভূপতি রায়ের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র গোলাপ রায় অনুপযুক্ত থাকায় নবাব দর্পনারায়ণকে খালসার পেস্কারী পদ প্রদান করেন। রাজস্ববিষয়ে দর্পনারায়ণের অত্যন্ত অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি বাঙ্গলার আয় ১ কোটি ৩০ লক্ষ হইতে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা করিয়াছিলেন। এই সমস্ত আয়বৃদ্ধির জন্য তাঁহাকে জমিদারদিগের বৃত্তির ও সরকারী কর্মচারিগণের গুপ্ত লাভের প্রতিও কিয়ৎপরিমাণে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। তজ্জন্য তিনি সেই সমস্ত লোকদিগের অপ্রিয় হইয়া উঠেন। তাঁহাদের অসন্তোষের কথা অবগত হইয়া কুলী খাঁ তাঁহার এত দিনের সঞ্চিত বিদ্বেষের প্রতিশোধ লইবার জন্য দর্পনারায়ণের হিসাবপত্র পরিদর্শনের ছলে তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখেন এবং তাঁহাকে যাবতীয় সুখভোগ হইতে বঞ্চিত করায় ক্রমে ক্রমে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায়, দর্পনারায়ণ মৃত্যুমুখে পতিত হন।[৭]

যদি ঐতিহাসিকগণের বিবরণে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয়, তাহা হইলে ইহা যে মুর্শিদকুলী খাঁর চরিত্রের একটি ভীষণ কলঙ্ক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মুর্শিদকুলী খাঁর ন্যায় ন্যায়পর নবাব যে এইরূপ ঘৃণিত কার্য করিয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। দর্পনারায়ণের পর, নবাব সুজা উদ্দীনের সময় তাঁহার পুত্র শিবনারায়ণ তাঁহার স্থলে কাননগো পদে নিযুক্ত হন, এবং তিনি বুকুনপুর নামক বিস্তৃত জমিদারীও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দর্পনারায়ণ ডাহাপাড়ায় বাসবাটী নির্মাণ করেন। যদিও এক্ষণে বঙ্গাধিকারিগণের পুনর্বার নূতন বাটী নির্মিত হইয়াছে, তথাপি সেই পুরাতন বাটীর চিহ্ন এখনও স্থানে স্থানে বর্তমান আছে। দর্পনারায়ণ ডাহাপাড়ায় আসিয়া কিরীটেশ্বরীর সেবার যথেষ্ট বন্দোবস্ত করেন। কিরীটেশ্বরী অনেক দিন হইতে তাঁহাদের হস্তে ছিলেন। দর্পনারায়ণ মন্দিরাদির নির্মাণ ও কালীসাগর নামে পুষ্করিণী খনন করাইয়া দেন। তিনি নিজ নামে একখানি গ্রাম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, দর্পনারায়ণের মৃত্যুর পর শিবনারায়ণকে তাঁহার স্থলে কাননগো পদে নিযুক্ত করা হয়। হিজরী ১১৩৭ খ্রীঃ অব্দে, সম্রাট্ মহম্মদশাহ তাঁহার রাজত্বের অষ্টম বৎসরে শিবনারায়ণকে কাননগোপদের ফার্মান প্রদান করেন। তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে যে, দর্পনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শিবনারায়ণের নিকট হইতে দর্পনারায়ণের দেয় অর্থ ২ লক্ষ টাকা নজর লইয়া তাঁহাকে তাঁহার পিতার

৭ Riyaz-us-salatin, p. 260. দর্পনারায়ণের উক্ত দুর্দশার কথা প্রথমে তারিখ বাঙ্গলায় লিখিত হয়। তৎপরে রিয়াজ ও স্টুয়ার্ট প্রভৃতির গ্রন্থেও উল্লিখিত হইয়াছে।

স্থলে অর্ধ সুবার কাননগো পদে নিযুক্ত করা গেল।[৮] মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন যে, মুর্শিদকুলী খাঁ শিবনারায়ণকে দশ আনা ও জয়নারায়ণকে ছয় আনার কাননগো পদ প্রদান করেন, কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে।[৯] গ্রাণ্ট সাহেব বলেন যে, শিবনারায়ণের রসুমের লাঘব হওয়ায়, তাঁহাকে বুকুনপুর জমিদারী প্রদান করা হয়।[১০] কিন্তু শিবনারায়ণের রসুমের লাঘব হওয়ার কোনই কারণ দেখা যায় না।

মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যুর পর সুজা উদ্দীন বাঙ্গলার সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। এই সময়ে শিবনারায়ণ কাননগোর কার্য করিতেছিলেন। সুজা উদ্দীন তাঁহার কাননগো-কার্যে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করিয়া, আমলচাঁদ নামে জনৈক বিশ্বাসী কর্মচারীকে খালসার দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করিয়া সম্রাট্ দরবার হইতে রায়রায়ান উপাধি আনাইয়া তাঁহাকে ভূষিত করেন। রায়রায়ান উপাধি বাঙ্গলায় এই প্রথম।[১১] রায়রায়ানগণ রাজস্বমন্ত্রীর কার্য করিতেন; রাজস্ববিভাগের যাবতীয় বন্দোবস্ত তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত ছিল। কাননগোগণ সেই সকল বন্দোবস্তের কাগজপত্র রক্ষা করিতেন, এবং রাজস্ববিভাগ হইতে জমিদার বা প্রজাদিগকে কোন কাগজপত্র দিতে হইলে তাহাতে স্বাক্ষর ও মোহর করিয়া দিতেন। বর্তমান সময়ের রেজিস্ট্রারের কার্য কাননগোগণের দ্বারা সম্পন্ন হইত। কিন্তু রায়রায়ানগণ রাজস্ববিভাগের সর্বময় কর্তা ছিলেন। এই রায়রায়ানপদ বা খালসার দেওয়ানী কোম্পানির রাজত্বেও প্রচলিত ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর তাহার লোপ হয়। প্রসঙ্গক্রমে আমরা এ স্থলে রায়রায়ানগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতেছি।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, আমলচাঁদ প্রথমে রায়রায়ান উপাধি প্রাপ্ত হন। আমলচাঁদের মৃত্যুর পর আলিবর্দী খাঁ চায়েন রায় নামে নিজের বিশ্বাসী কর্মচারীকে খালসার দেওয়ানী ও রায়রায়ান উপাধি প্রদান করেন। চায়েন রায় আলিবর্দীর সময়ে

৮ শিবনারায়ণকে যে ফার্মান দেওয়া হয়, তাহার পরপৃষ্ঠায় দেখা যায়, দর্পনারায়ণের নিকট ১ দফায় ৩৪৩৮৪২।০, ২ দফায় ৮২৭৩॥৵০, ৩ দফায় ১৪৬৮৬, ৪ দফায় ৪৪৭৭২, ৫ দফায় ২৩৪৪৫, টাকা পাওনা ছিল। শিবনারায়ণ সেই সমস্ত পরিশোধ করেন এবং তাঁহাকে ফার্মান লইতে ২ লক্ষ টাকা পেস্কস দিতে হয।

৯ Riyaz-us-salatin, p. 260.

১০ এই বুকুনপুর অত্যন্ত বৃহৎ জমিদারী। ইহা ৬২ পরগণায় বিভক্ত ছিল। এক মুর্শিদাবাদ চাকলায় ইহার ২৮টি পরগণা দেখা যায়।

১১ আলমচাঁদের পূর্বে কাহারও কাহারও লিখিত বিবরণে রায়রায়ান উপাধি প্রাপ্তির উল্লেখ আছে। কলিকাতা রিভিউ পত্রিকায় রাজসাহীবংশের বিবরণে নাটোরবংশের আদিপুরুষ রঘুনন্দনকে রায়রায়ান উপাধি দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া দেখা যায়। কিন্তু সে সকলের কোনই মূল নাই। রিয়াজুস্ সালাতিন গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে যে, আলমচাঁদের সময় পর্যন্ত বাঙ্গলার দেওয়ানী বা নিজামতের মুৎসুদ্দিগণের মধ্যে কেহ এরূপ উপাধি প্রাপ্ত হন নাই। (Riyaz-us-salatin, p. 293.)। রিয়াজের কথা উপেক্ষা করিয়া আমরা এরূপ স্থলে কেবল প্রবাদমূলক কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না।

রাজস্বসম্বন্ধে অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন এবং নবাবও কখনও তাঁহার কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। চায়েন রায়ের পর বীরু দত্ত নামক খালসার সহকারী দেওয়ানকে দেওয়ানী পদ প্রদান করা হয়; কিন্তু তিনি রায়রায়ান উপাধি প্রাপ্ত হন নাই। বীরু দত্তের পর তাঁহার সহকারী উমেদ রায় কিছুকাল উক্ত কার্য করিয়াছিলেন। পরে রায়রায়ান আলম চাঁদের পুত্র কীর্তিচাঁদ খালসার দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হন। তিনি রায়রায়ান উপাধি পাইয়াছিলেন কিনা, তাহা জানা যায় না। কীর্তিচাঁদের পরে উমেদ রায় খালসার দেওয়ানী ও রায়রায়ান উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনিই সম্ভবতঃ মুসলমানরাজত্বের শেষ রায়রায়ান। তাহার পর কোম্পানী দেওয়ানী গ্রহণ করিয়া নায়েব দেওয়ানী পদের সৃষ্টি করেন। হেস্টিংস ১৭৭২ খ্রীঃ অব্দে নায়েব দেওয়ানী পদের লোপ করিয়া পুনর্বার খালসার দেওয়ানী পদের প্রচলন করিয়াছিলেন এবং রায়দুর্লভের পুত্র রাজা রাজবল্লভকে রায়রায়ান নিযুক্ত করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত স্থির হইয়া গেলে রাজবল্লভের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত পদেরও অন্তর্ধান হয়। যতদূর জানা যায়, তাহাতে হিন্দুদিগকেই বরাবরই খালসার দেওয়ানী ও রায়রায়ান উপাধি প্রদান করা হইয়াছে। মুসলমান রাজত্বকালে রাজস্ববিভাগের সর্বোচ্চ পদে হিন্দুরা নিযুক্ত হইতেন। ইহা হিন্দুদিগের পক্ষে কম গৌরবের বিষয় নহে।

শিবনারায়ণের পর তাঁহার পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ নবাব আলিবর্দী খাঁর রাজত্বকালে প্রথম কাননগোর পদে নিযুক্ত হন। লক্ষ্মীনারায়ণের সহিত ভট্টবাটীবংশীয় মহেন্দ্রনারায়ণকে [১২] দ্বিতীয় কাননগোর কার্য করিতে দেখা যায়। আলিবর্দীর সময় হইতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পর্যন্ত লক্ষ্মীনারায়ণ ও মহেন্দ্রনারায়ণ এই দুই জনে কাননগোর কার্য করিতেন। সিরাজউদ্দৌলার সহিত ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী ইংরেজদিগের যে সন্ধি স্থাপিত হয়, সেই সন্ধিপত্রে লক্ষ্মীনারায়ণ ও মহেন্দ্রনারায়ণ উভয়েরই স্বাক্ষর দৃষ্ট হইয়া থাকে।[১৩] এইরূপ কথিত আছে যে, সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে যে-ষড়যন্ত্র হয়, লক্ষ্মীনারায়ণও তাহার একজন নেতা ছিলেন। এই ষড়যন্ত্রের পূর্বে তিনি কোন কার্যোপলক্ষে দিল্লী গমন করেন; পরে তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। অনন্তর মুসলমান-রাজত্বের অবসান হইলে,

১২ এই মহেন্দ্রনারায়ণের সহিত অনেকে রাজা মহেন্দ্র বা রায়দুর্লভের গোলযোগ করিয়া থাকেন। রায়দুর্লভের সম্পূর্ণ নাম "মহারাজ মহেন্দ্রনারায়ণ রায়দুর্লভ"। সেইজন্য কখনও তাঁহাকে রাজা মহেন্দ্র, কখনও রায়দুর্লভ এবং সময়ে সময়ে দুর্লভরামও কহিয়া থাকে। কাননগো মহেন্দ্রনারায়ণ ভিন্ন ব্যক্তি। দুর্লভরামের মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার পুত্র রাজা রাজবল্লভের সহিত অনেকদিন রাজস্ববিভাগের কার্য করিয়াছিলেন। রাজা মহেন্দ্র বা রায়দুর্লভকে সিরাজের মন্ত্রী বলিয়া কোন কোন স্থানে উল্লেখ দেখা যায়।

১৩ যাঁহারা সিরাজের সহিত ইংরেজদিগের সন্ধিপত্র দেখিতে চাহেন, তাঁহারা H. Verlest's Present State of the English Govt. in Bengal. (Appendix) Stewart's Bengal (Appendix) Achison's Treaties প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিবেন।

এবং কোম্পানী দেওয়ানীর ভার গ্রহণ করিলে, মহম্মদ রেজা খাঁ নায়েব দেওয়ান নিযুক্ত হন। সেই সময়ে কাননগোগণ তাঁহার অধীনে কার্য করিতেন। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের ভ্রাতা রাধাকান্ত সিংহ লক্ষ্মীনারায়ণের অধীনে নায়েব কাননগোর কার্য করিতেন; পরে গঙ্গাগোবিন্দ উক্ত পদে নিযুক্ত হন। যৎকালে মহম্মদ রেজা খাঁকে কোম্পানীর অর্থের জন্য দায়ী করিয়া কলিকাতায় বন্দী-অবস্থায় লইয়া যাওয়া যায়, সেই সময়ে কিছুদিন কাননগো পদ রহিত হয়। তাহার পর ওয়ারেন হেস্টিংসের নূতন বন্দোবস্তে পুনর্বার কাননগো-বিভাগের কার্য আরম্ভ হয়। এই সময়ে কাননগো-বিভাগ মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় অন্তরিত হয়। প্রাচীন কাগজপত্রাদিতে দৃষ্ট হয় যে, তৎকালে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ লক্ষ্মীনারায়ণের ও শ্রীনারায়ণ মুস্তফী মহেন্দ্রনারায়ণের অধীনে নায়েব কাননগোর কার্য করিতেন। গঙ্গাগোবিন্দ পরে কলিকাতার রাজস্বসমিতির দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এবং শ্রীনারায়ণকে লক্ষ্মীনারায়ণের অধীনে নায়েব কাননগো দেখা যায়। তৎকালে রাজা রাজবল্লভ রায়রায়ান বা খালসার দেওয়ানী পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই কাননগো-বিভাগ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। তাহার পর লর্ড কর্নওয়ালিস তাহা রহিত করিয়া দেন। লক্ষ্মীনারায়ণ অনেক সৎকার্য করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে তাঁহাদের জমিদারী বুকুনপুর, সন্দ্বীপ প্রভৃতি স্থানে বহু পরিমাণে ব্রহ্মোত্তর দিয়া যান। এইরূপ কথিত আছে যে, তিনি আপনার বিস্তৃত জমিদারীর মধ্যে ৩ লক্ষ কালীপূজার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। অদ্যাপি অনেক স্থানে তাহা প্রচলিত আছে এবং প্রতি-বৎসর কার্তিক মাসের অমাবস্যায় উক্ত পূজা হইয়া থাকে।

লক্ষ্মীনারায়ণ মৃত্যুসময়ে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে স্বীয় নাবালক পুত্র সূর্যনারায়ণের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করিয়া যান। বঙ্গাধিকারিগণ বলিয়া থাকেন যে, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের তত্ত্বাবধানে তাঁহারই স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁহাদিগের অনেক জমিদারি হস্তান্তরিত হয়। সূর্যনারায়ণের সময় হইতেই বঙ্গাধিকারিগণের দুর্দশার আরম্ভ। এই সময়ে তাঁহাদের কোন কার্য না থাকায় আয়ের লাঘব হয় এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ও তাঁহাদের অনেক জমিদারি হস্তান্তরিত হইয়া যায়। সূর্যনারায়ণের পর চন্দ্রনারায়ণ, তৎপরে ব্রজেন্দ্রনারায়ণ বঙ্গাধিকারিবংশে জন্মগ্রহণ করেন। এক্ষণে ব্রজেন্দ্রনারায়ণের পুত্র কুমার প্রতাপনারায়ণ এবং তাঁহার পুত্র দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বঙ্গাধিকারিগণের বংশধর। বঙ্গাধিকারিগণের অবস্থা এক্ষণে অত্যন্ত শোচনীয়। তাঁহাদের সে বিস্তৃত জমিদারি নাই। জীবিকানির্বাহ করা একপ্রকার কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। সেইজন্য কুমার প্রতাপনারায়ণকে রুরাল সবরেজিস্ট্রারীপদ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। যাঁহারা এককালে সমগ্র বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার রেজিস্ট্রারীপদে নিযুক্ত থাকিয়া দেশের যাবতীয় রাজা-মহারাজগণ-কর্তৃক সম্মান সহকারে পূজিত হইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধর কতিপয় সামান্য পল্লীর রেজিস্ট্রারী কার্য করিয়া অতীব কষ্টসহকারে জীবনাতিপাত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন! প্রতাপনারায়ণ গভর্নমেন্টের নিকট

বৃত্তির জন্য আবেদন করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার সে আবেদন গ্রাহ্য হয় নাই। ভট্টবাটীবংশীয়েরা উত্তররাঢ়ীয় সিংহবংশীয়, তাঁহাদের ক্ষমতা বড় কম ছিল না। উক্তবংশীয় মহেন্দ্রনারায়ণের পর কালীনারায়ণ ও তৎপরে সূর্যনারায়ণের নাম শুনা যায়। এক্ষণে তাঁহাদের দৌহিত্রবংশ বিদ্যমান। অনেকে ডাহাপাড়া ও ভট্টবাটীবংশীয়দিগকে এক বংশ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, ইহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম। দুই বংশ উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ বলিয়া এইরূপ ভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা ; কিন্তু ডাহাপাড়াবংশীয়েরা মিত্র ও ভট্টবাটীবংশীয়েরা সিংহ।

মুর্শিদাবাদের মধ্যে সম্মানে ক্রমান্বয়ে নবাব, জগৎশেঠ ও বঙ্গাধিকারিবংশীয়েরা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অনেক রাজা-মহারাজা বঙ্গাধিকারিগণকে যথোচিত সমাদর প্রদর্শন করিতেন। বঙ্গাধিকারিগণ বাদশাহ দরবার হইতে নিযুক্ত হওয়ায়, তাঁহাদের সম্মানের বৃদ্ধি হয়। তদ্ভিন্ন তাঁহাদের রাশি রাশি সৎকীর্তি সমগ্র বঙ্গরাজ্যে তাঁহাদের গৌরব ঘোষণা করিয়াছিল। সেই সমস্ত সৎকীর্তির এক্ষণে অনেক লোপ হইয়া গিয়াছে। বঙ্গাধিকারিগণের প্রধান সৎকীর্তির আদর্শস্থল কিরীটেশ্বরীও এক্ষণে তাঁহাদের হস্তচ্যুতা। তাঁহাদের অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বঙ্গাধিকারিগণের প্রাচীন ভবন এক্ষণে ভগ্নাবস্থায় পতিত। দর্প-নারায়ণের নির্মিত বাটীর স্থানে স্থানে সামান্য চিহ্নমাত্র আছে। যে বারদুয়ারীভবনে বঙ্গের রাজা-মহারাজগণ বঙ্গাধিকারিগণকে সম্মান প্রদর্শন করিতে আসিতেন, তাহারই ভিত্তির কিয়দংশ এক্ষণে বর্তমান রহিয়াছে। প্রাচীন পূজার বাটীর ভগ্নাবশেষ ও স্থানে স্থানে দুই-একটি ভগ্ন ফোয়ারা ও ইন্দারা দেখা যায়। অন্তঃপুর-চত্বরের মধ্যে শিবনারায়ণী পুষ্করিণী ও ভুবনেশ্বরী দেবীর গৃহ অসংস্কৃত অবস্থায় নয়নপথে পতিত হয়। বাটীর চতুর্দিক জঙ্গলে পরিপূর্ণ ও বন্যজন্তুগণের আবাসস্থল হইয়া উঠিয়াছে। অপেক্ষাকৃত অল্পদিনের নির্মিত একটি বিশাল তোরণদ্বার সেই জঙ্গলরাশির মধ্য হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া বঙ্গাধিকারিগণের পূর্বগৌরবের কথঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিতেছে।

গিরিয়া

মুর্শিদাবাদ হইতে প্রায় পঞ্চদশ ক্রোশ উত্তরে এবং বর্তমান জঙ্গীপুর উপবিভাগের নিকট, একটি বিশাল প্রান্তর ভাগীরথীর সলিল-প্রবাহ দ্বারা দ্বিধা বিভক্ত হইয়া বিরাজ করিতেছে। এই প্রান্তরের সাধারণ নাম গিরিয়া। ইহার বক্ষঃস্থিত গিরিয়া নামক একটি প্রসিদ্ধ পল্লী হইতে উক্ত প্রান্তরের নামকরণ হইয়াছে। যদিও এই বিশাল প্রান্তর ভাগীরথীর উভয় তীরবর্তী হওয়ায় দুইটি পৃথক প্রান্তর বলিয়া বোধ হয়, তথাপি ইহা একই নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। সম্ভবতঃ গিরিয়া ব্যতীত অন্য কোন প্রসিদ্ধ স্থান ইহার নিকটে না থাকায়, ভাগীরথীর উভয়তীরস্থ চারি পাঁচ ক্রোশব্যাপী প্রান্তরের উক্ত নাম হইয়া থাকিবে; কিন্তু কখনও কখনও ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী প্রান্তরকে সূতীর ময়দানও বলিয়া থাকে। সূতী ভাগীরথীর পশ্চিম তীরের একটি প্রসিদ্ধ স্থান; সেইজন্য তাহাকে সূতীর ময়দান কহে। পশ্চিম পারের প্রান্তরকে সময়ে সময়ে সূতীর ময়দান বলিলেও, দুই প্রান্তরই সাধারণতঃ গিরিয়া-প্রান্তর নামে কথিত হয়। গিরিয়া-প্রান্তর ভাগীরথীর পবিত্র সলিল দ্বারা সিক্ত হইলেও, তাঁহার চঞ্চল গতি-প্রভাবে স্থানে স্থানে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে।

এই বিশাল প্রান্তর দুই বার নরশোণিতদ্বারা রঞ্জিত হইয়াছিল। যাহা পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর পূতধারাপ্লাবনে পবিত্রীকৃত হইয়া থাকে, দুইবার তাহা নররুধিরধারায় কলঙ্কিত হয়। মুর্শিদাবাদে গিরিয়ার ন্যায় বিশাল প্রান্তর আর নাই। এইজন্য ইহা খ্রীস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে বারদ্বয় মহাসমর-ক্রীড়ার রঙ্গভূমি হইয়া উঠে। সুপ্রসিদ্ধ পলাশী-প্রান্তর হইতেও গিরিয়ার আয়তন বৃহৎ। গিরিয়ার বিস্তৃত সমরক্ষেত্রকে কোন ঐতিহাসিক মুর্শিদাবাদের পাণিপথ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।[১] সুবৃহৎ পাণিপথক্ষেত্র যেরূপ ভারতসাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লী নগরীর নিকটে অবস্থিত, গিরিয়ার বিশাল রণভূমিও সেইরূপ বঙ্গরাজ্যের রাজধানী মুর্শিদাবাদ হইতে অধিক দূর নহে। পাণিপথে যেরূপ মোগল-সাম্রাজ্য স্থাপনের সূচনা হয়, ও মহারাষ্ট্রীয় শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়, গিরিয়ায়ও সেইরূপ আলিবর্দী খাঁর রাজ্যপ্রাপ্তি ও মীর কাসেমের বাঙ্গালা হইতে চিরবিদায় সংঘটিত হয়। পলাশীর ন্যায় গিরিয়াও মুর্শিদাবাদের একটি স্মরণীয় স্থান। উভয়েই মুর্শিদাবাদ হইতে প্রায় সমদূরবর্তী এবং এই দুইটি প্রান্তর ব্যতীত মুর্শিদাবাদের আর কোন স্থল প্রকৃত সমরক্ষেত্রে পরিণত হয় নাই। পলাশীতে ইংরেজরাজত্বের সূচনা হয়; কিন্তু গিরিয়াতে তাহার পথ একরূপ নিষ্কণ্টক হইয়া যায়। উধূয়ানালায় (উদয়নালা) মীর কাসেমের সৈন্য সর্বতোভাবে বিধ্বস্ত হইয়া গেলেও তথায় প্রকৃত যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই। মীর কাসেমের সৈন্যের সহিত ইংরেজদিগের শেষ যুদ্ধ গিরিয়াতেই হইয়াছিল। উধূয়ানালায়

১ H. Beveridge. (Calcutta Review, April, 1893.)

ইংরেজেরা চৌর্যবৃত্তি অবলম্বনে মীর কাসেমের শিবির আক্রমণ করিয়া, তাহা ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলেন। সুতরাং গিরিয়ার পর তাঁহাদের মধ্যে যে আর প্রকৃত যুদ্ধ হয় নাই, ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। পলাশীর ন্যায় গিরিয়াও বাঙ্গলার ইতিহাসে একটি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে।

গিরিয়া প্রান্তর পূর্ব-পশ্চিমে চারি ক্রোশের অধিক হইবে এবং উত্তর-দক্ষিণে খামরা হইতে সূতী পর্যন্তও প্রায় চারি ক্রোশ।[২] গিরিয়ার স্থান-নির্ণয় লইয়া নানা জনে নানা কথা বলিয়া থাকেন। টিফেনথেলার ইহাকে ভাগীরথীর পূর্বপারে নির্দেশ করিয়াছেন। অর্মে গিরিয়ার প্রান্তরকে পশ্চিমতীরস্থ বলিয়াছেন।[৩] রেনেলের কাশিমবাজার দ্বীপের মানচিত্রে গিরিয়া গ্রাম পূর্ব পারে ও গিরিয়া সমরক্ষেত্র পশ্চিম পারে নির্দিষ্ট হইয়াছে। ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দ হইতে ৫৫ অব্দ পর্যন্ত জরিপ-বিভাগকৃত মুর্শিদাবাদ জেলার মানচিত্রে ও বর্তমান সময়ে গিরিয়া গ্রাম ভাগীরথীর পূর্ব পারেই আছে এবং বর্তমান গিরিয়া গ্রাম যে-স্থলে অবস্থিত সে স্থান কখনও ভাগীরথীর গর্ভস্থ হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে ভাগীরথী তাহার প্রান্তদেশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছেন। কালে গিরিয়া যে ভাগীরথীর গর্ভস্থ হইবে না, একথা কে বলিতে পারে? এই ভিন্ন ভিন্ন মতের সামঞ্জস্য করা দুরূহ নহে। পূর্বের বিবরণ এবং বর্তমান সময়ের অবস্থানুসারে ইহা স্থির সিদ্ধান্ত হয় যে, গিরিয়া গ্রাম বরাবরই ভাগীরথীর পূর্ব পারেই অবস্থিত রহিয়াছে। কিন্তু ভাগীরথীর উভয়তীরবর্তী বিস্তৃত প্রান্তর গিরিয়া-প্রান্তর নামে অভিহিত হওয়ায়, কেহ কেহ গিরিয়া-প্রান্তরকে কেবল পশ্চিমতীরস্থ বলিয়াছেন। কিন্তু উভয়তীরবর্তী প্রান্তরের নামই গিরিয়া। যাঁহারা গিরিয়া প্রান্তরকে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে নির্দেশ করিয়াছেন, তাঁহারা আলিবর্দীর সহিত

২ মুতাক্ষরীনে এই দূরত্ব কিছু অধিক পরিমাণে লিখিত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে যে, নবাব সরফরাজ খাঁ আলিবর্দীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া প্রথমে খামরায় উপস্থিত হন; পরে গিরিয়া গ্রামের নিকট শিবির সন্নিবেশ করেন। আলিবর্দী সেই সময় সূতীতে অবস্থান করিতেছিলেন। মুতাক্ষরীনকার সরফরাজের শিবির হইতে আলিবর্দীর শিবির ৫।৬ ক্রোশের অধিক নয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (Seir Mutaqherin Trans. Vol. I, p. 352.) রেনেলের কাশিমবাজার দ্বীপের মানচিত্রানুযায়ী সূতী ও খামরার ব্যবধান চারি ক্রোশের অধিক নহে। খামরা হইতে গিরিয়া প্রায় দুই ক্রোশ পশ্চিম ও কিছু উত্তরও বটে। তাহা হইলে সূতী ও গিরিয়ার ব্যবধান চারি ক্রোশের কম হয়। ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৮৫৫ পর্যন্ত জরিপবিভাগ-কর্তৃক মুর্শিদাবাদের যে-মানচিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে সূতী ও গিরিয়ার ব্যবধান ৩ ক্রোশের কিছু উপর। বর্তমান গিরিয়া হইতেও সূতী ৩ ক্রোশের কিছু উপর হইবে। গিরিয়া গ্রামের মধ্যে মধ্যে পরিবর্তন ঘটিলেও অধিক দূর ব্যাপিয়া সে পরিবর্তন কখনও ঘটে নাই। সুতরাং সায়রের মতানুযায়ী গিরিয়া ও সূতীর ব্যবধান কিছু অধিক বলিয়াই বোধ হয়।

৩ Orme's Indostan, Vol. II, p. 31.

সরফরাজের যুদ্ধ-প্রসঙ্গে সে কথার উল্লেখ করেন। আলিবর্দী পশ্চিম তীরে অবস্থান করায় এবং প্রথমেই পশ্চিম পারে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায়, তাঁহারা সেইজন্য কেবলই পশ্চিম পারের কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু আলিবর্দীর যুদ্ধও উভয় পারেই হইয়াছিল। আবার আলিবর্দীর যুদ্ধস্থল হইতে মীর কাসেমের যুদ্ধস্থল স্বতন্ত্র। এই সকল স্থানের এক্ষণে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আমরা দুই যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত মর্ম প্রদান করিয়া কোন কোন স্থানে কিরূপ ভাবে যুদ্ধ হইয়াছিল এবং তাহাদের এক্ষণেই বা কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছে, তাহার একটি বিবরণ প্রদান করিতেছি।

গিরিয়ার প্রথম যুদ্ধ নবাব সরফরাজ খাঁ ও আলিবর্দী খাঁর মধ্যে সংঘটিত হয়। নবাব সরফরাজ খাঁকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আলিবর্দীকে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার একেশ্বর করিবার জন্য সরফরাজের মন্ত্রী হাজি আহ্‌মদ, জগৎশেঠ, ফতেচাঁদ ও রায়রায়ান আলমচাঁদ প্রভৃতি যে-ষড়যন্ত্রের সূচনা করেন, গিরিয়ার যুদ্ধে তাহার অভিনয় শেষ হয় এবং নবাব সরফরাজকে চিরদিনের জন্য মরধাম পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। আলিবর্দী খাঁ পাটনা হইতে মুর্শিদাবাদাভিমুখে ধাবিত হইয়া রাজমহল, ফরাক্কা ও পরে সূতীর নিকট ভাগীরথীর মোহানার নিকটস্থ শাহ্‌মোর্তাজা হিন্দীর সমাধিস্থল হইতে জঙ্গীপুরের নিকট বালিঘাটা পর্যন্ত শিবির সন্নিবেশ করিয়া পিপিনা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। নবাব সরফরাজ খাঁ মুর্শিদাবাদ হইতে যাত্রা করিয়া প্রথম দিনে বামনিয়া, দ্বিতীয় দিনে দেওয়ানসরাই ও তৃতীয় দিনে খামরায় উপস্থিত হন।[8] খামরা হইতে নবাব গিরিয়ায় শিবির সন্নিবেশ করেন; কিন্তু তাঁহার কতক সৈন্য খামরায় অবস্থিতি করিতে থাকে। নবাব গিরিয়ায় উপস্থিত হইলে, তাঁহার প্রধান সেনাপতি গওস খাঁ ভাগীরথী পার হইয়া প্রায় সূতী পর্যন্ত ধাবিত হন। এই সময়ে উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধির প্রস্তাব চলিতেছিল; কিন্তু সে সন্ধি কার্যে পরিণত না হওয়ায়, পুনর্বার যুদ্ধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। আলিবর্দী নিজ সৈন্যদিগকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া একভাগ নন্দলাল নামে একজন বিশ্বস্ত কর্মচারীর অধীনে রাখিয়া অপর দুই দল নিজে লইয়া রাত্রিযোগে নদী পার হইলেন। গওস খাঁর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য নন্দলালের প্রতি আদেশ ছিল এবং তিনি নিজে সরফরাজের শিবির আক্রমণ করিবার জন্য ধাবিত হন। রিয়াজে লিখিত আছে যে, গওস খাঁ ও মীর সরফউদ্দীন গিরিয়ানালার পারে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন।[৫] এই গিরিয়ানালার কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় না; মুতাক্ষরীনে লিখিত আছে যে, আলিবর্দী নদীর যে-তীরে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন, সেই তীরে গওস খাঁর সহিত নন্দলালের যুদ্ধ হয়। ইহাতে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরই বুঝা যাইতেছে। তাহা হইলে গিরিয়ানালা ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে হওয়ার সম্ভাবনা। রেনেলের কাশিমবাজার দ্বীপের মানচিত্রে

৪ Riyaz-us-saltain, pp. 310-1.
৫ Riyaz-us-saltain, p. 314.

গিরিয়া যুদ্ধপ্রান্তরের নিকট একটি নালা ভাগীরথীর পূর্বতীরে দৃষ্ট হয়, তাহা এক্ষণে বালুকাস্তুপ মধ্যে প্রোথিত। কারণ ভাগীরথী পশ্চিম হইতে অনেক পূর্বে সরিয়া আসিয়াছেন। সায়রের কথানুসারে গওস খাঁর অবস্থান পশ্চিম তীরেই বুঝায়।

প্রভাত হইবামাত্র আলিবর্দী নিজের অধীন দুইদল সৈন্য লইয়া সরফরাজকে সম্মুখ ও পশ্চাৎ উভয় দিক দিয়া আক্রমণ করিলেন। এদিকে নন্দলালও গওস খাঁর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সরফরাজ হস্তীপৃষ্ঠে বিপদের সম্মুখীন হইলেন। নবাবের হস্তী-চালক তাঁহাকে আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করার জন্য রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু সরফরাজ তাহাকে তিরস্কার করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যস্থলে উপস্থিত হওয়ার জন্য আদেশ প্রদান করেন। অধিক দূর অগ্রসর হইতে না হইতে একটি বন্দুকের গুলি সরফরাজের মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হওয়ায় তিনি হস্তীপৃষ্ঠে শায়িত হন। মুর্শিদাবাদের নবাবদিগের মধ্যে কেবল সরফরাজই সমরক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিলেন। হস্তীচালক তাঁহার মৃতদেহ বহন করিয়া মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলে, তাহা নেক্টাখালির প্রাসাদে সমাহিত করা হয়। তাঁহার সমাধি অদ্যাপি বর্তমান আছে।[৬] সরফরাজের সহিত আলীবর্দীর যে-যুদ্ধ হয়, তাহা গিরিয়া গ্রামের নিকট এবং ভাগীরথীর পূর্ব তীরে। এক্ষণে তাহার কিয়দংশ তাহার গর্ভস্থ হইয়াছে, অবশিষ্টাংশ অদ্যাপি পূর্ব পারেই অবস্থিত রহিয়াছে। গওস খাঁ নন্দলালের সৈন্যদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলেন; নন্দলালও ইহজীবনের লীলা শেষ করিতে বাধ্য হয়। গওস খাঁ তৎপরে প্রভুর সাহায্যের জন্য গিরিয়াভিমুখে যাত্রা করেন। কতক দূর অগ্রসর হইয়া তিনি জানিতে পারেন যে, তাঁহার প্রভু বন্দুকের গুলির আঘাতে হস্তিপৃষ্ঠে শায়িত হইয়াছেন। তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া স্বীয় পুত্রদ্বয় মহম্মদ কুতুব ও মহম্মদ পীরকে আহ্বান করিয়া যাহাতে আলিবর্দীকে সম্পূর্ণরূপে বাধাপ্রদান করিতে পারেন, তাহার জন্য পরামর্শ করিলেন।[৭] তাঁহারা কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করা অপেক্ষা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং আপনাদিগের সৈন্য সমবেত করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই সরফরাজের মৃত্যুশ্রবণে ভগ্নোৎসাহ হইয়া মুর্শিদাবাদ অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল। যাহারা অবশিষ্ট ছিল, গওস খাঁ তাহাদিগকে লইয়া হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক আলিবর্দীর সৈন্যসাগর মথিত করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তাঁহার বীর পুত্রদ্বয়ও পিতার পথের অনুসরণ করেন। তাঁহাদের তরবারিচালনে আলিবর্দীর সৈন্যগণ অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। গওস খাঁ আলিবর্দীর গোলন্দাজ সেনাপতি ছেদন হাজারীর একটি বন্দুকের গুলিতে আহত

---

৬ এই নেক্টাখালিকে লেংটাখালিও বলিয়া থাকে; লেংটাখালি শাহানগর থানার পূর্বে। এক্ষণে তা জঙ্গলে পরিপূর্ণ। গভর্নমেণ্টের পূর্তবিভাগ-কর্তৃক সরফরাজের সমাধির নূতন সংস্কার হইয়াছে।

৭ রিয়াজে মহম্মদ পীরের স্থলে বাবর বলিয়া লেখা আছে। (Riyaz-us-salatin, p. 320)

হইয়া যেমন হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিতে যাইতেছিলেন, অমনি আরও দুইটি গুলি আসিয়া তাঁহাকে ভূতলশায়ী করিয়া ফেলে। কুতুব ও পীরের তরবারি-চালনে ছেদন হাজারী বিশেষরূপে আহত হন, পরে অব্যর্থ গুলির আঘাতে পিতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই পিত্রাদেশ-পরায়ণ পুত্রদ্বয়ও ইহজগৎ হইতে চিরবিদায় লইতে বাধ্য হন। যে স্থানে তাঁহাদের পবিত্র দেহ নিপতিত হইয়াছিল, সেই স্থানে তাঁহাদিগকে সমাহিত করা হয়। কিন্তু গওস খাঁর গুরু সা হায়দরী নামে জনৈক ফকীর তাঁহাদিগের মৃতদেহ গিরিয়া হইতে উত্তোলন করিয়া ভাগলপুরে লইয়া যান এবং তথায় তাঁহাদিগকে পুনঃসমাহিত করেন।

সা হায়দরী ভাগলপুরেই বাস করিতেন, সিয়াধর্মের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। সা হায়দরী একসময়ে গওস খাঁকে কোন সাংঘাতিক রোগ হইতে মুক্ত করায়, তিনি তাঁহার শিষ্যত্ব ও সিয়াধর্ম গ্রহণ করেন। গওস খাঁর মৃত্যুশ্রবণে সা হায়দরী মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া আলিবর্দীকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। আলিবর্দী তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিতে সাহস করেন নাই। পরে তিনি গিরিয়া হইতে গওস খাঁর, তাঁহার পুত্রদ্বয়ের ও অন্যান্য সহচরের মৃতদেহ উত্তোলন করিয়া ভাগলপুরে লইয়া গিয়া আবার সমাহিত করেন এবং আয়ুঃপূর্ণ হইলে প্রিয় শিষ্য গওস খাঁর পার্শ্বে নিজেও সমাহিত হন।[৮] প্রভুর অন্নে প্রতিপালিত হইয়া প্রভুর সিংহাসন রক্ষার জন্য অকাতরে প্রাণবিসর্জন দেওয়ায়, গওস খাঁ সাধারণের নিকট মহাপুরুষ বলিয়া কীর্তিত হইয়া আসিতেছেন।

আলিবর্দী খাঁ এক দিকে যেমন বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক প্রভুপুত্রের রক্তপাত করিয়া সিংহাসন লাভ করেন, অন্যদিকে সেইরূপ গওস খাঁ ও তাঁহার পুত্রদ্বয় আপনাদিগের শোণিত দান করিয়া প্রভুর সিংহাসন রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। গওস খাঁর সেই অনুপম মহত্ত্ব বহু দিন হইতে গিরিয়ার চতুষ্পার্শ্বে গ্রাম্য-কবিতায় গীত হইয়া আসিতেছে।[৯] সাধারণ লোকে তাঁহাকে অতিমানুষ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। এরূপ বিবেচনা সাধারণের মনে সহজেই উপস্থিত হইতে পারে। যিনি সপরিবারে ফকীরের নিকট দীক্ষিত হইয়া প্রভুর কল্যাণসাধনোদ্দেশে অনায়াসে প্রাণ বিসর্জন দিতে পারেন এবং যাঁহার পরিবারস্থ স্ত্রী-পুরুষ প্রত্যেকেই বীরত্বের পূর্ণাবতার, তাঁহাকে অতিমানুষ বিবেচনা করা অধিকতর আশ্চর্যের বিষয় নহে।[১০] গিরিয়ার যে-স্থানে

৮ Seir Mutaqherin Trans, Vol. I, p. 701.

৯ উক্ত গ্রাম্য কবিতাটি পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

১০ গওস খাঁর পত্নীও বীররমণী ছিলেন। স্বামী ও পুত্রের দেহত্যাগের পর তিনি ভাগলপুরে বাস করিতেন। যৎকালে পেশওয়া বালাজী রাও বিহার হইতে বাঙ্গলায় আগমন করেন, সেই সময়ে তাঁহার সৈন্যরা ভাগলপুরে উপস্থিত হইলে, নগরের যাবতীয় লোক গঙ্গাপারে পলায়ন করে। কিন্তু বীররমণী গওস খাঁর পত্নী আপনার অল্পসংখ্যক অনুচর লইয়া স্বীয় বাস-ভবন রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইলেন। মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যেরা সমস্ত নগর লুণ্ঠন করিয়া সেই স্থানে

গওস খাঁর পবিত্র দেহ পতিত হয়, তথায় তাঁহার স্মৃতির জন্য একটি দরগা নির্মিত হইয়াছিল। গিরিয়ার নিকট মমীনটোলা গ্রামের চাঁদপুর নামক মৌজায় উক্ত দরগা নির্মিত হয়। চাঁদপুর ভাগীরথীর পূর্ব তীরে ছিল। মমীনটোলার কিয়দংশ গঙ্গায় ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, চাঁদপুর এক্ষণে পশ্চিম তীরে পড়িয়াছে। ত্রিশ বৎসরেরও অধিক হইল, গওস খাঁর সে দরগা এক্ষণে ভাগীরথী-গর্ভস্থ হইয়াছে। বর্তমান সময়ে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে নূতন চাঁদপুরে আর একটি সামান্য দরগা নির্মিত হইয়াছে। গওস খাঁর দরগা মুসলমানগণ অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহকারে পূজা করিয়া থাকেন।

১৭৪০ খ্রীঃ অব্দের শেষ ভাগে গিরিয়ায় প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। গওস খাঁর সহিত সরফরাজের অন্যান্য অনেক সেনাপতি যুদ্ধস্থলে প্রাণবিসর্জন করিয়াছিলেন। বিজয়সিংহ নামে সরফরাজের জনৈক রাজপুত সেনাপতি প্রথমে খামরার নিকট অবস্থিত করিতেছিলেন ; পরে অগ্রসর হইয়া অত্যন্ত বীরত্ব প্রদর্শনপূর্বক ভূতলশায়ী হন। তাঁহার নবমবর্ষীয় পুত্র জালিমসিংহও এই যুদ্ধে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিল। যে স্থলে সেই রাজপুতবালক অলৌকিক বীরত্ব দেখাইয়াছিল, তাহাকে অদ্যাপি জালিম-সিংহের মাঠ কহিয়া থাকে। গিরিয়া হইতে অর্ধ ক্রোশের কিছু অধিক দক্ষিণ-পূর্বে মিঠিপুর নামে এক গ্রাম আছে ; মিঠিপুর হইতে খামরা পর্যন্ত বিস্তৃত প্রান্তরের নামই জালিমসিংহের মাঠ। গিরিয়া হইতে খামরা দুই ক্রোশের অধিক পূর্বে অবস্থিত। জালিমসিংহের মাঠের নিকট আকবরপুর নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। মিঠিপুর গ্রামে কয়েকঘর চৌহান রাজপুত বাস করেন। তাঁহারা এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, প্রতাপাদিত্যের পরাজয়ের পর, ভবানন্দ মজুমদারকে নদীয়ায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া, যৎকালে মানসিংহ ভাগীরথীর পূর্বতীরস্থ প্রসিদ্ধ বাদশাহী সড়ক দিয়া দিল্লী গমন করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহারা খামার পর্যন্ত অগ্রসর হইলে, মানসিংহের অনুচর কতিপয় চৌহান রাজপুত কোন কারণবশতঃ দিল্লী যাইতে ইচ্ছা না করিয়া মিঠিপুরে আপনাদিগের বাসস্থান নির্দেশ করেন[১১] ; বর্তমান চৌহানগণ তাঁহাদিগের বংশধর বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেন। বিজয়সিংহ মিঠিপুরস্থ রাজপুতবংশীয় কি রাজপুতনা হইতে নবাগত, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মিঠিপুর ও গিরিয়ার মধ্যে কাণাপুকুর নামে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, যুদ্ধের সময় জলাভাববশতঃ যুদ্ধাস্ত্রদ্বারা তাহা খনন করা হইয়াছিল। বর্ষাকাল ব্যতীত অন্যসময় তাহা শুষ্কাবস্থায় অবস্থিতি করে। দীঘল গিরিয়া ও ছোট গিরিয়া

উপস্থিত হইলে, সহসা বন্দুকের শব্দে ও গুলিবর্ষণে তাহারা চমকিত হইয়া উঠে। বালাজী রাও কারণ অনুসন্ধানে সেই বীরললনার সাহসের পরিচয় পাইয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হন এবং নিজ সৈনিকদিগকে সেদিকে যাইতে নিষেধ করিয়া, গওস খাঁর পত্নীকে দাক্ষিণাত্য হইতে আনীত কতকগুলি কারুকার্যযুক্ত দ্রব্য উপহার স্বরূপ প্রদান করেন। (Mutaqherin, Vol. I, pp. 453-54.)

১১ বর্তমানে প্রমাণিত হইয়াছে যে, মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করেন নাই।

নামে এক্ষণে প্রায় পরস্পর সংলগ্ন দুইখানি গ্রাম হইয়াছে। দীঘল গিরিয়া হইতেই ছোট গিরিয়ার উৎপত্তি। অষ্টাদশ শতাব্দীর যুদ্ধের সময় হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত গিরিয়া গ্রামের মধ্যে মধ্যে স্থান পরিবর্তন ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

মীর কাসেমের সৈন্যের সহিত ইংরেজদিগের যে-যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহার স্থল বিভিন্ন। এই যুদ্ধ কেবলই ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বাঁশলই নদীর মোহানার নিকট হইয়াছিল। সে স্থানের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং ভাগীরথীর পূর্বতীরে লাল-খাঁর দেওয়াড় নামে সুবৃহৎ চরে পরিণত হইয়াছে। লালখাঁর দেওয়াড় এক্ষণে এক-খানি বিস্তৃত পল্লী হইয়া উঠিয়াছে। বাঁশলইয়ের বর্তমান মোহানা হইতে পূর্ব মোহানা অপেক্ষাকৃত পূর্বদিকে ছিল; এক্ষণে তাহা লালখাঁর দেওয়াড়ের গর্ভস্থ। বাঁশলই রাজমহল পর্বতশ্রেণী হইতে বহির্গত হইয়া নানাস্থলে বক্রগতি অবলম্বনপূর্বক জঙ্গীপুরের নিকট কানুপুর নামক স্থানের উত্তরে ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই কানুপুরে বহুসংখ্যক দস্যুর বাস ছিল। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, তাহারা খাইবার গিরিপথ হইতে উড়িষ্যা পর্যন্ত সর্বত্র দস্যুবৃত্তি করিত। বাঁশলই-এর মোহানা হইতে সূতী তিন ক্রোশেরও অধিক উত্তরে হইবে। মীর কাসেমের সৈন্য কাটওয়া মোতিঝিলের নিকট পরাজিত হইয়া সূতীতে আসিয়া অন্যান্য সৈন্যদের সহিত মিলিত হয়। সূতীতে মীর কাসেমের ইউরোপীয় ও আর্মেনীয় সেনাপতি সমরু ও মার্কার অবস্থিতি করিতেছিলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার দেশীয় প্রধান প্রধান সেনাপতি আসদউল্লা, নাশীর খাঁ, বদরউদ্দীন, শের আলি প্রভৃতিও ইংরেজদিগকে বাধা প্রদান করিবার জন্য প্রবৃত্ত হন। মেজর আডামৃসের অধীন ইংরেজ সৈন্যগণ মুর্শিদাবাদ হইতে গঙ্গা পার হইয়া ভাগীরথীর পশ্চিমতীরস্থ বাদশাহী সড়ক ধরিয়া সূতীর দিকে অগ্রসর হয়। মুর্শিদাবাদ হইতে সূতী পর্যন্ত ভাগীরথীর উভয় পার দিয়া দুইটি সড়ক চলিয়া গিয়াছে। সরফরাজের সৈন্য পূর্বপারের সড়ক দিয়া গমন করায়, খামরা ও গিরিয়ায় উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু ইংরেজ-সৈন্য পশ্চিমপারের সড়ক দিয়া বাঁশলইয়ের মোহানার নিকট উপস্থিত হয়। মীর কাসেমের পরাজিত সৈন্যগণও উক্ত সড়ক দিয়া সূতীর দিকে গিয়াছিল। ১৭৬৩ খ্রীঃ অব্দের আগস্ট মাসে এই যুদ্ধ হইয়াছিল। ভাগীরথীর কেবল পশ্চিম তীরে সূতীর নিকট এই যুদ্ধ হওয়ায়, মুতাক্ষরীনকারা প্রভৃতি ইহাকে সূতীর যুদ্ধ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। ইংরেজরা ইহাকে গিরিয়ার যুদ্ধ কহেন।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি, সূতী পর্যন্ত ভাগীরথীর উভয়তীরবর্তী প্রান্তরের নামই গিরিয়া-প্রান্তর; সুতরাং উক্ত বিষয়ে কোনই পার্থক্য নাই। মীর কাসেমের সৈন্যগণের অবস্থান অত্যন্ত দৃঢ়ভাবেই করা গিয়াছিল। ভাগীরথী ও বাঁশলই তাহাদের দুই পার্শ্বের পরিখাস্বরূপ হইয়াছিল; তদ্ভিন্ন তাহারা অন্যান্য দিকেও পরিখা খনন করিয়াছিল। তাহারা মুর্শিদাবাদ হইতে পশ্চিমে যাইবার একমাত্র সড়ক অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল। মধ্যস্থলে সমরু ও মার্কার, দক্ষিণ পার্শ্বে আসদউল্লা ও বাম পার্শ্বে শের আলি ইংরেজ সৈন্য মথিত করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। আসদউল্লার

সৈন্য দক্ষিণ দিকে বাঁশলইয়ের নিকট পর্যন্ত অবস্থান করে। ইংরেজ-সৈন্যগণ বাদশাহী সড়ক ধরিয়া আসিয়া, বাঁশলই-এর মোহানার নিকট উক্ত নদী পার হইয়াছিল। সম্ভবতঃ বাঁশলই যেখানে সড়ককে বিভক্ত করিয়াছে, ইংরেজ-সৈন্য সেইখানেই পার হইয়া থাকিবে, যদিও তাহার কিছু পূর্বে এক্ষণে বর্তমান মোহানা অবস্থিত এবং প্রাচীন মোহানা আরও পূর্বে ছিল, তথাপি মোহানার নিকট যাওয়ার কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না; বর্ষাকালে মোহানার নিকট পার হওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে। মেজর অ্যাডাম্‌সের সহিত মেজর কার্নাক, নক্স, গ্রাণ্ট প্রভৃতি সেনাপতিও ছিলেন। ইংরেজ-সৈন্যগণ অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে। আসদউল্লার সৈন্যগণ ইংরেজদিগের অনেককে বাঁশলইয়ের জলে নিক্ষেপ করিয়াছিল। কিন্তু ইংরেজরা অপর পার্শ্বে জয়-লাভ করায়, মীর কাসেমের সৈন্যদিগকে অবশেষে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। ঐতিহাসিকেরা বলিয়া থাকেন যে, শের আলি যদি কিছু বীর্যবত্তা দেখাইতে পারিত, তাহা হইলে ইংরেজদিগকে বাঁশলই ও ভাগীরথীর গর্ভে চিরবিশ্রাম লাভ করিতে হইত। এই যুদ্ধের পর মীর কাসেমের সৈন্যের সহিত ইংরেজদিগের আর প্রকৃত যুদ্ধ ঘটে নাই। ইহার পর উধুয়ানালার শিবির আক্রমণ করিয়া ইংরেজরা মীর কাসেমের সৈন্যগণকে একেবারে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে।

যে-প্রান্তরে মীর কাসেমের সৈন্যের সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, ভাগীরথী তাহাকে গর্ভস্থ করিয়া লালখাঁর দেওয়াড়ে পরিণত করিয়াছেন। সূতীর নিকট কোন্দলিয়া নামে একটি ময়দান আছে। প্রবাদ আছে যে, সেইখানে প্রথমে নবাব ও ইংরেজ সৈন্যের প্রথম যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সূতীর নিকট বাজিতপুর নামক স্থানের সর্বেশ্বর দেবের মন্দিরের তীরে একটি যুদ্ধ-চিত্র আছে; সাধারণে বলিয়া থাকে যে, মীর কাসেম ও ইংরেজদিগের যুদ্ধ স্মরণ করিয়া সেই চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। গিরিয়া-প্রান্তরের উভয় যুদ্ধস্থলেরই অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। ভাগীরথী প্রতিবৎসর ভিন্ন ভিন্ন গতি অবলম্বন করায়, ক্রমাগত উক্ত পরিবর্তন ঘটিয়া আসিতেছে। ভাগীরথীর মোহানা পূর্বে সূতীর নিকট ছাপঘাটিতে ছিল; এক্ষণে তাহা সূতী হইতে দুই ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্বে বিশ্বনাথপুর নামক স্থানে সরিয়া আসিয়াছে। সূতী হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ দক্ষিণে আটপলগাছি নামক স্থানের নিকট দিয়া ভাগীরথী প্রবাহিতা হইতেন। রেনেলের মানচিত্রে তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে সেই আটপলগাছি হইতে ভাগীরথী প্রায় দেড় ক্রোশ পূর্বে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এইরূপে ভাগীরথী গিরিয়া-প্রান্তরকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার গতির এইরূপ পরিবর্তনসত্ত্বেও বিশাল গিরিয়া-প্রান্তরের চিহ্ন অদ্যাপি একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। আজিও তাহা বহুদূরব্যাপী ভূভাগে স্বীয় বিশালকায় বিস্তার করিয়া, অষ্টাদশ শতাব্দীর দুইটি প্রসিদ্ধ যুদ্ধের কথা স্মৃতিপটে উদয় করাইয়া দিতেছে।

একটি ক্ষুদ্র কাহিনী

অতীত কালসাগরে কত উজ্জ্বল রত্ন লুক্কায়িত রহিয়াছে, কে তাহাদের গণনা করিবে ? তাহাদিগের প্রভা দূরাগত নক্ষত্রালোকের ন্যায় এত ক্ষীণ যে, বিস্মৃতির ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া মুহূর্তের জন্য কাহারও নয়নপথে পতিত হয় কিনা সন্দেহ। যখন কোন ঐতিহাসিক সত্যানুসন্ধিৎসার রজ্জু অবলম্বন করিয়া সেই অতলস্পর্শ সাগরগর্ভে নিমগ্ন হইতে থাকেন, তখন কেবল তাঁহারই চক্ষুর সমক্ষে সেই উজ্জ্বল রত্নরাজির কিরণলহরী ক্রীড়া করিতে থাকে। তিনি স্মৃতিস্তর হইতে সেই জ্যোতির্ময়ী রত্নমালার উদ্ধার করিয়া সাধারণকে উপহার প্রদান করেন। দুঃখের বিষয়, রত্নোদ্ধার সকল সময়ে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না ; কখন হয়তো কোন কোন ক্ষীণপ্রভ রত্নের উদ্ধার হয় এবং তৎসঙ্গে অনেক উজ্জ্বলতম রত্ন পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। সে স্থলে আমরা তত দোষ দেখিতে পাই না। কিন্তু যেখানে সত্যানুসন্ধিৎসা-রজ্জুর একাংশ বিদ্বেষবুদ্ধির কৃষ্ণবর্ণে এবং অপরাংশ পক্ষপাতিত্বের স্বর্ণ বর্ণে রঞ্জিত করিয়া, উজ্জ্বল রত্নরাজিকে কৃষ্ণ ও ক্ষীণপ্রভ রত্ননিচয়কে উজ্জ্বলতর প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করা হয়, তথায় ঐতিহাসিকগণ কর্তব্যের অবমাননা করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ যখন হিন্দুর ইতিহাস লিখিয়াছেন, তখন তাঁহারা অনেক স্থলে, তাঁহাদিগের গৌরবের লাঘব এবং কোনও কোনও স্থলে প্রকৃত ঘটনা গোপন করিতে ত্রুটি করেন নাই। মুসলমানগণের ইতিহাস লিখিতে গিয়া ইংরেজ ঐতিহাসিকগণও উক্ত পথ অবলম্বন করিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে বিদ্বেষবুদ্ধির পরিচয় দিয়া অনেক চরিত্রকে এরূপ অতিরঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছেন যে, কোন মতে তাঁহাদের প্রবৃত্তির সমর্থন করা যাইতে পারে না।

মুসলমানদিগের সহিত সংসৃষ্ট বলিয়া দুর্ভাগ্য হিন্দুগণও কোন কোন স্থলে ইংরেজ ঐতিহাসিকগণের লেখনীমুখে স্থান পান নাই এবং অনেক স্থলে কৃষ্ণবর্ণেও চিত্রিত হইয়াছেন। যে মোহনলাল পলাশীর যুদ্ধে মীরমদনের পর অদম্য উৎসাহ-সহকারে ইংরেজসেনা মথিত করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন, অর্মে প্রভৃতির ইতিহাসে তাঁহার সেই বীরত্বকাহিনীর কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। পরবর্তী ব্রুম ম্যালীসন্ প্রভৃতিও অর্মের অনুসরণ করিয়াছেন। ভাগ্যে মুতাক্ষরীনকার সেই প্রভুভক্ত হিন্দুবীরের শৌর্যময় বিবরণের বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাই আমরা আজ তাহা লইয়া আত্মগৌরব করিতে পারিতেছি। তাই বঙ্গকবির অমৃতবর্ষিণী লেখনীতে চিত্রিত হইয়া মোহনলালের দেবদুর্লভ চিত্র আমাদের চক্ষের সমক্ষে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। এই রূপে বাঙ্গালীর গৌরবস্থল মহারাজ নন্দকুমার অনেক ঐতিহাসিকের নিকট কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত হইয়াছেন।

১ Seir Mutaqherin (English Translation), Vol. I, p. 768.

অদ্য আমরা যে ক্ষুদ্র কাহিনীটির বিষয় বলিতেছি, তাহা কোন ইংরেজি ইতিহাসে দৃষ্ট হয় না ; কেবল তাহা দুইখানি মুসলমানী ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ বোধ হয় ঘটনাটিকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় মুতাক্ষরীনেও ইহার উল্লেখ নাই। কেবল তারিখ বাঙ্গলা নামক ফারসী পুস্তকে ও রিয়াজুস্ সালাতীন নামক গ্রন্থে এই ক্ষুদ্র কাহিনীটি দেখিতে পাওয়া যায়। আলিবর্দী খাঁ যে সময়ে গিরিয়ার সমরক্ষেত্রে নবাব সরফরাজ খাঁকে নিহত করিয়া মুর্শিদাবাদের সিংহাসন লাভ করেন, ইহা সেই সময়ের একটি সামান্য ঘটনা মাত্র। ঘটনাটি সামান্য হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে হিন্দুর জাতীয়তার একটি বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। চতুর্দিকে প্রজ্বলিত ভীষণ সমরানলের মধ্যে একটি নবমবর্ষীয় বালকের অদ্ভুত পিতৃভক্তি আমাদের জাতীয় ভাবের কি একটি জ্বলন্ত ছবি নহে? অন্যান্য জাতির নিকট উপেক্ষণীয় হইলেও আমাদের নিকট যে ইহা পরম গৌরবের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা সংক্ষেপে ঘটনাটি যথাসাধ্য বর্ণন করিতে প্রয়াস পাইতেছি।

বিজয়লক্ষ্মীর বরমাল্যলাভের আশায় আলিবর্দী খাঁ ও সরফরাজ খাঁ ১৭৪০ খ্রীঃ অব্দের শেষ ভাগে গিরিয়া-প্রান্তরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। গিরিয়ার বিশাল প্রান্তর বিধৌত করিয়া প্রসন্নসলিলা ভাগীরথী কলকল নাদে প্রবাহিতা হইতেছেন। তাঁহার উভয় তীরে শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছে। সেই সমস্ত শিবিরের ধবল ছবি ভাগীরথীবক্ষে প্রতিবিম্বিত হইয়া তরঙ্গে তরঙ্গে শত শত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। রাত্রি প্রভাত হইলে, ঊষার বিমলচ্ছটায় চতুর্দিক্ উদ্ভাসিত হইতে লাগিল,—সমস্ত বিশ্বে যেন সজীবতার প্রবাহ ছুটিয়া চলিল,—বিহঙ্গনিচয়ের মধুর ঝঙ্কারে যোদ্ধৃগণের হৃদয়তন্ত্রী যেন বাজিয়া উঠিল। সূর্যদেব দিগ্বলয় আশ্রয় করিতে না করিতে উভয় পক্ষের সমরবাদ্য নিনাদিত হইল। হস্তীর বৃংহণে, অশ্বগণের হ্রেষারবে, কামানের গভীর গর্জনে, যোদ্ধ্‌গণের উৎসাহনিনাদে, দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত হইতে লাগিল। যুদ্ধ যখন ক্রমে ঘোরতর হইয়া উঠিল, তখন সরফরাজ স্বয়ং উৎসাহসহকারে হস্তীপৃষ্ঠে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার প্রধান প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষগণের অধিকাংশই ভূতলশায়ী হইয়াছেন। এরূপ অবস্থায় তিনি কাপুরুষতা অবলম্বন না করিয়া নিজেই ভীষণ সমরসাগরে ঝম্প প্রদান করিলেন। সহসা একটি বন্দুকের গুলি আসিয়া তাঁহার মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হইল এবং তিনি বীরের ন্যায় সেই সমরক্ষেত্রে জীবন বিসর্জন করিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাবদিগের মধ্যে একমাত্র সরফরাজই যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন বিসর্জন করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান সেনাপতি গওস খাঁ আলিবর্দীর একদল সৈন্য মথিত করিয়া প্রভুর সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইতেছিলেন ; পরে প্রভুর মৃত্যুশ্রবণে স্বীয় পুত্রদ্বয়সহ জীবন বিসর্জনে কৃতসংকল্প হইলেন। অদম্য উৎসাহসহকারে আলিবর্দীর সৈন্যসাগর মন্থন করিতে করিতে পরিশেষে তিনিও ধরাশায়ী হইলেন ; তাঁহার বীরপুত্রদ্বয়ও পিতার পথের অনুসরণ করিলেন।

বিজয়সিংহ নামে একজন রাজপুতবীরের হস্তে নবাব সরফরাজের সৈন্যের পশ্চাদ্‌ভাগ রক্ষার ভার ছিল। বিজয়সিংহ গিরিয়ার নিকট খামরা নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। যখন তিনি অবগত হইলেন যে, তাঁহার প্রভুর অধিকাংশ সৈন্যাধ্যক্ষ একে একে গিরিয়ার ভীষণ সমরে জীবন বলি দিয়াছেন এবং প্রভু নিজেও হস্তীপৃষ্ঠে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছেন, তখন তিনি কালবিলম্ব না করিয়া অতি অল্পসংখ্যক অশ্বারোহীর সহিত আলিবর্দীর দিকে অগ্রসর হইলেন। প্রভুর মৃত্যুতে রাজপুতের শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠিল। তিনি দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া এক ভীষণাকার বল্লম গ্রহণ করিয়া আলিবর্দীকে লক্ষ্য করিলেন,—উজ্জ্বল তপন প্রভায় বল্লম প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। আলিবর্দী খাঁর সমস্ত শরীরে যেন তড়িৎ-প্রবাহ ছুটিতে লাগিল। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার গোলন্দাজ সৈন্যাধ্যক্ষ দাওর কুলীর একটি অব্যর্থ গুলিতে রাজপুতবীর বিজয়সিংহ গিরিয়া-প্রান্তরে শায়িত হইলেন।

বিজয়সিংহের নবমবর্ষীয় পুত্র জালিমসিংহ ছায়ার ন্যায় পিতার অনুবর্তন করিত; কি শিবিরে, কি সমরক্ষেত্রে, কোন স্থানে তাহার গতির বিরাম ছিল না। যৎকালে বিজয়সিংহ খামরা হইতে গিরিয়া সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হন, শিশু জালিমও তাঁহার সঙ্গে সেই সমরসাগরের উত্তাল তরঙ্গমধ্যে পতিত হয়। বিজয়সিংহ অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হইলে, বালক নিষ্কোষিত-তরবারিহস্তে পিতার মৃতদেহ রক্ষার জন্য দণ্ডায়মান হইল। চতুর্দিকে আলিবর্দীর সেনাগণ জয়নিনাদ করিতেছে,—রণবাদ্যের ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতেছে,—নবমবর্ষীয় বালকের ভ্রূক্ষেপ নাই! সে আপনার ক্ষুদ্র তরবারি লইয়া আলিবর্দীর সৈন্যগণকে বাধা প্রদান করিতে লাগিল। পাছে মুসলমানগণ পিতার মৃতদেহ স্পর্শ করে, এই আশঙ্কায় সে আপনার প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, ভীষণ সমরসাগরমধ্যে নির্ভীকচিত্তে দণ্ডায়মান রহিল। কি যেন মহীয়সী শক্তি তাহার হৃদয়ে ক্রীড়া করিতেছিল; বালক তৎপ্রভাবে পিতার মৃতদেহ রক্ষার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল। ক্রমশঃ অসংখ্য সৈন্য চতুর্দিক হইতে বালককে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। জয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া তাহারা যেন বালককে পেষণ করিবার উপক্রম করিল। বালক তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত না হইয়া, স্বীয় ক্ষুদ্র তরবারি চালনা করিতে লাগিল, তরবারি তপনালোকে ঝলসিত হইয়া যেন নৃত্য করিয়া উঠিল। যতই আলিবর্দীর সৈন্যগণ অগ্রসর হইতেছিল, ততই বালকের উৎসাহ বর্ধিত হইতে লাগিল। যে রাজপুত জাতি জগতের ইতিহাসে অভূতপূর্ব বীরত্বের অভিনয় করিয়াছে, তাহাদের সামান্য রক্তবিন্দুও যে সজীব, ইহা কে অস্বীকার করিবে?

আলিবর্দী খাঁ স্বয়ং সেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বালকের অদ্ভুত সাহসে ও পিতৃভক্তিতে চমৎকৃত হইয়া সৈন্যগণকে তাহার গাত্র স্পর্শ করিতে নিষেধ করিলেন এবং স্বীয় হিন্দু সৈনিকগণকে বিজয়সিংহের মৃতদেহের যথারীতি সৎকার করিতে আদেশ দিলেন। এই আদেশ অবগত হইয়া বালক তাহাদিগকে পিতার দেহস্পর্শে অনুমতি দিল। আলিবর্দীর কতিপয় গোলন্দাজ সৈন্য বালকের অদ্ভুত

বীরত্বে প্রীত হইয়া তাহাকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া গিয়াছিল।[২] বালক ভাগীরথীতীরে যথারীতি সৎকার করিয়া পিতৃদেবের পবিত্র ভস্মরাশি গঙ্গার পবিত্র সলিলে ভাসাইয়া দিল। সেই পবিত্র ভস্মরাশিতে তাহার কয়েক বিন্দু পবিত্র অশ্রু পতিত হইয়া পবিত্রতার বৃদ্ধি করিল। পবিত্রসলিলা ভগীরথী সেই পবিত্র অশ্রুসিক্ত পবিত্র ভস্মরাশি বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া কুলুকুলুনাদে প্রবাহিত হইলেন। বালক পিতৃ-বিয়োগে কাতর হইয়া অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিল। নবমবর্ষীয় রাজপুত বালকের এইরূপ অদ্ভুত সাহস ও পিতৃভক্তি জগতের ইতিহাসে বিরল। মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে গিরিয়ার যুদ্ধ একটি প্রধান ঘটনা। রাজপুতবালক জালিম-সিংহের অদ্ভুত কাহিনী সেই ঘটনাকে আরও স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

হিন্দুর ন্যায় পিতৃভক্তি জগতের কোন জাতি দেখাইতে পারে নাই। যাহারা "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতা হি পরমংতপঃ. পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ" এই মহাবাক্য কার্যতঃ পদে পদে প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের নিকট পিতৃভক্তিতে জগতের সকল জাতিকে যে অবনত হইতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয়, এই সমস্ত জ্বলন্ত পিতৃভক্তির কাহিনী আমরা অনেক সময়ে বর্ণনা করিতে বিস্মৃত হইয়াছি। পাশ্চাত্য জগতে এই সকল জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত কত সাহিত্যে কত কবিতায় স্থান পাইয়াছে, কিন্তু আমরা শত চেষ্টা করিলেও বিস্মৃতিস্তর হইতে কিছুতেই তাহাদের উদ্ধার করিতে পারি না। টিসিনসের যুদ্ধে হানিবল কর্তৃক আহত হইয়া কর্নিলিয়াস সিপিও অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হইলে, তাঁহার সপ্তদশবর্ষীয় বালক সিপিও পিতার দেহ বহন করিয়া শিবিরে আনয়ন করিয়াছিল। এজ্‌হিলের যুদ্ধে প্রথম চার্লসের বৃদ্ধ সেনাপতি লিণ্ডসে পার্লিয়ামেণ্ট সৈন্য-কর্তৃক আহত হইলে, তাঁহার দ্বাত্রিংশবর্ষবয়স্ক পুত্র লর্ড উইলোবী পিতাকে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। নীলনদের ভীষণ সমরে বালক ক্যাসাবিয়াঙ্কা পিতার আদেশ প্রতিপালনের জন্য প্রজ্বলিত অগ্নিরাশির মধ্যে জীবন বিসর্জন দিয়াছিল। এই সমস্ত অদ্ভুত কাহিনী পাশ্চাত্য সাহিত্যে বর্ণিত ও কবিতায় গীত হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের নবমবর্ষীয় বালক জালিমের কথা কেহ অবগত আছে কিনা জানি না। কেবল যে-স্থানে তাহার অদ্ভুত বীরত্ব প্রকাশিত হইয়াছিল, গিরিয়া-প্রান্তরের সেই স্থানকে আজিও লোকে জালিমসিংহের মাঠ বলিয়া থাকে; কিন্তু জালিমসিংহের বিবরণ কেহই অবগত নহে। বিস্মৃতির ঘনীভূত অন্ধকার আমাদিগের উজ্জ্বল রত্নরাজিকে চিরদিনের জন্য আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। জানি না, কোন কালে তাহাদের উদ্ধার হইবে কিনা!

---

২ জালিমকে স্কন্ধে লইয়া যাওয়ার কথা কেবল রিয়াজ গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে (Riyaz-us-salatin, p. 322.)

আলিবর্দীর বেগম[১]

যাঁহারা কার্যের পসরা মাথায় লইয়া সংসারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং যাঁহাদের জীবন-তরণী অনন্তপ্রবাহ কর্মসাগরে প্রতিনিয়ত ভাসমান হইতে থাকে, তাঁহাদের ভাগ্যে যদি এক এক জন উপযুক্ত সঙ্গীর মিলন ঘটে, তাহা হইলে সেই সকল কর্মবীরদিগের জীবন তাদৃশ কষ্টকর বোধ হয় না। মহাশ্মশানে শবসাধনের ন্যায় তাঁহারা সংসারের সমস্ত আসাধ্য সাধন করিতে পারেন। যখন ক্লান্তি বা বিভীষিকা আসিয়া হৃদয় আচ্ছন্ন করে, তখনই উত্তরসাধকগণের "মা ভৈষীঃ মা ভৈষীঃ" রব তাঁহাদের হৃদয়ে আবার শক্তির সঞ্চার করিয়া দেয় এবং উৎসাহের প্রতপ্ত মদিরাপানে তাঁহারা পুনর্বার সিদ্ধিলাভে অগসর হইতে থাকেন। আবার যদি সেই সহায়তা জীবনের চিরসহচরী সহধর্মিণী হইতে লাভ হয়, তাহা হইলে সুখের আর সীমা থাকে না। যিনি গৃহ-কার্যের সঙ্গিনী, তিনি যদি পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দুঃসাধ্য কর্মের সহায়তার জন্য প্রস্তুত হন, তাহা হইলে কে এই সংসার-মহাশ্মশানে শবসাধনে প্রবৃত্ত না হয়? কে-ই বা কর্ম-মহাপারাবারে আপনার জীবন-তরণী চির-ভাসমান করিতে ইচ্ছা না করে? যাঁহারা শক্তিস্বরূপিণী, তাঁহারা যদি সেই শক্তি চির-অন্তর্হিত না রাখিয়া পতিশক্তির সহিত মিলাইয়া দেন, তাহা হইলে, জগতে এমন কোন্ অসাধ্য কর্ম আছে, যাহা সাধিত হইতে না পারে? যেখানে পতিশক্তি ও পত্নীশক্তির পূর্ণবিকাশ ঘটিয়াছে, সেইখানে অভূতপূর্ব ঘটনাসকল সংঘটিত হইয়াছে। জগতে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

পাশ্চাত্য জগতে কত কত দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও রাজনীতিবিদের জীবনে এই উভয় শক্তির মিলন দেখা গিয়াছে। অনেক ধর্মবীর ও কর্মবীর এই পবিত্র আশীর্বাদ লাভ করিয়াছেন। ভারতরমণী সাধারণতঃ গৃহাধিষ্ঠাত্রী হইলেও, সময়ে কর্মবীর পতিদিগের সহায়তা করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহারা পতির সহিত অরণ্যে ও পর্বতে ভ্রমণ করিয়া, তাঁহাদের দুঃখকষ্টে সঙ্গিনী হইয়াছেন ও তাঁহাদিগকে কর্তব্যকার্যে উৎসাহ দিয়া আপনাদিগের পবিত্র নাম চিরপূজ্য করিয়া গিয়াছেন। রামায়ণ-মহাভারত হইতে রাজস্থানের ইতিবৃত্ত পর্যন্ত অনেক স্থলে এরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা সম্রাজ্ঞী পদে বৃতা হইতেন, তাঁহারা রাজকার্যেও সময়ে সময়ে পতিকে পরামর্শ প্রদান করিতে ত্রুটি করিতেন না। ভারতরমণীগণ গৃহিণী হইয়াও সচিব ও সখীর ন্যায় কার্য করিয়াছেন। তাই কালিদাসের মধুর কবিতায় তাঁহারা "গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ, প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ" বলিয়া চিত্রিতা হইয়াছেন। আর রাজস্থানের ইতিবৃত্তে তাঁহারা যথার্থ শক্তিরূপিণী হইয়া আপনাদিগের মহাশক্তির ক্রীড়া দেখাইয়াছেন এবং স্বদেশ ও স্বধর্মরক্ষার জন্য পতির সহায়তা করিয়া, অবশেষে চিতানলে পবিত্র দেহ ভস্মীভূত করিয়াছেন। যে-মহাপুরুষ

১ বেগম শরফ্-উন্-নিসা।

হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য ভারতে অবতীর্ণ হইয়া মোগলদর্প চূর্ণীকৃত করিয়াছিলেন, সেই দেবতুল্য পুণ্যশ্লোক শিবাজীর রাজনৈতিক জীবনেও তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর সহায়তার কথা শুনা যায়। ফলতঃ কি ভারতে,—কি ইউরোপে সর্বত্রই রাশি রাশি মহত্তর ও কষ্টতর কার্যে পতিশক্তির ও পত্নীশক্তির মিলন দেখা গিয়াছে।

পুরুষ চিরকাল রাজনীতির সেবক হইয়া থাকেন। রমণী সাধারণতঃ সেই কঠোর তত্ত্বে মনোনিবেশ করিতে চাহেন না। কিন্তু অনেক সম্রাট্ ও রাজনীতিবিদ্‌গণের জীবনে তাঁহাদিগের সহধর্মিণীরও প্রতিভার ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। নবাব আলিবর্দী খাঁর ন্যায় রাজনীতিবিৎ পুরুষ বাঙ্গলার সিংহাসনে অতি অল্পই উপবেশন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। দুর্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দমন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলারাজ্যের প্রজাদিগকে শান্তির হিল্লোলে ভাসাইয়া, তিনি রাজনীতির চূড়ান্ত পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

এরূপ কথিত আছে যে, সুচতুর রাজনীতিবিৎ নিজাম উল্ মোল্ক অনেক সময়ে আলিবর্দী খাঁর রাজনীতিকৌশলে চমৎকৃত হইতেন এবং তাঁহাকে প্রতিদ্বন্দ্বিস্বরূপ মনে করিয়া, সময়ে সময়ে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে উত্তেজিত করিতেন। আলিবর্দীকে মুর্শিদাবাদ বা বাঙ্গলার আকবর বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। মুর্শিদাবাদের নবাবদিগের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানের প্রতি সম্প্রীতি দেখাইয়া, মহাবিপ্লবমধ্যেও শান্তভাবে প্রজা-পালন করিতে তাঁহার ন্যায় আর কেহই সমর্থ হন নাই। তাঁহার প্রভু ও পূর্ববর্তী নবাব সুজা উদ্দীন এই হিন্দু-মুসলমানের প্রতি সম্প্রীতির সূচনা করিয়া যান এবং আলিবর্দী খাঁ তাহা সম্পূর্ণরূপে কার্যে পরিণত করেন। সেই কর্মবীর আলিবর্দী খাঁর রাজনৈতিক জীবন তাঁহার প্রিয়তমা মহিষীর সহায়তায় পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। আলিবর্দীর উচ্ছৃঙ্খল সংসার যেমন এই মহীয়সী মহিলার তর্জনীতাড়নের অধীন ছিল, সেইরূপ বিপ্লবসাগরে নিমগ্ন সমগ্র বঙ্গরাজ্যের শাসনও তাঁহারই পরামর্শানুসারে চালিত হইত। জ্ঞান, ঔদার্য, পরহিতেচ্ছা ও অন্যান্য সদ্‌গুণে তিনি রমণীজাতির মধ্যে অতুলনীয়া ছিলেন। রাজ্যের যাবতীয় হিতকর কার্য তাঁহারই পরামর্শের উপর নির্ভর করিত।

একজন ইংরেজ লেখক বলিয়াছেন যে, নিষ্ঠুর ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক কার্য ব্যতীত রাজ্যের প্রায় প্রত্যেক প্রধান ও গুরুতর কার্যে নবাব তাঁহারই পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ঐ সমস্ত নিষ্ঠুর কার্যে তাঁহার অত্যন্ত ঘৃণা ছিল এবং তিনি বলিলেন যে, ঘৃণ্য ও নৃশংস পন্থা অবলম্বন করিলে তাঁহার বংশ নিশ্চয়ই ধ্বংসমুখে পতিত হইবে।[২] যদিও

২ "A woman whose wisdom, magnanimity, benevolence, and every amiable quality, reflected high honour on her sex and station. She much influenced the Userper's councils, and was ever consulted by him in every material movement in the state, except when sangui-

ঐ সমস্ত কার্যে তাঁহার অনিচ্ছা ছিল, তথাপি বিশেষ কোন প্রয়োজন হইলে, তিনিও সময়ে সময়ে তাহাতে সম্মতি প্রদান করিতেন। ইহাতে তাঁহার রাজনীতিজ্ঞানেরই বিশেষরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণতঃ তিনি ঐ সকল পন্থার বিরোধিনীই ছিলেন। আলিবর্দী খাঁ কদাচ তাঁহার কথা অমান্য করিতেন না। তাঁহার জ্ঞান ও দূরদর্শিতা এত দূর বিস্তৃত ছিল যে, নবাব সর্বদা বলিতেন যে, নবাববেগমের সিদ্ধান্ত ও ভবিষ্যদ্বাণী কদাচ অন্যথা হইবার নহে।[৩] তিনি কেবল মুর্শিদাবাদের রাজপ্রাসাদস্থিত পর্যঙ্কোপরি উপবেশন করিয়া সুরম্য ভাগীরথীশোভা সন্দর্শনে জীবন যাপন করিতেন না। কিন্তু নবাবের সহিত ভয়াবহ মহারাষ্ট্রীয় ও আফগানসমরে উপস্থিত থাকিয়া, তাঁহার মনে সর্বদা উৎসাহের সঞ্চার করিয়া দিতেন। রণক্ষেত্রের ভীষণ দৃশ্য তাঁহার মনে রমণীজনসুলভ ভীতির সঞ্চার না করিয়া উৎসাহ ও আনন্দ আনয়ন করিত। নবাবের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়া তিনি কোন কোন সময়ে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন। তথাপি স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া একাকিনী প্রাসাদ-প্রকোষ্ঠে অবস্থান করেন নাই। আমরা তাঁহার এক সময়ের বিপদের কথা উল্লেখ করিতেছি।

যৎকালে মহারাষ্ট্রীয়গণ স্বর্ণপ্রসবিনী বঙ্গভূমির অতুল ঐশ্বর্যের কথা শুনিয়া বাঙ্গলা রাজ্য মন্থন করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল, সেই সময়ে নবাব তাহাদিগকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে উড়িষ্যা হইতে বর্ধমানাভিমুখে অগ্রসর হন। সে যুদ্ধে নবাবের সহিত নবাববেগমও উপস্থিত ছিলেন। বেগম 'লণ্ডা' নামে এক হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, সেই ভয়ঙ্কর সমরসাগরের উত্তাল তরঙ্গে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ সেই হস্তীকে ধৃত করিয়া নবাববেগমকে বন্দী করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু নবাবের জনৈক সেনাপতি ওমর খাঁর পুত্র মোসাহেব খাঁ অসীম বীর্যবত্তা দেখাইয়া সেই কৃতান্তদূতদিগের হস্ত হইতে হস্তী ও বেগমের উদ্ধারসাধন করেন।[৪] এইরূপ আরও অনেক স্থলে তিনি রণক্ষেত্রের অসীম কষ্ট অকাতরে সহ্য করিয়াছেন। তথাপি কখনও হৃদয়দৌর্বল্য দেখাইয়া গৃহকোণে অবস্থিতি করেন নাই। যদিও তৎকালে বাদশাহ ও নবাবগণ আপন আপন বেগমদিগকে লইয়া অনেক সময়ে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতেন, তথাপি এরূপ

nary and treacherous measures were judged necessary, which he knew she would oppose as she ever condemned them when perpetrated however successful,—predicting always that such politics would end in the ruin of his family." [Holwell's Interesting Historical Events, Pt. I, Chap. II, pp. 170-71].

৩ "Her wisdom and foresight was so great and extensive, that it was commonly said be the Userper : "He never knew her judgment or prediction fail." (ibid, Pt. I, p. 176.)

৪. Riyaz-us-salatin, p. 339.

নির্ভীকচিত্তে রণোল্লাসের আনন্দোপভোগের কথা আমরা সকল স্থলে জানিতে পারি না। রাণা রাজসিংহের সৈন্যহস্তে বন্দী হইয়া বাদশাহ আরঙ্গজেবের বেগমেরা আর্তনাদে আকাশ বিদীর্ণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু দুর্দমনীয় মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে বহুবার কষ্ট ভোগ করিয়াও কখন সেই মহীয়সী মহিলার হৃদয় বিচলিত হয় নাই।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, রাজ্যসংক্রান্ত যাবতীয় প্রধান প্রধান কার্যে নবাববেগমের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। দুই একটি ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত তাঁহার সেই সম্বন্ধের উল্লেখ করা যাইতেছে। সকলেই অবগত আছেন যে, নবাব আলিবর্দী খাঁর সময়ে বঙ্গরাজ্য বারংবার মহারষ্ট্রীয়গণ-কর্তৃক আক্রান্ত হয়। তিনি তাহাদিগের অত্যাচারে জর্জরিত এবং অনন্যোপায় হইয়া বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক রগুজী ভোঁসলার সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতকে মনকরার ময়দানে নিহত করেন। ভাস্কর পণ্ডিতের মৃত্যুশ্রবণে রঘুজী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অবশেষে স্বয়ং সসৈন্যে বাঙ্গলায় আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি প্রথমে উড়িষ্যায় আগমন করেন এবং তথাকার শাসনকর্তা দুর্লভরামকে বন্দী করিয়া, বীরভূম প্রদেশ দলিত করিতে করিতে বিহারে উপস্থিত হন। তথায় বিদ্রোহী আফগান সৈন্যদিগের সহিত তাঁহার মিলন সংঘটিত হয়। বিহারের নবাবের সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের ঘোরতর যুদ্ধ ঘটে। ক্রমাগত যুদ্ধে উভয় পক্ষই অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া উঠে। বিশেষতঃ নবাবের অনেক আফগানসৈন্য উৎসাহসহকারে যুদ্ধ না করিয়া, বিদ্রোহী আফগানদিগের সহিত মিলিত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। নবাব আফগানদিগের ব্যবহারে অত্যন্ত মর্মাহত হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন। সম্মুখে ভীষণ শত্রুগণ সর্বধ্বংসসূচক হুঙ্কার ছাড়িতেছে এদিকে নিজ সৈন্যগণ বিশ্বাঘাতকতাপূর্বক তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত, এরূপ অবস্থায় নবাবের মন অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। এক দিন সহসা তিনি অন্তঃপুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নবাব-বেগমের সম্মুখে উপবিষ্ট হইলেন। নবাব-বেগম তাঁহাকে বিষণ্ণচিত্ত দেখিয়া অনুযোগ করিলেন। অনন্তর নবাবের বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, নবাব বলিলেন যে, আমি আমার লোকদিগের মধ্যে অন্যরূপ ভাব দেখিতেছি, কেন যে এ-সকল ব্যাপার ঘটিতেছে, বলিতে পারি না। নবাব-বেগম এই কথা শুনিয়া নিজেই মজঃফর আলি খাঁ ও ফকীর আলি খাঁ নামক দুই ব্যক্তিকে রঘুজীর নিকট দূতস্বরূপ পাঠাইয়া দেন।[৫] যাহাতে উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়, তাহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহারা মহারাষ্ট্রীয়দিগের পথপ্রদর্শক ও নবাবের প্রবল-শত্রু মীর হাবীবের নিকট উপস্থিত হইলে, মীর হাবীব তাঁহাদিগকে

৫ Seir Mutaqherin Trans., Vol. I, p. 522.

ইতিপূর্বে যে-সময়ে আলিবর্দী সরফরাজের ভগিনীপতি মুর্শিদকুলীখাঁর নিকট হইতে উড়িষ্যা অধিকার করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন সেই বালাসোরেরর যুদ্ধেও বেগম নবাবের পার্শ্বে ছিলেন। (Riaz, p. 329)

রঘুজীর নিকট লইয়া যান। রঘুজীও পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে পরিক্রান্ত হইয়া মনে মনে সন্ধিস্থাপনে উৎসুক হইলেও মীর হাবীব তাহাতে বাধা দিয়া তাঁহাকে আলিবর্দীর বিরুদ্ধে বারংবার উত্তেজিত করেন। মীর হাবীবের উত্তেজনায় রঘুজী সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া, মুর্শিদাবাদ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইলেন। রঘুজীকে সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতে দেখিয়া, নবাব ও বেগমের পরামর্শানুসারে পুনর্বার নবাবসৈন্যগণ মহারাষ্ট্রীয়দিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল এবং তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।

মহারাষ্ট্রীয়গণ যেরূপ নবাব আলিবর্দী খাঁকে ব্যাকুল করিয়াছিল, সেইরূপ কতিপয় আফগান সেনানীও তাঁহাকে কিছুদিন অশান্তির হিল্লোলে ভাসমান করিয়া তুলে। তাঁহার প্রধান সেনাপতি মোস্তাফা খাঁ, সমশের খাঁ প্রভৃতি বিদ্রোহী হইয়া বিহার প্রদেশে অত্যন্ত গোলযোগ ঘটাইয়াছিল। মোস্তাফা খাঁ প্রথমে হত হয়। তাহার পর আফগানেরা কথঞ্চিৎ ভগ্নোদ্যম হইয়া কৌশলপূর্বক নবাবের রাজ্যে নানারূপ উৎপাত করিতে থাকে। আলিবর্দীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা এবং সিরাজউদ্দৌলার পিতা জৈনুদ্দীন তৎকালে বিহারের শাসনকর্তার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আফগানেরা কথঞ্চিৎ শান্তভাব অবলম্বন করায়, জৈনুদ্দীন তাহাদিগকে নিজ সৈন্যগণের অন্তর্ভূত করিতে ইচ্ছা করেন। আফগানেরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত বিষয়ের বন্দোবস্ত করিতে স্বীকৃত হয়। পরে তাহারা দরবারগৃহে জৈনুদ্দীনের সহিত সাক্ষাতের ছলে তাঁহাকে সেই স্থানে নিহত করিয়া, তাঁহার পরিবারবর্গের যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা করে। তাহারা জৈনুদ্দীনের স্ত্রী আমিনা বেগম ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মহিলাদিগকে উন্মুক্ত শকটে আরোহণ করাইয়া, প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া সমস্ত নগর প্রদক্ষিণ করায় এবং জৈনুদ্দীনের পিতা ও আলিবর্দীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজী আহমদকে অশেষবিধ কষ্ট প্রদান করিয়া নিহত করে। ক্রমে সমস্ত বিহার প্রদেশ তাহাদের করতলগত হয়।

নবাব এই সংবাদশ্রবণে হৃদয়ে এতদূর আঘাত প্রাপ্ত হন যে, আফগানদিগের দমনের কি উপায় করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। তিনি নিজ প্রাণপ্রিয় জামাতা জৈনুদ্দীনের ও জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার তাদৃশ শোচনীয় পরিণামে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। স্নেহপুত্তলী কন্যা, দৌহিত্র ও দৌহিত্রীগণের নির্যাতন ও অবমাননায় নবাব স্ত্রীলোকের ন্যায় কাতর হইলেন ; তাহার উপর পাটনা ও সমস্ত বিহারের দুর্দশার স্মৃতি তাঁহাকে আরও অভিভূত করিয়া ফেলিল। সেই সময়ে তাঁহার সেই মহীয়সী মহিষীর উপদেশালোক পুনরায় তাঁহার হৃদয়াকাশ হইতে বিষাদ-মেঘ দূরীভূত করিতে আরম্ভ করিল। তিনি নবাবকে নিতান্ত নিস্তেজ ভাবে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া, তাঁহাকে আফগানদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। যাহাতে কন্যা, দৌহিত্র ও দৌহিত্রীগণের উদ্ধার সাধন হয়, তজ্জন্য প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বন করিতে

৬ Holwell's Interesting Historical Events, Pt. I, p. 170.

পরামর্শ দিলেন। তিনি নবাবের হৃদয়দৌর্বল্যের যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিয়া, যাহাতে তাঁহার মনে শত্রুদমনের ইচ্ছা বলবতী হয়, তজ্জন্য তাঁহাকে অবিরত প্রোৎসাহিত করিতে লাগিলেন। বেগমের উত্তেজনায় নবাব প্রবুদ্ধ হইয়া, আফগানদিগের দমনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং আপনার সৈন্যদিগকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগের নিকট সমস্ত কথা ব্যক্ত করিলেন। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া, স্রোতস্বিনীর মহা-প্রবাহে ভাসমান মুষ্টিমেয় আফগান তৃণগুচ্ছকে ভাসাইবার জন্য প্রবলবেগে ধাবিত হইলেন। তাঁহার যুদ্ধ-কৌশলে অচিরাৎ আফগানগণ বিধ্বস্ত হইয়া গেল। নবাব আপনার কন্যা, দৌহিত্র ও দৌহিত্রীগণের উদ্ধার-সাধন করিয়া আফগানদিগের পরিবার-গণের প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখাইয়া, যুগপৎ আপনার শৌর্য ও মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান করিলেন। নবাব-বেগম যদি আলিবর্দী খাঁকে আফগানদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত না করিতেন, তাহা হইলে, তিনি শোকে এত দূর অভিভূত হইয়া পড়িতেন যে, সহসা শত্রুদিগকে দমন করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ।

নবাব-বেগম এইরূপ অনেক স্থলে নবাবের হৃদয়দৌর্বল্যের অপনোদন করিয়া, তাঁহাকে উৎসাহসহকারে কার্যে ব্রতী করিতেন। কি মহারাষ্ট্রীয় সমরে, কি আফগান-যুদ্ধে সর্বত্রই তিনি উপস্থিত থাকিয়া নবাবকে নানারূপ পরামর্শ দিতেন এবং সময়ে সময়ে স্বয়ং অনেক কার্যের ভার লইয়া নবাবের কষ্টের ভার লঘু করিয়া তুলিতেন। যেখানে কোন গুরুতর কার্যে নবাব নিরুৎসাহপ্রায় হইতেন, নবাব-বেগম আপনি সেই স্থলে নবাবকে উত্তেজিত করিয়া সেই কার্যের জন্য তাঁহাকে উৎসাহিত করিতেন। নবাব আলিবর্দী খাঁর রাজত্বের অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা এইরূপে নবাব-বেগমের সহিত গাঢ়ভাবে বিজড়িত রহিয়াছে। নবাব-বেগমের এই অসাধারণ প্রতিভার জন্য আলিবর্দী খাঁ রাজধানী হইতে তাঁহার অনুপস্থিতি কালে অনেক সময়ে বেগমের প্রতি রাজকার্যের ভার প্রদান করিতেন, তজ্জন্য তিনি বাদশাহদরবার হইতে আদেশ লইয়াছিলেন। এই সময় হইতে মুর্শিদাবাদের গদিনসীন-বেগমপদের সৃষ্টি হয়।

নবাব আলিবর্দী খাঁর রাজনৈতিক জীবন যেরূপ অনেক পরিমাণে তাঁহার বেগমের সহায়তার উপর নির্ভর করিত, সেইরূপ তাঁহার প্রিয়তম দৌহিত্র সিরাজের জীবনও বাল্যকাল হইতে সেই আদর্শ মহিলার হস্তে গঠিত হইয়াছিল। সিরাজ শৈশবাবস্থা অবধি তাঁহাদের নিকট অবস্থিতি করিতেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে মহারাষ্ট্রীয় ও আফগান সমরে উপস্থিত থাকিয়া, অনেক-পরিমাণে সুশিক্ষিত ও কষ্টসহিষ্ণু হইয়া-ছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি এরূপ চঞ্চল ও বিলাসপরায়ণ ছিল যে, আলিবর্দী খাঁ ও নবাব-বেগমের সহস্র শিক্ষাসত্ত্বেও তাহা একেবারে কুপথ পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। তথাপি সিরাজের জীবনে আলিবর্দী ও তাঁহার বেগমের শিক্ষার অনেক সুফল দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের শিক্ষাবলে অনেকস্থলে সিরাজ মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন। সিরাজ চঞ্চলপ্রকৃতি ও বিলাসপ্রিয় হইলেও ইতিহাসে তাঁহাকে যেরূপ

শয়তানের অবতার বলিয়া চিত্রিত করা হয়, তিনি সেরূপ কলুষিত-প্রকৃতি ছিলেন না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। আদর্শ রাজনীতিবিদ আলিবর্দী ও তাঁহার প্রতিভাশালিনী মহিষীর স্বহস্তগঠিত সিরাজ-জীবন কদাচ একেবারে ঘৃণার্হ হইতে পারে না। স্থানান্তরে আমরা এ বিষয়ের আলোচনা করিব।

ঐতিহাসিকেরা একটি ঘটনার জন্য সিরাজকে যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহার কারণ জানিতে পারিলে, কেহই সিরাজকে তজ্জন্য বিশেষরূপে দোষী করিবেন না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। ঐতিহাসিকগণ কেবল সেই ভীষণ ঘটনাটি লোকসমক্ষে উপস্থিত করিয়া মনের আবেগে সিরাজকে নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহার মূল অনুসন্ধান করিয়া দেখেন নাই; অথবা তাহা গোপন করিয়া সাধারণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়াছেন। সাধারণ ইতিহাসপাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে, সিরাজউদ্দৌলা নৃশংসভাবে হোসেন কুলী খাঁর প্রাণবধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার কারণ কি, সম্ভবতঃ তাহা সকলের জানিবার সুযোগ ঘটে নাই। আমরা ইহার কারণ নির্দেশ করিতেছি। কারণটিও সেই নৃশংস হত্যা অপেক্ষা কোন অংশে অল্প গুরুতর নহে।

আলিবর্দী খাঁ ও তাঁহার বেগমের ন্যায় মহিলা যে-সংসারের কর্তা ও কর্ত্রীস্বরূপ ছিলেন, দুঃখের বিষয়, সেই সংসারে ব্যভিচার ও পাপ প্রবেশ করিয়া, তাঁহাদের হৃদয়ে সর্বদা সহস্র বৃশ্চিকদংশনের যন্ত্রণা প্রদান করিত। বলিতে দুঃখ ও লজ্জা বোধ হয় যে, আলিবর্দী খাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা ঘসেটী ও আমিনা আপনাদিগের পবিত্র চরিত্র রক্ষা করিতে পারেন নাই। ঘসেটী অনেক দিন হইতে পাপপথে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। জৈনুদ্দীনের মৃত্যুর পর আমিনাও ভগিনীর পথের অনুসরণ করেন। এই আমিনাই সিরাজের মাতা। দুই ভগিনীই হোসেনকুলী খাঁর প্রণয়ভাগিনী হইয়া উঠেন। হোসেনকুলী খাঁ ঘসেটীর স্বামী ও আলিবর্দীর ভ্রাতুষ্পুত্র নওয়াজেস মহম্মদ খাঁর সহকারী ছিলেন। নওয়াজেস মহম্মদ খাঁ ঢাকার শাসনকর্তৃত্বপদ লাভ করেন। তিনি বরাবরই হোসেনকুলী খাঁকে বিশ্বাস করিতেন ও ভালবাসিতেন। সেইজন্য হোসেনকুলী খাঁ ঘসেটী বেগমের সহিত প্রণয় স্থাপন করিয়া, প্রভুর ভালবাসা ও বিশ্বাসের প্রতিশোধ দিয়াছিলেন। এই প্রণয় বহুদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু অবশেষে ঘসেটী ও হোসেনকুলী খাঁর মধ্যে মনোবিবাদের সৃষ্টি হয়। এই মনোবিবাদের কারণই আমিনা বেগম। আমিনা স্বামীর মৃত্যুর পর মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলে, হোসেনকুলী খাঁ তাঁহার সহিত প্রণয় স্থাপন করেন। এইজন্য তাঁহার উপর ঘসেটীর অত্যন্ত ক্রোধ উপস্থিত হয়। কন্যাগণের কুপথগমনের কথা জ্ঞাত হওয়া অবধি নবাব-বেগম তাহা নিবারণের জন্য অশেষরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। ক্রমে যখন তাঁহাদের গুপ্ত প্রণয়ের কথা লইয়া সমস্ত মুর্শিদাবাদে আন্দোলন উপস্থিত হইল, তখন নবাব-বেগম আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা পূর্বে সচ্চরিত্রা থাকিয়া এক্ষণে অধঃপাতের দিকে অগ্রসর

হইতেছে দেখিয়া এবং হোসেনকুলী খাঁকেই সেই অধঃপতনের কারণ জানিয়া তিনি তাহার প্রতিবিধানে যত্নবতী হইলেন।

সিরাজ স্বীয় জননীর কলঙ্কের কথা শুনিয়া অবধি মর্মাহত হইয়াছিলেন এবং হোসেনকুলী খাঁকে প্রতিফল দিবার জন্য প্রতিনিয়ত চিন্তা করিতেছিলেন। নবাব-বেগম এক্ষণে উপায়ান্তর না দেখিয়া, আপনার সংসারের পরম শত্রু হোসেনকুলী খাঁর বিনাশসাধনের জন্য সিরাজকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। হলওয়েল সাহেব নবাব-বেগমকে যে-নিষ্ঠুর কার্যের পরামর্শ হইতে সর্বদা বিরত থাকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, এস্থলে আমরা তাহার অন্যথা দেখিতে পাই। নবাব-বেগম এ বিষয়ে নবাব আলিবর্দী খাঁর সহিত পরামর্শ করিলে, উভয়ের পরামর্শে হোসেনকুলীর প্রাণবধ করাই স্থির হইল। কিন্তু হোসেনকুলী খাঁ নওয়াজেস্ মহম্মদের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র; এজন্য এ বিষয়ে তাঁহার মত লওয়ার প্রয়োজন হইয়া উঠিল। নবাব-বেগম নিজেই তাঁহার উপায় করিলেন। নবাব-বেগম হোসেনকুলীর প্রতি ঘসেটীর ক্রোধ জানিতে পারিয়া উক্ত খাঁর বধের জন্য নওয়াজেস্ মহম্মদের মত করিতে ঘসেটীকেই নিযুক্ত করেন।[৭] চরিত্রহীনা রমণী যখন স্বীয় প্রণয়পাত্রকে অপরের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী দেখে, তখন হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়; এমন কি, ক্রোধ ও হিংসার বশীভূত হইয়া সেই প্রণয়পাত্রেরই মৃত্যুকামনা পর্যন্ত করিতে ত্রুটি করে না। বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহে জেবউন্নিসা চরিত্র এইরূপ ভাবেই চিত্রিত হইয়াছে। অবশেষে নওয়াজেস্ নানাপ্রকারে বাধ্য হইয়া মত প্রদান করিলে, নবাব আলিবর্দী খাঁ স্বীয় দোষক্ষালনের জন্য শিকারচ্ছলে রাজমহলে গমন করিলেন। নবাব-বেগম তাহার পর সিরাজকে হোসেনকুলী খাঁর নিধনের জন্য আদেশ দেন। এইজন্য সিরাজ হোসেনকুলী খাঁর হত্যাকাণ্ড সম্পাদন করেন।

প্রচলিত ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সিরাজ স্বহস্তে হোসেনকুলী খাঁর প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না।[৮] যে ব্যক্তি অবৈধ উপায়ে নিজ জননীকে কুপথগামিনী করে, কে তাহাকে অক্ষতশরীরে জীবিত দেখিতে পারে? যাহার জন্য নিজবংশ চির কলঙ্কিত হইয়া উঠে, কে তাহার নিঃসংকোচে কালযাপন সহ্য করিয়া থাকে? এই সিরাজ-কর্তৃক হোসেনকুলী খাঁর বধসাধন ঘটিয়াছিল। যে নবাব-বেগমকে দেশীয় ও ইউরোপীয়গণ সহস্রকণ্ঠে

৭ Seir Mutaqherin Trans., Vol. I, p. 647.

৮ মুতাক্ষরীনের ইংরেজী অনুবাদে লিখিত আছে যে, সিরাজ হোসেনকুলী খাঁকে বধ করিতে আদেশ দেন। "He (Siraz) ordered his being hacked to pieces, and he was hacked accordingingly." (Mutaqherin Trans., Vol. I, p. 649.) মূল মুতাক্ষরীনে লেখা আছে, হোসেনকুলী তীর, লেঙ্গা, তরবারি ও গালির নিশানা হইয়াছিল। ইহাতেও সিরাজের স্বহস্তে হোসেন কুলীর বিনাশের কথা বুঝা যায় না। মূল মুতাক্ষরীন্, ১৯২ পৃঃ)।

প্রশংসা করিয়াছেন, তিনি সিরাজউদ্দৌলাকে এই কার্যে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। নবাব আলিবর্দী খাঁরও ইহা অবিদিত ছিল না। তবে কি কারণে কেবল সিরাজই ঐতিহাসিকগণের নিকট দোষী হইলেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। জানি না, সভ্য অথবা অসভ্য জাতির মধ্যে কেহ স্বীয় জননীর ধর্মধ্বংসকারীকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে কিনা? সিরাজ ইহার জন্য ঐতিহাসিকগণের নিন্দার পাত্র হইতে পারেন, কিন্তু আমরা এ স্থলে তাঁহাকে বিশেষরূপে দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন করার কোন কারণ দেখিতে পাই না।

নবাব আলিবর্দী খাঁর মৃত্যুর পরে সিরাজউদ্দৌলা বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, আপনার জ্যেষ্ঠতাতপত্নী ও মাতৃস্বসা ঘসেটী বেগমের মোতিঝিলের প্রাসাদ আক্রমণ করিতে লোক প্রেরণ করেন। ঘসেটী বরাবরই সিরাজের বিরোধিনী ছিলেন এবং যাহাতে সিরাজ সিংহাসনে আরোহণ করিতে না পারেন, তজ্জন্য তাঁহার দেওয়ান রাজা রাজবল্লভের দ্বারা ইংরেজদিগের সহিত যুক্তি করিতেন। আলিবর্দী সে কথা বুঝিতে পারিয়া, ইংরেজদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং তাহাদিগকে দমন করার জন্য সিরাজকে মৃত্যুশয্যায় উপদেশ দিয়া যান। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই সিরাজ ঘসেটীর মোতিঝিলের প্রাসাদ আক্রমণ করেন। আলিবর্দীর বেগম এই বিবাদ মিটাইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি ও জগৎশেঠ ঘসেটীকে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করেন। ঘসেটী প্রথমে স্বীকৃত হন; কিন্তু অবশেষে সিরাজ তাঁহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে মোতিঝিলের প্রাসাদ হইতে বন্দী করিয়া আনেন। ইহার পর ইংরেজদিগের সহিত সিরাজের ঘোরতর বিবাদ আরম্ভ হইলে, সিরাজ কলিকাতা আক্রমণ করিলেন। হলওয়েল সাহেব অন্ধকূপ হইতে বহির্গত হইয়া মুর্শিদাবাদে আনীত হইলেন। তথায় কিছুদিন বন্দী-ভাবে অবস্থানের পর, এক দিন সিরাজের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, সিরাজ তাঁহাদিগকে নিষ্কৃতি দিবার অনুমতি দেন।

হলওয়েল সাহেব বলেন যে, আলিবর্দীর বেগম নাকি তাঁহাদিগের মুক্তির জন্য সিরাজকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। হলওয়েল লিখিয়াছেন যে, যখন তাঁহারা মুর্শিদাবাদে বন্দী-অবস্থায় ছিলেন, সেই সময়ে এক দিন প্রাতঃকালে আলিবর্দীর বেগমের এক জন পরিচারিকাকে তাঁহাদের প্রহরী শেখের সহিত এইরূপ বলাবলি করিতে শুনেন যে, পূর্ব দিন খানার সময় বেগম ইংরেজদিগকে ছাড়িয়া দিবার জন্য নবাবকে বলিয়াছেন।[১] তাহার পর তাঁহারা আবার অবগত হন যে, তাঁহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া পুনর্বার কলিকাতায় যাইতে হইবে। কিন্তু অবশেষে সিরাজউদ্দৌলার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে মুক্তি প্রদান করিতে আদেশ দেন। হলওয়েল আপনাদিগের প্রাণরক্ষার জন্য বেগমকে বারংবার ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন।

১ Holwell's India Tracts, p. 273.

হলওয়েল আরও এক স্থলে বলিয়াছেন যে, নবাব-বেগম সিরাজকে তাঁহার অযথা অত্যাচার হইতে নিবৃত্ত হইতে নিষেধ করিতেন ; কিন্তু সিরাজ তাঁহার সকল কথায় মনোযোগ দিতেন না। বেগম ইংরেজদিগের সহিত বিবাদ করিতে বারংবার নিষেধ করেন এবং উক্ত বিবাদে সিরাজের সর্বনাশ হইবার কথাও বলেন।[১০] পরন্তু হলওয়েল সাহেবের সমস্ত কথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

প্রচলিত ইতিহাসে দেখা যায় যে, নবাব আলিবর্দী খাঁ সিরাজকে ইংরেজদিগের সহিত বিবাদ করিতে নিষেধ করিয়া যান। কিন্তু সে কথা যথার্থ বলিয়া বোধ হয় না। তিনি ইংরেজদিগকে বিশেষরূপে দমনের জন্য মৃত্যুশয্যায় সিরাজকে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। আলিবর্দীর বেগম যে সে বিষয় জানিতেন না, ইহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। বিশেষতঃ রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁহার যতদূর দূরদর্শিতা ছিল, তাহাতে তিনি যে আলিবর্দীর মতের সম্পূর্ণ পক্ষপাতিনী ছিলেন, ইহাই আমাদের মনে উদয় হয়। সুতরাং ইংরেজদিগের সহিত সিরাজকে বিবাদ করিতে তাঁহার নিষেধ করা আমরা তাদৃশ সঙ্গত মনে করিতে পারি না। তবে সিরাজ যখন কোন নিষ্ঠুর বা গর্হিত পন্থা অবলম্বন করিতে যাইতেন, তখন তিনি তাঁহাকে সেই পন্থাবলম্বনে বাধা দিতেন বলিয়াই বোধ হয়। আমাদিগের বিশ্বাস, সিরাজ ইংরেজদিগের সহিত কখনও অসদ্ব্যবহার করেন নাই ; বরং তদানীন্তন ইংরেজরাই সাধুজনের বিপরীত ব্যবহার করিয়া সভ্য ইউরোপখণ্ডের নামে কলঙ্কপ্রদান করিয়াছেন। এস্থলে উক্ত বিষয়ে অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই।

ইংরেজদিগের সহিত বিবাদ গুরুতর হইয়া উঠিলে, সিরাজ কর্মচারিগণের বিশ্বাসঘাতকতায় পলাশীর রণক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া, অবশেষে মীরণের আদেশে নিহত হন এবং মীরজাফর বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার মসনদে উপবেশন করেন। এই সময় হইতে নবাব আলিবর্দী খাঁর পরিবারবর্গের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ হয়। যে বেগমের পরামর্শে নবাব আলিবর্দী খাঁ সমস্ত রাজনৈতিক কার্য সম্পন্ন করিতেন এবং যাঁহার পরামর্শবলে নবাব আলিবর্দী খাঁর আদর্শ-শাসনে বঙ্গের প্রজাগণ বিঘ্নরাশির মধ্যেও শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, যে অতুলনীয় রমণীরত্নকে দেশীয় ও বিদেশীয়গণ মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতেন, তাঁহারই অন্নে ও সংসারে প্রতিপালিত হইয়া মীরজাফরের পুত্র ছোট নবাব মীরণ তাঁহার প্রতি যেরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিতে গেলে, কষ্টে ও ঘৃণায় হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়ে। আলিবর্দীর বেগম ও তাঁহার কন্যাদ্বয় ঘসেটী ও আমিনা এবং সিরাজউদ্দৌলার স্ত্রী ও শিশু কন্যাকে অযথা কষ্ট প্রদান করিয়া বন্দীভাবে রাখা হয়। বন্দী-অবস্থায় তাঁহারা চূড়ান্ত যন্ত্রণা ভোগ করিলে, তাঁহাদিগকে মুর্শিদাবাদ হইতে ঢাকায় নির্বাসিত করা হইল। ঢাকায় তাঁহাদিগকে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় বাস করিতে হইয়াছিল।

১০ Holwell's Interesting Historical Events, Pt. I, p. 176.

মীরণ তাঁহাদিগের জীবিত থাকা অসহ্য মনে করিয়া, ঢাকার নায়েব যেশারৎ খাঁকে তাঁহাদের বিনাশের জন্য বারংবার লিখিয়া পাঠান ; কিন্তু যেশারৎ খাঁ এই নৃশংস ব্যাপারে অস্বীকৃত হওয়ায়, মীরণ নিজের একজন প্রিয়পাত্রকে উক্ত কার্যের জন্য এক পরওয়ানার সহিত ঢাকায় প্রেরণ করেন। নবাব আলিবর্দী খাঁর বেগম কোনরূপে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন।[১১] এবং সিরাজের বেগম ও কন্যাও অব্যাহতি পান। কিন্তু ঘসেটী ও আমিনা বেগমকে নৌকা করিয়া নদীগর্ভে নিক্ষেপ করা হয়। তাঁহারা মৃত্যুকালে মীরণকে বজ্রাঘাতে মরিবার জন্য অভিসম্পাত করিয়া যান এবং এইরূপ প্রবাদ আছে যে, মীরণের নাকি তাহাতেই মৃত্যু হইয়াছিল। কিন্তু মীরণের মৃত্যু সন্দেহজনক বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

ইহার পর আলিবর্দীর বেগমের বিষয় বিশেষরূপে অবগত হওয়া যায় না। এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, তিনি ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে পুনরানীতা হইয়াছিলেন এবং দেহত্যাগের পর খোশবাগে আলিবর্দী খাঁর পদতলে সমাহিতা হন।[১২] খোশবাগের সমাধির মধ্যে অনেকগুলির বিষয় ভাল করিয়া জানা যায় না। সুতরাং আলিবর্দী খাঁর সমাধিগৃহে তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর সমাধি আছে কিনা, তাহা আমরা যথার্থরূপে বলিতে পারি না। যদি তাঁহার মুর্শিদাবাদে মৃত্যু হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি যে স্বামীর পদতলে বা পার্শ্বে চিরনিদ্রিতা আছেন, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। কারণ তাঁহার ন্যায় আদর্শ মহিলা স্বামীর নিকট ভিন্ন অন্য স্থানে সমাহিত হইতে ইচ্ছা করিতে পারেন না।

১১ Holwell's India Tracts, pp. 40-42, also Vansittart's Narrative, Vol. I, p. 153.

১২ Sharaf-un-nisa and Lutf-un-nisa, and the latters young daughter escaped the violent watery grave which ended the sorrows of Ghasiti and Amina. They were released through the exertions of Lord Clive, theGovernor of Bengal and came back to Murshidabad. We find the seal of Shazaf-un-nisa among others, on an *arzi* submitted to the Governor in December 1765, begging to be granted a subsistance allowance." [*Calender of Persian Correspendence* i. 452 Letter No. 2761, received by the Governor General on 10th December, 1765]

Brajendranath Banerjee—*Begams of Bengal,* pp. 12, 36

ভগবান্‌গোলা

মুর্শিদাবাদ বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার কিরীটভূষিত হওয়ার বহু পূর্ব হইতে ভগবান্‌গোলা বাঙ্গলার মধ্যে একটি প্রধান স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। উত্তালতরঙ্গ-বাহিনী পদ্মার ক্রোড়স্থিত হওয়ায়, ভগবান্‌গোলা প্রতিনিয়ত বাণিজ্যপোতে পরি-শোভিত থাকিত। একপার্শ্বে ভাগীরথী, অপর পার্শ্বে জলঙ্গী, তথায় অবিরত নানাবিধ বাণিজ্যদ্রব্য আনিয়া উপস্থিত করিতেন। দেশীয়, বিদেশীয়, সকল জাতির ব্যবসায়ি-গণের কোলাহল অগাধসলিলা পদ্মার তরঙ্গমালার সহিত দিগ্‌দিগন্তে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িত। সুন্দর স্থানে অবস্থিত বলিয়া ভগবান্‌গোলা বাঙ্গলার মধ্যে একটি প্রধান বন্দরে পরিণত হয়। নিকটে অনেকগুলি নদনদী প্রবাহিত থাকায়, নানাদেশ হইতে বাণিজ্যদ্রব্য আনীত ও নানাদেশে প্রেরিত হইবার অত্যন্ত সুবিধা ছিল। মোঘলগণ-কর্তৃক বাঙ্গলা-বিজয়ের পর হইতে, ইহার শ্রীবৃদ্ধির সূচনা হয়। তাহার পর যখন মুর্শিদাবাদ বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার রাজধানী হইয়া বাণিজ্যগৌরবে স্ফীত হইয়া উঠে, সেই সময়ে ভগবান্‌গোলা মুর্শিদাবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্দর বলিয়া সমগ্র জগতে বিখ্যাত হইয়া পড়ে। যদিও কাশীমবাজার বাণিজ্যগৌরবে তাদৃশ ন্যূন ছিল না, তথাপি ভগবান্‌গোলায় দৈনিক যেরূপ বহুবিধ দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় হইত, কাশীমবাজারে সেরূপ হইত না। কাশীমবাজারে কেবল রেশমপ্রভৃতি কয়েকটি দ্রব্যের বাণিজ্যস্থান ছিল; কিন্তু ভগবান্‌গোলা সকল প্রকার শস্য, ঘৃত, তৈল প্রভৃতি বঙ্গদেশজাত যাবতীয় দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয়ে প্রত্যহ কোলাহলময় থাকিত। তৎকালীন এদেশবাসী জনৈক ইংরেজ ভগবান্‌গোলার বাজারকে তৎকালপরিজ্ঞাত সমগ্র জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।[১]

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মোগলগণ-কর্তৃক বাঙ্গলা-বিজয়ের পর হইতেই ভগবান্‌গোলার নাম বিস্তৃত হইতে আরম্ভ হয়। আইন আকবরী গ্রন্থে ভগবান্‌গোলার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে ভগবান্‌গোলাকে সরকার মামুদাবাদের অন্তর্গত বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। ভগবান্‌গোলা অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। খ্রীস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্ধমান প্রদেশের সভাসিংহ ও পাঠান রহিম খাঁ মিলিত হইয়া বঙ্গদেশে এক বিদ্রোহের অবতারণা করে। সভাসিংহ পশ্চিম বাঙ্গলার অনেক স্থান অধিকার করিয়া, রহিম খাঁকে নদীয়া ও মুখসুদাবাদ অধিকারের জন্য পাঠাইয়া দেয়। রহিম খাঁ মুখসুদাবাদের জায়গীরদার নিয়ামত খাঁকে নিহত করিয়া কাশীমবাজারের ব্যবসায়িগণের

---

১ Bugwan Gola is the greatest market for the abovementioned articles (grain, oil and ghee) in Indastan, or possibly in the known world." (Holwell's Interesting Historical Events, Part I, Chapter III, p. 194).

অনুনয়বিনয়ে সে স্থান পরিত্যাগপূর্বক ভগবান্‌গোলা পর্যন্ত অগ্রসর হয়। ভগবান্‌-গোলার সুন্দর অবস্থান দেখিযা রহিম খাঁ উক্ত স্থানে সৈন্য সমাবেশ করিয়া নবাব-সৈন্যের বাধা দিবার জন্য অবস্থিতি করিতেছিল। কিন্তু অবশেষে রাজমহালে নবাব ইব্রাহিব খাঁর পুত্র জবরদস্ত খাঁ-কর্তৃক পরাজিত হয়।[২]

খ্রীস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুর্শিদাবাদ বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার রাজধানী-পদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, ভগবান্‌গোলার গৌরব উচ্চসীমা অধিকার করিয়াছিল। পদ্মা, ভাগীরথী, জলঙ্গী প্রভৃতি প্রধান প্রধান নদীবক্ষ দিয়া সমস্ত বঙ্গদেশের পণ্যদ্রব্য আসিয়া ভগবান্‌গোলার বাজার পরিপূর্ণ করিয়া তুলিত। নিকটে কাশীমবাজার প্রভৃতি স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ইউরোপীয় জাতির কুঠী সংস্থাপিত থাকায়, এখানকার ক্রয়-বিক্রয় বহুল-পরিমাণেই সম্পন্ন হইত। তদ্ভিন্ন ভগবান্‌গোলা বাঙ্গলার একরূপ সীমান্তপ্রদেশে অবস্থিত থাকায়, বিহার প্রদেশের সহিত ইহার বাণিজ্যকার্যের অত্যন্ত সুবিধা হইয়াছিল। পদ্মার তীরবর্তী হওয়ায়, রাজমহল প্রভৃতি স্থানের সহিতও ইহার বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। নবাব আলিবর্দী খাঁর সময়ে ইহার শ্রীবৃদ্ধি সর্বোচ্চ সীমায় উপনীত হয়। তাঁহারই রাজত্বকালে বঙ্গভূমি বারংবার মহারাষ্ট্রীয়গণ-কর্তৃক আক্রান্ত হয়; এজন্য ভগবান্‌-গোলাকে বিশেষরূপে সুরক্ষিত করা হইয়াছিল। নদীতীর ব্যতীত অন্য সকলদিক্ পরিখা ও কাষ্ঠের প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত করা হয়। মহারাষ্ট্রীয়গণের আক্রমণের বিশেষ-রূপ আশঙ্কা হইলে, সময়ে সময়ে সহস্র অশ্বারোহী ও সহস্র পদাতিক ইহার রক্ষাকার্যে নিযুক্ত থাকিত এবং সুবার বিশ্বস্ত, নিপুণ ও কার্যক্ষম কর্মচারিগণই ইহার রক্ষাভার গ্রহণ করিতেন।

১৭৪৩ খ্রীঃ অব্দে ভাস্কর পণ্ডিত ও আলিভাই-এর অধীন মহারাষ্ট্রীয়গণ চারিবার ভগবান্‌গোলা আক্রমণ করে; কিন্তু প্রত্যেক আক্রমণই প্রতিহত হওয়ায়, তাহারা কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই। ১৭৫০ খ্রীঃ অব্দের প্রথম ভাগে পুনর্বার মহারাষ্ট্রীয়গণ ভগবান্‌গোলা আক্রমণ করে। এই বার তাহারা নগরমধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় এবং বহুসংখ্যক দ্রব্য ও অর্থ লুণ্ঠন করিয়া গৃহসকল ভস্মীভূত করিয়া চলিয়া যায়। এই আক্রমণে নবাব আলিবর্দী খাঁকে বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। ভগবান্‌-গোলায় সর্বদা নবাবের নৌসেনা অবস্থিতি করিত। জলপথে মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিতে হইলে, ভগবান্‌গোলার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইতে হয়। এই কারণে বহিঃশত্রুকে বাধাপ্রদানের জন্য এবং ভগবান্‌গোলা-বন্দরের সুরক্ষার জন্য মুর্শিদাবাদের যাবতীয় নৌসেনা সর্বদা ভগবান্‌গোলায় সুসজ্জিত থাকিত। সুতরাং বাঙ্গলার তৎ-কালীন সর্বপ্রধান নৌসেনাস্থান ঢাকা বা জাহাঙ্গীর নগরের সহিত ইহার বিশেষরূপ সম্বন্ধ ছিল। নৌসেনার অবস্থানের জন্য মহারাষ্ট্রীয়গণ অনেকবার ভগবান্‌গোলা আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারে নাই।

২ Stewart's History of Bengal (New Edition), p. 211.

উপরে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভগবান্‌গোলার বাজার সমগ্র পরিজ্ঞাত জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া কেহ কেহ নির্দেশ করিয়া থাকেন। বাস্তবিক, তৎকালে তথায় প্রতিনিয়ত লক্ষ লক্ষ মণ শস্য, ঘৃত, তৈল প্রভৃতি দ্রব্যের আমদানি-রপ্তানি হইত। উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, রাঢ়, বিহার, সকল প্রদেশ হইতেই নানাবিধ দ্রব্যের আমদানি হইত এবং তৎসমুদায় সমগ্র ভারতে ও সমগ্র ইউরোপে বিস্তৃত হইয়া পড়িত। ভগবান্‌গোলার বাজার বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের ধান্য, মুগ, কলাই, লঙ্কা, পলাণ্ডু প্রভৃতির নৌকা, তূলা, রেশম, নীল ও বস্ত্রাদির আমদানিতে সর্বদাই সমারোহময় থাকিত। শত শত বিপণীতে পরিপূর্ণ হইয়া বাণিজ্যলক্ষ্মীর প্রিয়ক্রীড়াভূমিরূপে ভগবান্‌গোলা সকলের মনে আনন্দ ও উৎসাহের ধারা ঢালিয়া দিত। তথায় দেশীয়, বিদেশীয় নানাজাতীয় ক্রেতা, বিক্রেতা, দালাল, গোমস্তার কলরব প্রতিনিয়ত আকাশপথে উত্থিত হইত। ভগবান্‌গোলা সুবার খাস মহালের মধ্যে পরিগণিত ছিল। ইহার বাজার হইতে বার্ষিক ৩ লক্ষ টাকার কর আদায় হইত। কেবল ধান্য প্রভৃতি শস্য হইতেই বৎসরে ৩ লক্ষ টাকার শুল্ক সংগৃহীত হওয়ার উল্লেখ দেখা যায়।[৩] সুতরাং ইহা হইতে বেশ অনুমান করা যায় যে, কিরূপ ভাবে ভগবান্‌গোলার বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের কার্য সম্পন্ন হইত। তৎকালে সমগ্র জগতে যে এরূপ বাজার ছিল না, ইহা স্পষ্টরূপে বলা যাইতে পারে। ভগবান্‌গোলার বর্তমান অবস্থান দেখিলে ঐ সমস্ত বিবরণ প্রবাদবাক্য বলিয়া বোধ হয়। মুর্শিদাবাদের গৌরবের সহিত অনেক দিন হইতে ইহার অধঃপতন ঘটিয়াছে। যে দিন হইতে মুর্শিদাবাদ-রাজলক্ষ্মী চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, সেই দিন হইতে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের প্রত্যেক স্থানেই অবনতির সহচর দুঃখদারিদ্র্যের কালিমাচ্ছায়া পড়িয়াছে এবং কোন কোন স্থান শ্মশান বা মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

ভগবান্‌গোলার সহিত আর একটি বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনার সম্বন্ধ আছে। পলাশীর রণক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া হতভাগ্য সিরাজ যখন প্রিয়তমা মহিষী লুৎফউন্নেসার সহিত মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিরা পলায়ন করিবার চেষ্ট করেন, সেই সময়ে তিনি প্রথমে ভগবান্‌গোলায় আসিয়া উপস্থিত হন।[৪] ভগবান্‌গোলায় প্রায়ই নবাবের নৌকার বন্দোবস্ত থাকিত। তিনি নৌকারোহণে ভগবান্‌গোলা পরিত্যাগ করিয়া রাজমহলাভিমুখে গমন করিলে, মালদহের নিকট মীরজাফরের অনুচরবর্গ-কর্তৃক ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদে নীত হন। পরে তথায় তাঁহার মস্তক ভূমিলুণ্ঠিত হয়। যেদিন ভগবান্‌গোলা সিরাজকে চিরবিদায় দিয়াছিল, সেইদিন হইতে সিরাজের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও সৌভাগ্য-রবি অস্তমিত হইতে আরম্ভ হয়।

বর্তমান সময়ে ভগবান্‌গোলার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ইহার পূর্ব বাণিজ্য-

৩ Holwell's Interesting Historical Events, Part I, Chapter III, pp. 194 and 195.

৪ Seir Mutaqherin (English Translation), Vol. I, p. 771.

গৌরবেরও চিহ্নমাত্রও নাই। পদ্মা যেন মনোদুঃখে ইহাকে নিজ ক্রোড় হইতে নিক্ষিপ্ত করিয়া দূরে প্রস্থান করিয়াছেন এবং আর একটি নূতন ভগবান্‌গোলার সৃষ্টি হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান এক্ষণে পুরাতন ভগবান্‌গোলা নামে অভিহিত হইতেছে। নূতন ভগবান্‌গোলাকে কখন কখন লোকে আলাতলীও বলিয়া থাকে। পুরাতন ভগবান্‌গোলা হইতে নূতন ভগবান্‌গোলা প্রায় সার্ধ দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

ভগবান্‌গোলার গৌরব নষ্ট হইলেও অনেক দিন পর্যন্ত ইহা একটি মনোহর স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। বিশপ হিবার ১৮২৪ খ্রীঃ অব্দের ২রা আগস্ট ভগবান্‌-গোলায় উপস্থিত হইয়া ইহার রমণীয়তায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি ভগবান্‌গোলা সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—"একটি বিশাল শ্যামল প্রান্তরোপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিচ্ছন্ন মৃৎকুটীরগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে রহিয়াছে। নদী হইতে কিছুদূরে একটি শ্যাম তৃণাচ্ছাদিত বাঁধ প্রান্তরের প্রাচীররূপে অবস্থিত। আম্র, বংশ, খর্জুর ও স্থানে স্থানে মনোহর বটবৃক্ষ বাঁধটির ধারে ধারে শোভা পাইতেছে। প্রান্তর গো, মহিষ ও বালক-বালিকাগণে পরিপূর্ণ। তীরের নিকট নদীবক্ষে কতকগুলি তরণীও ভাসিতেছে। কোন কোন উন্মুক্ত কুটীর হইতে নানাবিধ যন্ত্রের বিভিন্নপ্রকার বাদ্য-ধ্বনি চারিদিক মুখর করিয়া তুলিতেছে। আনন্দময়, উৎসাহময়, কোলাহলময় স্থানটি দেখিলে বাস্তবিক মন প্রফুল্ল হইয়া উঠে।[৫] নূতন ভগবান্‌গোলা পূর্বে বিহার প্রভৃতি স্থানের নীলের আড্ডা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।[৬] কিন্তু এক্ষণে সে ব্যবসাও মন্দীভূত হওয়ায়, ইহা একখানি সামান্য গ্রাম বলিয়া পরিচয় দিতেছে। প্রায় প্রতি বৎসরেই ভীষণ বন্যাস্রোতে ভগবান্‌গোলার কুটীরগুলি ভাসমান হইয়া ক্রমে ইহাকে জনমানবহীন মরুভূমি করিয়া তুলিতেছে। এখনও ভগবান্‌গোলার নাম শুনা যাইতেছে; কাল-সহকারে সম্ভবতঃ, অনন্ত বিস্মৃতিগর্ভে চিরদিনের জন্য তাহার স্থান হইবে!

৫ ভগবান্‌গোলাদর্শনে বিশপ হীবার একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল।

'If thou wert by my side, my love !
How fast would evening fail,
In green Bengala's palmy grove.
Listening the nightingale !"

(Heber's Narrative of a journey, New Edition, Vol I, p. 113)

আমার কোন বন্ধু ইহার এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন ঃ—

এ সময়ে প্রিয়তমে রহিলে নিকটে,
সুখময় সন্ধ্যাকাল সুখে যেত চলি,
শ্যামল বঙ্গের শোভা তালীবনমাঝে,
কলকণ্ঠ বিহগের শুনিয়া কাকলী।

৬ Gastrell's Statistical Account of Murshidabad.

মোতিঝিল

অতীতস্মৃতি যখন নবপরিণীতা বধূর ন্যায় ধীরে ধীরে মনোমন্দির অধিকার করিয়া বসে, তখন তাহার পাদস্পর্শে চারিদিকে ভাবের পারিজাত-কুসুম ফুটিয়া উঠে,—জীবনের শুষ্ক মরুভূমি কোমলতার মধুর ধারায় অভিষিক্ত হইয়া যায়,—হৃদয়-তন্ত্রীর তানগুলি মৃদু নিক্বণে ধ্বনিত হইতে থাকে। আমরা বর্তমানের নীরস ও বিশুষ্ক রাজ্যের অধিবাসী ; প্রতিদিন একই রূপের,—একই ভাবের ছবি আমাদের দৃষ্টি-সমক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ! আমরা সেই অবিকার, অবিশেষ দৃশ্যে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছি। তাই মধ্যে মধ্যে আমাদিগের ক্লিষ্ট প্রাণকে শান্ত করিবার জন্য অতীত-স্মৃতি সোহাগিনী প্রণয়িনীর ন্যায় হৃদয়ে অমৃতধারা ঢালিয়া দেয়। যখন কোন পুরাতন স্থান দৃষ্টিপথের পথিক হয়, অথবা কোন পুরাণ-কাহিনী কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তখনই যেন কি এক প্রফুল্লতায় আমাদের চিত্ত পরিপূর্ণ হইয়া যায় ! তখন আমরা বর্তমান ভুলিয়া অতীতের সঙ্গে মিশিয়া যাই এবং তাহার মাধুরীতে আপনাদিগকে সিক্ত করিয়া ফেলি। কোন কবি অতীতকে চিরসমাহিত করিতে উপদেশ দিয়া কেবল বর্তমানের উপর নির্ভর করিতে বলিয়াছেন। অবশ্য কার্য-শীলমাত্রেই বর্তমান ব্যতীত আর কোন দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও, অতীতের মধুর স্মৃতি জীবনে যে কোমলতার ফুল ফুটাইয়া দেয়, তাহার পবিত্র সৌরভ হইতে একেবারে বঞ্চিত হইতে আমরা সকল সময়ে ইচ্ছা করি না।

পুরান স্থান ও পুরান কথা অতীতস্মৃতির উদ্বোধন করিয়া থাকে। সেইজন্য এমন কি, যখন কোনও ভগ্নস্তূপ বা বিধ্বস্তপ্রায় স্থান আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়, অথবা আমরা কিয়ৎকালের জন্য কোন অসংলগ্ন প্রাচীন উপকথায় মনোনিবেশ করি, তখন আমরা যেন তাহাদেরও মধ্যে অতীতের মনোমোহিনী ছবি দেখিতে পাই। সে ছবি অস্পষ্ট হইলেও মধুরতাময়ী। প্রায় সার্ধশত বৎসর অতীত হইল, মোতি-ঝিলের গৌরবকাহিনী মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে। তাহার তীরস্থিত প্রাসাদ মুসলমান রাজত্বের শেষ ভাগে ও ইংরেজ-রাজত্বের প্রারম্ভে অনেক অভিনয়ের রঙ্গভূমিরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। অনেক দিন হইল, সে প্রাসাদ ধূলিরাশিতে পরিণত হইয়াছে ; কেবল তাহার ভিত্তিভূমি তৃণাচ্ছাদিত হইয়া অতীতের কথা স্মৃতিপটে বিকাশ করিয়া দিতেছে। মোতিঝিলের অবস্থা পূর্বের ন্যায় তেমন সৌষ্ঠবশালিনী না হইলেও, ইহার বর্তমান রমণীয় দৃশ্যে মনপ্রাণ মুগ্ধ হইয়া উঠে। এক কালে যাহাতে কত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার সুন্দর দৃশ্যটিমাত্র আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া থাকে।

স্পেন্সার বলেন, পূর্বে যে-স্থানে কোন বিশেষ প্রয়োজন সংসাধিত হইত, এক্ষণে কেবল তাহা সৌন্দর্যশক্তিরই পরিচায়ক ব্যতীত আর কিছুই নহে ; বিধ্বস্তপ্রায় দুর্গাদি ইহার প্রকৃত দৃষ্টান্ত। যাহা পূর্বে বাসনিকেতন ও আত্মরক্ষার আশ্রয় বলিয়া

নির্মিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা প্রীতিভোজনের স্থানরূপে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, তাহাদের চিত্রে আমাদের উপবেশনশালা সুসজ্জিত হয় এবং তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া কত কত উপকথার সৃষ্টি হইয়াছে।[১] রাজপুতানার প্রাচীন দুর্গ, দিল্লী ও আগরার প্রাচীন প্রাসাদ, গৌড়ের ভগ্নস্তুপ আমাদিগের সৌন্দর্যানুরাগের বৃদ্ধি সাধন করে মাত্র। সেইরূপ মুর্শিদাবাদের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রাচীন স্থানগুলি ও তাহাদের ভগ্নাবশেষ নয়নের তৃপ্তিসাধন ও তদাশ্রিত উপকথাগুলি বালক-বালিকাগণের মনস্তুষ্টি ব্যতীত আর কোন ব্যবহারে আইসে না।[২] শান্তিপ্রিয় নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁ অনেক উদ্দেশ্য-সাধনার্থ অশ্বপদাকৃতি মোতিঝিলের তীরে স্বীয় প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। আমরা এক্ষণে তাহার ভগ্নাবশেষসহ মোতিঝিলের সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া তৃপ্ত হইয়া থাকি।

বাস্তবিকই মোতিঝিল মুর্শিদাবাদের মধ্যে একটি রমণীয় দৃশ্য। যখন কেহ ইহার নিকটে উপস্থিত হন, তখনই হৃদয় স্বর্গীয় ভাবে ভরিয়া যায়। অশ্বপদাকৃতি ঝিল সলিলভরে টলটল করিতেছে,—স্থানে স্থানে পদ্মবনে বিকশিত পদ্মগুলি সলিল হইতে মস্তক উত্তোলনপূর্বক মৃদু বায়ুবেগে ঈষৎ সঞ্চালিত হইতেছে,—নানাবিধ জলচর পক্ষী কখন ঝিলে বসিয়া কলরব করিতেছে, কখন বা তান ছাড়িতে ছাড়িতে সুদূর অম্বরপথে মিশিয়া যাইতেছে ; কোকিল পাপিয়া প্রভৃতিরও মনোমোহকর সঙ্গীতে দিগ্বালাগণ চমকিত হইয়া উঠিতেছেন ! ঝিলবেষ্টিত ভূভাগ হরিদ্বর্ণ তৃণে আচ্ছাদিত হইয়া শ্যামলতার ঢেউ খেলাইতেছে। মহাকবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তৃণরাশিতে যে-মহিমাময়ী উজ্জ্বলতা[৩] দেখিতেন, সেই মহীয়সী উজ্জ্বলতা এই শ্যামল তৃণসাগরে প্রতিনিয়ত ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। যখন সমীরান্দোলিত স্বচ্ছ সলিলরাশি সৌর-করে বা চন্দ্রকিরণে সহস্র সহস্র মণিমাণিক্য ফুটাইতে থাকে, সেই সময়ে তরঙ্গায়িত হরিদ্বর্ণ তৃণসমুদ্রে দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয়, যেন সহসা অপ্সরোরাজ্য পৃথ্বীতলে অবতীর্ণ হইয়াছে। ঝিলের পূর্বতীরে দীর্ঘকায় বৃক্ষসকল সলিল-দর্পণে আপনাদিগের প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিতেছে, তাহাদের ছায়ায় বসিয়া গোপবালকগণ কখন গ্রাম্য-সঙ্গীত গাহিতেছে, কখন বা ভগ্নাবশিষ্ট প্রাসাদের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করিয়া পরস্পরে নানাপ্রকার উপকথা বলিতেছে।[৪]

১ Spencer's Essays—Use and Beauty.

২ বাবু ভোলানাথ চন্দ্র মুর্শিদাবাদের ধ্বংসোপলক্ষে লিখিয়াছেন :—"They gave birth of tales of vampires and goblins that yet amuse children in native nurseries." (*Travels of a Hindoo,* Vol. I, p. 72).

৩ Splendour in the grass.

৪ নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁর প্রাসাদকে সাধারণ লোকে "সিংদালান" বলিয়া থাকে। রাখাল-বালকগণ তাহাকে দেখাইয়া এইরূপ বলে যে, ইহাতে সাত পাত্র ধন প্রোথিত আছে। যে একরাত্রে সিংদালান সাত বার ভাঙ্গিতে ও গড়িতে পারিবে, সে-ই উক্ত ধনরাশির অধিকারী

এইরূপ রমণীয় স্থানে আসিলে অতীতস্মৃতি আপনা হইতে মানসপটে উদিত হয় —অতীত-গৌরব হৃদয়কে বড়ই ব্যাকুল করিয়া তুলে! তখন অতীতের কত কথা মনে পড়ে,—কত ঘটনার ছবি যবনিকাপাতের ন্যায় মানসচক্ষের সম্মুখ দিয়া অপসারিত হইতে থাকে,—কত মধুর ভাবে হৃদয় ভরিয়া যায়। আমরা অতীতের সে মাধুর্যবর্ণনে অক্ষম। যদি কোন মহাকবি আপনার বিশ্বব্যাপী হৃদয় লইয়া এইরূপ মনোমোহকর স্থানে উপস্থিত হন, তিনিই ইহার বর্তমান রমণীয়তার সহিত অতীতের মধুর স্মৃতি বিজড়িত করিয়া ভুবনমোহন চিত্র অঙ্কিত করিতে পারেন। আমাদের কার্য অন্যরূপ; আমরা ঘটনাবলীর নীরস বিন্যাসের জন্য উপস্থিত; সুতরাং আমরা এক্ষণে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা পাইব।

মোতিঝিল বর্তমান মুর্শিদাবাদের দক্ষিণ-পূর্বাংশে অর্ধক্রোশ দূরে অবস্থিত। পূর্বে ইহা ভাগীরথীর গর্ভে ছিল বলিয়া অনুমান হয়।[৫] ভাগীরথী মুর্শিদাবাদের অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন গতি অবলম্বন করিয়াছেন। পুরাতন খাদগুলি কোন কোন স্থানে শুষ্ক, কোথাও বা বদ্ধ বিলে পরিণত হইয়াছে; মোতিঝিল ইহার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কত কাল পূর্বে মোতিঝিল স্রোতঃশালিনী ভাগীরথীর গর্ভ ছিল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। উভয় পার্শ্বের প্রবাহ রুদ্ধ হওয়ায় ইহা অশ্বপাদুকাকৃতি ঝিলে পরিণত হইয়াছে। ইহার গর্ভে অনেক শুক্তি পাওয়া যাইত বলিয়া ইহা মোতিঝিল নামে অভিহিত হইয়া থাকে।[৬] কাশ্মীর, লাহোর প্রভৃতি স্থানেও এই নামের জলাশয় দৃষ্ট হয়। খ্রীস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য হইতে মোতিঝিলের বিবরণ মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। যৎকালে নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁ সা আমেদ জঙ্গ ইহার সুন্দর অবস্থান দেখিয়া পশ্চিম তীরে আপনার প্রাসাদাদি নির্মাণ করেন, সেই সময় হইতে ইহার প্রকৃত বৃত্তান্ত আমরা জানিতে পারি। কিন্তু ইতিহাসে উল্লিখিত না হইলেও খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে, অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে ইহার পূর্ব তীরে ৺রাধামাধব মূর্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তদবধি এই স্থানের কথা সাধারণে অবগত আছে। সম্ভবতঃ তৎকালে মোতিঝিল ভাগীরথীর গর্ভেই অবস্থিত ছিল।

আলিবর্দী খাঁ মহবৎজঙ্গ মহারাষ্ট্রীয় ও আফগানদিনের দমনার্থ জীবনের অধিকাংশ সময় সমরক্ষেত্রে যাপন করিয়াছিলেন। মৃত্যু-শয্যায় শায়িত হইয়া তিনি প্রিয়তম

হইবে। তাহারা ইহাও বলে যে, নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁর মস্জেদেও নাকি ধন প্রোথিত আছে।

৫ রেনেল, ডাক্তার বি. হামিল্টন প্রভৃতির এই মত। হণ্টার বলেন, কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ইহার তীরস্থ অট্টালিকানির্মাণের ইষ্টকের জন্য ইহাকে অশ্বপদাকারে খনন করা হইয়াছিল, ইহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

৬ এই সকল শুক্তিগর্ভস্থিত মোতিচূর্ণে নবাবদিগের তাম্বুলসেবন হইত বলিয়া প্রবাদ আছে।

সিরাজের নিকট একথা নিজমুখে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, তাঁহার জীবন যুদ্ধে ও সামরিক কৌশলেই অতিবাহিত হইয়াছে। আলিবর্দী খাঁর সমরক্ষেত্রে অবস্থানকালে তাঁহার বেগম এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁর প্রতি মুর্শিদাবাদ রক্ষার ভার থাকিত। নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁ ঢাকার শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত ছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে অধিকাংশ সময়েই মুর্শিদাবাদে বাস করিতে হইত; তাঁহার সহকারী হোসেনকুলী খাঁর প্রতি ঢাকার শাসনভার ন্যস্ত ছিল। হোসেনকুলী খাঁর মৃত্যুর পর রাজা রাজবল্লভ উক্ত পদে নিযুক্ত হন। নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁ অত্যন্ত বিলাসী ও আমোদপ্রিয় ছিলেন। মুর্শিদাবাদের মধ্যস্থিত স্বীয় প্রাসাদ তাঁহার সর্বদা ভাল লাগিত না। এই সময়ে আলিবর্দী খাঁ সিরাজউদ্দৌলাকে রাজ্যভার দিবেন বলিয়া প্রকাশ করিলে, তাঁহার পরিবারমধ্যে ভীষণ মনোবিবাদ উপস্থিত হয়। সিরাজ ধীরে ধীরে আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছিলেন। নওয়াজেস্ সিরাজের প্রভুত্ব অসহ্য বিবেচনা করিয়া রাজধানী হইতে কিছু দূরে অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা করেন। তৎকালে মহারাষ্ট্রীয়দিগের ভয়ও প্রবল ছিল; তাহারা দুই-একবার মুর্শিদাবাদ লুণ্ঠনও করে; সুতরাং তিনি একটি সুরক্ষিত স্থানের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। মোতিঝিলের সুন্দর অবস্থান দেখিয়া তাঁহার আশা পূর্ণ হইল। অশ্বপদাকার ঝিল ইহার তিন দিক্ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; অধিকন্তু এই স্থানটি পরম রমণীয়, এই সকল বিবেচনায় তিনি ইহার তীরে স্বীয় প্রাসাদ-নির্মাণের আয়োজন করিতে আরম্ভ করিলেন।

বাঙ্গলার প্রাচীন রাজধানী গৌড়ের অগণ্য ভগ্নস্তূপ হইতে প্রস্তরস্তূপ ও মর্মর প্রস্তর আনীত হইয়া প্রাসাদ নির্মিত হইল। কয়েকটি চত্বরে ভবনটি বিভক্ত হয়; চত্বর-গুলি পরস্পর অল্প ব্যবধানে অবস্থিত ছিল; প্রত্যেক চত্বর দুইটি বৃহৎ প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল, প্রাচীরগুলি প্রত্যেক দিকেই ঝিলের জল স্পর্শ করিত। দুই তিন শ্রেণীর লঘুকায় স্তম্ভ দ্বারা চত্বরের ছাদ সুরক্ষিত হইয়াছিল; কিন্তু প্রাসাদের গৃহগুলি তাদৃশ সুবিস্তৃত ছিল না। তৎকালে মুসলমানদিগের গৃহ প্রায়ই সুবিস্তৃত হইত না। অনেকস্থলে এখনও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাসাদের সোপানাবলী সলিলাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল। প্রাসাদের চারিদিকে নানাবিধ বৃক্ষ রোপণ করিয়া একটি রমণীয় কানন নির্মাণ করা হয়। ফলপুষ্পে শোভমান, বৃক্ষরাজিসমন্বিত রম্যকাননের মধ্যস্থ, জলমধ্যগত সোপানবলীসংলগ্ন সুচারু প্রাসাদটি পরপার হইতে দেখিলে বোধ হইত, যেন উদ্যানসহিত প্রাসাদটি ঝিলমধ্য হইতে ভাসিয়া উঠিতেছে।

নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁ প্রায়ই এই রম্য প্রাসাদে বাস করিতেন। তিনি ইহাতে কোকিলকণ্ঠী কামিনীগণের সঙ্গীতসুধাপানে অনেক সময়ে পরিতৃপ্ত হইতেন। ভগবাই নামে একটি রমণী তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। তাহার মনস্তুষ্টির জন্য তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করেন এবং তাহাকে বিস্তর হীরা জহরত উপহার দিয়াছিলেন। তাহার সহিত এই মোতিঝিলের রম্য প্রাসাদে তিনি অনেক সময় অতিবাহিত

করিতেন। গান, বাদ্য ও নানাবিধ আমোদজনক ক্রীড়া তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল বলিয়া তিনি রাজধানীর মধ্যস্থিত স্বীয় কোলাহলময় প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানেই আত্মীয়পরিজনপরিবৃত হইয়া বাস করিতে ভালবাসিতেন।

নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁ নিঃসন্তান ছিলেন ; এজন্য তিনি সিরাজউদ্দৌলার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এক্রাম উদ্দৌলাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। যখন মোতিঝিলে তিনি আগমন করিতেন, এক্রাম উদ্দৌলাও তাঁহার সহিত আসিতেন। তাঁহার ন্যায় তাঁহার প্রিয় পুত্রটিও নর্তকীগণের কণ্ঠসুধা পান করিতেন। এক্রামের মনোরঞ্জনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নর্তকী নিযুক্ত হইত। মুতাক্ষরীনকার এই সম্বন্ধে একটি গল্প বলিয়াছেন, তাহা হইতে নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁর ন্যায়পরায়ণতারও পরিচয় পাওয়া যায়।

একদিন এক্রাম উদ্দৌলা একদল নর্তকী লইয়া মোতিঝিলের রম্যকাননে আনন্দোপভোগ করিতেছিলেন। তাহাদের মধ্যে একটি নর্তকী মুতাক্ষরীনকারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গালিব আলির প্রতি কটাক্ষপাত করে ; ক্রমে উভয়ের দৃষ্টিবিনিময় হইতে থাকে ; অনুচরবর্গসহ এক্রাম উদ্দৌলা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতে, গালিব আলি তথা হইতে প্রস্থান করিতে বাধ্য হয়। এক্রাম উদ্দৌলা নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁর নিকট বারংবার বলিতে আরম্ভ করেন যে, গালিব আলি যদি পলায়ন না করিত, তাহা হইলে আমার হস্তে নিশ্চয়ই তাহার প্রাণবায়ুর অবসান হইত। নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁ এক্রাম উদ্দৌলার এইরূপ কথা শুনিয়া রাগান্বিত হইয়া বলিলেন,—যদি তুমি তাহাকে বধ করিতে, তাহা হইলে, আমিও স্বহস্তে তোমার কণ্ঠ ছেদন করিতাম। তুমি যেমন আমার এক ভগিনীর পুত্র, সেও সেইরূপ দ্বিতীয় ভগিনীর গর্ভজাত।[৭]

মোতিঝিলের বৃক্ষবাটিকা তিন দিকে স্বাভাবিক পরিখায় বেষ্টিত ছিল ; নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁ কেবল পশ্চিম দিকে তোরণদ্বার নির্মাণ করিয়া তাহাকে সুরক্ষিত করেন। উক্ত তোরণদ্বারের চিহ্ন আজিও বিদ্যমান আছে। তাহারই নিকটে হিজরী ১১৬৩ অব্দে (১৭৫০।৫১ খ্রীঃ অব্দে) এক মস্জেদ, মাদ্রাসা ও লঙ্গরখানা (অতিথিশালা) নির্মিত হয়। মস্জেদটি অদ্যাপি বর্তমান রহিয়াছে। তাহার বৃহৎ গম্বুজত্রয়ের নিম্নে শব্দ করিলে, ভিতর হইতে প্রতিধ্বনি নির্গত হয়। মস্জেদের সম্মুখ ভাগে ফারসী ভাষায় তাহার নির্মাণাব্দ লিখিত আছে। মসজেদ্-প্রাঙ্গণের দক্ষিণ দিকে একটি বিশাল তোরণদ্বার মস্তক উত্তোলন করিয়া অদ্যাপি বিরাজ করিতেছে। নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁ অত্যন্ত মুক্তহস্ত পুরুষ ছিলেন, মস্জেদে ও অতিথিশালায় তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করিতেন। দরিদ্র ও আর্তদিগের জন্য তাঁহার মাসিক ৩৭,০০০ টাকা ব্যয়িত হইত। মুর্শিদাবাদের যাবতীয় বিপন্ন বিধবা ও অনাথগণ তাঁহার পরিবার বলিয়া গণ্য ছিল।[৮] তিনি অত্যন্ত ধীর প্রকৃতি ও স্নেহপ্রবণ ছিলেন। এক্রাম

৭ Seir Mutaqherin, Vol. I, pp. 653-54.

৮ Mutaqherin, Vol. I, pp. 651-52.

উদ্দৌলাকে তিনি প্রাণ অপেক্ষাও অধিক ভালবাসিতেন। এক্রাম উদ্দৌলার বসন্ত-রোগে প্রাণবিয়োগ হইলে, তাঁহাকে মোতিঝিলের মসজেদ-প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হয়। নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁ এক্রামের শোকে উন্মত্ত হইয়া উঠেন; বাস্তবিকই তৎকালে তিনি হিতাহিত-জ্ঞান-বর্জিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ধীর প্রকৃতি অস্থির হইয়া উঠিল, জগতের সকল কার্যে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রণয়নী ঘসেটি বেগম ও পূজ্যপাদ পিতৃব্য আলিবর্দী খাঁ কিছুতেই তাঁহাকে শান্ত করিতে পারিলেন না; ক্রমে তিনি ভয়ঙ্কর শোথরোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন। আলিবর্দী তাঁহাকে নিজ প্রাসাদে লইয়া গিয়া সুচিকিৎসকের হস্তে অর্পণ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই ফলোদয় হইল না। ঘসেটি বেগম সিরাজউদ্দৌলার ভয়ে পুনর্বার তাঁহাকে নগরমধ্যস্থ স্বীয় প্রাসাদে লইয়া গেলেন। তথায় হিজরী ১১৬৯ অব্দে (১৭৫৫।৫৬ খ্রীঃ অব্দে) তিনি চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। তাঁহার ইচ্ছানুসারে তাঁহার প্রিয়তম এক্রামের পার্শ্বে মোতিঝিলের মস্‌জেদ-প্রাঙ্গণে নওয়াজেস্‌কে সমাহিত করা হয়। তাঁহাকে সমাধিস্থিত করার কথা মুতাক্ষরীনে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

"প্রভাত হইতে না হইতে জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ মীর মহম্মদ আলি, আলিবর্দী খাঁ স্বয়ং, তাঁহার পরিবারস্থ যাবতীয় আত্মীয়-স্বজন এবং নগরের স্ত্রী-পুরুষ অসংখ্য লোক মৃতদেহের সৎকারে উপস্থিত হইল। মুসলমান শাস্ত্রানুসারে মৃতদেহ ধৌত হইলে, জানাজী (শাস্ত্রীয় প্রার্থনা) পাঠের পর শব বহন করিয়া, মধ্যে মধ্যে স্কন্ধ বিনিময় করিতে করিতে, তাহারা তাঁহার প্রিয় গ্রাম্যভবন মোতিঝিলে উপস্থিত হইল। তথায় কিছুক্ষণ তাঁহার স্ব-নির্মিত মস্‌জেদে মৃতদেহ রাখিয়া তাহারই প্রাঙ্গণে, এক্রাম উদ্দৌলার পার্শ্বে তাঁহাকে সমাহিত করিল। যে সময়ে তাহারা সমাহিত করিবার জন্য ভূমি হইতে মৃতদেহ উত্তোলন করে, সেই সময়ে সেই অসংখ্য নর-নারীর মধ্য হইতে ঈদৃশ রোদন ও শোকের ধ্বনি উঠিয়াছিল যে, তাহাতে যেন আকাশ বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। এইরূপ ঘটনা পূর্বে কখনও দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই।"[১]

নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার প্রণয়িনী ঘসেটী বেগম আপনার যাবতীয় সম্পত্তি লইয়া মোতিঝিলের প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই সময়ে আলিবর্দী খাঁ মৃত্যুশয্যায় শায়িত হন। ঘসেটী বেগম সিরাজের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি জানিতেন যে, আলিবর্দীর মৃত্যুর পর সিরাজই বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার সিংহাসনে উপবিষ্ট হইবেন। ঘসেটী আত্মরক্ষার ও সিরাজের সিংহাসনারোহণে বাধাপ্রদানের জন্য পরলোকগত স্বামীর সৈন্যদিগকে হস্তী ও লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিয়া বদ্ধপরিকর হইতে অনুরোধ করেন। প্রায় দশ সহস্র সৈন্য প্রতিজ্ঞাপূর্বক একবাক্যে তাঁহার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে কৃতসঙ্কল্প হইল। হোসেনকুলী খাঁর মৃত্যুর

১ Mutaqherin, Vol. I, p. 651.

পর রাজা রাজবল্লভ ঢাকার সহকারী শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হন ; আলিবর্দীর মৃত্যুসময়ে তিনি মুর্শিদাবাদে উপস্থিত ছিলেন। ঘসেটী বেগম তাঁহাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন।[১০] বেগমের রক্ষার জন্য রাজা গোপনে কাশীমবাজারের ইংরেজকুঠির অধ্যক্ষ ওয়াট্‌স সাহেবের সহিত সিরাজের বিরুদ্ধে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তিনি স্বীয় পুত্র কৃষ্ণদাসকে সপরিবারে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। সিরাজ তাহার সহিত ইংরেজদের এইরূপ অসদ্ব্যবহারের কথা মৃত্যুশয্যায় শায়িত আলিবর্দীকে জানাইলে, নবাব কাশীমবাজারে সার্জন ফোর্থ সাহেবকে সে কথা জিজ্ঞাসা করেন। ফোর্থ সাহেব সে কথা অস্বীকার করিয়াছিলেন। সিরাজ কিন্তু ইহার প্রমাণের জন্য পুনর্বার চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হন ; ইতিমধ্যে আলিবর্দী খাঁর জীবনবায়ুর অবসান হয়।

আলিবর্দীর মৃত্যুর পর ১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল মাসে সিরাজউদ্দৌলা মোতিঝিল আক্রমণ করিবার আদেশ দিলেন। ঘসেটী বেগম যে-সমস্ত সৈন্যকে পূর্ব হইতে অর্থাদি প্রদান করিয়া তাঁহার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হইতে বলেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই অগ্রে পলায়ন করে। তাঁহার প্রণয়পাত্র মীর নজর আলি অতি অল্প-সংখ্যক সৈন্য লইয়া মোতিঝিলে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহারই কুপরামর্শে ঘসেটী সিরাজকে বাধা দিতে কৃতসঙ্কল্পা হন। সিরাজের সৈন্যগণ মোতিঝিল আক্রমণ করিলে, নজর আলি অনন্যোপায় হইয়া সিরাজের সৈন্যাধ্যক্ষ দোস্ত খাঁ ও রহিম খাঁকে অনেক উপহার প্রদান করিয়া, উপস্থিত বিপদ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। পরে যাবতীয় সম্পত্তিসহ ঘসেটী বেগম ধৃত হইয়া সিরাজের নিকট উপস্থিত হইলে, সিরাজ তাঁহাকে বন্দী অবস্থায় থাকিতে অনুমতি প্রদান করেন। তদবধি মোতিঝিল সিরাজের হস্তগত হয়।

লং, হণ্টার প্রভৃতি ভ্রমক্রমে লিখিয়াছেন যে, মোতিঝিলের প্রাসাদ সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক নির্মিত হয়। পরন্তু সিরাজের প্রাসাদের নাম হীরাঝিলের প্রাসাদ, তাহাকে মনসুরগঞ্জের প্রাসাদও বলিত। বোধহয় তাঁহারা হীরাঝিল ও মোতিঝিল একই ভাবিয়া এইরূপ ভ্রম করিয়া থাকিবেন। বাস্তবিক হীরাঝিলের ও মোতিঝিলের প্রাসাদ দুইটি স্বতন্ত্র। মোতিঝিল ভাগীরথীর পূর্ব তীরে এবং হীরাঝিল পশ্চিম তীরে অবস্থিত ছিল। হীরাঝিলের প্রাসাদ অনেক দিন হইল, ধ্বংসকবলে পরিণত হইয়াছে, হীরাঝিল ও মোতিঝিল ভাগীরথীগর্ভে মিশিয়া গিয়াছে। তাঁহারা আবার মোরাদবাগ ও মোতিঝিলকেও এক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ইহাও তাঁহাদের ভ্রম। বেভারিজ প্রথমে উক্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন ; পরে স্বীয় ভ্রম সংশোধন

---

১০ অর্মে সাহেব লিখিয়াছেন যে, রাজা রাজবল্লভের সহিত ঘসেটী বেগমের অবৈধ প্রণয় ছিল। (Orme's Indostan, Vol. II, p. 40.)। কিন্তু ইহা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। হোসেনকুলী খাঁর সহিত ঘসেটির ঐরূপ প্রণয় সংঘটিত হইয়াছিল। বোধ হয়, অর্মে ভ্রমক্রমে হোসেনকুলীর স্থলে রাজবল্লভকে নির্দেশ করিয়াছেন। হোসেনকুলী খাঁর পর মীর নজর আলি নামে এক ব্যক্তি ঘসেটির হৃদয় অধিকার করে।

করিয়া লন। মোরাদবাগও ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে এবং হীরাঝিলের নিকটে অবস্থিত ছিল। পর প্রবন্ধে হীরাঝিল ও মোরাদবাগের বিবরণ লিখিত হইতেছে।

মোতিঝিলের তীরস্থ ভূভাগ তিন দিকে সলিলবেষ্টিত হওয়ায় অত্যন্ত সুরক্ষিত ছিল। ১৭৬৩ খ্রীঃ অব্দের ২৪শে জুলাই মীর কাসেমের সৈন্যগণ ইংরেজদিগের হস্ত হইতে মুর্শিদাবাদ রক্ষার জন্য মোতিঝিলে শিবির সন্নিবেশ করে ; কিন্তু মেজর আডাম্‌সের অধীন ইংরেজসৈন্য-কর্তৃক তাহারা পরাজিত হইলে, নগরাধ্যক্ষ সৈয়দ মহম্মদ খাঁ সূতীতে পলায়ন করেন। ইংরেজরা মুর্শিদাবাদ অধিকার করিয়া মীরজাফরকে পুনর্বার সিংহাসন প্রদান করেন। ইংরেজরাজত্বের প্রারম্ভে মোতিঝিলের প্রাসাদে প্রতি বৎসর পুণ্যাহ সম্পন্ন হইত। ইংরেজদিগের দেওয়ানী গ্রহণের পর, ১৭৩৬ খ্রীঃ অব্দের ২৯শে এপ্রিল মোতিঝিলে প্রথম পুণ্যাহ হয়।[১১] নবাব নজমউদ্দৌলা সুচারু পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া নানাবিধ হীরা ও মণিমাণিক্যখচিত অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব-নাজিমরূপে মসনদে উপবিষ্ট হন। ক্লাইব বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানের প্রতিনিধিরূপে তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়াছিলেন। জগৎশেঠ, মহম্মদ রেজা খাঁ ও অন্যান্য অমাত্য ও প্রধান কর্মচারিবর্গ, বহুমূল্য পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া আপন আপন স্থানে উপবিষ্ট হন। বাঙ্গলার যাবতীয় রাজা ও জমিদারবর্গ, করহস্তে দণ্ডায়মান ছিলেন। চোপদার ও সৈন্যগণ, নিশান হস্তে দণ্ডায়মান ছিল ; মোতিঝিলে অসংখ্য তরণী সুসজ্জিত হইয়া শোভা পাইতেছিল।

১৭৬৭ খ্রীঃ অব্দে অধিকতর ধূমধামের সহিত পুণ্যাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তৎকালে নবাব সৈফ উদ্দৌলা বহুমূল্য পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া মসনদোপরি উপবিষ্ট হন এবং গবর্নর ভের্লেস্ট্ তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করেন। এই ভের্লেস্ট কর্মচারী ও জমিদারদিগকে তুতবৃক্ষের কৃষির জন্য উৎসাহ প্রদানার্থ পীড়াপীড়ি করিয়াছেলেন। ১৭৭২ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত মোতিঝিলে পুণ্যাহ হইয়াছিল। উক্ত বৎসর রাজস্ববিভাগ মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় অন্তরিত হয়। ইহার পূর্ব হইতেই পুণ্যাহের ধূম অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। ক্লাইব এই উৎসব রক্ষার জন্য অনেক যত্ন করিয়াছিলেন ; এমন কি, তিনি ইহার জন্য স্বতন্ত্র অর্থসংগ্রহের চেষ্টায়ও ছিলেন। কিন্তু ডিরেক্টরগণ ১৭৬৯ খ্রীঃ অব্দে খেলাত দিতে নিষেধ করায় পুণ্যাহের ধুম মন্দীভূত হয়। এই পুণ্যাহে পূর্বে ২,১৬,৮৭০ টাকার খেলাত বিতরিত হইত।[১২]

সার জন্ শোর ১৭৭১ হইতে ১৭৭৩ অব্দ পর্যন্ত মোতিঝিলে বাস করিয়াছিলেন। এইখানে তিনি প্রাচ্য ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন যে, এইখানে বাস করিয়া কপোতের মধুর শব্দ, কোকিলের

---

১১ Long's Selection, p. 439.

১২ ঐ সকল খেলাতের মধ্যে গবর্ণর ও কাউন্সিলের জন্য ৪৬,৭৫০ টাকার, নিজামতের জন্য ৩৮,৮০০ টাকার, খালসার কর্মচারিগণের জন্য ২২,৬৩৪ টাকার, নদীয়ার রাজাকে ৭,৩৫২ টাকার, বীরভূমের রাজাকে ১২০০, এবং বিষ্ণুপুরের রাজাকে ৭৩৪ টাকার খেলাত দেওয়া হইত।

কুহুধ্বনি ও সলিলরাশির কল কল রব শুনিতে শুনিতেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। বৈদেশিক ভ্রমণকারিগণ মোতিঝিলের রমণীয় দৃশ্য দেখিয়া মোহিত হইতেন। কিওর্সলি স্বীয় পত্রে মোতিঝিলের কথা লিখিয়াছেন। তিনি মোতিঝিলের প্রাসাদের ভিন্ন ভিন্ন চত্বর এবং ক্ষুদ্র ও অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ১৭৮৩ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর মাসে জেমস্ ফর্বেস মুর্শিদাবাদে আসিয়া মোতিঝিল দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি ইহার অশ্বপাদুকাবৎ আকার, সুন্দর উদ্যান ও প্রাসাদের কথা স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেই সময় হইতে ঐগুলির ভগ্নদশা উপস্থিত হয়।[১৩] মোতিঝিল অনেকদিন পর্যন্ত ইংরেজদিগের রাজকার্যসংক্রান্ত প্রধান স্থান ছিল। অনন্তর ১৭৮৫।৮৬ অব্দে মাদাপুর তাহার স্থান অধিকার করে।

মোতিঝিলের পশ্চিমতীরস্থ প্রাসাদ ক্রমে ভগ্নদশায় পতিত হইতেছিল দেখিয়া, নবাব মনসুর আলি খাঁর সময়ে রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেবের আদেশে উহা একেবারে ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। এক্ষণে কেবল তাহার ভিত্তিভূমি মাত্র অবশিষ্ট আছে। অদ্যাপি স্থানে স্থানে দুই-এক খণ্ড কৃষ্ণ মর্মর-প্রস্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে। নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁর কৃত মস্‌জেদটি এখনও তিনটি গম্বুজ মস্তকে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মস্‌জেদের প্রাঙ্গণে, একটি প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে ৪টি সমাধি বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে ২টি শ্বেত ও ১টি কৃষ্ণমর্মর প্রস্তরমণ্ডিত এবং অপরটি ইষ্টকনির্মিত। শ্বেতমর্মরমণ্ডিত সমাধি দুইটি নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁ ও এক্রাম উদ্দৌলার সমাধি। কৃষ্ণ মর্মরের সমাধিটি এক্রাম উদ্দৌলার শিক্ষকের। প্রাচীরের বাহিরে আর একটি ইষ্টকের সমাধি আছে। সেটি নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁর সেনাপতি সমসের আলি খাঁর। প্রাচীরের মধ্যস্থ ইষ্টকের সমাধিটি এক্রাম উদ্দৌলার ধাত্রীর। মস্‌জেদের নীচে মোতিঝিলের একটি বাঁধা ঘাট আছে ; তথায় বসিয়া মুর্শিদাবাদের নিষ্কর্মা পেন্সনভোগী মুসলমানগণ মৎস্যবংশ ধ্বংস করিয়া থাকেন। পূর্বে মোতিঝিলে অনেক মৎস্যের নাসিকায় মুক্তাসমন্বিত সোনার নত দেওয়া ছিল। মোতিঝিলের পশ্চিম-পার্শ্বস্থ প্রাচীন তোরণদ্বারের ভগ্নাবশেষ আজিও বিদ্যমান আছে। বর্তমান বৃক্ষবাটিকা তাহা হইতে দূরে অবস্থিতি করিতেছে। অশ্বপাদবৎ যে-ভূভাগ ঝিলবেষ্টিত, তাহার উত্তর ভাগে একখানি নূতন বাঙ্গালা নির্মিত হইয়াছে। বাঙ্গালাখানি দেখিতে অতি সুন্দর, পর পার হইতে উহা বড়ই মনোহর বোধ হয়। মোতিঝিলের নিকট ক্রিস্টফার কেটিং-এর শিশু পুত্র ইয়ান কেটিং-এর সমাধি আছে। সমাধিস্থ অঙ্কিত প্রস্তরখানি মস্‌জেদ বাটীতে রক্ষিত হইয়াছে।[১৪] ক্রিস্টফার কেটিং ১৭৭৪ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মুর্শিদাবাদ টাঁকশালের অধ্যক্ষ হন ; অনন্তর ১৭৯৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি আপীল আদালতের জজ হইয়াছিলেন। পূর্বে

১৩ Forbes's Oriental Memoirs (2d. Ed.), Vol. II, p. 449.

১৪ প্রস্তরখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে যে, ইয়ান কেটিং ১৭৭৯ খ্রীঃ অব্দের ২০শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন ও ১৭৮৮ খ্রীঃ অব্দের ৩রা মার্চ প্রাণ ত্যাগ করেন।

মসজেদবাটীতে অনেকগুলি ফকীর বাস করিত, অতিথিশালার ব্যয়-লাঘব হওয়ায় ফকীরগণ ১৭৮৯ খ্রীঃ অব্দে ব্যয়বৃদ্ধির জন্য নিষ্ফল আবেদন করিয়াছিল ; এক্ষণে স্থানটি প্রায় জনশূন্য।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, মোতিঝিলের পূর্ব তীরে কুমারপুর (কোঁয়ারপাড়া) নামক স্থানে রাধামাধব মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। রাধামাধবের স্নানযাত্রা এতদঞ্চলে সুপ্রসিদ্ধ ; সেই সময়ে কুমারপুরে একটি বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বৈষ্ণবচূড়ামণি পূজ্যপাদ জীবগোস্বামীর শিষ্যা হরিপ্রিয়া ঠাকুরাণী বৃন্দাবন হইতে কুমারপুরে আসিয়া ৺ রাধামাধবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।[১৫] সম্ভবতঃ সে সময়ে মোতিঝিল ভাগীরথীর গর্ভস্থ ছিল। রাধামাধবের অনেকগুলি দলিলপত্র তাঁহার বর্তমান সেবকের নিকট রহিয়াছে।[১৬] একখানি বাদশাহী ফারমান ছিন্ন অবস্থায় আজিও বর্তমান আছে। নবাব মহবৎ জঙ্গের (আলিবর্দীর) মৃত্যুর পর রাধামাধবের কতক ভূমি খাসমহালের গোমস্তা কর্তৃক বেদখল হওয়ায়, পরবর্তী নবাব (সম্ভবতঃ সিরাজউদ্দৌলা) তৎকালীন সেবক রূপনারায়ণ গোস্বামীকে তৎসমুদায় প্রত্যর্পণ করিতে অনুমতি দেন। রূপনারায়ণ হরিপ্রিয়া হইতে পঞ্চম সেবক। হরিপ্রিয়ার কৃত অতিথিশালার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। একটি একাকিনী মাধবীলতা বহুকাল হইতে আজিও জঙ্গলমধ্যে আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে। এই মন্দিরের সহিত মোতিঝিলের প্রাসাদের সম্বন্ধ ছিল ; আমরা এতদুপলক্ষে দুই-একটি গল্পের উল্লেখ করিতেছি।

এক্রাম উদ্দৌলার শোকে বিপ্রকৃতিস্থ হইয়া নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁ যৎকালে শান্তি-কামনায় মোতিঝিলের প্রাসাদে বাস করিতেন, সেই সময়ে তিনি প্রতিনিয়ত মন্দিরের শঙ্খঘণ্টার শব্দে বিরক্ত হইয়া স্বীয় অনুচরদিগকে গোস্বামীর নিকট খানা পাঠাইতে বলেন।[১৭] তিনি ভাবিয়াছিলেন, বলপূর্বক তাহাদিগকে বিদূরিত না করিয়া, এইরূপ কৌশল অবলম্বন করিলে, তাহারা চলিয়া যাইতে বাধ্য হইবে। খানা তদানীন্তন গোস্বামীর নিকট উপস্থিত হইলে, গোস্বামী তাহার আবরণ উন্মোচন করিতে বলিলেন ; আবরণ উন্মোচন করিয়া দেখা হইল যে, তাহা যূ'ই ফুলের মালা হইয়াছে। নওয়াজেস্

১৫ রাধামাধবের সেবক রাইমোহন গোস্বামী বলেন যে, হরিপ্রিয়া ঠাকুরাণী কুমারপুরে প্রথম আগমন করিয়াছিলেন। হরিপ্রিয়ার সেবাধিকারী বংশীবদন গোস্বামীর প্রথম আগমনের কথাও কাহারও কাহারও মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। হরিপ্রিয়া হইতে রাইমোহন একাদশ সেবক। ইঁহারা বঙ্গজ কায়স্থ ঘোষবংশসম্ভূত। রাধামাধবের সেবকগণের বিবাহ নিষিদ্ধ।

১৬ আমরা বাঙ্গলা ১০৯৯, ১১০৪, ১১১৫, ১১২০. ১১৫৪, ১১৯৩ প্রভৃতি সালের দলিল দেখিয়াছি। বাদশাহী ফারমান ও অন্যান্য কাগজপত্রও দেখিয়াছি।

১৭ রাধামাধবের সেবকগণ বলিয়া থাকেন, যে "পাগলা নবাব" সিংদালান নির্মাণ করেন, তিনিই এইরূপ খানা পাঠাইয়াছিলেন। সিংদালান নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁ কর্তৃক নির্মিত হয়, এবং এক্রাম উদ্দৌলার মৃত্যুর পর তিনি বিপ্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন, এইজন্য আমরা এখানে

মহম্মদ খাঁ তাহাতে বিশ্বাস না করিয়া স্বহস্তে পুনর্বার খানা পাঠাইয়া দেন ; খানা সে বারও যূঁইফুলের মালা হইল। তখন তিনি অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইলেন। তদবধি তিনি গোস্বামীকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। এক সময়ে গোস্বামীদিগের অনুরোধে তিনি এরূপ আদেশ দিয়াছিলেন যে, মন্দিরের নিকটস্থ চারিটি ঘাটের সীমার মধ্যে কেহ মৎস্য বা পক্ষী বধ করিতে পারিবে না।[১৮] এইরূপ অনেক প্রবাদে ও গল্পে মোতিঝিলের উভয়তীরস্থ ভূমি পরিপূর্ণ। বহুদিনের প্রাচীন স্থান হইলে, এইরূপে তাহা হইতে অনেক গল্পের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

আমরা মোতিঝিলের প্রবাদমূলক ও ঐতিহাসিক বিবরণ যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম। মুসলমানরাজত্বের সমাধিক্ষেত্র মুর্শিদাবাদে ভ্রমণ করিলে, এখনও তাহার অতীত গৌরবের অনেক বিবরণ অবগত হওয়া যায়। যদিও কালের কঠোর হস্তে ইহার প্রায় সমস্ত গৌরব-চিহ্নই ধরণীপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া গিয়াছে, তথাপি যাহা কিছু ভগ্নাবশেষ আছে, তাহার মধ্যে দাঁড়াইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলে, অতীতের অনেক মনোমোহিনী ছবি মানসচক্ষের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। আমরা মুসলমান-গৌরবের সমাধিক্ষেত্রে ভ্রমণ করিয়া গুরুভারাক্রান্ত-হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগত হই। অবশেষে ইংরেজরাজত্বের গৌরবপ্রবাহের মধ্যে আত্মবিসর্জন দিয়া গুরুভারের লাঘব করিয়া থাকি।

তাঁহারই নাম নির্দেশ করিলাম। কেহ কেহ এই খানা প্রেরণসম্বন্ধে অন্যান্য নবাবদের নাম করিয়া থাকেন।

১৮ উক্ত আদেশপত্র অনেক দিন পর্যন্ত গোস্বামীদের নিকট ছিল ; এক্ষণে তাঁহাদের নিকট নাই। তাহা দেখিলে কাহার দত্ত আদেশপত্র বেশ বুঝা যাইত। কিন্তু এক্ষণে তাহার কোন উপায় নাই।

হীরাঝিল

সিরাজের সাধের হীরাঝিল এবং তদুপরিস্থিত প্রাসাদ অনেক দিন হইতে কাল-গর্ভে নিমগ্ন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহার নিজ স্মৃতি যেমন বিস্মৃতির প্রগাঢ় অন্ধকারময় অনন্ত গর্ভে চিরনিদ্রিত রহিয়াছে, সেইরূপ তাঁহার প্রাসাদাদির চিহ্নও কাল-সমুদ্রে নিমগ্ন হইতে হইতে না জানি কোন্ অনিশ্চিত দেশে আশ্রয় লইতেছে। বিধাতার ইচ্ছা, মুর্শিদাবাদের সহিত সিরাজের সকল সম্বন্ধ ঘুচিয়া যায়। যে হতভাগ্য অতুলনীয় রূপরাশি ও অতুল সম্পত্তি লাভ করিয়াও সংসারে দুই দিন ভোগ করিতে পাইল না, তাহার আর স্মৃতিচিহ্ন থাকিবার প্রয়োজন কি? মুর্শিদাবাদ তাহার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর হইলেও, হতভাগ্যের প্রদত্ত অলঙ্কার সে অনায়াসে ভাগীরথীজলে বিসর্জন দিতে পারে। তাই কাল একে একে মুর্শিদাবাদের সকল অলঙ্কারগুলি খুলিয়া কতক বা ভাগীরথীজলে, কতক বা বসুন্ধরাহৃদয়ে মিশাইয়া দিয়াছে। যদিও সকলের প্রদত্ত অলঙ্কার-রাশি মুর্শিদাবাদনগরী একে একে উন্মোচন করিতেছে, তথাপি যাহার দ্বারা সিরাজ তাহাকে শোভাশালিনী করিয়াছিলেন, সেইগুলি কালপ্রবাহে ভাসাইয়া দেওয়া তাহার সর্বতোভাবে যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে। কারণ, সিরাজ যে তাহাকে প্রাণ অপেক্ষাও অধিক ভালবাসিতেন এবং তাহাকে সৌন্দর্যময়ী করিবার জন্য প্রতিনিয়ত যত্ন পাইয়াছিলেন।

সিরাজ বড় সাধ করিয়া হীরাঝিল ও তাহার উপরিস্থিত প্রাসাদের নির্মাণ করেন। বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার অধীশ্বর হইয়া সেই প্রাসাদে মহানন্দে জীবন যাপন করিবার ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে অত্যন্ত বলবতী হইয়াছিল। কিন্তু বিধাতার বিচারে সিংহাসনারোহণের কিঞ্চিদধিক এক বৎসর পরে তিনি ইহজগৎ হইতে চিরবিদায় লইতে বাধ্য হন। সিরাজের যৌবরাজ্যকালে হীরাঝিলের প্রাসাদ নির্মিত হয়। মোগলসম্রাট্‌দিগের মধ্যে বাদশাহ শাজাহানের ন্যায় মুর্শিদাবাদের নবাবদিগের মধ্যে সিরাজেরও সৌন্দর্যপ্রীতির কথা শুনা যায়। মুর্শিদাবাদের দ্বিতীয় নবাব সুজা উদ্দীনেরও সৌন্দর্যপ্রিয়তা ছিল বটে, কিন্তু সিরাজ তাঁহার সে প্রীতিকে অনেক পরিমাণে অতিক্রম করিয়াছিলেন। সৌন্দর্যপ্রীতি অনেক সময়ে বিলাসিতার সহিত বিমিশ্রিত থাকিলেও, বিমল সৌন্দর্যপ্রীতি দেবতারও বাঞ্ছনীয়। যদিও সিরাজ-হৃদযে তাহা বিলাসাবরণে আচ্ছাদিত ছিল, তথাপি সময়ে সময়ে তাহাকে আবরণোন্মুক্তও দেখা গিয়াছে।

হীরাঝিলের প্রাসাদ মুর্শিদাবাদের মধ্যে অতি মনোরম দৃশ্য ছিল। ঝিলের হীরকস্বচ্ছ সলিলরাশি তাহার পদপ্রান্ত চুম্বন করিয়া বেড়াইত এবং স্বীয় বক্ষে তাহার প্রতিচ্ছবি লইয়া ঈষৎ সমীরতাড়নেও কাঁপিয়া উঠিত। যখন জ্যোৎস্নালোকে বিধৌত হইয়া সেই সৌন্দর্যসারভূত প্রাসাদরত্ন হাসিতে হাসিতে ঝিলসলিলের ক্রীড়া নিরীক্ষণ করিত, সেই সময়ে কিছু দূরে ভাগীরথীবক্ষ হইতে তাহার অপূর্ব শোভা

দেখিলে, মনঃপ্রাণ প্রফুল্ল হইয়া উঠিত। এই সুন্দর প্রাসাদে সিরাজ যৌবনসুলভ আমোদোপভোগ করিতে আরম্ভ করেন। আলিবর্দী খাঁর সহিত প্রতিনিয়ত অবস্থান করায়, তাঁহার বিলাসোপভোগের তাদৃশ সুযোগ ঘটিয়া উঠিত না ; এজন্য হীরাঝিলের প্রাসাদে সেই পিপাসা মিটাইতে তাঁহার অত্যন্ত ইচ্ছা হয়। দিব্যাঙ্গনাতুল্য কোকিল-কণ্ঠী নর্তকীবৃন্দ লইয়া তিনি সেই প্রাসাদে বিলাসতরঙ্গে ভাসমান থাকিতেন এবং আসবপানে বিভোর হইয়া তাহাদের মধুর সঙ্গীতে অধিকতর আবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। সিংহাসনপ্রাপ্তির পূর্বে, মাতামহের অনুরোধে, সিরাজ সুরাপান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি যৌবনারম্ভে অত্যন্ত সুরাসক্ত ছিলেন। কখনও বা মোসাহেব ও অনুচরবর্গের তোষামোদবাক্যে এবং বিদূষক বা কাহিনীকথকদিগের রহস্যালাপে বিমল আনন্দ অনুভব করিতেন। সময়ে সময়ে নর্তকী ও মোসাহেববৃন্দ লইয়া সুসজ্জিত সাধের তরণীতে আরোহণপূর্বক হীরাঝিলের স্বচ্ছ সলিলরাশি আন্দোলিত করিয়া বেড়াইতেন। জ্যোৎস্নাবিধৌত যামিনীতে ঝিলবক্ষোবিহারিণী তরণী হইতে যখন নর্তকীগণের কণ্ঠধ্বনি দিগন্ত স্পর্শ করিতে ধাবিত হইত, তখন তাহাদের মধুর চুম্বনে ভাগীরথীর তরঙ্গলহরীও যেন মূর্ছিত হইয়া তীরক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িত।

এই প্রাসাদেই সিরাজউদ্দৌলা তাঁহার মনোমোহিনী ফৈজীর রূপসুধা পান করিয়া উন্মত্ত হইতেন এবং অবশেষে তাহার বিশ্বাসঘাতকতায় তাহাকে সজীবাবস্থায় গৃহাবদ্ধ করেন। এই স্থানেই তিনি স্বীয় প্রিয়তমা মহিষী লুৎফ উন্নেসার সহিত পবিত্র প্রণয় উপভোগ করিয়াছিলেন এবং রাজ্যপ্রাপ্তির পূর্ব হইতেই একে একে সকলপ্রকার বিলাস-বিভ্রম বিসর্জন দিতে আরম্ভ করিয়া, আলিবর্দীর সিংহাসনের পবিত্রতা রক্ষার্থ যত্নশীল হইয়াছিলেন। হীরাঝিলের প্রাসাদকে দেশীয়গণ মনসুরগঞ্জের প্রাসাদ বলিয়া থাকেন। সিরাজ উক্ত প্রাসাদে মসনদ স্থাপন করিয়া দরবারকার্য সমাধা করিতেন। ফলতঃ রাজকার্য হইতে সামান্য আমোদপ্রমোদ পর্যন্ত সিরাজের সমস্ত ব্যাপারই হীরা-ঝিলের প্রাসাদে সম্পাদিত হইত। সিরাজের সেই সাধের হীরাঝিল এক্ষণে ভাগীরথীর সহিত মিশিয়া গিয়াছে এবং তাহার উপরিস্থ প্রাসাদও কালগর্ভে নিমগ্ন হইয়াছে। দুই-একটি চত্বরের ভিত্তিভূমি গভীর জঙ্গলসমাবৃত হইয়া এখনও তাহার স্থান নির্দেশ করিয়া দিতেছে। আমরা এ স্থলে হীরাঝিলের নির্মাণ হইতে আরম্ভ করিয়া, তাহার সহিত সংসৃষ্ট প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

আলিবর্দী খাঁ ভাগীরথীর পূর্ব তীরের প্রাসাদে বাস করিতেন। মুর্শিদাবাদের যে-স্থানকে সাধারণতঃ নিজামত কেল্লা বলিয়া থাকে, সেই স্থানে বহুদিন নবাবদিগের প্রাসাদ ছিল। সৌন্দর্যপ্রিয় সিরাজ তথা হইতে অন্য কোন স্থানে একটি মনোরম প্রাসাদনির্মাণের কল্পনা করেন। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বর্তমান জাফরাগঞ্জের সম্মুখভাগে তাহার স্থান নির্ণীত হয়। হিন্দু ও মুসলমান-গৌরবের সমাধিস্থল গৌড়

ফৈজীর বিবরণ লুৎফ উন্নেসা নামক প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য

হইতে নানাবিধ প্রস্তরাদি আনীত হইয়া প্রাসাদের সৌন্দর্যবৃদ্ধির চেষ্টা করা হইয়াছিল। প্রাসাদ সাধারণতঃ ইষ্টকে নির্মিত হয়। কিন্তু স্থানে স্থানে প্রস্তর বসাইয়া সিরাজ তাহাকে শোভাশালী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রাসাদের তরঙ্গায়িত পলগুলি কার্ণিসের অপরিসীম সৌন্দর্য বিস্তার করিত। ভিন্ন ভিন্ন চত্বরে প্রাসাদটি বিভক্ত হয়, অথবা এক-একটি পৃথক্ চত্বরই, এক-একটি বিভিন্ন প্রাসাদে পরিণত হয়। কোনটি এমৃতাজ মহাল, কোনটি বা রঙ্গমহাল প্রভৃতি নামে অভিহিত হইত। সেই সুন্দর প্রাসাদ এতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল যে, কাহারও কাহারও মতে তাহাতে তিনটি ইউরোপীয় নরপতি অনায়াসে বাস করিতে পারিতেন।[২]

প্রাসাদের প্রান্তদেশে একটি কৃত্রিম ঝিল খনন করিয়া, তাহাকে হীরাঝিল নাম প্রদান করা হইয়াছিল। সম্ভবতঃ নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁর মোতিঝিলের অনুকরণে সিরাজের হীরাঝিল হইয়া থাকিবে। ঝিলের উভয় পার্শ্ব ইষ্টকদ্বারা বাঁধান হয়। এই সুচারু প্রাসাদের নির্মাণ শেষ হওয়ার পূর্বে সিরাজ মাতামহ আলিবর্দী খাঁকে প্রাসাদ-দর্শনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। বৃদ্ধ নবাবের সহিত অনেক কর্মচারী, রাজা, জমিদার ও জমিদারদিগের প্রতিনিধিগণও ভাবী নবাবের সুরম্য প্রাসাদ দেখিতে অগ্রসর হইলেন। নবাব আলিবর্দী খাঁ প্রাসাদ দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হন। তাঁহার অনুচরবর্গও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, সিরাজের রুচির ভূয়সী প্রশংসা করিতে থাকেন। কেহ বা ভিন্ন ভিন্ন চত্বরের, কেহ বা সুরম্য কক্ষশ্রেণীর, কেহ বা পলতোলা কার্নিসের এবং কেহ বা হীরাঝিলের প্রশংসায় সিরাজের বালসুলভ চঞ্চল অন্তরকে অধিকতর স্ফীত করিয়া তুলেন। যখন সকলে ভিন্ন ভিন্ন চত্বরে বা প্রকোষ্ঠে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন সেই সময় বৃদ্ধ নবাব কোন একটি প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, সিরাজ মাতামহের সহিত কৌতুকচ্ছলে তাঁহাকে সেই প্রকোষ্ঠমধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন। নবাব দৌহিত্রের রহস্য বুঝিতে পারিয়া বলিলেন যে, আজ তোমারই জয় হইয়াছে, এক্ষণে তোমাকে কি উপহার দিলে আমাকে মুক্ত করিয়া দিবে? সিরাজও হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন যে, আমার প্রাসাদের জন্য কোন বন্দোবস্ত না করিলে, ইহার নির্মাণ শেষ ও সৌন্দর্য রক্ষা হইবে না। তজ্জন্য ইহার কোনরূপ উপায় বিধান করিতে হইবে।

নবাবের প্রকোষ্ঠমধ্যে রুদ্ধ হওয়ার কথা শুনিয়া, ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে তাঁহার সমস্ত অনুচরবর্গ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। সিরাজ তাঁহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন যে, এই সকল জমিদার ও জমিদারদিগের প্রতিনিধির নিকট হইতে একটি

২ "That palace which was on other side of the Bagratty and contained lodgings enough for three. European Kings is now ruined." Mutaqherin Trans., Vol. II, p. 28. Note. ইহা একজন ইউরোপীয়ের উক্তি। মুতাক্ষরীনের অনুবাদক একজন ফরাসী ছিলেন, পরে ইনি মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হন।

করের ব্যবস্থা করা হউক। নবাব সন্তুষ্টচিত্তে তাহাতে সম্মত হইয়া হীরাঝিলের প্রাসাদের জন্য যে কেবল কর নির্দেশ করিলেন এমন নহে, কিন্তু সিরাজের জন্য একটি গঞ্জও স্থাপন করিয়া দিলেন। কথিত আছে, এই সময়ে ৫,০১,৫৯৭ টাকার আবওয়াব আদায় হয়।[৩] সিরাজের মনসুর উল মোল্ক উপাধি হইতে প্রাসাদের নাম মনসুরগঞ্জের প্রাসাদ এবং নবস্থাপিত গঞ্জটিও মনসুরগঞ্জ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। যে-স্থলে গঞ্জটি স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাকে অদ্যাপি মনসুরগঞ্জ বলিয়া থাকে। দেশীয় গ্রন্থকারগণ সিরাজউদ্দৌলার প্রাসাদকে মনসুরগঞ্জের প্রাসাদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন[৪] কিন্তু ইউরোপীয়গণ সাধারণতঃ তাহাকে হীরাঝিলের প্রাসাদ বলিতেন।[৫]

হীরাঝিলের প্রাসাদ নির্মাণ হইলে, যুবরাজ সিরাজ মুর্শিদাবাদে অবস্থানকালে সেই খানেই বাস করিয়া আমোদপ্রমোদে কাল অতিবাহিত করিতেন। কেল্লার মধ্যে থাকিলে বিলাসোপভোগের তাদৃশ সুবিধা হইত না বলিয়া, হীরাঝিলের প্রাসাদে বাস করাই তাঁহার একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তথায় তাঁহার সমস্ত জীবন অতিবাহিত হয়। তিনি নবাব হইলেও, কেল্লা পরিত্যাগ করিয়া, মনসুরগঞ্জে মসনদ স্থাপন-পূর্বক রাজকার্য নির্বাহ করিতেন। তাহার পর রাজ্যচ্যুত হইয়া, তিনি কিয়ৎপরিমাণ সম্পত্তি লইয়া, প্রিয়তমা মহিষী লুৎফ উন্নেসার সহিত ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দের ২৪শে জুন শুক্রবার রাত্রিতে সাধের হীরাঝিলের প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদ হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। তৎপরে আর সিরাজকে হীরাঝিলের প্রাসাদে পদার্পণ করিতে হয় নাই। ধৃত হইয়া তিনি মুর্শিদাবাদে আনীত ও জাফরাগঞ্জে নিহত হন।

সিরাজউদ্দৌলার পলায়নের পূর্বেই মীরজাফর পলাশীপ্রান্তর হইতে আসিয়া মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হন। সিরাজের পলায়নের কথা শুনিয়া তিনি মনসুরগঞ্জের প্রাসাদ অধিকার করেন। কিন্তু ক্লাইবের আগমনের পূর্বে মসনদে উপবিষ্ট হন নাই। ক্লাইব পলাশী হইতে প্রথমে দাদপুরে, পরে বহরমপুরের নিকট মাদাপুরে শিবির সন্নিবেশ করেন। তাহার পর ২৯শে জুন পর্যন্ত কাশিমবাজারে অপেক্ষা করিয়া, ঐ দিবস মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হন। হীরাঝিলের উত্তরে মোরাদবাগে তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়। মোরাদবাগ হইতে ক্লাইব মনসুরগঞ্জের প্রাসাদে মীরজাফরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। মনসুরগঞ্জের প্রাসাদের দরবারগৃহের উত্তর দিকে বিশাল নবাবী মসনদ স্থাপিত ছিল; সিরাজ সেই মসনদে বসিতেন। ক্লাইব মীরজাফরের হস্ত ধারণ করিয়া মসনদের উপর উপবেশন করাইয়া, নূতন নবাবকে এক পাত্র মোহর নজর প্রদান করিলেন।[৬] পরে অন্যান্য ইংরেজ ও দেশীয় কর্মচারী এবং সম্ভ্রান্ত জনগণ

৩ Grant's Analysis of the Finances of Bengal. 5th Report, p. 215.

৪ Mutaqherin and Riyaz-us-salatin.

৫ Orme and Vansitart

৬ Mutaqherin, Vol. I, also Orme, Vol. II, p. 181.

তাঁহাকে যথারীতি নজর প্রদান করিলে, মীরজাফর সমস্ত নগরে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব বলিয়া বিঘোষিত হইলেন।

মীরজাফরের মসনদে উপবেশন করার পর, হীরাঝিলের প্রাসাদস্থিত সিরাজ-উদ্দৌলার ধনাগারলুণ্ঠনের ব্যবস্থা হইল। মীরজাফর, ক্লাইব, তাঁহার সহকারী ওয়াল্‌শ, কাশীমবাজারের ওয়াট্স, লশিংটন, দেওয়ান রামচাঁদ এবং মুন্সী নবকৃষ্ণ[৭] প্রভৃতি সেই কোষাগারলুণ্ঠনের সময় উপস্থিত ছিলেন। সিরাজউদ্দৌলার এই প্রকাশ্য ধনাগারে ১ কোটি ৭৬ লক্ষ রৌপ্যমুদ্রা, ৩২ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা[৮], দুই সিন্ধুক অমুদ্রিত স্বর্ণপিণ্ড, ৪ বাক্স অলঙ্কারে ব্যবহারোপযোগী হীরা, জহরত ও ২ বাক্স অখচিত চুণী, পান্না প্রভৃতি প্রস্তরখণ্ড মাত্র থাকার উল্লেখ দেখা যায়। এই প্রকাশ্য ধনাগার ব্যতীত সিরাজ-উদ্দৌলার অন্তঃপুরস্থ আর একটি ধনভাণ্ডারের কথা কেহ কেহ উল্লেখ করিয়া থাকেন। তৎকালে অর্থশালী ভারতবাসীমাত্রেই নিজ নিজ অন্তঃপুরে একটি স্বতন্ত্র ধনাগার স্থাপন করিতেন। নবাব-বাদশাহের তো কথাই নাই। কথিত আছে যে, সিরাজউদ্দৌলার অন্তঃপুরস্থ ধনাগার মধ্যে ৮ কোটি টাকা সঞ্চিত ছিল। ইংরেজেরা নাকি তাহার কোনও সন্ধান পান নাই। তাহা মীরজাফর, তাঁহার কর্মচারী আমীর বেগ খাঁ, রামচাঁদ ও নবকৃষ্ণের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। রামচাঁদ পলাশীযুদ্ধের সময় মাসিক ৬০ টাকা বেতনে কার্য করিতেন; কিন্তু তাহার দশ বৎসর পরে মৃত্যুকালে তাঁহার নগদে ও হুণ্ডীতে ৭২ লক্ষ টাকা, ৪০০টি বড় বড় সোনার ও রূপার কলস থাকার উল্লেখ দেখা যায়। তন্মধ্যে ৮০টি সোনার ও অবশিষ্টগুলি রৌপ্যনির্মিত। এতদ্ব্যতীত তাঁহার ১৮ লক্ষ টাকার জমিদারী ও ২০ লক্ষ টাকার জহরতও ছিল। নবকৃষ্ণও মাসে ৬০ টাকা বেতন পাইতেন, তিনিও নাকি মাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।[৯] মীরজাফরের প্রিয়তমা ভার্যা মণি বেগমও হীরাঝিলের প্রাসাদলুণ্ঠনলব্ধ অর্থেই অগাধ সম্পত্তির অধীশ্বরী হন। তাঁহার যাবতীয় হীরা, জহরত এই লুণ্ঠন হইতেই লব্ধ।

রামচাঁদ ও নবকৃষ্ণ যে-সমস্ত অর্থ পাইয়াছিলেন, যদি ক্লাইব তাহা জানিতে

৭ রামচাঁদ আন্দুলরাজবংশের ও নবকৃষ্ণ শোভাবাজার-রাজবংশের আদিপুরুষ।

৮ হণ্টার ভ্রমক্রমে ২ কোটি ৩০ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার কথা লিখিয়াছেন।

৯ Mutaqherin Trans., Vol. I, p. 773, Note. মহারাজ নবকৃষ্ণের জীবনী-প্রণেতা শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রনাথ ঘোষ বলিয়াছেন যে, মার্স‌ম্যান সাহেব ব্যতীত তৎপূর্বে আর কেহ নবকৃষ্ণের ৬০ টাকা বেতন ও মাতৃশ্রাদ্ধে ৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ের কথা বলেন নাই। ঘোষ মহাশয় অষ্টাদশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক উপকরণের যে বিশিষ্টরূপ অনুসন্ধান করিয়াছেন এরূপ বোধ হয় না। তাহা হইলে ঐরূপ কথা লিখিতে সাহসী হইতেন না। মুতাক্ষরীনের অনুবাদক ঐ কথা বলিয়া গিয়াছেন। ১৭৮৯ খ্রীঃ অব্দে মুতাক্ষরীনের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। অনুবাদ কলিকাতায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল, তৎকালে রাজা নবকৃষ্ণ জীবিত। সুতরাং অনুবাদক ও নবকৃষ্ণ সমসাময়িক। রাজা নবকৃষ্ণের সময় হইতেই যে এ কথা চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে আর তাহার অংশ পাইতে হইত না ; সমস্তই সেই ব্রিটিশপুঙ্গবের হস্তগত হইত। মীরজাফরের নিকট হইতে ইংরেজেরা ৩,৩৮,৮৫,৭৫০ টাকা লাভ করেন। কিন্তু একবারে সমস্ত টাকা দেওয়া হয় নাই ; ঐ টাকার অধিকাংশ সিরাজের প্রকাশ্য ভাণ্ডার হইতে দেওয়া হয়। কথিত আছে যে, ধনাগার উন্মুক্ত হইবামাত্র তাহা হইতে ৮০ লক্ষ টাকা নৌকাযোগে কলিকাতায় রওনা হইয়াছিল।[১০] ইংরেজসাধারণের প্রাপ্য অর্থ হইতে একা ক্লাইব সাহেবই ২৩ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপে সিরাজের সমস্ত সম্পত্তি বিভক্ত হইয়া যায়। সিরাজের প্রাসাদ ধনে পরিপূর্ণ থাকায় বর্তমান সময় পর্যন্ত এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, ভগ্নাবশিষ্ট প্রাসাদের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে এখনও অনেক অর্থ পাওয়া যাইতে পারে।

মীরজাফর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া প্রথমে হীরাঝিলের প্রাসাদেই বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু তথায় তিনি অধিক কাল বাস করেন নাই ; কিছুকাল পরে, ভাগীরথীর পূর্বতীরে কেল্লামধ্যে আলিবর্দীর প্রাসাদে[১১] আসিয়া বাস করেন। নবাব হওয়ার পূর্বে জাফরাগঞ্জের প্রাসাদ তাঁহার আবাস-স্থান ছিল ; কিন্তু মসনদে উপবেশন করার পর, স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র মীরণকে জাফরাগঞ্জের প্রাসাদ দান করা হয়। মীরণের বংশধরেরা অদ্যাপি তথায় বাস করিতেছেন। মীরণের বংশধরেরা জাফরাগঞ্জের প্রাসাদ অধিকার করায়, নূতন নবাব আর তথায় গমন করেন নাই। তিনি মুর্শিদাবাদ-কেল্লার মধ্যস্থিত আলিবর্দীর প্রাসাদে আসিয়াই বাস করেন।

গবর্নর ভান্সিটার্ট মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া, মীরকাসেমকে মসনদ প্রদান করেন। ভান্সিটার্ট মীরজাফরকে হীরাঝিলের প্রাসাদে বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন।[১২] কিন্তু মীরজাফর তাহাতে সম্মত না হইয়া, স্বীয় প্রিয়তমা ভার্যা মণি বেগমের সহিত কলিকাতায় আসিয়া চিৎপুরে বাস করেন।

মীর কাসেমের সহিত যখন ইংরেজদিগের বিবাদ আরম্ভ হয়, সেই সময়ে মীর কাসেম জগৎশেঠদিগকে ইংরেজদিগের পক্ষপাতী জানিয়া, তাঁহাদিগকে বন্দী করিয়া মুঙ্গেরে পাঠাইবার জন্য বীরভূমের ফৌজদার মহম্মদ তকী খাঁকে আদেশ দেন। মহম্মদ তকী খাঁ শেঠদিগকে প্রথমত হীরাঝিলের প্রাসাদে বন্দী করিয়া রাখেন। পরে মুঙ্গের হইতে নবাবের প্রেরিত লোক উপস্থিত হইলে, তাহাদের হস্তে তাঁহাদিগকে সমর্পণ করেন।

ইহার পর হইতে আর হীরাঝিল সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ দেখা যায় না। এক্ষণে সে প্রাসাদ কালগর্ভে অন্তর্হিত। মীরজাফরের সময় হইতেই তাহা

১০ Hunter's Statistical Account of Murshidabad, p. 188.

১১ আলিবর্দীর প্রাসাদকে লোকে সিরাজের প্রাসাদ বলিত। Mutaqherin, Vol. II, Note, p. 28.

১২ Vansitart's Narrative, Vol. I, p. 124.

ভগ্নদশায় পতিত। ইহার উপকরণ লইয়া মধ্যস্থিত অনেক প্রাসাদ ও অন্যান্য লোকের অনেক অট্টালিকাদি নির্মিত হইয়াছিল।[১৩] জাফরাগঞ্জের পর পারে অদ্যাপি তাহার কিছু কিছু চিহ্ন রহিয়াছে। হীরাঝিল ভাগীরথীর সহিত মিশিয়া গিয়াছে; কেবল তাহার পোস্তার কিয়দংশ ও একটি পয়ঃপ্রণালীর নিদর্শন ভাগীরথীর জলাপসরণে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। সিরাজউদ্দৌলার প্রাসাদকে সাধারণে লালকুঠি বলিত। সে প্রাসাদের অধিকাংশই বিলুপ্ত; কেবল এম্‌তাজ মহাল-নামক চত্বরের ভিত্তির কিঞ্চিৎ ভগ্নাবশেষ আজিও বর্তমান আছে। পশ্চিম পার্শ্বের ভিত্তিটি সম্পূর্ণ আছে। পূর্ব পার্শ্বের সমস্ত ভিত্তি উত্তর-দক্ষিণে দৈর্ঘ্যে প্রায় ১২৫ হস্ত হইবে, পূর্ব-পশ্চিমেও সম্ভবতঃ তাহাই ছিল: কিন্তু ভাগীরথীস্রোতে ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, এক্ষণে কেবল উত্তর-দক্ষিণে, দুই পার্শ্বেই প্রায় ৭৫ হস্ত মাত্র অবশিষ্ট আছে। এই চত্বরের মধ্যস্থলে একটি গৃহের ভিত্তি অদ্যাপি বিরাজমান আছে, তাহা দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সমান ও প্রায় ৩০ হস্ত হইবে। এই সকল ভিত্তি এক্ষণে নিবিড় জঙ্গলে আবৃত, আম্র প্রভৃতি দুই-একটি বৃহৎ বৃক্ষও তাহাদের উপর জন্মগ্রহণ করিয়াছে। দুই-একটি পথশ্রান্ত পক্ষী সময়ে সময়ে সেই সকল বৃক্ষের শাখায় বসিয়া সিরাজের সাধের ভবনের ভগ্নাবশেষ দেখিবার জন্য বিষাদপূর্ণ কণ্ঠে পথিকদিগকে আহ্বান করিয়া থাকে।

সিরাজউদ্দৌলার সমস্ত চিহ্নই প্রায় মুর্শিদাবাদ হইতে লয় পাইয়াছে; কেবল ভাগীরথীর পূর্বতীরে তাঁহার নির্মিত মদীনাটি ও সিরাজউদ্দৌলার বাজার প্রভৃতি দুই-একটি স্থান অদ্যাপি তাঁহার ক্ষীণ স্মৃতি আনয়ন করিয়া দেয়। আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, হীরাঝিলের প্রাসাদনির্মাণের সময় আলিবর্দী খাঁ সিরাজউদ্দৌলার জন্য একটি গঞ্জ স্থাপিত করিয়া দেন এবং তাহার নাম মনসুরগঞ্জ হয়। যে-স্থলে গঞ্জটি স্থাপিত হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহাকে মনসুরগঞ্জ বলে। মনসুরগঞ্জ আজিমগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন হইতে প্রায় এক ক্রোশ দক্ষিণে এবং হীরাঝিলের ভগ্নাবশেষ হইতেও বড় অধিক দূর নহে। হীরাঝিল হইতে প্রায় অর্ধ ক্রোশ উত্তরে মোরাদবাগ অবস্থিত ছিল। রেনেলের কাশীমবাজার দ্বীপের মানচিত্রে হীরাঝিল ও মোরাদবাগ উভয়ের নির্দেশ দেখা যায়। মুর্শিদাবাদের মধ্যে মোরাদবাগ ও মোতিঝিল ইংরেজদিগের প্রিয় বাসস্থান ছিল; পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইব মোরাদবাগে আসিয়া অবস্থান করেন। মীরজাফরের পুত্র মীরণ এইখানে তাঁহার অভ্যর্থনায় নিযুক্ত ছিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংস মুর্শিদাবাদের রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইয়া মোরাদবাগেই বাস করিয়াছিলেন। মীরজাফরকে অপসারিত করিয়া মীর কাসেমের হস্তে রাজ্যভার দিবার জন্য ভান্সিটার্ট মোরাদবাগেই আসিয়া বাস করেন।

হীরাঝিলের অব্যবহিত দক্ষিণে একটি ভবনের কিছু কিছু চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় একটি গৃহের ভিত্তি ও দেওয়ালের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

১৩. Mutaqherin, Trans., Vol. II, Note, p. 28.

এই ভবনটি রাজা মহেন্দ্র বা রায়দুর্লভের। রায়দুর্লভ সিরাজের রাজত্বকালে মন্ত্রীর কার্য করিয়াছিলেন এবং মীরজাফরের সময়েও দেওয়ানের পদে অভিষিক্ত হন। হীরাঝিলের নিকটেই তাঁহার বাসভবন ছিল। গৃহটির ভগ্নাবশেষ ব্যতীত ভবনের চতুর্দিকেই ইষ্টকরাশি বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। ভূগর্ভপ্রোথিত সোপানাবলীর কয়েকটি সোপানও দৃষ্টিপথে পতিত হয়। মহেন্দ্র সায়ার নামে একটি নাতিদীর্ঘ পুষ্করিণী রাজা মহেন্দ্র বা রায়দুর্লভের নাম ঘোষণা করিতেছে। বর্ষাকালে তাহার সহিত ভাগীরথীর সংযোগ হয়। এক্ষণে কৃষকগণ রায়দুর্লভের সেই বাসভবনের ভূমি কর্ষণ করিয়া শস্য বপন করিতেছে। কালে সমস্ত মুর্শিদাবাদের যে উক্ত দশা না হইবে, ইহা কে বলিতে পারে!

লুৎফ উন্নেসা

সংসার-মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকারাশির প্রচণ্ড তাপে মানবজীবন অভিভূত হইয়া পড়িলে, একমাত্র স্নেহময়ী রমণীর সজীব সুস্নিগ্ধ করুণাধারাই তাহাকে শীতল করিয়া তুলে। ফল্গুনদীর ন্যায় সে ধারা এই ভীষণ মরুভূমির তলে তলে নীরবে প্রবাহিত হয়,—কেহ তাহাকে সহজে দেখিতে পায় না। কিন্তু যখনই দুর্ভাগ্যের প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবাত দুঃখ ও নিরাশার অগ্নিময় ধূলিরাশি উড়াইয়া জীবনকে প্রতিনিয়ত দগ্ধ করিতে থাকে, তখনই সেই স্বর্গীয় ধারা শত মন্দাকিনীর ন্যায় ছুটিতে আরম্ভ করে এবং অধঃপতিত মানবের আত্মাকে, কারুণ্য-সলিলে স্নিগ্ধ করিয়া শান্তির সুমধুর আবেশময় মোহন ক্রোড়ে নিদ্রিত করিয়া রাখে। তাহার বিন্দুপাতে কত কত বিশুষ্ক জীবন সজীবতা লাভ করিয়াছে,—কত শত ভগ্ন হৃদয় সন্তাপাগ্নির বিভীষিকাময়ী শিখা হইতে নিস্তার পাইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। যে-স্থানে একবার সে ধারা বহিয়াছে, সেই স্থান কোমলতার পবিত্র বারিধারায় সিক্ত হইয়া গিয়াছে এবং তথায় প্রীতির চিরশ্যামল কুসুম-লতিকা অঙ্কুরিত হইয়া, ত্রিদিবসৌরভে দিগন্ত আমোদিত করিয়াছে। যে-স্থানে তাহার বিন্দুক্ষরণ হয় নাই, সে স্থান চিরমরুভূমি—চিরশ্মশান। শোকতাপ চিরদিনের জন্য তাহা অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। সংসারের ধূলিমাখা দগ্ধজীবনকে স্নিগ্ধ করিতে হইলে, এই মন্দাকিনীধারায় অবগাহন ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

বাস্তবিক নারীহৃদয়ের স্নেহরাশিই ক্ষতবিক্ষত মানবহৃদয়ের একমাত্র মহৌষধ। যখন মনুষ্য দুর্ভাগ্যের ভীষণ আবর্তে নিপতিত হইয়া ঊর্ধ্বক্ষিপ্ত ও অধঃপতিত হইতে থাকে, তখন করুণাময়ী রমণীই বাহু প্রসারিত করিয়া তাহাকে ক্রোড়ে টানিয়া লয় এবং দুর্ভেদ্য কবচের ন্যায় আচ্ছাদন করিয়া স্বয়ং সমস্ত আঘাত সহ্য করে। যেখানে পুঞ্জীভূত বিপদ অভ্রভেদী পর্বত হইতে শ্লথ পাষাণরাজির ন্যায় অবিরত বিচ্যুত হইতে আরম্ভ হয়, সেইখানে রমণী অগ্রসর হইয়া আপনার হৃদয় পাতিয়া দেয়; শিরীষ-সুকুমার সে হৃদয় দলিত ও নিষ্পেষিত হইলেও, তাহার বিন্দুমাত্র ক্লান্তির অনুভব হয় না। রমণীহৃদয়ের এইরূপ বিস্ময়করী দৃঢ়তা, সংসারের অগ্নিপরীক্ষা ব্যতীত অন্য সময়ে বুঝিতে পারা যায় না। যাহারা চিরদিন সৌভাগ্যের মোহিনী দোলায় অঙ্গ ঢালিয়া সুখের স্বপনে দিন যাপন করিয়াছে, তাহারা রমণীহৃদয়ের গভীরতা বুঝিতে পারে না; কিন্তু যাহারা বিপদকে চির-সহচর করিয়া জগতীতলে অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহারাই ইহা বিশিষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ। যে-হৃদয় সৌভাগ্যসময়ে নবনীকোমল বলিয়া বোধ হয় এবং অত্যল্প উত্তাপেই দ্রবীভূত হইবার সম্ভাবনা, দুর্ভাগ্যের কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় না জানি কি শক্তিবলে তাহা পাষাণ অপেক্ষাও দৃঢ় হইয়া উঠে এবং তরঙ্গের পর তরঙ্গের ন্যায় অগণিত বিপদরাশির অসহনীয় আঘাত প্রতিহত করিয়া দূর-দূরান্তরে নিক্ষেপ করিয়া দেয়। যত বার কেন সে পরীক্ষা

হউক না, প্রত্যেক পরীক্ষায় তাহার দৃঢ়তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেই থাকে। নারীহৃদয়ের এরূপ রহস্য যে বিস্ময়কর, তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্বর্গ ও মর্ত্য উভয়েরই উপকরণ লইয়া নারীহৃদয় গঠিত। যাঁহারা তন্ন তন্ন রূপে নারীহৃদয় অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারা সবিশেষ অবগত আছেন যে, নারীর অর্ধেক হৃদয় সংসারের ক্ষণস্থায়ী মোহ ও চাঞ্চল্যে বিজড়িত; কিন্তু অপরার্ধ ত্রিদিবসুলভ অক্ষয় স্নেহ ও কারুণ্যে পরিপূর্ণ। তাহার এক ধারে পৃথিবীর ছায়াময়ী ছেলেখেলা শারদাকাশের বিচিত্র মেঘচূর্ণের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়, অন্য ধারে অপার্থিব আত্মত্যাগ ও সহিষ্ণুতা উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ আলোকে বিশ্বকে চিরপ্রভাময় করিয়া রাখে। নারী-হৃদয়রূপ কুসুমিত কাননের এক দিকে মল্লিকা কামিনী প্রভৃতি পুষ্পরাশি ফুটিতে না ফুটিতে ঝরিয়া পড়ে, অন্যদিকে চিরসুরভি পারিজাত অনন্তকাল ধরিয়া সমীরপ্রবাহের প্রত্যেক পরমাণু সুবাসিত করিতে থাকে। এই দুই ভাবের সুন্দর সামঞ্জস্যটুকু বুঝিতে পারিলেই প্রকৃত রমণীহৃদয় বুঝা যায়। যুগপৎ এই দুই ভাবের বিকাশ কখন ঘটিয়া উঠে না। যে সময়ে মনুষ্য বিলাসলালসায় বিভোর হইয়া রমণীহৃদয় দেখিতে ইচ্ছা করে, সে সময়ে কেবল ইহার পার্থিব ভাবই দেখিতে পায়; কিন্তু ইহার স্বর্গীয় সৌরভের আঘ্রাণ করিতে হইলে, দুঃখ ও নিরাশার মহাশূন্যপথে জীবনকে ছুটাইয়া দিতে হয়। তীরে বসিয়া কেবল সমুদ্রলহরীর লীলাচাঞ্চল্য দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু রত্ন সংগ্রহ করিতে হইলে, তাহার সুগভীর অন্তস্তলে প্রবেশ করাই আবশ্যক। কষ্টস্বীকার ব্যতীত কে কবে রত্নরাজি-সমাকীর্ণ-স্নিগ্ধজ্যোতির্ময়ী সাগরগভীরতা বুঝিতে সমর্থ হইয়াছে?

নারীহৃদয়ের এই স্বর্গীয় ভাবে জগতের সর্বজাতির সাহিত্য অলঙ্কৃত হইয়া রহিয়াছে; কেবল সাহিত্য-উপন্যাস নহে,—ইতিহাসও ইহাকে সমাদরে নিজ হৃদয়ে স্থান দিয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই স্বর্গীয় ভাবের একটি ছায়ামাত্র প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ইহা কল্পনাপ্রসূত নহে; প্রকৃত ঐতিহাসিকতত্ত্ব। বঙ্গবাসীর মধ্যে সিরাজউদ্দৌলার নাম কাহারও অবিদিত নাই; আমরা যাঁহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করিতে উপস্থিত, তিনি সেই নবাব সিরাজউদ্দৌলার প্রিয়তমা মহিষী লুৎফ উন্নেসা।[১] লুৎফ উন্নেসা মানবী হইয়াও দেবী; তাঁহার সেই পবিত্র দেবভাবে হতভাগ্য সিরাজ আপনার তাপদগ্ধ জীবনে কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। লুৎফ উন্নেসা ছায়ার ন্যায় সিরাজের অনুবর্তন করিতেন; কি সম্পদে কি বিপদে, লুৎফ উন্নেসা কখনও সিরাজকে পরিত্যাগ করেন নাই। যখন সিরাজ বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার যুবরাজ হইয়া আমোদতরঙ্গে গা ঢালিয়া দিতেন, তখনও লুৎফ উন্নেসা তাঁহার সহচরী, আবার যখন রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া তেজোহীন—আভাহীন—কক্ষচ্যুত গ্রহের ন্যায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন, তখনও লুৎফ

১ লুৎফ—ভালবাসা, নেসা—স্ত্রী। লুৎফ উন্নেসা—প্রিয়তমা স্ত্রী।

উন্নেসা তাঁহারই অনুবর্তিনী। যখন, ষড়যন্ত্রকারিগণের ভীষণ চক্রে নিষ্পেষিত হইয়া, সিরাজ পলাশীর রণক্ষেত্রে সর্বস্ব বিসর্জন দিয়া, সাধের মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন, তখন তাঁহার আকুল আহ্বানে ও মর্মভেদী অনুনয়ে কেহই তাঁহার অনুসরণ করিতে ইচ্ছা করে নাই; কেবল সেই দেবহৃদয়া লুৎফ উন্নেসা আপনার জীবনকে অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করিয়া শত বিপদ মাথায় লইয়াও সিরাজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়াছিলেন। নিদাঘের প্রখর রৌদ্র, বর্ষার দারুণ বর্ষণ, পদ্মার উত্তাল তরঙ্গমালা—কিছুতেই তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে নাই। যাঁহার আদরে আদরিণী হইয়া, লুৎফ উন্নেসা মহিষীপদবাচ্যা হইয়াছিলেন, তাঁহারই জন্য তিনি আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। যত দিন তাঁহার পবিত্র দেহ পৃথিবীতে বর্তমান ছিল, তত দিন তিনি স্বামীর কল্যাণসম্পাদন ব্যতীত অন্য কোন কার্যে আপনাকে নিযুক্ত করেন নাই। স্বামীর দেহত্যাগের পরও তাঁহার জীবন তাঁহারই পরকালের কল্যাণোদ্দেশ্যেই সমর্পিত হয়। মাতামহের স্নেহলালিত, সুখস্বপ্নে বিভোর, সিরাজ নিজ সৌভাগ্যসময়ে লুৎফ উন্নেসার হৃদয়ের গভীরতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন কিনা, জানি না; কিন্তু শেষ জীবনে রাজ্যহারা, সিংহাসনহারা হইয়া যখন ভিখারীর ন্যায় বিচরণ করিতে বাধ্য হন, তখন যে তাহা বিশিষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয়, লুৎফ উন্নেসার একটিও ধারাবাহিক চিত্র পাওয়া যায় না। আমরা তাঁহার জীবনের দুই-একটি ঘটনা সাধারণের নিকট উপস্থিত করিতেছি, ইহা হইতে তাঁহার চরিত্রের কতকটা পরিচয় পাওয়া যাইবে। সিরাজের জীবনের সহিত যাঁহার জীবন চিরবিজড়িত, তাঁহার কথঞ্চিৎ বিবরণ সকলেরই জানা আবশ্যক, এইজন্য আমরা এরূপ প্রয়াস পাইতেছি।

লুৎফ উন্নেসা কোন উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি বাল্যকাল হইতে ক্রীতদাসীরূপে[২] নবাব আলিবর্দী খাঁর সংসারে প্রবিষ্ট হন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যখন

২ মূল সায়র মুতাক্ষরীনে লুৎফ উন্নেসাকে সিরাজের "জারিয়া" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। (মূল মুতাক্ষরীন ১৮২ পৃ.)। জারিয়া শব্দে ক্রীতদাসী বুঝায়; কিন্তু জারিয়াগণ নিতান্ত হীনভাবের দাসী নহে। তাহারা যে-সংসারে প্রবিষ্ট হয়, তাহার মধ্যে কেহ ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে ভার্যারূপে গ্রহণ করিতে পারেন। মুতাক্ষরীনের ইংরেজি অনুবাদক জারিয়াকে Bond-maid বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন, (Mutaqherin Eng. Trans., Vol. I, p. 614.)। বেভারিজের মতে লুৎফ উন্নেসা হিন্দুরমণী—মোহনলালের ভগিনী। মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের দেওয়ান ফজলে রব্বী খাঁ বাহাদুরেরও এই মত। মুতাক্ষরীনে কিন্তু লুৎফ উন্নেসা জারিয়া অর্থাৎ ক্রীতদাসী বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। কেহ কেহ মোহনলালকে বাঙ্গালী বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। মুর্শিদাবাদের নবাবদিগের সময় যে-সমস্ত বাঙ্গালী উচ্চপদাভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বাসস্থানের ও তদ্বংশীয়গণের আজিও পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু মোহনলাল সম্বন্ধে কিছুই পাওয়া যায় না। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কাহার নিকট শুনিয়াছিলেন যে, মোহনলালের বংশীয়েরা অদ্যাপি বর্ধমানে বাস করিতেছেন। পরন্তু এ বিষয়ে বিশিষ্টরূপ অনুসন্ধান না

তাঁহার অপূর্ব রূপের ছটা বিকীর্ণ হইতে লাগিল, তখন তিনি যুবরাজ সিরাজের হৃদয়-রাজ্য অধিকার করিয়া বসিলেন। কেবল যে তাঁহার অনুপম সৌন্দর্যরাশি সিরাজকে মুগ্ধ করিয়াছিল, এমন নহে, তাঁহার সুকোমল স্বভাবই সিরাজকে ভালবাসিতে শিখায়। যৌবনের উদ্দাম তরঙ্গে ভাসমান, বিলাসের ক্রীড়াপুত্তল সিরাজের মনে কখনও প্রণয়ের ছায়ামাত্র পড়িবে, ইহাও অনেকের নিকট অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে পারে ; কিন্তু বাস্তবিকই সিরাজ লুৎফ উন্নেসার প্রতি যথার্থ ভালবাসা দেখাইয়াছিলেন। আমরা সচরাচর ইতিহাসে সিরাজকে যেরূপে চিত্রিত দেখিতে পাই, তাঁহার চরিত্র যে সেরূপ ভয়াবহ ছিল, তদ্বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যৌবনের প্রারম্ভে সাধারণতঃ ঐশ্বর্যশালী লোকের সন্তানগণ যেরূপ বিকৃত হয়, সিরাজেরও সেইরূপ বিকৃতি ঘটিয়াছিল ; কিন্তু ইহা জানা আবশ্যক যে, নবাব আলিবর্দী খাঁর সে বিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি ছিল। যাঁহারা সিরাজকে আলিবর্দীর 'আলালের ঘরের দুলাল' বলিয়া নির্দেশ করিতে চেষ্টা পান তাঁহারা অনেক সময়ে ভ্রমে পতিত হন। আমরা স্থানান্তরে ইহা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইব। একটা কথা বলিয়া রাখি, বাঙ্গলার ইতিহাসে সিরাজকে সিংহাসনারোহণের পরেও যে ঘোরতর মদ্যপায়ী বলিয়া বর্ণনা করা হয়, ইহা সম্পূর্ণ অমূলক। যৌবনারম্ভে সিরাজ মদ্যপান করিতেন বটে কিন্তু আলিবর্দী মৃত্যুশয্যায় সিরাজকে কোরান স্পর্শ করিয়া ভবিষ্যতে মদ্যপান না করিতে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লন এবং সিরাজ যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন মাতামহের সেই হিতকর অনুরোধ রক্ষা করিতে ত্রুটি করেন নাই।[৩] যাহা হউক, এ বিষয় লইয়া এক্ষণে অধিক আন্দোলনের প্রয়োজন নাই। সিরাজ আলিবর্দীর সবিশেষ দৃষ্টিসত্ত্বেও যে যৌবনলালসার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই, একথা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। বিলাসের তরঙ্গ যখন তাঁহাকে ভাসাইতে আরম্ভ করে, সেই সময়ে তিনি লুৎফ উন্নেসার পবিত্র মূর্তি নিজ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন। লুৎফ উন্নেসাকে প্রণয়িনীরূপে স্বীকার করিয়া, যখন তিনি তদীয় অপার্থিব প্রেমরসের আস্বাদ পাইতে লাগিলেন, তখন বুঝিতে পারিলেন যে, রমণী বিলাসের সামগ্রী নহে,—ভালবাসার সামগ্রী ; তাই তাঁহার প্রেমের স্রোত লুৎফ উন্নেসার দিকে প্রবাহিত হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে বিলাসমুগ্ধ হইয়া সিরাজ লুৎফ উন্নেসাকে

হইলে কিছুই স্থির করা যায় না। 'রিয়াজুস্ সালাতীন' নামক গ্রন্থে মোহনলালকে কায়স্থ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। তাহা হইতে তিনি বাঙ্গালী ছিলেন কিনা বুঝা যায় না।

৩ "I have before mentioned Sirajh Dowla, as giving to hard-drinking ; but Allyverde, in his last illness, foreseeing the ill conseqnences of his excess, obliged him to swear on the Koran, never more to touch any intoxicating liquor , which he ever after strictly observed," (An Enquiry into our National Conduct to other Countries. Chap. II, p. 32) ইহা একজন ইংরেজের কথা,—দেশীয়ের নহে।

বুঝিতে পারিতেন না ; কিন্তু শেষ জীবনে যে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। লুৎফ উন্নেসার অগাধ স্নেহ ও পবিত্র স্বভাব অন্যান্য সকল বিষয় হইতে সিরাজের মনকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছিল। লুৎফ উন্নেসার ভালবাসায় তিনি এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে ক্ষণমাত্র ছাড়িয়া থাকিতে পারেন নাই। বিপদে-সম্পদে, সকল সময়ে লুৎফ উন্নেসাকে না পাইলে, তাঁহার হৃদয় শান্ত হইত না। বাস্তবিক যদি কেহ সৌভাগ্যবশতঃ রমণীর পবিত্র প্রণয়ের অধিকারী হয়, তাহা হইলে তাহার হৃদয় যেরূপই হউক না কেন, তাহা স্নেহপ্রবণ হইয়া উঠে।

লুৎফ উন্নেসার প্রতি সিরাজের অধিকতর ভালবাসার আর একটি কারণ ছিল। সিরাজ কোন একটি রমণীর সৌন্দর্যতরঙ্গে একবার আপনাকে ভাসাইয়াছিলেন। রূপে পাগল হইয়া যাহাকে তিনি হৃদয়ে স্থান দান করেন, সে কিন্তু ঘোর বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া দেয়। এই রমণীর নাম ফৈজী ফয়জান। ফৈজী দিল্লীতে নর্তকীর ব্যবসায়ে জীবন অতিবাহিত করিত। তদীয় অলোকসামান্য সৌন্দর্য দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। মুর্শিদাবাদে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত ছিল যে, তৎকালে ফৈজীর ন্যায় সুন্দরী সমগ্র ভারতবর্ষে দৃষ্ট হইত না। তাহার উত্তপ্তকাঞ্চনবর্ণ কৃশ অঙ্গযষ্টি ও মন্থরগমন অনেককে মোহিত করিয়া ফেলিত, সর্বাপেক্ষা তাহার কৃশাঙ্গের প্রশংসাই অধিক ছিল।[৪] ফৈজীর অনুপম রূপরাশির কথা সিরাজের কর্ণগোচর হইলে, সিরাজ লক্ষ মুদ্রা সমর্পণ করিয়া বহু অনুনয়বিনয়ে তাহাকে মুর্শিদাবাদে আনয়ন করেন।[৫] এবং নিজ অন্তঃপুরিকাগণের অন্তর্ভূত করিয়া লন।

৪ এইরূপ প্রবাদ আছে যে, ফৈজী ওজনে ২২ সের মাত্র ছিল। মুতাক্ষরীনের ইংরেজী অনুবাদের টিপ্পনীতে এইরূপ লিখিত আছে ঃ—

"She was, says the amorous chronicle of that capital, complete Indian beauty of that right golden hue, so much coveted all over that region, and of that delicacy of person, which weighs only two and twenty seers, or about fifty pounds averdupois ; a small delicate woman with a cool retreat, being the *summum bonum* of an Indian. (Mutaqherin, Vol. I, Note, p. 614.)

৫ "This last (Faizy) had been a *Knecheni* at Delhi, that is a dance-girl, from whence *her attendance had been supplicated,* (and this was the expression used), at the court of Moorshoodabad the request being accompanied by no less than a draught of one lac of rupees." Mutaqherin, Vol. I. Note, p. 614) ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সিরাজ মোহনলালের এক ভগিনীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুতাক্ষরীনের অনুবাদক মুস্তাফা লিখিয়াছেন যে, মোহনলাল সিরাজকে স্বীয় ভগিনী উপহার দিয়া তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। এইখানে মোহনলালের ভগিনীরও ফৈজীর ন্যায় রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত

ফৈজীর সেই উন্মাদয়িত্রী রূপসুধা পান করিয়া সিরাজ অধীর হইয়া পড়িলেন ; কিন্তু তাহার তলদেশে যে ভীষণ হলাহলের স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল, তাহা তিনি প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই। যদিও সিরাজের অনুপম সৌন্দর্য অনেক রমণীর মনঃপ্রাণ হরণ করিতে পারিত, কিন্তু তাহা ফৈজীর হৃদয়কে বিন্দুমাত্র আকর্ষণ করিতে পারে নাই। ফৈজী সিরাজের ভগিনীপতি সৈয়দ মহম্মদ খাঁর প্রেমে পতিত হয়। সৈয়দ মহম্মদ খাঁ ইউরোপীয়দিগের ন্যায় সুন্দর ও বলিষ্ঠ ছিলেন। ফৈজী গুপ্তভাবে তাঁহাকে অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া যায়। দুই দিবস পরে এই গুপ্ত প্রণয়ের কথা সিরাজের কর্ণগোচর হইলে, তাঁহার হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়। দুঃখে ও ক্রোধে জ্ঞানহারা হইয়া তিনি ফৈজীর নিকট উপস্থিত হইলেন। সিরাজের মূর্তি দেখিয়া ফৈজী জীবনের আশা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়। সিরাজ কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন—"আমি দেখিতেছি তুমি যথার্থই বারাঙ্গনা।" ফৈজী আপনার জীবনে হতাশ হইয়া উত্তর করিল,—"জাঁহাপনা আমার ব্যবসায় তাহাই, এইরূপ তিরস্কার আপনার জননীর

করিতেছি। This Mohonlal had made present of his sister to Seradj-eddoulah which sister was a true Indian beauty, small and delicate. Nothing is more common amongst Indians, when they went to give an idea of a surpassing beauty, than to say : *when she ate Paan you might have seen through her skin the colored liquor run down her throat and she was so delicate, as to weigh only twenty two seers,* (or sixty-six pound English .) which by the bye, was they say, the weight of that beloved girl, which Seradj-eddoulah ordered to be immured alive. (Mutaqherin, Vol. I, Note, p. 717.) মুতাক্ষরীনের অনুবাদকের মতে ফৈজী ও মোহনলালের ভগিনী স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু দুই জনের রূপবর্ণনা ও কৃশাঙ্গত্ব একই হওয়ায় দুই জনকে অভিন্ন মনে করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। কেবল রূপবর্ণনা ও কৃশাঙ্গের কথা হইলে আমরা যথেষ্ট মনে করিতাম না। কিন্তু দুই জনের ওজন যখন ২২ সের বলিয়া উল্লিখিত, তখন সেই ধারণা আরও দৃঢ় হইয়া উঠে। কৃশাঙ্গত্ব ভারতনারীর সৌন্দর্যের পরিচয় বটে, কিন্তু ২২ সের ওজন যে-সমস্ত নারীর সৌন্দর্যের লক্ষণ, তাহা তো কখনও শুনা যায় নাই। সুতরাং দুই জনের ওজন ২২ সের ও একই প্রকার রূপবর্ণনা হওয়ায় দুই জনকে অভিন্ন বলিয়া প্রতীতি হওয়াই সম্ভব। স্টুয়ার্ট সাহেব ২২ সের ভারতনারী-সৌন্দর্যের লক্ষণ না বলিয়া মোহনলালের ভগিনীর ওজন বলিয়াই লিখিয়াছেন। "She was a lady of the most delicate form and weighed only 64 lbs. English." (Stewart's Bengal, p. 309) অনুবাদক মুস্তাফা মুর্শিদাবাদের প্রবাদবাক্য হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়াছেন। সেই সংগ্রহ যে একেবারে অভ্রান্ত তাহাই বা কিরূপে বলা যায়। ফলতঃ ফৈজী ও মোহনলালের ভগিনীর অভেদের ধারণা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। মোহনলাল ভগিনীকে যে উপহার দিয়াছিলেন, ইহাও অনুবাদকের কথা। আমরা মূল মুতাক্ষরীনে তাহার কোন উল্লেখ দেখিতে পাই না। সুতরাং এ বিষয়েও আমরা অনুবাদকের সহিত একমত নহি।

প্রতি প্রয়োগ করিলে শোভা পাইত।”[৬] জননীর প্রতি এইরূপ শ্লেষবাক্য শুনিয়া সিরাজ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন এবং তাহাকে একটি প্রকোষ্ঠে বদ্ধ করিয়া তাহার দ্বার ইষ্টক দ্বারা চিররুদ্ধ করিবার আদেশ দিলেন। হতভাগিনী গৃহাবদ্ধ হইয়া মারমিয়নের কনস্টান্টের ন্যায় আপনার জীবলীলার শেষ করিল। তিন মাস পরে সে দ্বার উন্মুক্ত হইলে দেখা গেল, তাহার কঙ্কালাবশিষ্ট দেহ পড়িয়া রহিয়াছে এবং তাহার কৃশাঙ্গের জন্য সে কঙ্কাল দেখিয়া কাহারও মনে বীভৎস ভাবের উদয় হয় নাই।

ফৈজীর বিশ্বাসঘাতকতায় রমণীজাতির উপর সিরাজের আন্তরিক ঘৃণা উপস্থিত হয়। কিন্তু তিনি যখন লুৎফ উন্নেসার হৃদয় পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, তখন দেখিলেন যে, সে হৃদয় অটল! তাহার প্রবাহ কেবল একই দিকে প্রবাহিত হয়। ফৈজীর হৃদয় যেরূপ পৈশাচিক, লুৎফ উন্নেসার হৃদয় ততোধিক পবিত্র; তাই লুৎফ উন্নেসার প্রতি তাঁহার অগাধ ভালবাসা দেখিতে পাওয়া যায় এবং তিনিই সিরাজের প্রিয়তমা মহিষী বলিয়া ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়া থাকেন।

প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলিয়া রাখি, লুৎফ উন্নেসা অথবা ফৈজী কেহই সিরাজের বিবাহিতা স্ত্রী নহেন। সিরাজের বিবাহিতা স্ত্রীর নাম ওমদাৎ উন্নেসা।[৭] তিনি কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যা; তাঁহার পিতার নাম মির্জা ইরাজ খাঁ। প্রথমে আলিবর্দী তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজী আহম্মদের দৌহিত্রী, আতাউল্লা খাঁর কন্যার সহিত সিরাজের বিবাহ স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কন্যাটি কাল-কবলে পতিত হওয়ায়,

৬ সিরাজের মাতা ও মাতৃস্বসার সহিত হোসেন কুলী খাঁর অবৈধ প্রণয়ের কথা প্রচলিত থাকায়, ফৈজী সিরাজকে ঐরূপ মর্মস্পর্শী উত্তর প্রদান করিয়াছিল।

৭ সিরাজের কয়টি স্ত্রী ছিলেন, তাহা স্থির করা যায় না। কেবল তিন বা চারি জনেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, (১) ওমদাৎ উন্নেসা, ইনি তাঁহার বিবাহিতা পত্নী (ইরাজ খাঁর কন্যা); (২) লুৎফ উন্নেসা; (৩) ফৈজী; (৪) মোহনলালের ভগিনী; বেভারিজের মতে লুৎফ উন্নেসা ও ওমদাৎ উন্নেসা একই। কিন্তু ইহা তাঁহার ভ্রম। নিজামত Record-এ আছে যে, ওমদাৎ উন্নেসা ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে গবর্নমেণ্টের নিকট মাসহারাবৃদ্ধির প্রার্থনা করিয়া বলেন যে, তিনি প্রথমে মাসে ৫০০ টাকা পাইতেন, হেস্টিংস ৪৫০ টাকা করিয়া দেন, এক্ষণে ৩২৫ টাকা হইয়াছে। আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, লুৎফ উন্নেসা ১৭৮৯ খ্রীঃ অব্দে মুর্শিদাবাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহার মাসহারা সম্বন্ধে আমরা অন্য বিবরণ জ্ঞাত হই। লুৎফ উন্নেসা মাসে ১০০ টাকা পাইতেন. তদ্ব্যতীত আলিবর্দী ও সিরাজ প্রভৃতির সমাধিস্থল খোসবাগের তত্ত্বাবধানের ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত থাকায়, তিনি তাহার জন্য আরও ৩০৫ টাকা অধিক পাইতেন। এতদ্ভিন্ন আজিমাবাদস্থ হাজী আহম্মদের সমাধির তত্ত্বাবধানেরও ভার তাঁহারই হস্তে ছিল। গ্যাস্ট্রেল ১০০ টাকার স্থলে ১০০০ লিখিয়াছেন। ওমদাৎ উন্নেসার ৫০০ টাকা প্রভৃতির সহিত লুৎফ উন্নেসার ১০০ টাকার কোন মিল নাই। ওমদাৎ উন্নেসা যে সিরাজের বিবাহিতা পত্নী ও ইরাজ খাঁর কন্যা তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। Board of Revenue-এর Proceeding-এর অনেক স্থলে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। আমরা ১৭৮০ খ্রীঃ অব্দের Miscellaneous Index-এর একটি স্থল উদ্ধৃত করিতেছি। "Jageer—Jessore. Application from Umdat-ul Nissa Begum, daughter

আলিবর্দী মির্জা ইরাজ খাঁর কন্যার সহিত সিরাজের বিবাহ দেন। এই বিবাহ মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। মুতাক্ষরীনে ইহা বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা যেরূপ দেখিতে পাই, তাহাতে সিরাজ লুৎফ উন্নেসা ব্যতীত আর কাহাকেও যে অধিক ভালবাসিতেন, এরূপ বোধ হয় না। সিরাজের অন্যান্য ভার্যার সহিত তাঁহার যে বড় বিশেষ সম্বন্ধ ছিল, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। যেখানে তাঁহার বেগমের উল্লেখ দেখিতে পাই, সেইখানে লুৎফ উন্নেসা ব্যতীত আর কাহারও নির্দেশ দেখিতে পাওয়া যায় না। ফলতঃ সুখে-দুঃখে সকল সময়ে সিরাজ লুৎফ উন্নেসাকে আপনার সহচরী করিতেন।

সিরাজ যে সকল সময়েই লুৎফ উন্নেসাকে নিজ সঙ্গিনী করিতেন, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়। এক সময়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। সিরাজ বরাবরই অত্যন্ত চঞ্চলচিত্ত ছিলেন। যে তাঁহাকে যে-দিকে লওয়াইত, তিনি সেই দিকেই নত হইয়া পড়িতেন। সিরাজের পিতা জৈনুদ্দীন আফগানদিগের হস্তে অতি নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হইলে নবাব আলিবর্দী খাঁ সিরাজকে পাটনার শাসনকর্তার পদ দিয়া রাজা জানকীরামকে তাঁহার সহকারিরূপে নিযুক্ত করেন। কিন্তু সিরাজ অল্পবয়স্ক ও আলিবর্দীর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ; এজন্য নবাব সিরাজকে আপনার নিকটেই রাখিতেন। কার্যতঃ রাজা জানকীরামই পাটনা শাসন করিতেন। মেহেদী নেসার খাঁ নামক একজন কর্মচারী সিরাজকে এইরূপ বুঝাইয়া দেয় যে, নবাব সিরাজকে মিথ্যা আশা দিয়াছেন ; নতুবা তিনি সিরাজকে প্রকৃতপ্রস্তাবে পাটনা শাসন করিতে দিতেছেন না কেন? সিরাজ তাহাতেই বিশ্বাস করিয়া মেহেদী নেসারের সহিত জানকীরামের নিকট হইতে পাটনা অধিকারের জন্য অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে তিনি সঙ্গে আর কাহাকেও লন নাই, কেবল লুৎফ উন্নেসা ও তাঁহার মাতাকে নিজ যানে লইয়া পাটনা যাত্রা করেন। উক্ত যান দিনে ৩০।৪০ ক্রোশগামী দুইটি সুন্দর বলীবর্দ দ্বারা চালিত হইত।[৮] সিরাজের এইরূপ হঠকারিতায় মেহেদী নেসার খাঁ

of Mirza or Nabab Muhomed Ariffee cawn or Eretch Khan, and widow of Seroje-ul-dowlah, for continuance to her the jageers enjoyed by her husband in the district Committee desired by Government to furnish them with their opinion, on the applicant's claim with a list of the family continuance of the jageers to the daughters of the Nabab for the support of his family, authorsied by Government. (15th June) 5 (7th August). ওমদাৎ উন্নেসা ও লুৎফ উন্নেসা সম্ভবতঃ দুইজনেই খোসবাগে সমাহিত হইয়াছিলেন।

৮ মুস্তাফা সেই বলীবর্দ দুইটি দেখিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মীরজাফর মসনদে বসার পর সে দুইটি কাশীমবাজার কুঠির রেসিডেন্ট ওয়াট্স সাহেবকে প্রদান করা হয়। মুস্তাফা নিজ মধ্যমাঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া তাহাদের ককুৎ স্পর্শ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু

হত হন। পরন্তু সিরাজ আলিবর্দীর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র বলিয়া, যাহাতে তিনি অক্ষত শরীর থাকেন, তজ্জন্য রাজা জানকীরামকে বিশিষ্টরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। সিরাজ জানিতেন যে, এইরূপ চাপল্যে নানারূপ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা; তথাপি স্নেহবশে লুৎফ উন্নেসাকে ছাড়িয়া যাইতে পারেন নাই। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা লুৎফ উন্নেসার প্রতি সিরাজের প্রগাঢ় ভালবাসার উল্লেখ করিলাম। এক্ষণে সেই অলোকসামান্যা মহিলার উচ্চহৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিতেছি। আলিবর্দীর মৃত্যুর পর ইংরেজদিগের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, সিরাজ কাশীম-বাজার কুঠি অবরোধ করিয়া তাহার অধ্যক্ষ ওয়াট্‌স সাহেবকে সপরিবারে বন্দী করিয়া মুর্শিদাবাদে লইয়া আসেন। সিরাজ-জননী ওয়াট্‌স সাহেবের পত্নী ও পুত্রকন্যাদিগকে নিজ মহলে ৩৭ দিবস পর্যন্ত সযত্নে রক্ষা করেন। তাহার পর লুৎফ উন্নেসার সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাদিগকে জলপথে চন্দননগরের ফরাসী শাসনকর্তার নিকট পাঠাইয়া দেন। বলা বাহুল্য, সিরাজ তাহা জানিতে পারিলে তাঁহাদিগের লাঞ্ছনার একশেষ হইত। কিন্তু রমণী ও বালক-বালিকার দুঃখ তাঁহাদের হৃদয়কে এরূপ অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল যে, তাঁহারা সিরাজের ক্রোধের পাত্রী হইতেও কুণ্ঠিতা হন নাই। কেবল তাহাই নহে, লুৎফ উন্নেসা সিরাজের নিকট ওয়াট্‌স সাহেবেরও মুক্তির জন্য ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন। তিনি সিরাজকে সানুনয়ে বলিয়াছিলেন,—"কুঠিয়াল সাহেব আপনারই প্রজা ও আপনারই সন্তান। আপনি সন্তানকে ব্যথা প্রদান করিতেছেন কেন? সামান্য একজন ইংরেজ প্রজাকে বন্দী করিয়া রাখা, বঙ্গ-রাজ্যের অধীশ্বরের কদাচ উচিত নহে।" ওয়াট্‌সের মুক্তির জন্য লুৎফ উন্নেসা নবাব সিরাজউদ্দৌলার পদতলে নিপতিতা হইলেন। নবাব তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ওয়াটসকে বন্দী করিলে, কলিকাতার ইংরেজ বণিকেরা সংযতভাবে কার্য করিবে। কিন্তু সেই উদার-হৃদয়ার অশ্রুপাতের সহিত কাতর প্রার্থনোক্তি শুনিয়া সিরাজ অবশেষে ওয়াট্‌সকে মুক্তি প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।[১]

এ সকল সিরাজের সৌভাগ্য-সময়ের কথা। আমরা তাঁহার দুর্ভাগ্য-সময়ে লুৎফ উন্নেসা কিরূপ দেব-হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

নবাব আলিবর্দী খাঁর মৃত্যুর পর সিরাজ বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু দৈবদুর্বিপাকে তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির পূর্ব হইতেই তাঁহার

কৃতকার্য হন নাই; আরও আধ ফুটের আবশ্যক হইয়াছিল। গুজরাটদেশজাত এই বলীবর্দ দুইটি দেখিতে তুষারশ্বেত ও অত্যন্ত শান্তপ্রকৃতি ছিল। বারশত টাকায় তাহারা ক্রীত হয়। (Mutaqherin, Vol. I, Notes, p. 615).

১ "Parochial Annals of Bengal"—H. B. Hyde, p. 158.

বিরুদ্ধে একটি ভীষণ ষড়যন্ত্রের অভিনয় হইতেছিল। আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, সিরাজের বুদ্ধির তাদৃশ স্থিরতা ছিল না এবং যদিও তিনি মাতামহের অনুরোধে মদ্যপান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি পূর্বের অভ্যাস-দোষ তাঁহার চঞ্চল চিত্তকে অধিকতর চঞ্চল করিতেছিল। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, চারিদিকে হিংসা, বিদ্বেষ ও ষড়যন্ত্রের বিভীষিকাময় চিত্র দেখিতে লাগিলেন। কাহারও উপর তিনি সহজে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেন না, যাহাকে তিনি বিশ্বাস করিতেন, সে-ই তাঁহার সর্বনাশ-সাধনে প্রবৃত্ত হইত। দুই-একজন ব্যতীত তাঁহার প্রধান প্রধান সেনাপতি ও কর্মচারী সকলেই তাঁহার সর্বনাশসাধনে উদ্যত। এইরূপ অবস্থায় তাঁহার হৃদয় কিরূপ অশান্তিকর হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু. একজন মাত্র তাঁহার সেই দগ্ধহৃদয়ে শান্তিবারি প্রদান করিয়া তাঁহার চঞ্চল চিত্তকে কিয়ৎ পরিমাণে স্থিরতর করিতে চেষ্টা পাইতেন, তিনিই লুৎফ উন্নেসা। লুৎফ উন্নেসা তাঁহার প্রত্যেক কার্যে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া, তাঁহার দুশ্চিন্তা-দাবদগ্ধ-হৃদয়ে শান্তির স্নিগ্ধবারি সেচন করিতেন।

বিশ্বাসঘাতক ষড়যন্ত্রকারিগণের কৌশলে, যখন পলাশীর রণক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া, যুদ্ধস্থল হইতে পলায়নপর সিরাজ মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার সে চিত্র মনে হইলে, করুণরসে হৃদয় অভিষিক্ত হইয়া উঠে। তিনি যাহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন, সেই তাঁহার প্রতি বিমুখ হয়। গভীর রাত্রি, চারিদিকে কেমন একটা বিষাদের ছবি সিরাজের চক্ষের সমক্ষে নাচিয়া বেড়াইতেছে! মুর্শিদাবাদে মীরজাফরের ও পলাশীর পথে ইংরেজ-সৈন্যের সানন্দ-কোলাহল ও বিজয়বাদ্য চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত করিতেছে; তাহাদের প্রত্যেক আঘাতে সিরাজের মর্মস্থল ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। সিরাজ ছিন্নকণ্ঠ কপোতের ন্যায় অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন; তাঁহার মস্তিষ্ক হইতে বিবেচনাশক্তি যেন চিরবিদায় লইয়াছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কোনও কোনও বিশ্বাসী বন্ধুর কথায় সিরাজ একবার নগররক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন, আবার বিশ্বাসঘাতকেরা পরামর্শ দিল, পলায়ন কর; নতুবা তোমার নিস্তার নাই। সিরাজ অনন্যোপায় হইয়া তাঁহার অনুগমন করিবার জন্য সকলের পদতলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। যাহারা তাঁহার চরণ স্পর্শ করিবারও উপযোগী নহে, আজ সিরাজ তাহাদেরও কৃপার ভিখারী। কিন্তু কেহই তাঁহার সেই কাতরোক্তিতে কর্ণপাত করিল না। এমন কি, তাঁহার শ্বশুর পর্যন্ত তাঁহার সহিত একপদ গমন করিতে স্বীকৃত হইলেন না। যতই বিপক্ষগণের বিজয়ধ্বনি শুনিতে পান, ততই সিরাজের প্রাণ কম্পিত হইতে থাকে। তখন তিনি স্বীয় প্রিয়তমা লুৎফ উন্নেসার নিকট ভগ্নহৃদয়ে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইতে ইচ্ছা করিলেন। লুৎফ উন্নেসা বাক্যব্যয় না করিয়া দুই-একজন দাসীর সহিত স্বামীর পশ্চাদ্বর্তিনী হইলেন।

ভীষণ দ্বিপ্রহর রজনীতে বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার অধিপতি ও অধীশ্বরী সামান্য

যানে আরোহণ করিয়া, রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন। নৈশান্ধকার তাঁহাদের মুখে আবরণ প্রদান করিল, মধ্যে মধ্যে শৃগাল ও পেচকের ভীষণ শব্দ তাঁহাদের মনে ভীতির উৎপাদন করিতেছে,—নিকটে কোনও শব্দ শুনিলে মীরজাফরের চর বলিয়া তাঁহারা চমকিত হইয়া উঠিতেছেন,—এইরূপ অবস্থায় ক্রমশঃ তাঁহারা ভগবানগোলার দিকে অগ্রসর হইলেন। সিরাজ যতই গমন করেন, ততই চঞ্চল হইয়া উঠেন; বিশেষতঃ লুৎফ উন্নেসার জন্য তিনি নিরতিশয় ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। কিন্তু সেই দেবহৃদয়া নিজে কিছুমাত্র ক্লান্তি অনুভব না করিয়া, প্রাণপণে স্বামীর কষ্ট নিবারণে যত্নবতী হইলেন। রাত্রি প্রভাত হইল; নিদাঘতপন স্বীয় প্রচণ্ড কিরণ ছড়াইতে ছড়াইতে দেখা দিলেন; ক্রমে রৌদ্রে ও রৌদ্রতপ্ত ধূলিতে সিরাজের কমনীয় মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল; স্বেদজলে ললাট ও গণ্ডস্থল অবিরত সিক্ত হইতে লাগিল। লুৎফ উন্নেসা স্বামীর সেই ক্লেশ নিবারণার্থ অবিরত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিজের শরীর সূর্যোত্তাপে দগ্ধ হইয়া যাইতেছে—ভ্রূক্ষেপ নাই! কিসে স্বামীর ক্লান্তি দূর করিবেন, তজ্জন্য অত্যন্ত চঞ্চলা হইয়া উঠিলেন।

এইরূপে তাঁহারা ভগবানগোলায় উপস্থিত হইয়া তথা হইতে নৌকারোহণে রাজমহাল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পদ্মার উত্তাল তরঙ্গমালা দেখিয়া চিরসুখাভ্যস্ত সিরাজের প্রাণ কাঁপিতে লাগিল; কিন্তু সেই দেবহৃদয়া তাহাতে বিচলিত হইলেন না। তিনি নিজে স্বামীকে সঙ্গে লইয়া সেই ক্ষুদ্রতরণীতে আরোহণপূর্বক গমন করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে তরঙ্গের পশ্চাৎ তরঙ্গ আসিয়া সেই ক্ষীণকলেবরা তরণীকে রসাতলে প্রেরণের উপক্রম করিতে লাগিল। সিরাজ জীবনের আশা বিসর্জন দিয়া ভীত ও চমকিত হইতে লাগিলেন, কিন্তু লুৎফ উন্নেসা তাঁহাকে শান্ত করিয়া সলিলসিক্ত স্বামীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মুছাইতে আরম্ভ করিলেন। মধ্যে মধ্যে নিদাঘের বৃষ্টি তাহাদিগকে অস্থির করিয়া তুলিতে লাগিল। লুৎফ উন্নেসা সিরাজকে আচ্ছাদন করিয়া, তাহা হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে যত্নবতী হইলেন। সঙ্গে চারি বৎসরের একমাত্র বালিকা কন্যা উম্মৎ জহুরা। সিরাজ এক-একবার তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কাঁদিয়া আকুল হন, পাছে তাঁহার সর্বস্বধন পদ্মার তরঙ্গে ভাসিয়া যায়! কিন্তু লুৎফ উন্নেসা তাহার প্রতিও দৃক্‌পাত না করিয়া, স্বামীর কষ্ট নিবারণার্থ অত্যন্ত ব্যাকুলা হইয়া উঠিলেন। এইরূপে তিন দিন তিন রাত্রি অনাহারে কাটাইয়া তাঁহারা রাজমহালের নিকট উপস্থিত হন। এই সময়ে সিরাজ আপনাদিগের জন্য কিছু খিচুড়ী প্রস্তুতের ইচ্ছা করেন। দানাশাহ নামে এক ফকীর।[১০] তাঁহাদের

১০ দানাশাহ প্রথমে সিরাজকে চিনিতে পারে নাই, কিন্তু তাঁহার বহুমূল্য পাদুকা দেখিয়া তাহার সন্দেহ হয়; পরে নৌকার মাঝিদিগকে জিজ্ঞাসা করায়, তাহারা সমস্ত বলিয়া দেয়। অদ্ভুতপ্রকৃতি ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ লিখিয়া থাকেন যে, সিরাজ নাকি স্বীয় সৌভাগ্য-সময়ে দানাশাহের কান কাটিয়া দিয়াছিলেন! (Ives's Voyage, p. 151. Also Orme's Indostan, Vol. II, p. 183.)। কিন্তু মুতাক্ষরীনে যাহা লেখা আছে, তাহার ইংরেজী অনুবাদ

জন্য আহার প্রস্তুত করিবার ভার লয়। কিন্তু সে গোপনে মীরজাফরের জামাতা মীর কাসেম ও ভ্রাতা মীর দাউদকে সংবাদ দিলে, তাঁহারা সিরাজকে ধৃত করিয়া মুর্শিদাবাদে পাঠাইয়া দিলেন। ঐ সকল কর্মচারী স্ত্রীলোকদিগের নিকট হইতে যাবতীয় ধনরত্নাদি অপহরণ করেন। মীর কাসেম লুৎফ উন্নেসার নিকট হইতে যাবতীয় সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াছিলেন।

মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হওয়ার পর, হতভাগ্য সিরাজ মীরণের আদেশক্রমে মহম্মদী বেগের তরবারির আঘাতে খণ্ডবিখণ্ডিত হইয়া খোসবাগের বৃক্ষচ্ছায়ায় চিরদিনের জন্য সমাহিত হইলেন। তাঁহার পরিবারবর্গের দুর্দশা শ্রবণ করিলে, হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া উঠে। নবাব আলিবর্দী খাঁর বেগমকে তদীয় কন্যাদ্বয় ঘসেটী ও আমিনার সহিত চিরনির্বাসিতা করা হইল। সেই সঙ্গে পতিবিয়োগবিধুরা অভাগিনী লুৎফ উন্নেসাও চারি বৎসরের কন্যা উম্মত জহুরাকে লইয়া মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।[১১] প্রথমে তাঁহাদিগকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনার সহিত কারারুদ্ধ করিয়া, পরে নির্বাসনের

দেখিলে সকলে বুঝিতে পারিবেন। "This man (Shah Dana) whom probably he had either disobliged or oppressed in the days of his full power, rejoiced & c. মুতাক্ষরীনকারের মতে দানাশাহের প্রতি সিরাজ অত্যাচার করিয়াছিলেন কিনা তাহার স্থিরতা নাই। কিন্তু ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ লিখিলেন যে, একেবারে তাহার কান কাটিয়া দেওয়া হয়। ধন্য সত্যানুসন্ধিৎসু ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ! রিয়াজুস সালাতীন গ্রন্থে লিখিত আছে,—সিরাজ ভগবান্‌গোলা হইতে পদ্মা পার হইয়া মালদহ পর্যন্ত যান, পুরাতন মালদহের নিকট বড়াল নামক স্থানে দানাশাহের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। হণ্টার বলেন যে, সিরাজকে ধৃত করার জন্য দানাশাহ মীরজাফরের নিকট হইতে জায়গীর পাইয়াছিল। কিন্তু বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল বলেন যে, দানাশাহের বংশীয়েরা যে নিষ্কর ভূমি ভোগ করে, তাহা গৌড়ের প্রসিদ্ধ বাদশহ হোসেন শার দত্ত। বটব্যাল মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—"যেস্থানে সিরাজউদ্দৌলা ধৃত হইলেন, ঐ স্থান কালিন্দীতীরবর্তী; উহা তদবধি "সুবামার" নামে বিখ্যাত। স্থানীয় লোকে তাহার "শুওরমারা" নাম দিয়াছে। হায় বিধাতঃ, মূর্খের জিহ্বাতে তুমি সুবা সিরাজ-উদ্দৌলাকে শূকরে পরিণত করিয়াছ!!" সাহিত্য—১৩০১ মাঘ "লক্ষ্মণাবতী" প্রবন্ধ পৃ ৬৫০।) বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় দানাশাহের বংশধরগণের নিকট হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া ও তাঁহার সমাধির ফলকলিপির সাহায্যে স্থির করিয়াছেন, মালদহ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ দানাশাহ সে সময়ে জীবিত ছিলেন না। কিন্তু সমসাময়িক মুতাক্ষরীনকার ও রিয়াজ গ্রন্থকারের উক্তিতে উক্ত ফকীরের দানাশাহ নামই হইতেছে। রিয়াজ গ্রন্থকার অনেকদিন পর্যন্ত মালদহ অঞ্চলে বাসও করিয়াছিলেন। সুতরাং এরূপ স্থলে এই প্রকার অনুমান হয় যে, সিরাজের ধৃতকারী ফকীরের নাম দানাশাহ হইতে পারে। কিন্তু সে প্রসিদ্ধ দানাশাহ হইতে বিভিন্ন ব্যক্তি। মুতাক্ষরিনে দানাশাহকে একজন সামান্য ফকীর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রসিদ্ধ দানাশাহ হইলে তাঁহার বর্ণনা অন্যরূপ হইত।

১১ মজঃফরনামায় লিখিত আছে যে, সিরাজের মৃত্যুর পর তাঁহার বেগমদিগের নিকট স্ব-স্ব-পাত্র নির্বাচন করিয়া লইয়ার প্রস্তাব করিলে, লুৎফ উন্নেসা সগর্বে উত্তর করিয়াছিলেন,— "হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণে অভ্যস্ত লোক কোথায় গর্দভবাহন বাঞ্ছা করে?"

অনুমতি দেওয়া হয়। যে নবাব আলিবর্দী খাঁর আদর্শ শাসনে বঙ্গের প্রজাগণ বিঘ্নরাশির মধ্যেও শান্তিলাভে সমর্থ হইয়াছিল, তাঁহার পরিবারবর্গের এরূপ দুর্দশা যে অতীব কষ্টজনক, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহারা ঢাকায় নির্বাসিত হইয়া অতি কষ্টে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। সেই রাক্ষসপ্রকৃতি মীরণ ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া আলিবর্দীর কন্যাদ্বয়কে জলমগ্ন করিতে আদেশ প্রদান করে, তাহার সে আজ্ঞাও প্রতিপালিত হইয়াছিল।[১২]

কিছুকাল ঢাকায় বাসের পর লুৎফ উন্নেসা ইংরেজদিগের যত্নে মুর্শিদাবাদে পুনরানীতা হইয়া, নবাব আলিবর্দী ও সিরাজের সমাধি খোসবাগের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হন। উক্ত তত্ত্বাবধানের জন্য মাসিক ৩০৫ টাকা নির্দিষ্ট ছিল; তদ্ভিন্ন তিনি মাসিক ১০০ টাকা বৃত্তিও পাইতেন।[১৩] আজিমাবাদস্থ হাজী আহম্মদের সমাধির তত্ত্বাবধানের ভারও তাঁহার প্রতি অর্পিত হইয়াছিল। সেই সময়ে তাঁহার শোচনীয় অবস্থার কথা স্মরণ করিলে, পাষাণেরও হৃদয় বিগলিত হয়। তাঁহার প্রিয়তম স্বামী এক্ষণে ধরণীগর্ভে শায়িত; অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনও একে একে অনন্তপথে যাত্রা করিয়াছেন; আজ তিনি এই বিশাল বিশ্বে একাকিনী,—একটিমাত্র বালিকা কন্যা অবলম্বন। এইরূপ অবস্থায় তিনি প্রতিদিন স্বামীর সমাধি পূজা করিতে আসিতেন। রৌপ্য ও স্বর্ণময় পুষ্পখচিত কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রদ্বারা সে সমাধি আচ্ছাদিত ছিল; তিনি তথায় প্রতিনিয়ত দীপ প্রজ্বলিত করিয়া দিতেন এবং উদ্যানের সুগন্ধি কুসুমসকল চয়ন করিয়া, সেই অশ্রুজলসিক্ত কুসুমরাশি প্রিয় পতির সমাধির উপর নিক্ষেপ করিতেন। সেই সময়ে বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে করিতে তিনি

---

১২ কেহ কেহ বলেন যে, লুৎফ উন্নেসা, তাঁহার কন্যা ও সিরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা একাম উদ্দৌলার পুত্র মোরাদউদ্দৌলাকেও নিহত করা হয়। Holwell's India Tracts, p. 41-42, also Vansitart's Narratives. Vol. I, p. 52). Long-ও ইহাই লিখিয়াছেন; তিনি লুৎফ উন্নেসার স্থলে Suffen Nissa Begum লিখিয়াছেন, (Long's Selection, p. 223.) কিন্তু মুতাক্ষরীনে কেবল ঘসেটী ও আমিনারই জলমগ্ন হওয়ার কথা আছে। মীরণ তাঁহাদিগের প্রতি ষড়যন্ত্র সন্দেহ করিয়া জলমগ্ন করিতে আদেশ দেয়। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, তাঁহারা মৃত্যুকলে মীরণকে বজ্রাঘাতে মরিবার জন্য অভিসম্পাত করিয়া যান, এবং মীরণের নাকি তাহাতেই মৃত্যু হয়। মীরণের মৃত্যু সন্দেহজনক বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। লুৎফ উন্নেসা ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে পুনরানীতা হন। মুস্তাফা তাঁহাকে ১৭৮৯ খ্রীঃ অব্দে মুর্শিদাবাদে অবস্থিতি করিতে দেখিয়াছেন। খোসবাগে আজিও লুৎফ উন্নেসার সমাধি আছে। মোরাদ উদ্দৌলাকেও মুস্তাফা মুর্শিদাবাদে দেখিয়াছেন (Mutaqherin, Vol. I, p. 643) লুৎফ উন্নেসার কন্যা উম্মত জহুরাবংশীয়েরা অনেকদিন পর্যন্ত পেন্সন পাইয়াছিলেন। অদ্যাপি সে বংশের মালবার বেগম ও জাফর কুলী খাঁ নামক দুইজন জীবিত আছেন।

১৩ গ্যাস্ট্রেল সাহেব লিখিয়াছেন যে, লুৎফ উন্নেসা মাসিক ১০০০ টাকা পাইতেন: কিন্তু আমরা তাঁহার কন্যা উম্মত-জহুরাবংশীয়দিগের কাগজপত্র হইতে জানিতে পাইয়াছি, তাহা ১০০ টাকা মাত্র ছিল। [পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য]

ভূতলশায়িনী হইয়া পড়িতেন এবং অশেষ প্রকার করুণোদ্দীপক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া শোকভারের লঘুতা সম্পাদনার্থ চেষ্টা পাইতেন।[১৪] এইরূপে স্বামীর সমাধি পূজা করিতে করিতে, অন্তিমকাল উপস্থিত হইলে লুৎফ উন্নেসা স্বামীর চরণে মনোনিবেশ করিয়া তাঁহারই পদতলে চিরদিনের জন্য সমাহিত হইলেন। আজিও খোসবাগে সিরাজের পদতলে তাঁহার সমাধি বর্তমান রহিয়াছে। খোসবাগের বৃক্ষরাজির নিবিড় ছায়াতলে প্রকোষ্ঠমধ্যে তাঁহারা অনন্ত বিশ্রাম লাভ করিতেছেন, বিশ্বজননী বসুন্ধরার বিশাল অঙ্গের একদেশে তাঁহারা চিরনিদ্রায় অভিভূত। যাঁহারা জীবনে প্রভূত দুঃখ ও কষ্টে ক্ষতবিক্ষতহৃদয় হইয়া এক্ষণে বিশ্রাম লাভ করিতেছেন, তাঁহাদের সে বিশ্রামে ব্যাঘাত উৎপাদন করা যুক্তিসঙ্গত নহে। অনন্ত বিশ্রামে তাঁহারা চিরশান্তি লাভ করুণ।

উপরিলিখিত দুই-একটি ঘটনা হইতে সাধারণে লুৎফ উন্নেসার অলোকসামান্য চরিত্রের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাইবেন। ইতিহাসে তাঁহার কোনরূপ উজ্জ্বল চিত্র নাই; কিন্তু তাঁহার জীবনের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ঘটনা মিলিত করিলে, আমরা তাহারই মধ্য হইতে সে চরিত্রের অনেকটা আভাস বুঝিতে পারি। প্রচলিত ইতিহাসে সিরাজউদ্দৌলার মহিষীর উজ্জ্বল চিত্র থাকা সম্ভবপর নহে; সুতরাং আমাদের মনে তাহা সুন্দররূপে প্রতিভাত হইলেও, ঘটনাভাবে অধিকতর সুস্পষ্ট করা কঠিন।

---

১৪ Forster নামে একজন সাহেব লুৎফ উন্নেসার এইরূপ শোকপ্রকাশের কথা ১৭৮২ খ্রীঃ অব্দের ৩১শে আগস্ট তারিখে লিখিত একখানি পত্রে উল্লেখ করিয়াছেন। (Journey from Bengal to England. I. 10.)

পলাশী

পলাশী—এই নাম করিতে ইংলণ্ডীয় নর-নারীগণের কণ্ঠ মহানন্দে অবরুদ্ধ হইয়া আসে,—এই নাম শ্রবণে বিরাট আটলাণ্টিকের নীলহৃদয়ে মহা তুফানের সৃষ্টি হয়,—ইহার প্রতিধ্বনিতে ব্রিটনের বায়ুস্তর কম্পিত হইয়া ইউরোপের অন্যান্য জাতির মনে আঘাত করিতে থাকে। পলাশী—এই অমর নাম ভারতবিজেতা ক্লাইবের উপাধির সহিত চিরবিজড়িত হইয়া আছে।[১] ইংরেজের গৌরব-ভিত্তি ফোর্ট উইলিয়মের তোরণদ্বার পলাশী নাম মস্তকে বহন করিতেছে। পলাশীপ্রান্তরের বিজয়স্তম্ভে অক্ষরে অক্ষরে এই নাম ক্ষোদিত রহিয়াছে। পলাশী—আবার এই নামের স্মরণ করিতে সেই অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের চিত্র আসিয়া মানসনেত্রের সম্মুখে উপস্থিত হয়। সেই আলুলায়িতকেশা, ম্লানকান্তি, চ্যুতকিরীটিনী, মুসলমান-রাজলক্ষ্মীর ছবি মনে পড়ে—তাঁহার মুকুট হইতে একে একে সমস্ত রত্নগুলি বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছে এবং উদীয়মান ভাস্করকান্তি আর একটি জ্যোতির্ময়ী রমণী সেইগুলি ধীরে ধীরে সংগ্রহ করিয়া স্বীয় মুকুটে বিন্যাস করিতেছেন। মনে পড়ে—পলাশীযুদ্ধের দিন বিশ্বাসঘাতকদিগের অধীনতায় সহস্র সহস্র নবাবসৈন্য অর্ধচন্দ্রাকারে বহুদূরব্যাপী প্রান্তর বেষ্টন করিয়া, চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং নবাবের দুই-এক জন বিশ্বাসী সেনাপতির রণকৌশলে ইংরেজসৈন্য আম্রকুঞ্জমধ্যে চিরবিশ্রাম লাভ করিবার জন্য বাধ্য হইতেছে। আবার হতভাগ্য চঞ্চলমতি চতুর্বিংশতিবর্ষবয়স্ক যুবক নবাব সেই বিরাট বিশ্বাসঘাতকের পদতলে উষ্ণীষ রক্ষা করিয়া প্রাণ ভিক্ষা করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে আম্রকুঞ্জ হইতে বহির্গত ইংরেজসৈন্যগণের বিনাযুদ্ধে পলাশীবিজয়বার্তা এবং রোরুদ্যমান নবাবের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন প্রভৃতিও মনে পড়িয়া যায়। নিদাঘশুষ্কা ভাগীরথীর আকুলধ্বনি, মেঘাবরণে তপনের বদনাচ্ছাদন,[২] এইরূপ আরও অনেক কথার স্মরণ হয়। অবশেষে মনে হয়, বাঙ্গলার সিংহাসন মুসলমানের নিকট হইতে স্খলিত হইয়া পড়িতেছিল, অমনি ইংরেজ অগ্রসর হইয়া বাহু প্রসারণ পূর্বক তাহা ধরিয়া ফেলিল। ফরাসী ও অন্যান্য ইউরোপীয় জাতি অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল! এই পলাশী নামের সহিত কত স্মৃতি ও কত কথা যে জড়িত রহিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

পলাশীপ্রান্তরে বাঙ্গলার অথবা সমগ্র ভারতবর্ষের ভাগ্যপরিবর্তন ঘটে। এই স্থানে মুসলমান-ভাগ্য-চন্দ্রমা অস্তমিত ও ব্রিটিশ গৌরবসূর্যের অভ্যুদয় হয়। যে-শক্তি ধীরে ধীরে দক্ষিণাপথের পূর্বসাগরতীরে আপনার বিস্ময়করী ক্রীড়া দেখাইতেছিল, পলাশীপ্রান্তরে সেই শক্তি আসিয়া কেন্দ্রস্থ হয়। অবশেষে তাহার প্রবল প্রবাহে

১ পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইব Baron of Plassey এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

২ পলাশী যুদ্ধের দিন মেঘ, বৃষ্টি হওয়ার উল্লেখ আছে।

সমগ্র বঙ্গরাজ্য প্লাবিত হইয়া আসমুদ্র-হিমালয় সমগ্র ভারতবর্ষ ভাসিতে থাকে। পলাশীপ্রান্তরে যে কেবল মুসলমান রাজলক্ষ্মী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন, এমন নহে ; ভারতে তৎকালে আবার যে-হিন্দু রাজরাজেশ্বরী মূর্তির অস্ফুট ছায়া ধীরে ধীরে বিকাশ পাইতেছিল, তাহাও অবশেষে প্রকৃত ছায়াতেই পর্যবসিত হইয়া যায় ! ভারতে ব্রিটিশ ক্ষমতা সুদৃঢ় হওয়ায়, মহারাষ্ট্রীয় শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া পড়ে। অন্যান্য ইউরোপীয়গণও ভারতে প্রাধান্য লাভের যে আশায় উৎফুল্ল হইতেছিল, পলাশীপ্রান্তরে সে আশাও বিকলাঙ্গী হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে ভারত হইতে চিরবিদায় লইতে বাধ্য হয়। পলাশী হইতেই প্রাচ্য জগতে ইংলণ্ডের ক্ষমতা সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য জগতেও তাহার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পলাশীই উত্তমাশা অন্তরীপ, মরিশাস ও মিসরের বিজয় ও সেই সেই স্থানে উপনিবেশ সংস্থাপনের কারণ। পলাশীর জন্যই সমস্ত পৃথিবীতে ইংলণ্ডের বাণিজ্যস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে ; তাই নীলসাগরের উত্তাল তরঙ্গরাশি ভেদ করিয়া ব্রিটিশ অর্ণবপোত সদর্পে দেশ-বিদেশে গতায়াত করিতেছে। পলাশীই ইংলণ্ড ও তাহার উপনিবেশসমূহের শিল্পকার্যের মহোন্নতি সংসাধিত করিয়াছে। ইংলণ্ডের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কার্যে নিযুক্ত হইয়া, আপনাদিগের প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে অগাধ সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়া মনে মনে পলাশীকে ধন্যবাদ দিতেছেন ! ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত বংশীয়গণ শাসনকর্তার পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিজ নিজ রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিতেছেন এবং সমস্ত ব্রিটনসন্তানের হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব গৌরব সমুদিত হইয়া তাহাদিগকে সমগ্র বসুন্ধরার শ্রেষ্ঠজাতি বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইতেছে। পলাশীই ব্রিটিশ জাতির মনে আমেরিকার স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনের সান্ত্বনা দিয়াছে, এবং তাহার প্রতি অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিসমূহের অসূয়াদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

আর আমাদের—আমাদের অধিক কথা তুলিবার প্রয়োজন নাই। তবে শত শত বৎসর মুসলমানের পদানত থাকিয়া, সুশাসনের ছায়া যে-জাতির মন হইতে চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছিল, পলাশী সে জাতিকে যে যথেষ্ট সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছে ইহা কে অস্বীকার করিবে ? *যে দেশে প্রায়ই বিচারবিভ্রাট ঘটিত, সে দেশে এখন যে রাজার বিরুদ্ধেও বিচার প্রার্থনা করা হয়, ইহা এই হতভাগ্য জাতির পক্ষে কম সান্ত্বনার বিষয় নহে। যে-জ্ঞান বিজ্ঞানে সমগ্র ইউরোপ উন্নতির উচ্চ* শিখরে আরোহণ করিয়াছে, পলাশী সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের ছায়া ভারতবর্ষে আনিয়া দিয়াছে। পলাশী যেমন এক দিকে ভারতের দর্শন, ভারতের সাহিত্য, ইউরোপে লইয়া গিয়াছে, সেইরূপ ইউরোপ হইতে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানের আলোকও আনয়ন করিয়াছে। যে-দেশের অধিবাসিগণ সাধারণতন্ত্রের ও রাজনীতির পরিচয় বহুদিন হইতে জানিত না, পলাশী সেই ইউরোপীয় শাসন-নীতির শান্তিময় ছায়াতে সে দেশকে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে।

কিন্তু পলাশী হইতে যে আমাদের সম্পূর্ণ লাভ ঘটিয়াছে, এ কথা বলিতে পারা যায় না। পলাশী এক দিকে যেমন ব্রিটিশ-শিল্পের উন্নতি করিয়াছে, অন্য দিকে তেমনি ভারতীয় শিল্পের মস্তকে পদাঘাত ঘটাইয়াছে। এক দিকে যেমন ইউরোপের মধ্যবিত্তগণ ধনকুবের হইতেছেন, অন্য দিকে ভারতের মধ্যবিত্তগণ তেমনি অন্নাভাবে শ্মশানকঙ্কালের ন্যায় হইয়া উঠিতেছে। এক দিকে যেমন পাশ্চাত্ত্যজ্ঞান-বিজ্ঞান আমাদিগকে আলোকিত করিয়াছে, আর এক দিকে তেমনি আমাদিগের জাতীয় ভাবের অস্তিত্ব লোপ করিতে বসিয়াছে। এক দিকে যেমন আমাদিগের অলস হৃদয় উৎসাহের প্রতপ্ত মদিরাপানে কার্যক্ষম হইতেছে, অন্য দিকে তেমনি হৃদয় হইতে সরল বিশ্বাস অন্তর্হিত হইয়া সন্দেহের বিষময় বীজ দিন দিন অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছে। ভারতে এক্ষণে জাতিও নাই, জাতীয় ভাবও নাই। সে রাজপুত নাই, সে মহারাষ্ট্রীয় নাই, সে শিখও নাই—সে ধর্মপিপাসা নাই, সে স্বদেশভক্তি ও স্বজাতিপ্রীতিও নাই। পুরাকালের কথা বলিতেছি না, মুসলমানরাজত্বে যাহা ছিল, এখন তাহারও ছায়ামাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। পলাশী যেমন সমস্ত ভারতবাসীকে শান্তিময় ন্যায়ানুমোদিত শাসনের স্নিগ্ধ সুখ অনুভব করাইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে দরিদ্র ও অবিশ্বাসী করিয়া হৃদয়ের শান্তিঘট অশান্তির লগুড়াঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিয়াছে। বাহ্য শান্তির চরমোৎকর্ষ ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু আভ্যন্তরিক শান্তি ধীরে ধীরে যেন কোন্ অনিশ্চিত রাজ্যে পলায়ন করিতেছে। ইংরেজশাসনে যে এই দোষ ঘটিয়াছে, আমরা সে কথা বলিতেছি না। জাতীয় শিক্ষার অভাবেই পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানের সংঘর্ষ সহ্য করিতে না পারিয়া আমরা জাতীয়তা হারাইতে বসিয়াছি। এ বিষয়ে অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই, আপাততঃ বর্তমান প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ই বর্ণিত হইতেছে।

বর্তমান প্রবন্ধে পলাশী-যুদ্ধের একটি সংক্ষিপ্ত মর্ম প্রদান করিয়া, পূর্বতন ও আধুনিক পলাশীপ্রান্তরের একটি বিবরণ বর্ণন করাই আমাদের উদ্দেশ্য। পলাশীপ্রান্তর মুর্শিদাবাদ হইতে প্রায় পঞ্চদশ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। ইহার পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া প্রসন্নসলিলা ভাগীরথী কুল্ কুল্ রবে প্রবাহিত হইতেছেন; দক্ষিণে পলাশী গ্রাম। সেইজন্য এই ইতিহাস-বিখ্যাত প্রান্তরের নাম পলাশীপ্রান্তর। পলাশী নামে একটি বিশাল পরগণা মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ার মধ্যে বিরাজ করিতেছে। পলাশী গ্রাম ও পলাশী-প্রান্তর প্রভৃতি সমুদায়ই উক্ত পরগনার অন্তর্ভূত। মুর্শিদাবাদ হইতে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত যে প্রসিদ্ধ বাদশাহী সড়ক ভাগীরথীর পূর্বতীর দিয়া গমন করিয়াছে, সেই বিস্তৃত সড়ক পলাশীপ্রান্তর ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ভাগীরথীর গতি-প্রভাবে পূর্বতন সড়ক হইতে বর্তমান সড়কের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এইরূপ শুনা যায়, পূর্বে এই সকল স্থানে অনেক পলাশ বৃক্ষের শ্রেণী থাকায় ইহাকে পলাশী বলিত; কিন্তু এক্ষণে তাহাদের কোনই চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। খ্রীস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে পলাশীর আম্রকুঞ্জের নামই কীর্তিত হইয়া আসিতেছে; পলাশীতে লক্ষ বৃক্ষের

উদ্যান ছিল বলিয়া, পলাশীপ্রান্তরের কোন কোন স্থানকে অদ্যাপি লাখবাগ বলিয়া থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর আম্রকুঞ্জ সেই লাখবাগেরই অন্তর্গত ছিল। পলাশীপ্রান্তর উত্তর-দক্ষিণে প্রায় দুই ক্রোশ ও পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় এক ক্রোশ হইবে। এই প্রান্তরের মধ্যে মধ্যে এক্ষণে গ্রামের পত্তন হইয়া ইহার বিস্তৃতি লাঘব করিয়াছে। ভাগীরথীও ইহার কিয়দংশ স্বীয় গর্ভস্থ করিয়া কিছু কিছু চররূপে উদ্গীরণ করিয়াছেন।

মুর্শিদাবাদের দক্ষিণে পলাশীর ন্যায় আর বিস্তৃত প্রান্তর নাই। এইজন্য এইখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর মহাসমর সংঘটিত হয়। ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দের ২৩-এ জুন, হিজরী ১১৭০ অব্দের ৫ই সওয়াল বৃহস্পতিবার নবাব সিরাজউদ্দৌলা ও ইংরেজদিগের মধ্যে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। ইংরেজ বণিগ্‌গণ বাণিজ্যের আশায় ভারতবর্ষে আসিয়া দেশীয় রাজগণের অকর্মণ্যতাবশতঃ আপনাদিগের রাজ্যলাভের পিপাসা বর্ধিত করিতে থাকেন। বাঙ্গলার সুচতুর দূরদর্শী নবাব আলিবর্দী খাঁ তাহা সম্যগ্‌রূপে বুঝিতে পারিয়া, মৃত্যুকালে স্বীয় দৌহিত্র ও উত্তরাধিকারী সিরাজউদ্দৌলাকে ইংরেজদিগের দমনার্থ উপদেশ দিয়া যান।[৩] সিরাজের মাতৃষ্বসা ও জ্যেষ্ঠতাতপত্নী ঘসেটী বেগম বরাবরই সিরাজের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত ছিলেন ; তিনি গোপনে ইংরেজদিগের সহিত যোগ দিয়া সিরাজের অনিষ্ট সাধনের ইচ্ছা করেন। ঘসেটীর দেওয়ান রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ সপরিবারে কলিকাতায় ইংরেজদিগের আশ্রয় লইলে, সিরাজ তাঁহাদিগকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিবার জন্য কলিকাতার গবর্নর ড্রেক সাহেবের নিকট লোক প্রেরণ করেন। ইংরেজেরা নবাবের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ইংরেজদিগের কাশীমবাজার কুঠি ও কলিকাতা অধিকার করিয়া বসেন। তাঁহার কর্মচারিগণের অসাবধানতায় ইংরেজ-দুর্গের অন্ধকূপ নামে একটি ক্ষুদ্র কারাগৃহে আবদ্ধ হইয়া কয়েক জন ইংরেজ প্রাণত্যাগ করে। পরবর্তী কালে ইংরেজেরা তাহাকে অন্ধকূপহত্যাকাণ্ড নাম প্রদান করিয়া, একটি অতিরঞ্জিত কাহিনী লোকসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন। এই অন্ধকূপহত্যাসম্বন্ধে অনেক রহস্য আছে, স্থানান্তরে তাহার উল্লেখ করা যাইবে।

কলিকাতার ইংরেজদিগের দুরবস্থাশ্রবণে মাদ্রাজ হইতে আড্‌মিরাল ওয়াট্‌সন ও কর্নেল ক্লাইব ইংরেজদিগের রক্ষার জন্য বাঙ্গলায় আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহারা কলিকাতা পুনরাধিকার করিয়া হুগলী অধিকার করিলে, নবাব তাঁহাদিগকে বাধা প্রদানের জন্য পুনর্বার কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। ক্লাইবের রণকৌশলে নবাব পরাজিত হইয়া ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী এক সন্ধিপত্র লিখিয়া দেন। ইহাতে নবাব ইংরেজদিগের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিবেন না বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাঁহাদিগের ক্ষতিপূরণে প্রতিশ্রুত হন। ইংরেজেরাও বণিকের ন্যায়

৩ Holwell's India Tracts, pp. 32-33.

ব্যবসায় চালাইবেন, নবাবের রাজ্যে গোলযোগ ও শান্তিভঙ্গ করিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করেন। সিরাজ সন্ধির শর্ত রক্ষা করিতে যথেষ্ট যত্ন পাইয়াছিলেন; কিন্তু ক্লাইব সাহেবের ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল। শান্তির অপেক্ষা তাঁহার হৃদয়ে যুদ্ধের পিপাসা বলবতী থাকায়, তিনি ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে যুদ্ধারম্ভের ছলে, ফরাসীদিগের চন্দননগর অধিকার করিতে ইচ্ছা করিলেন। রাজ্যমধ্যে পুনর্বার যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হইলে, নবাব শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় ইংরেজদিগকে চন্দননগর আক্রমণ করিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। ইংরেজেরা নবাবের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহারা হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমারকে হস্তগত করিয়া, চন্দননগর অধিকার করিতে অগ্রসর হইলেন। নবাব নন্দকুমাবকে ফরাসীদিগের সাহায্যের জন্য লিখিয়া পাঠাইয়া, রাজা দুর্লভরামকে সসৈন্যে হুগলীতে পাঠাইয়া দিলেন। নন্দকুমার স্বয়ং ফরাসীদিগের সাহায্য করিলেন না, অধিকন্তু রাজা দুর্লভরামকেও ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। ইংরেজেরা অবশেষে চন্দননগর অধিকার করিয়া বসিলেন। ফরাসীরাও এই আক্রমণে আপনাদিগের যথাসাধ্য বিক্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

নবাব দুর্লভরামকে সসৈন্যে পলাশীতে অবস্থান করিতে আদেশ দিলে, দুর্লভরাম আপনার সৈন্য লইয়া পলাশী-প্রান্তরে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। এই সময়ে সিরাজের বিরুদ্ধে এক ভীষণ ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। জগৎশেঠ, মীরজাফর, রায়দুর্লভ প্রভৃতি তাহার অধিনায়ক। ইয়ার লতিফ খাঁ নামে নবাবের একজন সেনাপতি নবাবীপ্রাপ্তির আশায় ইংরেজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন; মীরজাফরও সেই মর্মে আবেদন করেন। ইংরেজেরা মীরজাফরকে নবাবী দিতে স্বীকৃত হন; কিন্তু ইয়ার লতিফকেও আশ্বাস দিয়া ভুলাইয়া রাখিতে ত্রুটি করেন নাই। ইংরেজেরা নবাবকে পলাশীপ্রান্তর হইতে সৈন্য ফিরাইয়া লওয়ার জন্য লিখিয়া পাঠাইলে, নবাব প্রথমে স্বীকৃত হন, কিন্তু অবশেষে ইংরেজদিগের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। ক্লাইবও চতুরতাপূর্বক নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন বলিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন। যখন উভয় পক্ষের উদ্দেশ্য প্রকাশিত হইয়া পড়িল, তখন উভয় পক্ষই পলাশী প্রান্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। ইংরেজ-সৈন্য পলাশীর দিকে যাত্রা করিয়া ১৬ই জুন পাটুলীতে উপস্থিত হয়। অনন্তর ১৭ই জুন কাটোয়াতে উপনীত হইয়া, কাটোয়া অধিকারপূর্বক তথায় ২২শে পর্যন্ত অপেক্ষা করে। ঐ স্থানেই নবাবকে পলাশীতে আক্রমণ করিবার পরামর্শ স্থির হইল। ২২শে রাত্রিকালে তাহারা পলাশীতে উপস্থিত হইয়া আম্রকুঞ্জমধ্যে আশ্রয় লয়। নবাব মীরজাফর প্রভৃতির অভিসন্ধি কিয়ৎপরিমাণে বুঝিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু সে সময়ে মীরজাফরের সহিত মিলন করিয়া প্রথমে তাঁহাকেই পলাশী অভিমুখে যাইবার আদেশ দেন। বলা বাহুল্য, মীরজাফর নিজে মৌখিক সদ্ভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। মীরজাফর পলাশী অভিমুখে যাত্রা করিলে, নবাব মুর্শিদাবাদ হইতে প্রথমে

মনকরায়, তৎপরে দাদপুরে, অবশেষে ইংরেজদিগের আসিবার প্রায় ১২ ঘণ্টা পূর্বে পলাশীতে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করেন।[৪]

পলাশীর যে-আম্রকুঞ্জমধ্যে ইংরেজেরা আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহা উত্তর-দক্ষিণে দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৬ শত হস্ত, এবং প্রস্থে পূর্ব-পশ্চিম প্রায় ৬ শত হস্ত। এই কুঞ্জে শ্রেণীবদ্ধ আম্র ও অন্যান্য বৃক্ষশাখা বিস্তার করিয়া ইংরেজ সৈন্যদিগকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছিল। ভাগীরথী তৎকালে বড় অধিক দূরে ছিলেন না। কুঞ্জটি চারিদিকে একটি অল্প পরিসর খাদ ও একটি অনতি-উচ্চ বাঁধ দ্বারা বেষ্টিত হইয়া বিরাজ করিতেছিল। কুঞ্জের উত্তর দিকে নদীতীরে নবাবের একটি শিকারমঞ্চ ছিল। এইখানে ভাগীরথী অত্যন্ত বক্রতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, দুইটি বড় বড় বাঁক নৌকারোহিগণের গতায়াতের বড়ই বিলম্ব ঘটাইত। শিকার-মঞ্চের নিকটস্থ বাঁকটি অপেক্ষাকৃত অল্প দূর বিস্তৃত ছিল। কিন্তু তাহার উত্তর-পশ্চিমে তদপেক্ষা আর একটি অশ্বপদাকৃতি প্রশস্ত বাঁক একটি উপদ্বীপের সৃষ্টি করিয়াছিল। সে স্থলে ভাগীরথীর উভয় মুখের ব্যবধান অর্ধক্রোশেরও এক-চতুর্থাংশমাত্র হইবে। রায়দুর্লভ হুগলী হইতে পলাশীতে গমনপূর্বক এখানে আম্রকুঞ্জের উত্তরে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিবিরের দক্ষিণ দিকের পরিখা হইতে কুঞ্জের ব্যবধান বড় অধিক দূর ছিল না। উক্ত পরিখা দক্ষিণ দিকে ভাগীরথী তীর হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্বমুখে ৪ শত হস্ত পর্যন্ত গমন করে, পরে উত্তর-পূর্বে প্রায় ৩ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ভাগীরথী-বেষ্টিত উপদ্বীপটি এই পরিখার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে।

নবাব উপস্থিত হইলে, তাঁহার সমস্ত সৈন্য এই পরিখার মধ্যে শিবির সন্নিবেশ করিল। পরিখার সম্মুখে একটি বুরুজ নির্মাণ করিয়া, তাহাতে কামান সকল স্থাপিত হইল। পরিখার বাহিরেও বুরুজ হইতে প্রায় ৬ শত হস্ত পূর্বে একটি বনাচ্ছন্ন পাহাড়ী বা উচ্চভূমি ছিল। পাহাড়ী ও বুরুজ হইতে ১৬ শত হস্ত দক্ষিণে একটি ছোট পুষ্করিণী এবং তাহা হইতে ২ শত হস্ত আরও দক্ষিণে কুঞ্জের নিকটে একটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ পুষ্করিণী আপনাদিগের অনতি-উচ্চ পাহাড়ীবেষ্টিত হইয়া প্রান্তর-বক্ষে বিরাজিত ছিল। ২৩শে জুন প্রাতঃকালে নবাব-সৈন্য শিবির হইতে বহির্গত হইয়া, কুঞ্জাভিমুখে যাত্রা করিয়া সমস্ত প্রান্তর বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইল। সিনফ্রে বা সেণ্ট ফ্রায়াস নামে একজন ফরাসী গোলন্দাজ সেনাপতির অধীন কতিপয় ফরাসী সৈন্যের সহিত নবাবসৈন্যের কিয়দংশ আম্রকুঞ্জের সন্নিহিত বৃহত্তর পুষ্করিণীর নিকট উপস্থিত হইল। তাহাদের পশ্চাদ্ভাগে মীরমদন এবং মীরমদনের পশ্চাৎ মোহনলাল অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের দক্ষিণ পার্শ্বে অর্থাৎ পূর্ব দিকে বনাচ্ছন্ন পাহাড়ীর অব্যবহিত দক্ষিণ-পূর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া আম্রকুঞ্জ অতিক্রমপূর্বক

৪ Orme, Vol. II, p. 172.

প্রায় পলাশীগ্রাম পর্যন্ত নবাব-সৈন্য দুর্লভরাম, ইয়ার লতিফ ও মীরজাফরের অধীন সুসজ্জিত অবস্থায় দণ্ডায়মান হইল। দুর্লভরাম উত্তর-পশ্চিম দিকে পাহাড়ীর নিকটে, ইয়ার লতিফ মধ্যভাগে এবং মীরজাফর দক্ষিণ-পশ্চিমে আম্রকুঞ্জের দক্ষিণ-পূর্ব ও পলাশী গ্রাম হইতে অল্প ব্যবধানে মহাসমরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।[৫] বলা বাহুল্য, দুর্লভরাম, ইয়ার লতিফ ও মীরজাফর তিনজনই বিশ্বাসঘাতক ও ষড়যন্ত্র-কারিগণের নেতা ; এবং ইঁহাদের নেতৃত্বে নবাবের সর্বাপেক্ষা অধিক সৈন্য ছিল। যুদ্ধকালে ইঁহারা সামান্যমাত্র পদবিক্ষেপও করেন নাই। ক্লাইব আম্রকুঞ্জের নিকটস্থ শিকারমঞ্চ হইতে শত্রুপক্ষের সৈন্যসাগর নিরীক্ষণপূর্বক ভীত হইয়া পড়িলেন। তাহাদিগকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, তিনি স্বীয় সৈন্যদিগকে কুঞ্জ হইতে বহির্গত হইতে আদেশ দিয়া, মঞ্চের পূর্ব হইতে তাহার সহিত সমরেখ করিয়া সৈন্যদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিলেন। সম্মুখে একটি যৎসামান্য বুরুজ নির্মাণ করিয়া, তাহাতে কামান-সকল রক্ষা করা হইল। ক্লাইব বামভাগের সৈন্যদিগের কতক অংশকে অগ্রসর হইয়া ৪ শত হস্ত দূরে দুইটি ইষ্টকের পাঁজার পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিতি করিতে আদেশ দিলেন।

বেলা আট ঘটিকার সময় প্রথমে সিনফ্রের অধীন সৈন্যগণ গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করিল। ইংরেজেরাও তাহার প্রতিবর্ষণ করিলেন। তিন ঘণ্টা কাল গোলায় গোলায় যুদ্ধ চলিল। ক্লাইব কোনরূপ সুবিধা বুঝিতে না পারিয়া, সৈন্যদিগকে পশ্চাৎ হটিয়া আম্রকুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিতে আদেশ দিলেন এবং অন্যান্য সামরিক কর্মচারীর সহিত পরামর্শ করিয়া রাত্রিযোগে নবাবকে আক্রমণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। এই সময়ে এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায়, নবাবের সমস্ত বারুদ ভিজিয়া যায়। ইংরেজেরা আপনাদিগের বারুদ আবরণ দ্বারা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বারুদ ভিজিয়া যাওয়ায়, নবাবকে বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। ইংরেজ-সৈন্য আম্রকাননে প্রবিষ্ট হইতেছে দেখিয়া, নবাবের প্রধান সেনাপতি মীরমদন একদল অশ্বারোহী সৈন্যসহ কুঞ্জাভিমুখে অগ্রসর হইলেন ; কিন্তু অধিক দূর যাইতে না যাইতেই ইংরেজদিগের একটি গোলা আসিয়া তাঁহাকে সাংঘাতিকরূপে আহত করিল ; ইহাতে নবাবসৈন্য অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। মীরমদনের পশ্চাদ্ভাগে হিন্দুবীর মোহনলাল অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া, ইংরেজদিগকে মথিত করিবার জন্য মহাবেগে ধাবিত হইলেন। তাঁহার আক্রমণে ইংরেজসৈন্যগণ অস্থির হইয়া ক্রমশঃ কুঞ্জমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল।[৬] ইতিমধ্যে এক মহা ব্যাপার উপস্থিত হইল।

---

৫ মেজর রেনেল, এই সৈন্যাবস্থানের একটি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। লর্ড কর্জনের উপদেশে সেই চিত্র অবলম্বনে পলাশী প্রান্তরে স্তম্ভ সকল স্থাপিত হইয়াছে।

৬ মীরমদনের মৃত্যুর পর মোহনলালের অগ্রসর হওয়ার কথা Orme, Broome, Malleson প্রভৃতি প্রধান প্রধান ইংরেজ ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থে উল্লিখিত হয় নাই। একমাত্র Stewart-এ উল্লিখিত হইয়াছে। সায়র উল মুতাক্ষরীনে প্রথমে এই ঘটনা উল্লিখিত হয়,

মীরমদনের পতন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া, সিরাজ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন। তিনি ইতিকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া মীরজাফরকে আহ্বানপূর্বক তাঁহার পদতলে উষ্ণীষ রক্ষা করিয়া, এই আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। মীরজাফর সে দিবস নবাবকে যুদ্ধে ক্ষান্ত হইতে পরামর্শ দিলেন। বিশ্বাসঘাতকদের পরামর্শে সিরাজ মোহনলালকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিয়া পাঠাইলেন। মোহনলাল তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া উত্তর দিলেন যে, এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হইলে, আর কিছুতেই জয়ের আশা থাকিবে না। সিরাজ মীরজাফরকে মোহনলালের কথা জানাইলে, উত্তর করিলেন যে, তিনি নবাবকে সময়োচিত সৎপরামর্শই দিয়াছেন ; এক্ষণে নবাবের যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। রায়দুর্লভও তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে যাইতে পরামর্শ দিলেন। মীরজাফরের এইরূপ উত্তর শুনিয়া সিরাজ আরও ভীত হইয়া পড়িলেন, এবং পুনর্বার মোহনলালকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ পাঠাইলেন। নবাবের বারংবার আদেশে মোহনলাল বিরক্ত হইয়া যেই প্রতিনিবৃত্ত হইতে আরম্ভ করিলেন, অমনি নবাবসৈন্য-গণ চতুর্দিকে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। ইংরেজসৈন্য সুযোগ বুঝিয়া আম্রকুঞ্জ হইতে বহির্গত হইয়া মহাবেগে নবাবসৈন্যের উপর পতিত হইল।

এস্থলে ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ ক্লাইবের সম্বন্ধে এক কৌতুকাবহ ঘটনার উল্লেখ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, ক্লাইব স্বীয় সৈন্যদিগকে আম্রকুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিতে আদেশ প্রদান করিয়া স্বয়ং শিকারমঞ্চে বিশ্রাম করিতেছিলেন। মোহনলাল রণে ভঙ্গ দিলে, নবাবসৈন্যগণ যখন প্রতিনিবৃত্ত হইতে আরম্ভ করে, ঠিক সেই সময়ে মেজর কিলপ্যাট্রিক তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য ইংরেজসৈন্যদিগকে আদেশ দিয়া এক-জন সৈনিক কর্মচারী দ্বারা ক্লাইবের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। সৈনিক কর্মচারী গিয়া দেখিলেন, ক্লাইব নিদ্রা যাইতেছেন।[৭] এই সংবাদে ক্লাইব প্রথমে চমকিত হইয়া উঠেন এবং কিলপ্যাট্রিককেও তিরস্কার করেন, কিন্তু যখন বুঝিতে পারিলেন যে, কিলপ্যাট্রিকের কার্য যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে, তখন নিজেই নবাবসৈন্যের প্রতি মহাবেগে ধাবিত হইলেন।

এদিকে নবাবসৈন্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। বিশ্বাসঘাতক সেনাপতিত্রয় ইংরেজদিগের কোনপ্রকার বাধাপ্রদান করিল না। কিন্তু সেনাপতি সিনফ্রে ইহাতে

(Mutaqherin, Trans. Vol. I, p. 768); স্টুয়ার্ট তাহা হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। মোহনলালের এই অদ্ভুত বীরত্বকাহিনীর উল্লেখ করিতে ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ কি জন্য বিস্মৃত হইলেন, বলিতে পারি না। যদি সিরাজউদ্দৌলা তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ না দিতেন, তাহা হইলে ইংরেজদিগের যে সর্বনাশ সংসাধিত হইত, এই কথা গোপন কবিবার জনাই বোধ হয় কোন কোন ঐতিহাসিক ইচ্ছাপূর্বক নীরব হইয়াছেন। কিন্তু ম্যালীসনের ন্যায় নিরপেক্ষ ঐতিহাসিককে নীরব থাকিতে দেখিয়া আমরা যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছি।

৭ Orme, Vol. II, p. 176. also Transactions in India, p. 36. অধুনা ক্লাইবের নিদ্রা যাওয়ার কথার প্রতিবাদ হইতেছে। Hill's Indian Records—Bengal.

বিচলিত না হইয়া, আপনার অধীন অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়াই ইংরেজদিগের গতিরোধ করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে পশ্চাৎ হটিয়া নবাবের বুরুজ, পরিখাভ্যন্তর এবং পাহাড়ী হইতে ক্রমান্বয়ে গোলাগুলি চালাইতে লাগিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলিয়া থাকেন যে, পলাশীযুদ্ধের মধ্যে এইটুকুই প্রকৃত যুদ্ধ।[৮] সিনৃফ্রে শত চেষ্টা করিয়াও ইংরেজদিগের গতিরোধ ও নবাবকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। অপরাহ্ণ পাঁচঘটিকার সময় ইংরেজরা নবাবের পরিখাবেষ্টিত শিবির অধিকার করিলেন। কিন্তু সিরাজ ইতিপূর্বেই উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন।

এইরূপে পলাশীযুদ্ধের অবসান হইল। এই যুদ্ধে নবাবের ৩৫ হাজার পদাতি, ১৫ হাজার অশ্বারোহী ও ৫০টি কামান উপস্থিত ছিল।[৯] তাহাদের মধ্যে প্রায় ৪৫ হাজার সৈন্য বিশ্বাসঘাতক সেনাপতিত্রয়ের নেতৃত্বে অবস্থিতি করে। ইংরেজদিগের ৯ শত ইউরোপীয়, ১ শত তোপাসী ও ২১ শত সিপাহী মাত্র ছিল। ইংরেজদিগের নাকি ৭০ জন মাত্র হত ও আহত হয়।[১০] ২৩-এ জুন রাত্রিতে ক্লাইব পলাশীপ্রান্তর হইতে প্রায় তিন ক্রোশ উত্তরে দাদপুরে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। পর দিন প্রাতঃকালে মীরজাফর দাদপুরে ক্লাইবের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, ক্লাইব তাঁহাকে বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার নবাব বলিয়া অভ্যর্থনা করেন। দাদপুর হইতে প্রথমে মীরজাফর, তৎপরে ইংরেজেরা মুর্শিদাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হন। ২৫-এ জুন ক্লাইব বহরমপুরের নিকট মাদাপুরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া, ২৯-এ জুন পর্যন্ত কাশীমবাজারে অবস্থান করেন; অনন্তর সেই দিবসেই মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া, মীরজাফরকে সিংহাসনে উপবেশন করাইয়াছিলেন।

আমরা সংক্ষেপে পলাশী যুদ্ধের বিবরণ প্রদান করিলাম। ইহা হইতে পলাশী-ক্ষেত্রে নবাবের সহিত ইংরেজদিগের কিরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, সাধারণে তাহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিবেন। নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, পলাশীতে

৮ Malleson's Lord Clive, p. 270.

৯ নবাবের সৈন্যসংখ্যা লইয়া মতভেদ দৃষ্ট হয়। Malleson, ৩৫ হাজার পদাতি, ১৫ হাজার অশ্বারোহী ও ৫০টি কামানের উল্লেখ করিয়াছেন। Orme ৫০ হাজার পদাতি, ১৮ হাজার অশ্বারোহী ও ৫০টি কামানের কথা বলেন। Scrafton ৫০ হাজার পদাতি, ২০ হাজার অশ্বারোহী ও ৫০টি কামানের কথা বলিয়াছেন। (Scrafton's Reflection, pp. 85-86.)

১০ ইংরেজদিগের ৭০ জন মাত্র হত ও আহত হওয়ার কথা ইংরেজরাই বলিয়া থাকেন। একজন নিরপেক্ষ ইংরেজ সে সম্বন্ধে একটু ব্যঙ্গপূর্বক এইরূপ লিখিয়াছেন :

"Happy it was for the company that this numerous army made so little resistance that, according to Mr. Scrafton there were only seventy men killed and wounded." (Bolt's Consideration on Indian Affairs, Pt. I, p. 40)

প্রকৃত যুদ্ধ ঘটে নাই ; ইংরেজেরা একরূপ বিনাযুদ্ধেই পলাশীতে জয়লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই জয়লাভে তাঁহাদিগকে জগতের মধ্যে অজেয় করিয়া তুলিয়াছে। এই বিজয়ের কারণ, কেবল বিশ্বাসঘাতকদিগের ষড়যন্ত্র ও সিরাজউদ্দৌলার কাপুরুষতা! যদি নবাবের সেনাপতিগণ স্ব স্ব কর্তব্য পালন করিতেন, অথবা মীরমদনের পতনের পর সিরাজ মোহনলালের সহিত নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন, তাহা হইলে উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল মহাসমুদ্রপ্রায় নবাবসৈন্যের নিকট মুষ্টিমেয় ইংরেজ তৃণগুচ্ছ যে কোথায় ভাসিয়া যাইত, তাহা বলিতে পারা যায় না।

কোন নিরপেক্ষ ইংরেজ ঐতিহাসিক এই পলাশীযুদ্ধ সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। "বাস্তবিক ফলবিষয়ে পলাশীবিজয়ের ন্যায় বিজয়লাভ আর কখনও হয় নাই। কিন্তু যুদ্ধের কথা ভাবিলে, আমার মতে তাহাতে গৌরবের বিষয় কিছুই নাই। প্রথমতঃ সে যুদ্ধ ন্যায়সঙ্গত হয় নাই। সিরাজউদ্দৌলার তিন জন প্রধান সেনাপতি যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করিত, তাহা হইলে, পলাশীযুদ্ধে কখনই জয়লাভ হইত না। মীরমদন খাঁর মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত ইংরেজেরা অগ্রসর হইতে পারেন নাই ; প্রত্যুত পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নবাবসৈন্য যদি বিশ্বস্ত ও রাজভক্ত ব্যক্তিগণের দ্বারা চালিত হইয়া, স্বস্থানে অবস্থিতিমাত্র করিত, তাহা হইলে ইংরেজেরা তাহাদের কিছুই করিতে পারিতেন না। ফরাসী গোলন্দাজদিগের অভিমুখে অগ্রসর হইলেই ইংরেজসৈন্যের দক্ষিণ পার্শ্ব ৪০ সহস্র বিপক্ষ সেনার সম্মুখে পড়িত। অতএব সে কথা মনে স্থান পাইবার যোগ্য নহে। কেবল বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারাই কার্যসিদ্ধি হইয়াছিল। যখন সেনাপতিগণের বিশ্বাসঘাতকতাবশতঃ নবাব যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন, যখন সেই বিশ্বাসঘাতকতা নবাবসৈন্যগণকে তাহাদের সুরক্ষিত অবস্থান হইতে অপসারিত করিল, তখনই ক্লাইব সসৈন্যে বিধ্বস্ত হইবার আশঙ্কা না করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। অতএব পলাশীতে যদিও নিঃসংশয়রূপে বিজয়লাভ হইয়াছিল, তথাপি ইহাকে একটি মহাযুদ্ধ বলা যাইতে পারে না।"[১১] তাহার পর, ইংরেজেরা সিরাজের সহিত যেরূপ সাধুজনবিগর্হিত ব্যবহার করিয়া

---

১১ "Yes ! As a victory, Plassey was, in its consequences perhaps the greatest ever gained. But as a battle, it is not in my opinion, a matter to be very proud of. In the first place, it was not a fair fight. Who can doubt that if the three principal generals of Sirazu'd daulah had been faithful to their master, Plassey would not have been won ? Up to the time of the death of Mir Mudin Khan the English had made no progress ; they had even been forced to retire. They could have made no impression on their enemy had the Nuwab's army, led by men loyal to their master, simply maintained their position. An advance against the French guns meant an exposure of their right flank to some 40,000 men. It was not to be thought

পলাশীযুদ্ধের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে পলাশীযুদ্ধের নাম ইতিহাসে চিরকলঙ্কিত হইয়া থাকিবে। ৯ই ফেব্রুয়ারীর সন্ধির পর হইতেই সিরাজ সন্ধিবিরুদ্ধ কোন কার্যই করেন নাই। কিন্তু ইংরেজেরা কৌশলপূর্বক পদে পদে সন্ধিভঙ্গ করিয়া, বিশ্বাসঘাতকদিগের সাহায্যে সিরাজের সর্বনাশসাধন করিয়াছেন।

কোন ইংরেজ লেখক বলিয়াছেন,—'যে গরজের জন্য রাজনৈতিক বিষয়ে সমস্ত শপথসন্ধি প্রভৃতি অতিক্রান্ত হয়, সেই গরজবশতঃ ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধিগণ পূর্বকৃত সন্ধির প্রায় তিন মাস পরে ঈশ্বরের আশীর্বাদে সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া অপর আর একজনকে তাহা প্রদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন।'[১২]

of. It was only when treason had done her work, when treason had driven the the Nuwab from the field, when treason had removed his army from its commanding position, that Clive was able to advance without .the certainty of being annihilated, Plassey then, though a decisive, can never be considered a great battle." (Malleson's Decisive Battles of India—Plassey. p. 73)

বিশ্বাসঘাতকতার জন্য পলাশীতে যে ইংরেজেরা জয়লাভ করিয়াছিলেন, ইহা নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকমাত্রেরই মত। আমরা আর একজন ইংরেজ লেখকের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি ঃ

"It was also stipulated, that these treasonable arrangements should only take place when Meer Jaffier should have foully betrayed his master in the field. This memorable instance of perfidy was acted in the grove of Plassey, (June 26, 1757) where the standard of rebellion was hoisted, and where a few hundreds of British soldiers are said to have acquired immortal honour, by facilitating the sanguinary machinations of traitors against the dominion and life of their lawful sovereign, by taking advantage of an enemy thrown into confusion and convulsed by the death or desertion of its officers, and by deluging the plains with the blood of an unwieldy multitude, without arms, union, confidence, or discipline, and equally incapable of resistance or retreat. * * * * * *

"In this manner was fought the celebrated battle of Plassey. Truth will ascribe the achievement to treachery ; when the lustre of the actors ceases to give brilliancy to the fact. It was no new mode of displaying military heroism, and Clive was but a servile imitator in making the experiment, first to bribe the general, and then to massacre the troops." (Transactions in India, pp. 35-37.) লেখকের উক্তিতে পলাশীযুদ্ধের তারিখটি ভ্রমক্রমে ২৩শে জুনের স্থলে ২৬-এ জুন লিখিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ উহা মুদ্রাকরপ্রমাদ।

১২ "Necessity which in politics usually supersedes all oaths treaties or forms whatever, induced the English East India Company's

আর একজন বলিয়াছেন যে, "কোন নিরপেক্ষ ইংরেজ ৯ই ফেব্রুয়ারী হইতে ২৩-শে জুন পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাবলীর বিচার করিতে বসিয়া, একথা অস্বীকার করিবেন না যে, ক্লাইবের নাম অপেক্ষা সিরাজউদ্দৌলার নাম অধিকতর সম্মানীয়। সেই বিয়োগান্ত নাটকের প্রধান অভিনেতাদিগের মধ্যে কেবল সিরাজই প্রতারণা করিতে চেষ্টা করেন নাই।"[১৩] ইহা ইংরেজ ঐতিহাসিকগণেরই মত। ফলতঃ ন্যায়ধর্ম বিসর্জন দিয়া, একমাত্র বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে ইংরেজরা যে পলাশীতে জয়লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। উক্ত বিষয়ের আর অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই। আপাততঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর পলাশীপ্রান্তরের কিরূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর পলাশীপ্রান্তরের এক্ষণে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ভাগীরথীর গতিই এই পরিবর্তনের প্রধান কারণ। ভাগীরথী পশ্চিম দিক হইতে পূর্বদিকে সরিয়া আসায়, এইরূপ পরিবর্তন ঘটে। ভাগীরথীগর্ভস্থ পলাশীপ্রান্তরের কিয়দংশ পুনর্বার চররূপে পরিণত হইয়াছে। বর্ষাকালে তাহাও ভাগীরথী-সলিলরাশির অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া থাকে। এই চরভূমির পূর্বে একটি প্রকাণ্ড বাঁধ বরাবর ভাগীরথীর পূর্ব তীর দিয়া মুর্শিদাবাদ অতিক্রমপূর্বক চলিয়া গিয়াছে। এই বাঁধদ্বারা ভাগীরথীর জলপ্লাবন রক্ষা করা হয়। বাঁধের পূর্বপার্শ্বেই পলাশীপ্রান্তর। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রান্তর বাঁধের পশ্চিম পার্শ্বেও ছিল। পলাশীযুদ্ধের সময় যে দুইটি বৃহৎ বাঁক ছিল, এক্ষণে তাহাদের আকারও ভিন্নরূপ হইয়াছে। অশ্বখুরাকৃতি প্রশস্ত বাঁকটিকে ১৭৮৭ খ্রীঃ অব্দে টমাস লায়ন সাহেব কাটিয়া দেন।[১৪] বাঁকের দুই মুখ এক হওয়ায় বাঁকটিকে এক্ষণে একটি বিলে পরিণত করিয়াছে। তৎকালে বাঁকবেষ্টিত প্রশস্ত উপদ্বীপটিতে যে-সমস্ত গ্রাম ভাগীরথীর পূর্বতীরে ছিল, এক্ষণে তাহারা পশ্চিমতীরবর্তী হইয়াছে। বিধুপাড়া নামে একখানি গ্রামের ঐরূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। প্রশস্ত বাঁকটির একেবারে অন্তর্ধান ঘটায়, তাহার দক্ষিণ-পূর্বদিকের বাঁকেরও

representatives, about three months after the execution of the former treaty, to determine 'by the blessing of God,' upon dispossessing the Nabob Serjah al Dowlah of his Nizamut, and giving it to another." (Bolt's consideration, p. 40.)

১৩ "Nay more, no unbiased English man, sitting in judgment on the events which passed in the interval between the 9th February and the 23rd June, can deny that the name of Siraju'd daulah stands higher in the scale of honour than does the name of Clive. He was the only one of the principal actors in that tragic drama who did not attempt to deceive!" (Malleson's Decisive Battles of India. p. 76)

১৪ Proceedings of the Board of Revenue.

পরিবর্তন হইয়াছে। যে-স্থানে আম্রকুঞ্জ ছিল, তাহার অধিকাংশ ভাগীরথীগর্ভস্থ হইয়াছিল ; এক্ষণে কিয়দংশ আবার চররূপে নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। বাঁকের পশ্চিমে ভাগীরথীর প্রাচীন গর্ভের নিদর্শন দেখা যায় ; বর্ষাকালে তাহা জলপ্লাবিত হইয়া থাকে। বিধুপাড়ার পারঘাটের নিকট তাহার উত্তরদিকের মুখ দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণদিকের অনেক অংশ পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

আম্রকুঞ্জের শেষে বৃক্ষটি ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দে শুষ্ক হওয়ায়, তাহার মূল খনন করিয়া ইংলণ্ডে পাঠান হয়। গোলার আঘাতে বৃক্ষটিতে ছিদ্র হইয়াছিল। উক্ত বৃক্ষ আম্রকুঞ্জের উত্তর-পশ্চিম কোণের বৃক্ষ বলিয়া প্রতীত হয়। ১৮০২ খ্রীঃ অব্দে ভ্যালেণ্টাইন সাহেব পাল্কী আরোহণে পলাশীপ্রান্তর দিয়া গমন করিয়াছিলেন। তিনি কুঞ্জটি দেখিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান পলাশী গ্রামের উত্তর-পূর্বে ও নবগ্রাম তেজনগরের দক্ষিণ-পূর্বে একটি আম্রবৃক্ষ আছে। লোকে বলিয়া থাকে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর আম্রকুঞ্জ বা লাখবাগের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের আম্রবৃক্ষের নিকট তাহারই বীজ হইতে উক্ত বৃক্ষের উৎপত্তি হইয়াছে। যেখানে শেষ আম্রবৃক্ষটি ছিল, অর্থাৎ যাহা ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দে শুকাইয়া যায়, তাহা হইতে প্রায় ৬০।৭০ হস্ত দক্ষিণ-পূর্বে বেঙ্গল গবর্নমেণ্ট কর্তৃক ১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দে একটি গ্রানাইট প্রস্তরের বিজয়স্তম্ভ নির্মিত হইয়াছিল। ১৯০৯ খ্রীঃ অব্দে লর্ড কর্জনের অনুমতিক্রমে তদপেক্ষা একটি বৃহৎকায় মনুমেণ্ট ও তাহার নিকট দর্শকগণের বিশ্রামের জন্য একটি গৃহ নির্মিত হইয়াছে। তদ্‌ভিন্ন রেনেলের যুদ্ধ-চিত্রানুযায়ী উভয় পক্ষের সৈন্য-সংস্থান-প্রদর্শনের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভও স্থাপিত হইয়াছে।[১৫] পুরাতন স্তম্ভের নিকট একটি তিন্তিড়ী ও বওলা বৃক্ষের ছায়াতলে দৌলত আলি নামে জনৈক মুসলমান সৈনিক কর্মচারীর সমাধি আছে ; কেহ কেহ তাহাকে আকবর আলিও বলিয়া থাকে। দৌলত আলি পলাশীযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন বলিয়া কথিত। তাঁহার সমাধিকে হিন্দু-মুসলমানে সমভাবে সম্মান করিয়া থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর আম্রকুঞ্জের ও পুরাতন বিজয়স্তম্ভের নিকট একখানি নূতন গ্রাম স্থাপিত হইয়াছে ; তাহাকে তেজনগর কহে। তেজনগরের পশ্চিমপারে রামনগর কুঠি, রামনগর পূর্বেও ভাগীরথীর পশ্চিম পারেই ছিল ; রেনেলের মানচিত্রে তাহাই দেখা যায়। পলাশীগ্রাম হইতে তেজনগর প্রায় অর্ধক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। পূর্বোক্ত নবজাত আম্রবৃক্ষ হইতে প্রায় ১৮০০ হস্ত উত্তরে পূর্ত বিভাগের পুরাতন বাঙ্গলার নিকটে কতকগুলি উচ্চ

১৫ পুরাতন স্তম্ভে এইরূপ লিখিত ছিল ঃ

PLASSEY

Erected by the Bengal Government, 1883.

কিন্তু নূতন স্তম্ভে পলাশীযুদ্ধে উপস্থিত ইংরেজ সৈন্য ও সেনাপতিগণের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

জমি দেখা যায় ; সেগুলি ইংরেজদিগের বুরুজের চিহ্ন বলিয়া লোকে নির্দেশ করিয়া থাকে। তথায় কতিপয় বিষবৃক্ষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই স্থান হইতে নবজাত আম্রবৃক্ষ পর্যন্ত মধ্যে মধ্যে পরিখার চিহ্ন দেখা যায়, তাহা আম্রকুঞ্জের পূর্বসীমা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে এবং অদ্যাপি ঐ স্থানকে লোকে লাখবাগও বলিয়া থাকে।

প্রাতঃস্মরণীয়া রানী ভবানী লক্ষ আম্রবৃক্ষের বাগান করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়। পলাশী পরগণার কিয়দংশ এককালে তাঁহারই জমিদারীর অন্তর্ভূত ছিল, তজ্জন্য উক্ত প্রবাদ নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয় না। লাখবাগ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর আম্রকুঞ্জ বর্তমান না থাকিলেও ঐ সমস্ত চিহ্নের দ্বারা তাহার স্থান নির্ণয় করা যাইতে পারে। পুরাতন বাঙ্গলার নিকট একটি পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নাম কালীকূপ। কালীকূপ যুদ্ধস্থলের পুষ্করিণী নহে ; ভাগীরথীর জলপ্লাবনে বাঁধ ভগ্ন হওয়ায় ইহার উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। পূর্বোক্ত বাঙ্গলা হইতে পশ্চিম দিকে বর্তমান চরভূমিতে স্থানীয় লোকে নবাবের শিকারভবনের স্থান নির্দেশ করিয়া থাকে। ১৭৮০ খ্রীঃ অব্দে হজ সাহেব তাহা দর্শন করিয়াছিলেন।[১৬] রেনেলের মানচিত্র অঙ্কনের সময়ও তাহা বিদ্যমান ছিল। অর্মের লিখিত বিবরণানুসারে ও রেনেলের পলাশীযুদ্ধক্ষেত্রের চিত্রদর্শনে এইরূপ প্রতীতি হয় যে, রায়দুর্লভের দক্ষিণ পরিখার সম্মুখেই নবাবের বুরুজ নির্মিত হইয়াছিল। যে-স্থানে নবাবের বুরুজ নির্মিত হয়, অদ্যাপি তথায় তাহার কোন কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পূর্বদিকের অংশকে আজিও লোকে বুরুজডাঙ্গা কহে।

এই বুরুজডাঙ্গা বর্তমান লাখবাগ হইতে প্রায় এক ক্রোশ উত্তর-পূর্বে। মুর্শিদাবাদ হইতে যে-সড়ক কৃষ্ণনগর পর্যন্ত গিয়াছে, তাহারই উত্তর-পূর্বে একডালা নামক গ্রামের দক্ষিণে এবং সেজো গ্রামের বিলের পশ্চিমে এই বুরুজডাঙ্গা দৃষ্ট হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর সড়ক পলাশীযুদ্ধের সময় আম্রকুঞ্জের নিকট দিয়াই গিয়াছিল ; রেনেলের কাশীমবাজার দ্বীপের মানচিত্রে ইহাই নির্দিষ্ট হইয়াছে। বর্তমান সড়ক অষ্টাদশ শতাব্দীর আম্রকুঞ্জ ও বর্তমান তেজনগর হইতে অর্ধ ক্রোশেরও অধিক উত্তরে, লোকনাথপুর নামক গ্রামের দক্ষিণ দিয়া প্রথমে পূর্বে, পরে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়াছে। এই সড়ক মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জেলার সীমা। বিল্বকুঞ্জ হইতে অর্ধক্রোশেরও কিছু অধিক উত্তরে প্রান্তর-মধ্যে নূতনগ্রাম-নামে নবস্থাপিত গ্রামের নিকট একটি নিম্নভূমি দেখা যায়। সেজো গ্রামের বিলের পশ্চিম পর্যন্ত এই নিম্নভূমি দৃষ্ট হইয়া থাকে ; ইহাই নবাব-শিবিরের পরিখা। রেনেলের মানচিত্র-নির্দিষ্ট ইংরেজ-বুরুজ হইতে নবাব-শিবিরের দূরত্বের সহিত বিল্বকুঞ্জ হইতে ইহার দূরত্ব সমান হয়। এই পরিখা প্রথমে রায়দুর্লভ খনন করেন। বেভারিজ ভ্রমক্রমে

১৬ Hodge's Travels in India, p. 18.

লিখিয়াছেন যে, লাখবাগে রায়দুর্লভের পরিখা খনিত হইয়াছিল। নবজাত বৃক্ষ হইতে প্রায় ১৬০০ হস্ত দক্ষিণ-পূর্বে গ্রাম্য সমাধিক্ষেত্রের নিকট অর্ধচন্দ্রাকারে বিস্তৃত উচ্চ ভূমিতে মীরজাফরের সৈন্য সমবেত হইয়াছিল বলিয়া প্রতীত হয়। গবর্নমেণ্ট-কর্তৃক যে সৈন্য-সংস্থান প্রদর্শিত হইয়াছে, লোকপ্রবাদের নির্দিষ্ট স্থানসকলের সহিত তাহার সম্পূর্ণ ঐক্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর পলাশী-প্রান্তরে তেজনগর, নূতনগ্রাম, কদমখালি ও লোকনাথপুর প্রভৃতি গ্রাম স্থাপিত হইয়াছে। পলাশী পরগণা কাশীমবাজার-রাজবংশের জমিদারী হওয়ায়, কান্তবাবুর পুত্র রাজা লোকনাথের নামানুসারে লোকনাথপুরের নামকরণ হইয়াছে বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ক্লাইব যুদ্ধের দিবস রাত্রিতে পলাশীপ্রান্তর হইতে প্রায় তিন ক্রোশ উত্তরে দাদপুর নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করেন। এই দাদপুর পূর্বে মুর্শিদাবাদের একটি প্রসিদ্ধ চটী ছিল। এখানে নবাবদিগেরও অনেক লোকজন থাকিত। নবাবদিগেরও একটি নিজ বাসস্থান ছিল, তাহাকে নবাববাটী বলিত। নবাববাটীর নিকটস্থ একটি বৃহৎ জলাশয়কে নবাব-বাঁওড় নামে অভিহিত করা হইত। নবাবদিগের হস্তী, গো প্রভৃতির আবাসস্থানের চিহ্ন অদ্যাপি নির্দেশ করা যায়। সেই সেই স্থানকে আজিও ফিলখানা ও গোখানা কহিয়া থাকে। রেনেলের মানচিত্রে এই ফিলখানার উল্লেখ আছে। ফিলখানা হইতে প্রায় অর্ধক্রোশ উত্তরে ক্লাইব শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিলেন, রেনেলের মানচিত্রে ঐরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং ফিলখানার বর্তমান অবস্থান দেখিয়া সেই শিবিরসন্নিবেশের স্থান-নির্ণয় করিতে হইলে এইরূপ অনুমান হয় যে, এক্ষণে যে-স্থানে দাদপুরের নীলকুঠি আছে, তাহারই সম্মুখে বাদশাহী সড়কের পূর্বপার্শ্বে উক্ত শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছিল। দাদপুরেরও এক্ষণে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ভাগীরথী পূর্বে দাদপুর হইতে প্রায় অর্ধক্রোশ পশ্চিমে প্রবাহিতা ছিলেন, এক্ষণে পূর্বদিকে সরিয়া আসিয়া তাহার কিয়দংশ গর্ভস্থ করিয়াছেন। দাদপুরে কতকগুলি কবর ছিল; বেভারিজ সেগুলি পলাশীতে হত ইংরেজদিগের কবর বলিয়া অনুমান করেন; কিন্তু দাদপুরের প্রাচীন লোকদিগের নিকট তৎসমুদায় নবাবের কর্মচারিগণের কবর বলিয়া শুনা যায়।[১৭] নবাববাটী ও নবাব-বাঁওড় ভাগীরথীর গর্ভস্থ হইয়া এক্ষণে পশ্চিম তীরে চররূপে পরিণত হইয়াছে।

দাদপুর হইতে এক ক্রোশ দক্ষিণে ফরীদতলা নামক স্থান, ফরীদতলা ফরীদপুর নামক গ্রামের পূর্বে। এই ফরীদতলায় ফরীদ সাহেব নামে জনৈক ফকীরের সমাধিভবন আছে। সমাধিভবনের প্রবেশ-দ্বার পূর্বমুখে অবস্থিত; একটি বৃহৎ গম্বুজের নীচে ফরীদ সাহেবের সমাধি। ফরীদ সাহেবের সমাধির পশ্চাদ্ভাগে সমাধিভবনের মধ্যেই সিরাজের প্রিয় ও বিশ্বাসী সেনাপতি মীরমদন শায়িত

১৭ দাদপুরের নীলকুঠিতে Maddey সাহেব নামে তাহার অধ্যক্ষের একটি কবর আছে; তাঁহাকে সাধারণ লোকে মতি সাহেব কহিয়া থাকে।

রহিয়াছেন। এইরূপ শুনা যায় যে, ফরীদতলা মুসলমানদিগের একটি প্রসিদ্ধ উপাসনা-স্থান বলিয়া, মীরমদন তথায় সমাহিত হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ফরীদ সাহেবের সমাধির মধ্যে মধ্যে সংস্কার হইয়া থাকে; কিন্তু মীরমদনের সমাধির প্রতি কাহারও তাদৃশ মনোযোগ দেখা যায় না। তাঁহার সমাধি প্রায়ই অসংস্কৃত অবস্থায় বিরাজ করিয়া থাকে। মুর্শিদাবাদে যেরূপ সিরাজের সমস্ত স্মৃতিচিহ্নের দুর্দশা ঘটিয়াছে, তাঁহার প্রিয় ও বিশ্বাসী সেনাপতি মীরমদনের সমাধির অবস্থাও সেইরূপ। মুসলমানগণ ফরীদ সাহেবের সমাধিসংস্কারের সহিত মীরমদনের সমাধিটির সংস্কার অনায়াসেই করিতে পারেন। মীরমদনের প্রতি কি জন্য তাঁহারা উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, বুঝিতে পারা যায় না। যিনি চিরদিন প্রভুভক্ত থাকিয়া, প্রভুর কল্যাণোদ্দেশেই রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জন দিয়াছিলেন, তিনিও যে সাধারণের নিকট সর্বতোভাবে পূজ্য, এ কথা বোধ হয়, নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। সম্প্রতি পূর্তবিভাগ-কর্তৃক তাহা সংস্কার হইতেছে শুনা গিয়াছে। মীরমদনের বীরত্বকাহিনী ও পলাশীযুদ্ধের কথা পলাশী-অঞ্চলে অদ্যাপি গ্রাম্য কবিতায় গীত হইয়া থাকে।[১৮]

অষ্টাদশ শতাব্দীর পলাশীপ্রান্তরের অনেক পরিবর্তন ঘটিলেও অদ্যাপি তাহা স্বকীয় বিশাল কায় বিস্তার করিয়া ধূ ধূ করিতেছে। প্রান্তরে প্রায় উত্তমরূপে তৃণাদিও জন্মে না; কোন কোন স্থানে কতকদূর লইয়া তৃণরাশি ও শস্যপুঞ্জের হরিৎ শোভা নয়নের তৃপ্তিসম্পাদন করিয়া থাকে। স্থানে স্থানে দুই-চারিটি বৃক্ষও জন্মগ্রহণ করিয়া, পলাশীর উত্তপ্ত বক্ষঃস্থলে ছায়াপ্রদান করিতেছে। মধ্যে মধ্যে দুই-একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম স্থাপিত হইয়া ইহার পূর্ববিস্তৃতির লঘুতা সম্পাদন করিয়াছে। ভাগীরথীতীরস্থ বাঁধটি প্রান্তরের প্রাচীরস্বরূপে অবস্থিত আছে। বাঁধের নীচে কতকটা চরভূমি এবং কতক প্রাচীন প্রান্তর ও নদীর অবশেষ দৃষ্ট হয়। চরের নীচেই ভাগীরথী ধীরে ধীরে প্রবাহিতা হইতেছেন। বর্ষাকালে উক্ত চরভূমি ভাগীরথীসলিলে প্লাবিত হইয়া যায়। পলাশীপ্রান্তরের মধ্যস্থলে এখনও পলাশীযুদ্ধের অনেক গোলা-গুলি[১৯] প্রোথিত হইয়া আছে। ভূমিকর্ষণসময়ে পলাশীপ্রান্তরের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইলে, তৎসমুদায় মানবচক্ষুর গোচরীভূত হইয়া থাকে। যে-সমস্ত ইংরেজ ও ইংরেজললনাগণ পলাশীর নিকট দিয়া জলপথে বা স্থলপথে গতায়াত করিয়া থাকেন, তাঁহারা বিজয়স্তম্ভের নিকট উপস্থিত হইয়া জয়ধ্বনিতে প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলেন। বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট পক্ষিগণ সে ধ্বনিশ্রবণে চমকিত হইয়া কলরব করিতে করিতে দিগ্‌দিগন্তে উড়িয়া যায়। বর্তমান সময়েও পলাশীপ্রান্তর ইংলণ্ডীয় নরনারীগণের নিকট তীর্থস্থানরূপে বিরাজ করিতেছে।

১৮ উক্ত গ্রাম্য কবিতাটি পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

১৯ পলাশীপ্রান্তর হইতে সংগৃহীত পলাশীযুদ্ধের একটি গোলা ও একটি গুলি ডাক্তার রামদাস সেনের পুস্তকালয়ে রক্ষিত হইয়াছে।

খোশ্‌বাগ

শ্মশান মুর্শিদাবাদের পরিচয় দিবার জন্য কেবল দুই-একটি সমাধিক্ষেত্র নগরের কোলাহল হইতে দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া বৃক্ষরাজির স্নিগ্ধছায়ায় অদ্যাপি বিরাজ করিতেছে। সমাধিব্যতীত আর কিছুতেই মুর্শিদাবাদের পরিচয় পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। মুর্শিদকুলী বল, আলিবর্দী বল, সিরাজ বল, কাহারও কোন সুস্পষ্ট চিহ্ন মুর্শিদাবাদে দেখিতে পাইবে না ; কেবল তাঁহারাই সেই শ্মশানক্ষেত্রের এক এক স্থানে শায়িত হইয়া, আপনাদিগের পরিচয় আপনারাই প্রদান করিতেছেন। কিন্তু নীরব, নির্জন সমাধি-উদ্যানের নিবিড় বৃক্ষচ্ছায়া তাঁহাদিগকে এরূপ ভাবে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে যে, সহসা তাঁহাদিগকে দৃষ্টিপথের পথিক হইতে দেখা যায় না। তাঁহাদিগের নাম ও গৌরব যেমন দিন দিন কাহিনীতে পর্যবসিত হইতেছে, তাঁহারাও সেইরূপ ক্রমে ক্রমে বৃক্ষচ্ছায়ার অন্ধকারে মিশিয়া যাইতেছেন। প্রভাতে ও সায়াহ্নে কেবল পক্ষিগণ বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া কলধ্বনিতে সমাহিত ব্যক্তিদিগকে সাদরসম্ভাষণ করিয়া থাকে এবং যদি কখনও কোন সহৃদয় ব্যক্তি দর্শন-কৌতূহলপরবশ হইয়া তাঁহাদের অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হন, তিনি উদ্যানস্থিত কুসুমবৃক্ষের নিকট হইতে দুই-চারিটি কুসুম প্রার্থনা করিয়া, সমাধির উপর নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যান। আমরা মুর্শিদাবাদের অধীশ্বরগণের ইহা অপেক্ষা অধিকতর অপর কোন সম্মানের বিষয় অবগত নহি। যাঁহাদের নামই একরূপ বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে, তাঁহাদের প্রতি অধিক সম্মানপ্রদর্শনের প্রয়োজন কি? মৃত ব্যক্তির আত্মা শান্তিপিপাসু। যে-যে স্থানে তাঁহাদের দেহ সমাহিত আছে, প্রকৃতি সেই সেই স্থানকে পরম শান্তিময় করিয়া রাখিয়াছেন। প্রকৃতিই তাঁহাদিগকে পবিত্র ও স্নিগ্ধ শান্তি প্রদান করুন,—তাঁহারা কৃত্রিম সম্মানের প্রার্থী নহেন। সুখের বিষয়, মুর্শিদাবাদে যে-কয়েকটি সমাধিভবন আছে, প্রায় সকলগুলিই নির্জন ও শান্তিময়।

মুর্শিদাবাদ হইতে দক্ষিণ দিকে ভাগীরথী বাহিয়া গমন করিতে হইলে, লালবাগ নামক স্থানের কিছু দক্ষিণে, ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে একটি প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যানবাটিকা নয়নপথে পতিত হইয়া থাকে। এই উদ্যানবাটিকা একটি সমাধিভবন। যেখানে সমাধিভবনটি অবস্থিত, তাহাকে সাধারণতঃ লোকে খোশ্‌বাগ কহে। এই খোশ্‌বাগের সমাধিভবনে নবাব আলিবর্দী খাঁ ও হতভাগ্য সিরাজ চিরনিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছেন। তাঁহাদের পার্শ্বে তাঁহাদের অন্যান্য পরিবারবর্গ অনন্ত শান্তি উপভোগ করিতেছেন। মহারাষ্ট্রীয় ও আফগানগণের অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া, যিনি জীবনে শান্তি ভোগ করিতে পারেন নাই, অথচ বঙ্গরাজ্যের প্রজাদিগকে শান্তিসুখ আস্বাদন করাইবার জন্য সর্বদা যাঁহার চেষ্টা ছিল, মুর্শিদাবাদের অলঙ্কার ও আদর্শ নবাব সেই আলিবর্দী খাঁ মহবৎ জঙ্গ এক্ষণে এই বৃক্ষবাটিকার ছায়ায় চির শান্তি লাভ করিতেছেন। পদতলে তাঁহার মহীয়সী মহিলা শায়িত হইয়া আছেন। আবার যে হতভাগ্য ষড়যন্ত্রকারিগণের

চক্রে রাজ্যচ্যুত হইয়া খণ্ড-বিখণ্ডিত দেহে জীবন বিসর্জন দিয়াছিলেন, আলিবর্দীর প্রিয়তম ও ইংরেজের মহাকণ্টক সেই সিরাজও মাতামহের পার্শ্বে নিদ্রিত। তাঁহারও পদতলে তাঁহার সেই সুখ-দুঃখের একমাত্র সঙ্গিনী লুৎফ উন্নেসাও মহাশান্তিতে নিমগ্না। এই স্নিগ্ধচ্ছায়াসমন্বিত শান্তিনিকেতন খোশ্‌বাগ মুর্শিদাবাদের মধ্যে একটি প্রধান বৈরাগ্যোদ্দীপক স্থান। এখানে আসিলে, স্মৃতি আলিবর্দী ও সিরাজের অনেক কথা মনে উদয় করিয়া দেয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর সমস্ত চিত্র ধীরে ধীরে মানসপটে বিকাশ পাইতে থাকে। সেই মহারাষ্ট্রীয়যুদ্ধ, সেই আফগানসমর, পলাশী রণক্ষেত্রে মুসলমান রাজলক্ষ্মীর সেই মর্মভেদী দৃশ্য—সমস্তই মনে হয়, এবং সেই বঙ্গাধীশ্বরগণের বর্তমান ধূলিপরিণতি দেখিয়া কালরহস্যেও চমৎকৃত হইতে হয়।

খোশ্‌বাগের কিছু দূরে ভাগীরথী সিকতাস্তূপে আত্মবিলয় করিয়া চলিয়া যাইতেছেন ; বর্ষাকালে না জানি কি উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া, খোশ্‌বাগের প্রাচীরপ্রান্ত স্পর্শ করিয়া থাকেন। চারিদিকে আম্র, বাদাম প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ আপনাদিগের দূরব্যাপী শাখা বিস্তার করিয়া ছায়ায় ছায়ায় সমাধি-ভবনটি ছাইয়া ফেলিয়াছে। প্রভাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে ঘুঘুর দল সেই সমস্ত বৃক্ষশাখার পত্রান্তরালে বসিয়া, গম্ভীর বিষাদসঙ্গীতে সমাধিভবনটিকে আরও বিষাদময় করিয়া উপস্থিত জনগণের চিত্তপটে কেমন এক উদাসভাবোদ্দীপক চিত্র অঙ্কিত করিয়া তুলে। কুন্দ, কামিনী প্রভৃতি কুসুমরাজি প্রস্ফুটিত হইয়া নীরবে সেই সমাধিভবনতলে ঝরিয়া পড়িতেছে ; ক্বচিৎ তাহারা সমাধিগুলির উপর স্থান পাইয়া থাকে। খোশ্‌বাগের সহিত বৈরাগ্যের যেরূপ সংমিশ্রণ, অনেক স্থলে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। যে-সিরাজের নাম বাঙ্গলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে প্রবাদবাক্য রূপে প্রতিনিয়ত উচ্চারিত হইয়া থাকে, তাঁহার সমাধিদর্শনে তাঁহার ভীষণ শোচনীয় পরিণামচিন্তা স্বতঃই হৃদয়ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়া নিতান্ত বিষয়ী লোকেরও বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া থাকে। যিনি একসময়ে বঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর হইয়া ক্ষমতাশালী ইংরেজ জাতিকে উন্মূলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার শেষ দুর্গতি ও বর্তমান ধূলিশয়ন মনে পড়িলে, কাহার না সংসারবৈরাগ্য উপস্থিত হয় ? প্রাকৃতিক অবস্থান ও ভাবোদ্বোধনহেতু খোশ্‌বাগ একটি শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্যভূমি বলিয়া অনুমিত হয়। এই নির্জন স্থানে লোকজনের প্রায়ই গতায়াত নাই। সমাধিরক্ষকেরা সময়ে সময়ে উপস্থিত হইয়া থাকে। এখানে কেবল দলবদ্ধ শাখামৃগগণ ব্যতীত আর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই।

খোশ্‌বাগের সমাধিভবন প্রধানতঃ দুইটি চত্বরে বিভক্ত। প্রথমটি প্রবেশদ্বার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। দ্বিতীয় চত্বরটি প্রথমটির পশ্চিম দিকে। এই দ্বিতীয় চত্বরে প্রবেশ করিবার জন্যও আর একটি প্রবেশদ্বার আছে। ভাগীরথীতীর হইতে অতি অল্প দূরেই খোশ্‌বাগের সমাধিভবন অবস্থিত ; ইহার চতুর্দিক প্রাচীরবেষ্টিত। প্রবেশদ্বারটি পূর্বমুখ ; প্রবেশদ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটি প্রকোষ্ঠ আছে। প্রবেশদ্বারটি এত বৃহৎ যে, তাহার মধ্য দিয়া অনায়াসে হস্তী গমনাগমন করিতে পারে। প্রাচীরের

উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব কোণে দুইটি গুমৃটি বা প্রহরীদিগের বাসস্থান। প্রবেশদ্বারের দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া তাহার শীর্ষোপরি উঠিতে পারা যায়; দ্বারের মস্তকে একটি নাতি-প্রশস্ত চাতাল; এই চাতালে দাঁড়াইয়া ভাগীরথীর তরঙ্গলীলা ও পরপারস্থিত বর্তমান মুর্শিদাবাদ নগরের সুন্দরদৃশ্য নয়নপথে পতিত হইয়া থাকে। প্রবেশদ্বার অতিক্রম করিয়া, প্রথম চত্বরে পদার্পণ করিতে হয়; চত্বরটি আম্র প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ ও নানাবিধ পুষ্পবৃক্ষে পরিপূর্ণ। চত্বরের মধ্যস্থলে একটি প্রাচীরবেষ্টিত উন্মুক্ত স্থল; তাহাতে তিনটি সমাধি রক্ষিত হইয়াছে। উক্ত চত্বরমধ্যে পূর্ব দিকের দ্বারের নিকট আলিবর্দী খাঁর মাতা চিরনিদ্রায় অভিভূত আছেন। আলিবর্দী খাঁ তাঁহাকেই সমাহিত করিবার জন্য প্রথমে এই সুন্দর বৃক্ষবাটিকা নির্মাণ করেন।

এই প্রাচীরবেষ্টিত সমাধিস্থানটির উত্তর দিকে একটি উচ্চ স্থানে ১৭টি সমাধি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কোন-কোনটিতে ফারসী অক্ষর খোদিত আছে। পূর্ব দ্বার হইতে পশ্চিম চত্বরে প্রবেশ করিবার দ্বারের নিকট দক্ষিণ দিকে এবং পূর্ব চত্বরমধ্যেই আরও তিনটি সমাধি দৃষ্ট হয়। পূর্ব চত্বর ও পশ্চিম চত্বরের মধ্যস্থ প্রবেশ-দ্বার অতিক্রম করিয়া, পশ্চিম চত্বরে প্রবেশ করিলে, সম্মুখে একটি সমাধিগৃহ দৃষ্ট হইয়া থাকে; সেই সমাধিগৃহে গমন করিবার পথের দক্ষিণ দিকে উন্মুক্ত স্থলে দ্বার হইতে প্রথমতঃ তিনটি সমাধি দেখিতে পাওয়া যায়; এই সমাধি তিনটি আলিবর্দীবংশীয়-দিগের কোন কোন কর্মচারীর সমাধি বলিয়া কথিত হয়। সমাধিগৃহটির বর্গক্ষেত্র, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে প্রায় ২১ হস্ত হইবে। গৃহের চারি পার্শ্বে চারিটি বারাণ্ডা; এই বারাণ্ডার চারি পার্শ্বেও চারিটি অপ্রশস্ত রোয়াক আছে। গৃহের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিকেই তিনটি করিয়া দ্বার; কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ দিকে এক-একটি দ্বার ও দুই-দুইটি জানালা রহিয়াছে। সমাধিগৃহাভ্যন্তরে সর্বশুদ্ধ ৭টি সমাধি আছে। মধ্যস্থলে শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরখণ্ডমণ্ডিত সমাধিতলে বাঙ্গলার আদর্শ নবাব আলিবর্দী খাঁ শায়িত আছেন। আফগান ও মহারাষ্ট্রীয়গণের অবিশ্রান্ত আক্রমণে ব্যাকুল হইয়া, যখন মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধিস্থাপনপূর্বক তিনি কিছুদিনের জন্য শান্তিলাভের প্রয়াসী হইয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার পরিবারমধ্যে দুর্ঘটনা ঘটিতে আরম্ভ হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা হাজী আহম্মদ এবং ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা জৈনুদ্দীন ইতিপূর্বেই আফগান হস্তে প্রাণবিসর্জন দিয়াছিলেন। তাহার পর নওয়াজেস মহম্মদ খাঁ ও তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা সৈয়দ আহম্মদ খাঁও একে একে সংসার হইতে বিদায়গ্রহণ করিলেন।

এই সমস্ত কারণে বৃদ্ধ নবাবের হৃদয়ের শান্তি দূরে পলায়ন করিল; ক্রমে ক্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে আরম্ভ হইল। হিজরী ১১৬৯ অব্দের জমাদিয়ল আউয়ল মাসের ৯ই হইতে তিনি শোথরোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। নবাব প্রথমতঃ জলপান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার ন্যায় বৃদ্ধ বয়সে এই ভীষণ রোগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতির কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই, তখন হইতে

তিনি পানাহারের প্রতি তাদৃশ মনোযোগ প্রদান করিতেন না। ক্রমে ক্রমে রোগের আক্রমণ বৃদ্ধি পাইলে, দেশের যাবতীয় লোক তাঁহার নিকটে সমাগত হইতে লাগিল। তাঁহার পরিবারবর্গের মুখশ্রী ম্লান হইয়া গেল। এই সময়ে সিরাজউদ্দৌলার সহিত ঘসেটী বেগমের বিবাদ গুরুতর ভাবেই চলিতেছিল। ঘসেটী যে ইংরেজদিগের সহিত সিরাজের বিরুদ্ধে পরামর্শ করিতেছিলেন, আলিবর্দী সে কথা জানিতে পারিলেন। তিনি ইংরেজদিগের রাজ্যলালসার কথা বুঝিতে পারিয়া, সিরাজকে উপদেশ দিয়া যান যে, ইংরেজদিগকে যেরূপে পার দাসানুদাসের ন্যায় দমন করিয়া রাখিবে ; ইংরেজদিগকে দমন করিতে না পারিলে, তাহারা নিশ্চয়ই তোমার রাজ্য অধিকার করিয়া বসিবে।

মুতাক্ষরীনকার লিখিয়াছেন যে, নবাবের মৃত্যুর পূর্বে নগরের প্রধান প্রধান ব্যক্তি সমবেত হইয়া, সিরাজউদ্দৌলার হস্তে তাঁহাদিগের হস্ত বিন্যাস করিয়া, তাঁহাদিগকে প্রীতির চক্ষে দেখিবার জন্য সিরাজকে অনুরোধ করিতে নবাবের নিকট প্রার্থনা করেন। নবাব তাহাতে এইরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন যে, যদি তোমরা আমার মৃত্যুর পর তিন দিবস পর্যন্ত সিরাজের মাতামহীর সহিত তাহার সদ্ভাব দেখিতে পাও, তাহা হইলে তোমাদের কতকটা আশা থাকিতে পারে।[১] মুতাক্ষরীনকারের এই কথায় শ্রদ্ধাস্থাপন করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। যে আলিবর্দী কূটনীতি-বিশারদ ইংরেজদিগকে দমন করিবার জন্য সিরাজকে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছিলেন, তাঁহার যে সিরাজের প্রতি ঐরূপ ঘৃণাব্যঞ্জক ভাব ছিল তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। বরং সিরাজের প্রতি তাঁহার ভাব অন্য প্রকারই ছিল, আমরা অনেক স্থলে তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। সিরাজ মসনদে বসিয়া যে মাতামহীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন নাই, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

ক্রমে ক্রমে মৃত্যুর করাল ছায়া আলিবর্দীকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। তিনি ১১৬৯ হিজরীর ৯ই রজব তারিখে (১৭৫৩ খ্রীঃ অব্দের ৯ই এপ্রিল) চিরদিনের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। বাঙ্গলার আদর্শ নবাব হিন্দুর পরম মিত্র, মহারাষ্ট্রীয় ও আফগানদিগের দর্পচূর্ণকারী, মহামহিমান্বিত আলিবর্দী খাঁ মহবৎজঙ্গ অনন্তকালের জন্য মর্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়া, কোন অজ্ঞাত প্রদেশে চলিয়া গেলেন। তাঁহার অবসানে মুসলমান রাজলক্ষ্মীর কিরীট শিথিল হইতে আরম্ভ হইল এবং ইংরেজ রাজলক্ষ্মীর জ্যোতিঃ সহসা ভারতাকাশে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। অনেক দিন হইতে ইংরেজেরা স্বর্ণপ্রসবিনী ভারতভূমির প্রতি যে আশায় সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, এতদিনে সে আশা ফলবতী হইতে চলিল। হতভাগ্য সিরাজ বুঝিতে পারিলেন না যে, তাঁহার ভাগ্যাকাশ ঘোর অন্ধকারময় হইয়া উঠিতেছে! আলিবর্দীর মৃত্যুতে সমস্ত বঙ্গরাজ্যের প্রজারা হাহাকার করিতে লাগিল ; মহারাষ্ট্রীয় ও আফগান দস্যুভয়ে তাহাদের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল ; সমস্ত বঙ্গরাজ্যে যেন কেমন একটা বিপদের

১ Mutaqherin, Trans. Vol. I, p. 682.

ছায়া ঘনীভূত হইতে লাগিল। নবাবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ও অনুচরবর্গ সমবেত হইয়া, তাঁহার মৃতদেহ পবিত্রীকৃত করার পর, বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া, রাত্রির অন্ধকার থাকিতে থাকিতে খোশ্‌বাগের সমাধিকাননে তাঁহার মাতার পদতলে আনিয়া উপস্থিত করে ; পরে তথা হইতে যথাস্থানে সমাহিত করা হয়।[২]

আলিবর্দীর সমাধির অব্যবহিত পূর্বভাগে তাঁহার প্রিয়তম দৌহিত্র বাঙ্গালীর সুপরিচিত, নবাব সিরাজউদ্দৌলা শায়িত রহিয়াছেন। তাঁহার বর্তমান সমাধি একরূপ মাটির সহিত মিশিয়াই আছে। তাহার উপর কোন প্রস্তরখণ্ড নাই,—কেবল বিলাতী মৃত্তিকা দ্বারা তাহা লেপিত হইয়াছে। সিরাজের শোচনীয় মৃত্যুর কথা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই ; কারণ বঙ্গবাসীমাত্রেই তাহা সবিশেষ অবগত আছেন। তথাপি সে সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা যাইতেছে।

পলাশী যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সিরাজ, বেগম লুৎফ উন্নেসার সহিত মুর্শিদাবাদ হইতে পলায়ন করেন এবং রাজমহলের নিকট ধৃত হইয়া পুনরায় মুর্শিদাবাদে আনীত হন। তাহার পর হিজরী ১১৭০ অব্দের ১৫ই শওয়াল (১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দের ৩রা জুলাই) তাঁহার শোচনীয় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। আমরা মুতাক্ষরীন হইতে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতেছি।[৩] মুতাক্ষরীনকার বলেন যে, যৎকালে সিরাজউদ্দৌলা মুর্শিদাবাদে আনীত হন, তৎকালে মীরজাফর সিদ্ধিপানে বিভোর হইয়া মধ্যাহ্ন নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন। তাঁহার পুত্র মীরণ সিরাজউদ্দৌলার উপস্থিতির সংবাদশ্রবণমাত্র জাফরাগঞ্জের বাটীতে তাঁহাকে বন্দী করিয়া, একে একে অনুচরবর্গের নিকট হতভাগ্যের জীবননাশের প্রস্তাব করে, কিন্তু কেহই তাহাতে সম্মত হইতে ইচ্ছা করিল না।

অবশেষে মহম্মদী বেগ নামে এক ব্যক্তি এই ভীষণ কাণ্ড সম্পাদনের জন্য স্বীকৃত হইল। এই মহম্মদী বেগ সিরাজউদ্দৌলার পিতা ও মাতামহীর অন্নে প্রতিপালিত হয়। আলিবর্দীর বেগম একটি অনাথকুমারীর সহিত তাহার বিবাহও প্রদান করেন। মহম্মদী বেগ সে-সমস্ত বিস্মৃত হইয়া, সিরাজের হত্যাসম্পাদনে প্রবৃত্ত হইল। পাষণ্ড অস্ত্রহস্তে সিরাজের কক্ষে প্রবেশ করিলে, তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার জীবনবায়ুর অবসান হইতে আর বিলম্ব নাই। তখন তিনি অবনতভাবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া, তাঁহার অতীত কার্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অবশেষে ঘাতকের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া স্খলিতকণ্ঠে বলিতে লাগিলেণ—"তাহারা কি আমাকে রাজ্যের কোন নির্জন প্রান্তে বাস করিয়া যৎসামান্য জীবিকায় সময় অতিবাহিত

২ Mutaqherin, Vol I, p. 683.

৩ মুতাক্ষরীনে লিখিত আছে যে, মীরণ মীরজাফরের অজ্ঞাতে সিরাজকে নিহত করিতে আদেশ দেন। কিন্তু রিয়াজুস সালাতীনে লিখিত আছে যে, জগৎশেঠ ও ইংরেজসর্দার সিরাজের হত্যার জন্য মীরজাফরকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। (Riyaz-us-salatin, p. 373.)

করিতে দিবে না !" অতঃপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া পুনর্বার বলিয়া উঠিলেন,—"না, তাহারা তাহা করিবে না, আমি হোসেন কুলী খাঁর মৃত্যুর জন্য অবশ্যই প্রাণ বিসর্জন দিব।" এই কয়েকটি কথা উচ্চারণ করিবামাত্র সেই কৃতান্তদূতস্বরূপ ঘাতক সিরাজের বঙ্গবিখ্যাত রূপলাবণ্যসম্পন্ন দেহযষ্টিতে উপর্যুপরি তরবারির আঘাত করিতে লাগিল ! সিরাজের উত্তপ্ত শোণিতধারায় বসুন্ধরার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইল ! "আমার কৃতকার্যের ফল যথেষ্ট হইয়াছে, হোসেন কুলী খাঁর মৃত্যুর প্রতিশোধ হইল," এই কথা বলিতে বলিতে বিশ্বনিয়ন্তাকে স্মরণ করিয়া সিরাজ সর্বংসহার ক্রোড়ে নিপতিত হইলেন। এইরূপে কৃতঘ্ন চক্রান্তকারিগণের ষড়যন্ত্রে, বঙ্গের শেষ স্বাধীন নবাব হতভাগ্য সিরাজের জীবনলীলার অবসান হইল।[৪]

এই স্থানে আমরা একটি কথা বলিয়া রাখি। সিরাজ মৃত্যুকালে হোসেন কুলী খাঁর মৃত্যুকে একটি ভয়ানক পাপকার্য মনে করিয়াছিলেন ; ইহা হইতে তাঁহার প্রকৃতি কিরূপ ছিল, তাহা বুঝা যাইতেছে। জীবনের মধ্যে সেই ঘটনাটিকেই তিনি কেবল সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। নতুবা মৃত্যুকালে তাহার উল্লেখ করিতেন না। আমরা দেখাইয়াছি যে, সিরাজ স্বীয় জননীর কলঙ্কক্ষালনের জন্য আদর্শমহিলা মাতামহীর পরামর্শে উত্তেজিত হইয়া, হোসেন কুলী খাঁকে বধ করিতে আদেশ দেন। যে-ব্যক্তি নিজ জননীর পবিত্রতাপহারীর হত্যাকেও ভীষণ পাপকার্য বলিয়া মনে করিতে পারে, হায় ! দেশীয় ও ইংরেজ ঐতিহাসিক পুঙ্গবগণ, তাহার প্রকৃতিকে নিষ্ঠুর ও শয়তানতুল্য বলিয়া বর্ণনা করিতে তোমাদের বিবেকে কি কিঞ্চিন্মাত্র লাগে নাই ? এস্থলে সে কথার অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই। সিরাজের এই সৌন্দর্যসারভূত দেহযষ্টি অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া, তদীয় শোণিত-ধারায় নূতন নবাবের অভিষেক ক্রিয়া সংসাধিত হইল। অতঃপর সিরাজের দেহ হস্তিপৃষ্ঠে সমস্ত মুর্শিদাবাদ নগরে পরিভ্রামিত হইল। নিয়তিচক্রের ভীষণ আবর্তন-দর্শনে জনসাধারণ বিস্ময়বিহ্বল হইয়া পড়িল।

মুতাক্ষরীনকার এই সময়ের একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, যে-স্থলে হোসেন কুলী খাঁর হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হয়, সিরাজের দেহবাহী হস্তীটি কোন কারণে সেই স্থলে দণ্ডায়মান হইলে, সিরাজের দেহ হইতে নাকি তথায় দুই চারি বিন্দু রক্তপাত হইয়াছিল।[৫]

মুতাক্ষরীনকার প্রকারান্তরে এই ঘটনাটিকে ঈশ্বরকৃত বলিয়া, হোসেন কুলী খাঁর মহত্ত্ব ও সিরাজের নিষ্ঠুরতা প্রতিপাদনের প্রয়াস পাইয়াছেন। এরূপ ঘটনার ভিত্তি জনপ্রবাদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। বাস্তবিক ঐরূপ ঘটিবার যদি সম্ভাবনাও থাকে, এরূপ স্থলে তাহা যে ঘটিতে পারে, ইহা কদাচ বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। যে-ব্যক্তি

৪ Mutaqherin, Vol. I, p. 778.
৫ Mutaqherin, Vol. I, p. 779.

স্বীয় প্রভুপত্নীর ধর্মনাশ সাধন করিয়া, একটি সংসারকে ঘোরতর পাপপঙ্কে নিমগ্ন করিয়াছিল, ভগবানের অপক্ষপাত বিচারে সে যদি সাধুপ্রকৃতি বলিয়া পরিগণিত হয়, আর যে স্বীয় জননীর ধর্মধ্বংসকারীর হত্যার আদেশ প্রদান করিয়াছিল, সে যদি শয়তানতুল্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে, ন্যায়ধর্ম ভগবানের রাজ্যে আছে বলিয়া কে বিশ্বাস করিতে পারে? ভগবানের এরূপ বিসদৃশ নীতি যাঁহাদের ইচ্ছা হয়, অনুমোদন করিতে পারেন, আমরা কিন্তু যতদিন পর্যন্ত ন্যায়, ধর্ম ও পবিত্রতা জগতে বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন তাহা কদাচ অনুমোদন করিতে পারিব না।

যাহা হউক, সিরাজের ছিন্নভিন্ন দেহ হস্তিপৃষ্ঠে মুর্শিদাবাদের প্রতি রাজপথে ভ্রমণ করাইয়া, অবশেষে তাঁহার মাতার বাসভবনের দ্বারে আনীত হয়। অন্তঃপুর মধ্যে আবদ্ধ থাকায়, সিরাজের মাতা এই মহাবিপ্লবের কিছুই অবগত ছিলেন না। তিনি চারিদিকে গোলযোগ শুনিয়া, কারণানুসন্ধানে সমস্ত জানিতে পারিলেন। তখন তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া অবগুণ্ঠন উন্মোচনপূর্বক দ্রুতপদে রাজপথে উপস্থিত হইলেন। যাঁহার ভাগ্যে, সকল সময় সূর্যের আলোক দেখা ঘটিয়া উঠিত না, পুত্রের তাদৃশ শোচনীয় পরিণামশ্রবণে, তিনি আজ রাজপথে উপস্থিত। অনন্তর তিনি হস্তিপৃষ্ঠ হইতে তনয়ের মৃতদেহ নামাইয়া, পুনঃ পুনঃ চুম্বনপূর্বক, তাহা বক্ষঃস্থলে ধারণপূর্বক ছিন্নমূল ব্রততীর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন এবং অনবরত নিজ বক্ষে ও মুখে করাঘাত করিতে লাগিলেন।[৬] এই দৃশ্যে নগরবাসী সকলের হৃদয় বিগলিত ও অশ্রুধারায় প্লাবিত হইল। নবাব আলিবর্দীর কন্যা ও সিরাজ-জননীর রাজপথে এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া খাদেম হোসেন খাঁ নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত মুসলমান অনুচরসহ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ও অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগকে বলপূর্বক অন্তঃপুরমধ্যে লইয়া যান। অনন্তর সিরাজের মৃতদেহ নদীর পরপারে খোশ্‌বাগে প্রেরিত ও আলিবর্দীর পার্শ্বে সমাহিত করা হইল। সিরাজের শোচনীয় পরিণাম মনে করিতে গেলে, বাস্তবিক হৃদয় কারুণ্যরসে আপ্লুত হইয়া পড়ে। ইহার উপর আবার তাঁহাকে ঐতিহাসিকগণের চিত্রে কালিমামণ্ডিত হইতে হইয়াছে! খোশ্‌বাগের সমাধিগৃহে আলিবর্দীর পার্শ্বে এক্ষণে সিরাজ চিরবিশ্রাম লাভ করিতেছেন। মুতাক্ষরীনকার বলেন যে, সিরাজের হত্যাসম্বন্ধে মীরজাফর কিছুই জানিতেন না; কিন্তু রিয়াজুস্ সালাতীনকার উল্লেখ করিয়াছেন যে, জগৎশেঠ ও ইংরেজসর্দার সিরাজের হত্যাকাণ্ডের জন্য মীরজাফরকে পরামর্শ দিয়াছিলেন।[৭] কোন্ বিবরণ সত্য, তাহা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি না।

সিরাজের পূর্ব পার্শ্বে তাঁহার ভ্রাতা মির্জা মেহেদী[৮] শায়িত রহিয়াছেন। মির্জা মেহেদী পঞ্চদশ বৎসর বয়সে মীরজাফরের আদেশে জীবন বিসর্জন দিতে বাধ্য হন।

৬ Mutaqherin, Vol, I, p. 779.
৭ Riyaz-us-salatin, p. 373.
৮ মির্জা মেহেদীকে রিয়াজে মির্জা মহম্মদ আলি নামে উল্লেখ করা হইয়াছে।

তাঁহারও হত্যাকাণ্ডে মীরণই নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। মীরজাফর সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে, রায়দুর্লভের সহিত তাঁহার মনোবিবাদ উপস্থিত হয়। মীরজাফর মসনদে বসিলে, আলিবর্দী ও সিরাজের পরিবারবর্গকে বন্দীদশায় বাস করিতে হয়। মির্জা মেহেদীকেও কারাযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। রায়দুর্লভ মির্জা মেহেদীকে কারাগার হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিলে, তিনি পাছে মির্জা মেহেদীকে সিংহাসন প্রদান করেন, এই সন্দেহ করিয়া, মীরজাফর মীরণকে তাঁহার বিনাশের জন্য আদেশ দেন। মীরণ হত্যাকাণ্ডের ব্যবস্থায় বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ মির্জা মেহেদীর হত্যার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তদীয় আদেশানুসারে মির্জা মেহেদীর দুই পার্শ্বে দুই খানি তক্তা বিন্যাস করিয়া সুদৃঢ় রজ্জুর বেষ্টন দ্বারা সেই তক্তা দুই-খানিকে চাপিয়া তাঁহার প্রাণসংহার করা হয়। এই অদ্ভুত উপায়ে পঞ্চদশবৎসরবয়স্ক বালকের ঈদৃশ নিষ্ঠুর ভাবে হত্যার কথা যে শুনিয়াছিল, তাহারই নয়ন হইতে অশ্রুধারা নিপতিত হইয়াছিল।[১] এই নৃশংস হত্যার পর তাঁহার মৃতদেহ আনিয়া খোশ্‌বাগে সিরাজের পার্শ্বেই সমাহিত করা হয়।

সিরাজের দক্ষিণে, তাঁহার পদতলে, তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী লুৎফ উন্নেসা চিরনিদ্রিতা। স্বামীর মৃত্যুর পর ঢাকায় নির্বাসনযন্ত্রণা ভোগ করিয়া তিনি পুনর্বার মুর্শিদাবাদে আসিয়া খোশ্‌বাগের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হন। পরে অন্তিম কালে স্বামীর পদতল আশ্রয় করিয়া চিরশান্তি ভোগ করিতেছেন। যিনি কি সুখে, কি দুঃখে, চিরদিনই ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুবর্তন করিয়াছিলেন, তিনি স্বামীর পদতল ব্যতীত আর কোথায় চিরশায়িত থাকিতে পারেন?

লুৎফ উন্নেসার পূর্ব পার্শ্বে মির্জা মেহেদীর দক্ষিণে আর একটি সমাধি আছে; সাধারণ লোকে তাহাকে মির্জা মেহেদীর বেগমের সমাধি বলিয়া থাকে; কেহ কেহ তাহাকে সিরাজের আর কোন বেগমের সমাধিও বলে। বালক মির্জা মেহেদী বিবাহিত হইয়াছিলেন কিনা, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না; সুতরাং উক্ত সমাধিটি সিরাজের কোন বেগমের সমাধি হইলেও হইতে পারে। সম্ভবতঃ উহা ওমদাৎ উন্নেসার সমাধি হইবে।

আলিবর্দীর দক্ষিণে যে-সমাধিটি রহিয়াছে, সেটি তাঁহার মহীয়সী বেগমের সমাধি বলিয়া কথিত হয়। ঢাকার নির্বাসন হইতে পলায়নের পর, আর তাঁহার কোন বিবরণ অবগত হওয়া যায় না। সম্ভবতঃ তিনি তথা হইতে মুর্শিদাবাদে পুনরাগমন করিয়াছিলেন। পরে অন্তিমসময় উপস্থিত হইলে, স্বামীর পদতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। যিনি আলিবর্দীর জীবনের একমাত্র সঙ্গিনী ছিলেন, অনন্তজীবনে তিনিই সহচরীরূপে বিরাজ করিতেছেন।

---

১ Mutaqherin, Vol. II, pp. 8-9. মুতাক্ষরীনকার বলেন যে, কেহ কেহ বলিয়া থাকে যে, মির্জা মেহেদীকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হইয়াছিল; কিন্তু তিনি সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছিলেন যে, তক্তা চাপিয়াই তাঁহাকে বধ করা হয়। রিয়াজেও তাহাই আছে।

আলিবর্দীর সমাধির পশ্চিম দিকে আরও দুইটি সমাধি আছে। সাধারণলোকে ঐ দুইটিকে আলিবর্দীর কন্যাদ্বয়ের সমাধি বলিয়া থাকে। আমরা জানি যে, তাঁহার দুই কন্যা ঘসেটী ও আমিনা, মীরণের আদেশে নদীগর্ভে প্রাণ বিসর্জন দেন; সুতরাং তাঁহাদের সমাধি হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই। তাঁহার মধ্যমা কন্যা ময়মানা পূর্ণিয়ার নবাব সৈয়দ আহম্মদের পত্নী ও সওকতজঙ্গের মাতা ছিলেন। তিনি পূর্ণিয়াতেই বাস করিতেন। মীরজাফর পূর্ণিয়া অধিকার করিলে, তিনি মুর্শিদাবাদে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন কিনা, জানা যায় না। ফলতঃ উক্ত সমাধি দুইটি আলিবর্দী খাঁর কন্যাদ্বয়ের না হইলেও, তাঁহার পরিবারস্থ অন্য কাহারও হইতে পারে।

সমাধিগৃহের পশ্চিমে. পশ্চিম চত্বরেব প্রান্তভাগে, একটি মস্‌জেদ বিরাজ করিতেছে। অদ্যাপি তথায় উপাসনাদি হইয়া থাকে। মস্‌জেদের সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা রহিয়াছে। এই সমাধিভবনে পূর্বে কারী বা কোরাণাধ্যায়ীদিগের বাসস্থান ছিল; অনেক দিন হইল, সে-সমস্ত গৃহ ভূমিসাৎ করা হইয়াছে। অদ্যাপি তৎসমুদায়ের ভিত্তিভূমির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমাধিভবনের দক্ষিণে একটি আম্র, বাদাম প্রভৃতি বৃক্ষের বাগান আছে। তথায় একটি প্রকাণ্ড ইন্দারা, একটি শুষ্ক পুষ্করিণী ও তাহার বাঁধাঘাটের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়; পূর্বে এইখানে মোসাফেরখানা ছিল, তাহার চিহ্নও দেখা যায়। পূর্বে সমাধিভবন যেরূপ বিস্তৃত ছিল, এক্ষণে তাহার আয়তন কিয়ৎ-পরিমাণে হ্রাস করা হইয়াছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইষ্টকরাশি আজিও তাহার পূর্ব আয়তনের পরিচয় দিতেছে।

আলিবর্দী খাঁ এই খোশ্‌বাগের সৃষ্টি করেন। প্রথমে তাঁহার জননী খোশ্‌বাগে সমাহিতা হইয়াছিলেন। আলিবর্দী ভাণ্ডারদহ ও নবাবগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের আয় হইতে এই সমাধিভবনের ব্যয়নির্বাহের জন্য মাসিক ৩০৫ টাকা বন্দোবস্ত করিয়া দেন। সিরাজের মৃত্যুর পর লুৎফ উন্নেসার প্রতি খোশ্‌বাগের তত্ত্বাবধানের ভার অর্পিত হয়। তাঁহার হস্তে পাটনাস্থিত আলিবর্দীর ভ্রাতা হাজী মহম্মদের সমাধির ভারও অর্পিত হইয়াছিল। লুৎফ উন্নেসার জীবিতকালেই তাঁহার কন্যা উম্মত জহুরার মৃত্যু হয়। সেইজন্য লুৎফ উন্নেসার মৃত্যুর পর উম্মত জহুরার চারি কন্যা সরীফন্নেসা, আসম্মতন্নেসা, সাকিনা ও উম্মতুলা মেহেদী বেগম খোশ্‌বাগ প্রভৃতির তত্ত্বাবধানের জন্য ওয়ারেন হেস্টিংসের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। লর্ড কর্নওয়ালিস তাঁহাদিগকে উক্ত ভার প্রদান করেন। তাঁহাদের মৃত্যু হইলে, উক্ত বংশীয়েরা খোশ্‌বাগের তত্ত্বাবধানের ভার পাইয়াছিলেন। ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দে সাকিনার জ্যেষ্ঠা কন্যা খয়েরুন্নেসার কন্যা জীনা বেগম ও তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা ফতেমার পুত্র মহম্মদ আলি খাঁ এবং উম্মত জায়েনা ও উম্মত কোলসুম বেগম নামে উক্ত বংশীয় আরও দুই জন মহিলা এই চারি জন খোশ্‌বাগের মাতোয়ালী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ক্রমে উক্ত বংশীয়গণের হস্ত হইতে গবর্নমেণ্ট স্বয়ং সে ভার গ্রহণ করেন। পূর্বে খোশ্‌বাগর সমাধিভবন রৌপ্য ও স্বর্ণময় পুষ্পখচিত কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত

হইত এবং সমাধিগৃহে উত্তমরূপে প্রদীপ জ্বালিত হইত। এক্ষণে আর সে-সকল বস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। শুনা যায়, বিশেষ বিশেষ পর্বোপলক্ষে শতছিন্ন সেই পুরাতন বস্ত্রগুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সমাধিগৃহে দীপ জ্বালিবার জন্য এক্ষণে মাসে চারি আনা মাত্র তৈলের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। বিশেষ বিশেষ পর্বোপলক্ষে সমাধিগুলির উপর মিষ্টান্নাদিও নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।

খোশ্‌বাগের সমাধিভবনের কথা অনেকানেক ইউরোপীয় প্রশংসার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন। হজেস্ সাহেবের ভারত-ভ্রমণে ইহার উল্লেখ আছে।[১০] ১৭৮২ খ্রীঃ অব্দে ফর্স্টার নামে কোন ইংরেজ খোশ্‌বাগে উপস্থিত হইয়া লুৎফ উন্নেসাকে সিরাজের জন্য শোক প্রকাশ করিতে দেখিয়াছিলেন। বহরমপুরের এক্‌জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার কাপ্তেন লেয়ার্ড খোশ্‌বাগের এক সুন্দর বিবরণ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে খোশ্‌বাগের প্রবেশদ্বারের সম্মুখে একটি বাঁধাঘাটের চিহ্ন ছিল, সে চিহ্ন অনেক দিন পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া যাইত, এক্ষণে তাহা ভূগর্ভে প্রোথিত। লেয়ার্ড খোশ্‌বাগের প্রাচীরে বন্দুক ছাড়িবার ছিদ্র দেখিয়াছিলেন। এক্ষণে সে প্রাচীরের নূতন সংস্কার হইয়াছে। তিনি সমাধিভবনের বৃক্ষশ্রেণীর ও কুসুম-কাননের অনেক প্রশংসা ও সমাধির আচ্ছাদন কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রাদিরও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। খোশ্‌বাগের উদ্যানটি অনেকটা সেই রূপই আছে; কিন্তু সমাধির জন্য যেরূপ ব্যবস্থা ছিল, এক্ষণে তাহার কিছুই নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মধ্যে মধ্যে খোশ্‌বাগের সংস্কার হইয়া থাকে। সম্প্রতি সুন্দররূপে সংস্কার করায়, মুর্শিদাবাদের মধ্যে ইহা একটি রমণীয় দৃশ্য হইয়া উঠিয়াছে। ছায়াতরঙ্গের লীলাভূমি এই রমণীয় সমাধিকাননে উপস্থিত হইলে, হৃদয়ে কেমন এক অনির্বচনীয় ভাবের উদয় হয়। আলিবর্দী ও সিরাজের সমাধি আজিও শ্মশান মুর্শিদাবাদ হইতে লয় পায় নাই, ইহাও কিয়ৎ-পরিমাণে আশ্চর্যের বিষয় বলিতে হইবে।

১০ Hodges' Travel in India, p. 11

জাফরাগঞ্জ

জাফরাগঞ্জ সিরাজের বধ্যভূমি,—বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার স্বাধীনতার সমাধি। এই স্থানের ভূমি বিশ্বাসঘাতকের তরবারির আঘাতে কলুষিত হইয়াছিল; তাই যে-ভবনে সেই শোচনীয় হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হয়, মুর্শিদাবাদবাসিগণ অদ্যাপি তাহাকে "নেমক্‌হারামী দেউড়ি" কহিয়া থাকে। যাহার অন্নে, যাহার গৃহে প্রতিপালিত হইয়া, বিশ্বাসঘাতকগণ সংসারে সুপরিচিত হইয়াছিল, আপনাদের বাসভবনে তাহারই রক্তপাতের দ্বারা কৃতজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিল! যে-হতভাগ্য প্রত্যেকের পদতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া প্রাণভিক্ষা চাহিয়াছিল, পাশবিক হত্যাকাণ্ডে তাহার সে প্রার্থনা পূর্ণ করা হয়। বসুন্ধরা এই রক্তপাত কিরূপে ধারণ করিয়াছিলেন বলিতে পারি না; বোধহয় তিনি সে রক্ত-প্রবাহ নিজ-অঙ্গে মিলাইতে পারেন নাই; বিশ্বাসঘাতক-কর্তৃক পাতিত রক্ত তাঁহার পবিত্র অঙ্গে কদাচ মিশিয়া যাইতে পারে না; অথবা তিনি সর্বংসহা,—সমস্তই সহ্য করিতে পারেন। যে-গৃহে সেই শোচনীয় হত্যাকাণ্ড সংসাধিত হইয়াছিল, সে গৃহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া অণুপরমাণুতে মিশিয়া গেলেও তাহার স্থানের লোপ হয় নাই। আজিও সে স্থানে উপস্থিত হইলে, বিশ্বাসঘাতক-গণের প্রতি আন্তরিক ঘৃণা ও হতভাগ্য সিরাজের প্রতি সহানুভূতির উদয় হইয়া থাকে। জাফরাগঞ্জ আবার বঙ্গের শেষ নবাব-নাজিমগণের সমাধিভবন। এই স্থানে নবাব জাফর আলি খাঁ বা মীরজাফর হইতে তদ্বংশীয় অন্যান্য নবাব-নাজিমগণ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত আছেন। জাফর আলির প্রিয়তমা ভার্যা মণিবেগম ও বব্বুবেগমও সেই সমাধিভবনে শায়িত। এই রাজ-সমাধিভবন মুর্শিদাবাদের একটি দর্শনীয় স্থান। সিরাজের বধ্যভূমি ও নবাব-নাজিমগণের সমাধিভবনের জন্য জাফরাগঞ্জ ঐতিহাসিকের নিকট নিতান্ত উপেক্ষার সামগ্রী নহে।

জাফরাগঞ্জ ভাগীরথীর পূর্ব তীরে ও মুর্শিদাবাদ কেল্লা হইতে প্রায় অর্ধক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। মীরজাফর মসনদে বসিবার পূর্বে জাফরাগঞ্জেই অবস্থিতি করিতেন। তাঁহার নামানুসারে, অথবা মুর্শিদাবাদের স্থাপয়িতা মুর্শিদকুলী জাফর খাঁর নামানুসারে অথবা অন্য কাহারও নামানুসারে জাফরাগঞ্জের নামকরণ হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। জাফরাগঞ্জের নবাব-বংশীয়েরা এক্ষণে যে-প্রাসাদে বাস করিতেছেন, সেই প্রাসাদই মীরজাফরের বাসস্থান ছিল। জাফর আলি খাঁ নবাব হইয়া প্রথমতঃ সিরাজউদ্দৌলার হীরাঝিলে বা মনসুরগঞ্জের প্রাসাদে বাস করিয়া-ছিলেন; পরে মুর্শিদাবাদ কেল্লামধ্যে আলিবর্দী খাঁর প্রাসাদে আসিয়া বাস করেন।

নবাব হইয়া তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র মীরণকে জাফরাগঞ্জের প্রাসাদ প্রদান করেন। তদবধি মীরণের বংশধরেরা জাফরাগঞ্জের প্রাসাদেই বাস করিতেছেন। জাফরাগঞ্জ মুর্শিদাবাদ নগরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। অর্মে সাহেব মীরফাফরের প্রাসাদকে তৎকালীন

মুর্শিদাবাদের দক্ষিণ সীমার শেষ প্রান্তে অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন।[১] কিন্তু মুতাক্ষরীনকার মীরজাফরের জাফরাগঞ্জে বাস করার কথা লিখিয়াছেন। অর্মে মীরজাফরের প্রাসাদকে যখন হীরাঝিলের পরপারে বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, তখন তাহা জাফরাগঞ্জেই অবস্থিত বুঝা যাইতেছে। জাফরাগঞ্জ অষ্টাদশ শতাব্দীর মুর্শিদাবাদের মধ্যস্থলেই ছিল—দক্ষিণ সীমার শেষ প্রান্তে নহে। রেনেলের কাশীমবাজার দ্বীপের মানচিত্রে অষ্টাদশ শতাব্দীর মুর্শিদাবাদকে ভাগীরথীর পূর্ব তীরে মোতিঝিলের উত্তর হইতে সাধকবাগ পর্যন্ত ও পশ্চিম তীরে খোশ্‌বাগ হইতে বড়নগরের নিকট পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়া অঙ্কিত করা হইয়াছে। সুতরাং তৎকালে জাফরাগঞ্জ যে মুর্শিদাবাদের মধ্যস্থলেই ছিল, তাহাতে সন্দেহ করার কোনই কারণ নাই এবং মীরজাফর যে জাফরাগঞ্জেই বাস করিতেন, তাহাও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, জাফরাগঞ্জের প্রাসাদেই সিরাজের হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হয়। কেবল তাহাই নহে, পলাশীযুদ্ধের পূর্বে ইংরেজদিগের যে গুপ্তসন্ধি হয়, জাফরাগঞ্জের প্রাসাদেই মীরজাফর শপথপূর্বক তাহা প্রতিপালন করিতে স্বীকৃত হন। কাশীমবাজার কুঠির অধ্যক্ষ ওয়াট্‌সসাহেব সিরাজের ভয়ে স্ত্রীলোকদিগের বহনোপযোগী আবৃত শিবিকায় আরোহণ করিয়া, একেবারে জাফরাগঞ্জের প্রাসাদের অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করেন। মীরজাফর ও মীরণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া, একটি কক্ষমধ্যে লইয়া যান; তথায় মীরজাফর ইংরেজদিগকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। সিরাজ মুর্শিদাবাদ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলে, মীরজাফর সিরাজের প্রাসাদ আক্রমণ এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজদিগকে সাহায্য ও সিরাজকে বন্দী করিয়া তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিতে প্রতিজ্ঞা করেন। পরে কোরান ও মীরণের মস্তক স্পর্শ করিয়া, সন্ধির সমস্ত শর্ত পালন করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।[২] তাহার পর পলাশীর যুদ্ধশেষে সিরাজ রাজমহলের নিকট হইতে ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদে নীত হইলে, জাফরাগঞ্জের প্রাসাদেই হত হন।[৩] যে-গৃহে তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল, সেই গৃহমধ্যে মহম্মদী বেগের তরবারির আঘাতে তাঁহার দেহ খণ্ড-বিখণ্ডিত হইয়া যায়। সিরাজের রক্তে জাফরাগঞ্জের যে-গৃহ রঞ্জিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা ভূমিসাৎ হইয়াছে—তাহার কোনই চিহ্ন নাই। সেইখানে একটি প্রকাণ্ড নিম্ববিক্ষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, এক্ষণে তাহা পড়িয়া গিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্বে সেই গৃহের কিছু কিছু ভগ্নাবশেষ নিম্ববৃক্ষের নিকট দেখা যাইত; এক্ষণে সে স্থান তৃণাচ্ছাদিত সমতল-

---

১ Orme's Indostan, Vol. II, p. 159.

২ Orme, Vol. II, pp. 160, 161.

৩ অর্মে সাহেবের বিবরণ পাঠ করিয়া বোধ হয়, সিরাজউদ্দৌলা মনসুরগঞ্জ বা হীরাঝিলের প্রাসাদে নিহত হইয়াছিলেন। কিন্তু মুতাক্ষরীন ও স্টুয়ার্ট জাফরাগঞ্জই তাঁহার হত্যাস্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মুর্শিবাদাবের প্রবাদানুসারেও জাফরাগঞ্জেই সিরাজের হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হইয়াছিল। সুতরাং অর্মের বিবরণে কিছু ভ্রম আছে বলিয়া বোধ হয়।

ভূমি। সে স্থানটিকে অদ্যাপি প্রাচীরবেষ্টিত করিয়া রাখা হইয়াছে। তথায় কতক-গুলি বৃক্ষ জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাকে একটি ক্ষুদ্র বাগানের ন্যায় করিয়া তুলিয়াছে। সেই স্থানে দুই-একটি গৃহের ভিত্তি দেখা যায়। কিন্তু সিরাজের বধ্যগৃহের কোনই চিহ্ন নাই। সেই সমস্ত ভিত্তি দেখিয়া বোধ হয়, তথায় কতকগুলি গৃহ ছিল; এক্ষণে ভূমিসাৎ হওয়ায়, তাহাদের স্থানে দুই-চারিটি বৃক্ষ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সিরাজের বধ্যভূমি জাফরাগঞ্জ প্রসাদের উত্তর-পূর্ব কোণে। উক্ত স্থানটিকে বিশেষ করিয়া দেখিতে হইলে, জাফরাগঞ্জ প্রাসাদভবনে প্রবেশ করিতে হয়।

জাফরাগঞ্জের প্রাসাদে মীরণের বংশধরগণ অদ্যাপি বাস করিতেছেন। প্রাচীন দরবারগৃহ এমামবারায় পরিণত হইয়াছে; কিন্তু মহলসরা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। জাফরাগঞ্জের নবাবেরা গবর্নমেণ্টের নিকট হইতে বাৎসরিক ৬০ হাজার টাকা বৃত্তি পাইতেন। মীরণ বিহারে শাহজাদা আলিগওহরের (পরে বাদশাহ শাহ আলম) সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া প্রান্তরমধ্যে বজ্রাঘাতে নিহন হন। মুতাক্ষরীনকার লিখিয়াছেন যে, মীরণের আদেশে সিরাজের মাতা আমিনা ও মাতৃস্বসা ঘসেটী বেগম জলমগ্ন হওয়ায়, তাঁহারা মৃত্যুকালে মীরণকে বজ্রাঘাতে প্রাণপরিত্যাগের জন্য অভিসম্পাত করিয়া যান। সেইজন্য অনুমান করা হয় যে, মীরণের বজ্রাঘাতেই মৃত্যু হইয়াছিল। কিন্তু মীরণের মৃত্যু সন্দেহজনক বলিয়া তৎকালে অনেকের মনে ধারণা হইয়াছিল। মীরণের মনে স্বাধীনতার ইচ্ছা বলবতী হওয়ায়, পুণ্যশ্লোক ব্রিটিশপুঙ্গবগণ মীর কাসেমের সাহায্যে তাঁহাকে নাকি কৌশল-পূর্বক নিহত করিয়াছিলেন।[৪] পরে, বজ্রাঘাতে মৃত্যু বলিয়া প্রকাশ করা হয়। উক্ত জনশ্রুতি সত্য কি মিথ্যা বলা যায় না; তবে তৎকালে সাধারণের মনে যে ঐরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। মীরণের দেহ রাজমহলে সমাহিত করা হয়। রাজমহলের যে-স্থানে মীরণের সমাধি আছে, তাহাকে সরিফাবাজার কহে। সমাধিটি একটি জঙ্গলময় উদ্যানবাটিকার মধ্যে অবস্থিত করিতেছে। সমাধিটি অদ্যাপি বর্তমান আছে বটে, কিন্তু তাহার প্রতি কাহারও তাদৃশ যত্ন না থাকায়, তাহা অধিক দিন পর্যন্ত বর্তমান থাকিবে বলিয়া বোধ হয় না। পূর্বে এই সমাধিভবনটি প্রাচীরবেষ্টিত ছিল এবং ইহাতে লোকজনের বাসস্থানও ছিল। এক্ষণে তৎসমুদায় ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে; স্থানে স্থানে তৎসমুদায়ের চিহ্নমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সমাধিটির যত্ন করিবার জন্য জাফরাগঞ্জের নবাব-কর্তৃক একটি লোক নিযুক্ত আছে বটে, কিন্তু তাহার প্রতি কোনই যত্ন লক্ষিত হয় না। মীরণের সমাধির প্রতি মীরণ-বংশীয়দিগের অধিকতর যত্নবান হওয়া উচিত।

নবাব-নাজিমদিগের সমাধিভবন পশ্চিম মুখে রাজপথের উপরই অবস্থিত। এই বিস্তৃত সমাধিভবন নবাব-বংশীয়দিগের সমাধির দ্বারা এরূপ পরিপূর্ণ হইয়াছে যে,

৪ Mutaqherin, Vol. II, p. 132. (Translator's note.)

তথায় তিলমাত্রও স্থান নাই। তথায় ভ্রমণ করিতে করিতে এইরূপ শঙ্কা উপস্থিত হয় যে, পাছে মৃতদেহের প্রতি কোনরূপ অসম্মান প্রদর্শিত হইয়া পড়ে। সমাধি-ভবনের মধ্যস্থলে একটি শ্রেণীতে সমস্ত নবাব-নাজিমগণ শায়িত আছেন। এই শ্রেণীর পূর্ব সীমায় একটি আবৃত স্থানে গতিয়ারা বেগম নাম্নী নবাব-বংশীয়া কোন সম্ভ্রান্ত মহিলার সমাধি। তাহার পশ্চিম হইতে একটি শ্রেণীতে ক্রমান্বয়ে দ্বাদশটি সমাধি আছে। পূর্বদিক হইতে আরম্ভ করিলে, প্রথমে মীরজাফরের পিতা সৈয়দ আহম্মদ নজফীর সমাধি দৃষ্ট হয়। তাহার পশ্চিমে মীরজাফরের ভ্রাতা ও রাজমহলের নবাব কাজম আলি খাঁর সমাধি। তাহার পশ্চিমেই নবাব জাফর আলি খাঁ বা ইতিহাস-পরিচিত মীরজাফর খাঁ শায়িত।

মীরজাফরের নূতন পরিচয় দিবার আর আবশ্যক নাই; তাঁহাকে বঙ্গবাসিমাত্রেই সবিশেষ অবগত আছেন। মীরজাফর সম্ভ্রান্তবংশসম্ভূত; এই বংশ সৈয়দ বলিয়া পরিচিত। সৈয়দগণ মহম্মদ হইতে আপনাদিগের উৎপত্তি বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। হীনাবস্থা হওয়ায়, জাফর প্রথমতঃ আলিবর্দী খাঁর সংসারে প্রতিপালিত হন। আলিবর্দী তাঁহাকে সম্ভ্রান্তবংশোদ্ভব জানিয়া স্বীয় বৈমাত্রেয় ভগিনী শা খানমের সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। শা খানমই মীরণের মাতা। মীর কাসেম শা খানমের গর্ভজাতা মীরজাফরের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। শা খানম মীর কাসেমের প্রতি সন্তুষ্ট থাকায়, তাঁহারই নিকটে বাস করিতেন। আলিবর্দী খাঁ মীরজাফরের কার্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সেনাপতির পদ প্রদান করেন। মীরজাফর মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধের সময়ে অসামান্য বীর্যবত্তা দেখাইয়া আপনার সুনাম প্রচার করিয়াছিলেন; কিন্তু আলিবর্দীর ভ্রাতৃ-জামাতা আতাউল্লা খাঁর সহিত পরামর্শ করিয়া বঙ্গরাজ্য বিভাগ করিয়া লইবার ইচ্ছা করায়, আলিবর্দী তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে বাধ্য হন। পরে আলিবর্দীর ভ্রাতুষ্পুত্র নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁর অনুরোধে তাঁহাকে পুনর্বার সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহার পর সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের নেতা হইয়া, মীর-জাফর ইংরেজদিগের সহিত যোগদানপূর্বক সিরাজের সর্বনাশসাধনের পর মুর্শিদাবাদের মসনদে উপবিষ্ট হন। মসনদে বসিয়া তিনি ইংরেজদিগের দুর্ব্যবহারে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া উঠেন এবং তাঁহাদিগের হস্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া স্বাধীন হওয়ার ইচ্ছা করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মীরণের সেই ইচ্ছা অধিকতর বলবতী ছিল। কিন্তু ইংরেজেরা মীরজাফরকে বলপূর্বক পদচ্যুত করিয়া তাঁহার জামাতা মীর কাসেমকে সিংহাসন প্রদান করেন। আবার মীর কাসেমের সহিত মনোবিবাদ উপস্থিত হইলে, তাঁহারা পুনর্বার মীরজাফরকেই নবাব মনোনীত করিতে বাধ্য হন। এই সময়ে মীরজাফর নন্দকুমারকে স্বীয় দেওয়ান করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া অনেক কষ্টে কলিকাতা কাউন্সিলের সভ্যগণের মত করিয়া লন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন নন্দকুমারের পরামর্শানুসারে কার্য করিতেন। ক্রমে অন্তিম সময় উপস্থিত হইলে, হিজরী ১১৭৮ অব্দের ১৪ই সাবান (১৭৬৫ খ্রীঃ অব্দের

জানুয়ারি মাসে) বৃহস্পতিবার তিনি কুষ্ঠরোগে ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোকগত হন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে নন্দকুমার কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত আনাইয়া তাঁহার মুখে প্রদান করাইয়াছিলেন এবং তাহার তাঁহাই শেষ জলপান।[৫]

মীরজাফরের সমাধির পশ্চিমে তাঁহার অন্যতম জামাতা ইস্‌মাইল খাঁর সমাধি ; তাহার পশ্চিমে মীরজাফরবংশীয় দ্বিতীয় নবাব নজমউদ্দোলা শায়িত। মীরজাফরের মৃত্যুর পর নজমউদ্দোলা নিজামতী প্রাপ্ত হন। মীরজাফর জীবিত থাকিতেই তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মীরণের মৃত্যু হইয়াছিল ; কলিকাতা কাউন্সিলের সভ্যেরা মীরণের পুত্রগণের আবেদন না শুনিয়া, নজমউদ্দোলাকেই মসনদ প্রদান করেন। নজমউদ্দোলা মীরজাফরের জীবিত পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং মুসলমান ব্যবহারশাস্ত্রানুসারে তিনিই মীরজাফরের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। কারণ, মুসল্‌মান নিয়মানুসারে পিতামহ বর্তমানে পিতার মৃত্যু হইলে এবং পিতৃব্য জীবিত থাকিলে, পৌত্রেরা পিতামহের উত্তরাধিকারী হইতে পারেন না। নজমউদ্দোলা স্বীয় জননী মণিবেগম-কর্তৃক মীরফুলুরী নামে অভিহিত হইতেন। নজমউদ্দোলা যে-সময়ে গর্ভমধ্যে ছিলেন, সে সময়ে তদীয় মাতা মণিবেগমের ফুলুরী খাইবার ইচ্ছা হওয়ায়, ফুলুরীর দ্বারা সময়ে সময়ে তাঁহার দোহদক্রিয়া সম্পন্ন হইত ; এইজন্য নজমউদ্দোলা ভূমিষ্ঠ হইলে, মাতা তাঁহাকে মীরফুলুরী আখ্যা প্রদান করেন।[৬] নজমউদ্দোলা নিজামতী পাইয়া নন্দকুমারকে দেওয়ান করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন ; কিন্তু কলিকাতা কাউন্সিলের সভ্যেরা নন্দকুমারের প্রতি ঘোরতর অসন্তুষ্ট থাকায়, তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য করেন। এবং মহম্মদ রেজা খাঁকে নায়েব সুবা নিযুক্ত করিয়া, রায়দুর্লভ ও জগৎশেঠ প্রভৃতির পরামর্শে তাঁহাকে কার্য করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। নজমউদ্দোলার সময়ই ১৭৬৫ খ্রীঃ অব্দের ১২ই আগস্ট তারিখে ক্লাইব বাদশাহ শাহ আলমের নিকট হইতে কোম্পানীর জন্য দেওয়ানী গ্রহণ করেন। সেই সময়ে নবাব নাজিমের জন্য ৫৩,৮৬,১৩১৸৶০ বাৎসরিক বৃত্তি নির্দিষ্ট হয়। তন্মধ্যে ১৭,৭৮,৮৫৪৶০ নবাবের নিজ ব্যয় ও অবশিষ্ট সৈন্য ও বরকন্দাজ প্রভৃতির জন্য নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ক্লাইব নজমউদ্দোলার সহিত মোতিঝিলে কোম্পানীর প্রথম পুণ্যাহ করিয়াছিলের। ইহার কিছুদিন পরেই হিজরী ১১৭৯ অব্দের ২৪শে জেল্কদ (১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দের ৮ই মে) নজমউদ্দোলা উদরমধ্যে ভয়ানক যন্ত্রণা অনুভব করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন।

নজমউদ্দোলার পরে উক্ত বংশীয় তৃতীয় নবাব নাজিম সৈফউদ্দোলা বা মীর কানাইয়ার সমাধি। সৈফউদ্দোলা নজমউদ্দোলার সহোদর ভ্রাতা এবং মীরজাফর ও মণিবেগমের পুত্র। সৈফউদ্দোলার সময় নিজামত বৃত্তি ৪১,৮৬,১৩১ টাকায় নির্দিষ্ট হয়। সৈফউদ্দোলার সহিত উপবিষ্ট হইয়া গবর্নর ভেরেলেস্ট মোতিঝিলে পুণ্যাহক্রিয়া

৫ Mutaqherin Trans. Vol. II, p. 345.

৬ Mutaqherin, Vol. II, Translator's Note, p. 376.

সম্পন্ন করিয়াছিলেন। যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে বঙ্গভূমি শ্মশানে পরিণত হইয়া উঠে, সেই ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের সময় হিজরী ১১৮৫ অব্দের জেলহজ্জ মাসে (১৭৭০ খ্রীঃ অব্দে) সৈফউদ্দৌলা বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণ বিসর্জন দেন।

সৈফউদ্দৌলার পশ্চিমে মীরজাফরের আর এক পুত্র আশ্রফ আলি খাঁর সমাধি। তাঁহার পরই চতুর্থ নবাব-নাজিম মোবারক উদ্দৌলা নিদ্রিত। মোবারক উদ্দৌলা মীরজাফরের অন্যতম ভার্যা বব্বুবেগমের গর্ভজাত। মোবারক নাবালক অবস্থায় নিজামতী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাবক নিযুক্ত হইবার জন্য তাঁহার মাতা বব্বুবেগম প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু গবর্নর হেস্টিংসসাহেব তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া, মোবারকের বিমাতা মণিবেগবের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণপূর্বক তাঁহাকেই নাবালক নবাব-নাজিমের অভিভাবক নিযুক্ত করেন। এই সময়ে মহারাজ-নন্দকুমারের পুত্র রাজা গুরুদাস নবাবের দেওয়ান নিযুক্ত হন। মোবারক উদ্দৌলার নিজামতী প্রাপ্তির সময় নিজামতের বৃত্তি ৩১,৮১,৯৯১ টাকায় নির্দিষ্ট হয়; অবশেষে তাহা ১৬ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়া যায়। ১৭৭২ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারি মাস হইতে নবাব-নাজিমগণ এই ১৬ লক্ষ টাকা বরাবরই পাইয়া আসিয়াছিলেন। নবাব মনসুর আলি খাঁর পর হইতে তাহার অন্যরূপ বন্দোবস্ত হয়। ১৭৯৬ খ্রীঃ অব্দে নবাব মোবারকউদ্দৌলার মৃত্যু ঘটে।

মোবারক উদ্দৌলার পশ্চিমে পঞ্চম নবাব-নাজিম বাবরজঙ্গের সমাধি। বাবরজঙ্গ মোবারক উদ্দৌলার পুত্র; তিনি দিলার জঙ্গ বা দ্বিতীয় মোবারক উদ্দৌলা উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮১০ খ্রীঃ অব্দে তিনি পরলোকগত হন। তাঁহারই পার্শ্বে ষষ্ঠ নবাব-নাজিম আলিজা বা সৈয়দ জৈনুদ্দিন আলি খাঁ শায়িত। আলিজা বাবরজঙ্গের পুত্র; ১৮২১ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। আলিজার পার্শ্বে তাঁহার ভ্রাতা সপ্তম নবাব-নাজিম ওয়ালাজার সমাধি; ওয়ালাজা ১৮২৫ খ্রীঃ অব্দের প্রথমেই প্রাণত্যাগ করেন।

ওয়ালাজার পার্শ্বে অষ্টম নবাব-নাজিম হুমায়ুঁজা চির নিদ্রাসুখ সম্ভোগ করিতেছেন; ইহাই সর্বশেষ সমাধি। হুমায়ুঁজা ওয়ালাজার পুত্র। হুমায়ুঁজার সময় মুর্শিদাবাদের বর্তমান নবাব-প্রাসাদ নির্মিত হয়। এই পরমসুন্দর প্রাসাদটির নির্মাণ-কার্যে ন্যূনাধিক নয় বৎসর লাগিয়াছিল। ১৮৩৭ খ্রীঃ অব্দে ইহার নির্মাণ শেষ হয়। ইঞ্জিনিয়ার জেনারেল ম্যাক্লিয়ডের তত্ত্বাবধানে কেবল দেশীয় লোকদিগের দ্বারা এই প্রাসাদ নির্মিত হইয়াছিল। প্রাসাদটির নির্মাণে প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়। প্রাসাদে নবাব-নাজিমগণের এবং বর্তমান নবাব-বাহাদুর ও তদ্বংশীয়গণের অনেক চিত্র আছে। এই সুসজ্জিত সুরম্য প্রাসাদ মুর্শিদাবাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দর্শনীয় পদার্থ। ইহাতে যে-সকল চিত্র আছে, ভারতের প্রায় কোথাও সেরূপ চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। এই প্রাসাদকে সাধারণতঃ হাজারদুয়ারী কহিয়া থাকে। হাজারদুয়ারী ভাগীরথীতীরেই অবস্থিত। হুমায়ুঁজা নির্জনবাস ভালবাসিতেন; এইজন্য তিনি একটি মনোহর

বৃক্ষবাটিকা নির্মাণ করেন ; তাহার নাম মোবারক মঞ্জিল বা হুমায়ু মঞ্জিল। এই হুমায়ু মঞ্জিল পূর্বে কোম্পানীর বিচারালয় ছিল। মোবারক মঞ্জিল সুন্দর উদ্যান-মধ্যস্থিত একটি রমণীয় প্রাসাদ। তাহার ন্যায় মনোহর স্থল মুর্শিদাবাদে অতি অল্পই আছে। এই স্থানে কষ্টিপ্রস্তরনির্মিত একখানি গোলাকার মনসদ আভ্যন্তরীণ চত্বর প্রাঙ্গণে অবস্থিত ছিল। এই মসনদ শা সুজার সময়ে নির্মিত হয়। ইহা রাজমহল হইতে ঢাকায়, পরে তথা হইতে মুর্শিদাবাদে আনীত হইয়াছিল। নবাব-নাজিমগণ পূর্বে ইহাতে উপবেশন করিতেন, এক্ষণে তাহা কলিকাতায় ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-মন্দিরে অবস্থিতি করিতেছে।[৭] হুমায়ুজা ১৮৩৮ খ্রীঃ অব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

হুমায়ুজার পর তাঁহার পুত্র মনসুর আলি বা ফেরুদুজা নিজামতের গদীতে উপবেশন করিয়াছিলেন। মনসুর আলিই বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার শেষ নবাব-নাজিম। তাঁহার সময়ে মুর্শিদাবাদের বর্তমান এমামবারা নির্মিত হয়। এই এমামবারা হুগলীর বিখ্যাত এমামবারা অপেক্ষাও বৃহৎ। বর্তমান এমামবারা পুরাতন এমামবারার নিকটেই নির্মিত হইয়াছে। পুরাতন এমামবারা সিরাজউদ্দৌলা-কর্তৃক নির্মিত হয়। সিরাজের এমামবারা মুর্শিদাবাদের মধ্যে একটি সুন্দর অট্টালিকা বলিয়া বিখ্যাত ছিল। মহরমের সময় দশ দিবস মহা ধুমধাম হইত ; মীরজাফর প্রভৃতিও মহরমের সময় তথায় গমন করিতেন। সিরাজের এমামবারার অনুকরণে মুর্শিদাবাদের অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের বাটীতে এমামবাড়া নির্মিত হইয়াছিল।[৮] সিরাজের এমামবারা নষ্ট হইয়া যাওয়ায়, নবাব-নাজিম মনসুর আলি খাঁ ১৮৪৭ খ্রীঃ অব্দে নূতন এমামবারা নির্মাণ করেন। কথিত আছে যে, নূতন এমামবারা ৮।১০ মাস মধ্যে নির্মিত হইয়াছিল। কেবল মুসলমানদিগের দ্বারা ইহার নির্মাণক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

মনসুর আলি খাঁর সময় হইতেই মুর্শিদাবাদের সমস্ত গৌরবের অন্তর্ধান ঘটে। তাঁহার সময়ে গবর্নমেণ্ট নিজামতের সম্মানের অনেক লাঘব করিয়া দেন। নবাব নাজিমের ১৯ তোপ ১৩ তোপে পরিণত হয়। মোবারক উদ্দৌলার সময় হইতে যে ১৬ লক্ষ টাকা নিজামত বৃত্তির জন্য চলিয়া আসিতেছিল, তন্মধ্যে নবাব নিজ ব্যয়ের জন্য ৭ লক্ষ টাকা পাইতেন। উক্ত ১৬ লক্ষ টাকা গবর্নর জেনারেল ইচ্ছা করিলে কমাইতে পারিবেন বলিয়া প্রকাশ করা হয়, কিন্তু মনসুর আলির জীবনে গবর্নমেণ্ট তাহার লাঘব করিতে ইচ্ছা করেন নাই। পূর্বে কেল্লামধ্যে নবাবের অনুমতি ব্যতীত কেহ প্রবেশ করিতে পারিত না ; গবর্নমেণ্ট নবাব-নাজিমকে সে ক্ষমতা

৭ মসনদের শিলালিপিতে লিখিত আছে যে, "এই মাঙ্গলিক সিংহাসন ১০৫২ হিজরীর ২৭-এ সাবান বিহার প্রদেশস্থ মুঙ্গের নগরে বোখরাবাসী দাসানুদাস খাজা নজর-কর্তৃক নির্মিত হইল।" হিজরী অব্দের শেষ অক্ষরটি অস্পষ্ট, তাহা ২, ৪, ৫, বলিয়া পঠিত হইতে পারে। বেভারিজ উক্ত তারিখকে ১৬৪১ খ্রীঃ অব্দের ১১ই নবেম্বর নির্দেশ করিয়াছেন।

৮ Mutaqherin, Vol. II, p. 37.

হইতেও বঞ্চিত করেন। এতদ্ব্যতীত মণিবেগম প্রভৃতির সঞ্চিত তহবিলে যে-সমস্ত টাকা জমিয়াছিল, গবর্নমেণ্ট নবাব-নাজিমকে তাহাও প্রদান করিতে অস্বীকৃত হন।

লর্ড ডালহৌসির সময় হইতেই নবাব-নাজিমের গৌরব-হ্রাসের সূচনা হয়। যিনি দেশীয় রাজন্যবর্গের ক্ষমতাহ্রাসের জন্য সংহার মূর্তিতে ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যাঁহার কুটিল কটাক্ষে অযোধ্যা, পঞ্জাব, সেতারা প্রভৃতি প্রদেশ হইতে স্বাধীনতালক্ষ্মী চিরদিনের জন্য অন্তর্হিতা হন, বাঙ্গলার নবাব-নাজিমের যে-কিছু গৌরব ও ক্ষমতা ছিল, তাহারও লাঘব করিতে তিনি সঙ্কুচিত হইবেন কেন? তাই তিনি প্রথমে তাহার সূচনা করিয়া যান। পরে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য গবর্নর জেনারেলও তাঁহারই রীতির অনুসরণ করেন। নবাব-নাজিম এই সমস্ত বিষয়ের জন্য স্টেট্ সেক্রেটারী সার চার্লস্ উডের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন; পরে স্বয়ং ইংলণ্ড যাত্রা করিতে বাধ্য হন। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট তাঁহাকে ১০ লক্ষ টাকা দিয়া নিরস্ত করেন। ইংলণ্ড হইতে বাঙ্গলায় প্রত্যাগত হইয়া, তিনি বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব-নাজিম উপাধি চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করেন। তাহার পর হইতে তদ্বংশীয়েরা কেবল মুর্শিদাবাদের নবাববাহাদুর নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। সমস্ত বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা যাঁহাদের নামের সহিত বিজড়িত ছিল, এক্ষণে কেবল মুর্শিদাবাদ তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে! নাজিমের পরিবর্তে বাহাদুরমাত্র নবাবের সহিত যুক্ত হইয়াছে!

মনসুর আলি খাঁ ১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দের ৫ই নভেম্বর বেলা ১টা হইতে ২টার মধ্যে পরলোকগত হন। সেই দিবসেই তাঁহার অন্যতম ভার্যা মালকা জামানিয়া বেগম স্বামীর পশ্চাদনুসরণ করিয়াছিলেন। মনসুর আলিকে প্রথমে জাফরাগঞ্জের সমাধিভবনে হুমায়ুঁজার পার্শ্বেই সমাহিত করা হইয়াছিল; পরে তাঁহার মৃতদেহ মক্কায় প্রেরিত হয়। জাফরাগঞ্জের সমাধিভবনের যে-স্থানে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়, অদ্যাপি তথায় তাহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। মনসুর আলির জ্যেষ্ঠপুত্র আলি কাদের হোসেন আলি মির্জা মুর্শিদাবাদের প্রথম নবাব-বাহাদুর। ইঁনি বার্ষিক ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকারও কম বৃত্তি প্রাপ্ত হন। বঙ্গের অদ্বিতীয় সম্রান্তবংশের সন্তানের ন্যায় তাঁহার হৃদয় অতীব উন্নত ছিল। হিন্দু-মুসলমানগণের প্রতি যে-সম্প্রীতির জন্য মুর্শিদাবাদরে নবাবগণ চিরকাল ইতিহাস-বিখ্যাত হইয়া আসিতেছেন, নবাব বাহাদুরেরও সেই গুণ উজ্জ্বলতররূপেই প্রতিভাত হইয়াছিল। দরিদ্রগণের জন্য তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন; আর্তের কাতরধ্বনি মুহূর্তমধ্যে তাঁহার মর্ম স্পর্শ করিত। কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলেই তাঁহার নিকট হইতে আশানুরূপ ফল লাভ করিত। মুর্শিদাবাদের অনেক অনাথ-পরিবার নবাববাহাদুর-কর্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিল। গভর্নমেণ্টও তাঁহার এই সমস্ত গুণের জন্য তাঁহাকে যথারীতি সম্মানিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। হোসেন আলির পুত্র ওয়াসিফ আলি[১] বর্তমান নবাববাহাদুর। ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘজীবন প্রদান করিয়া মুর্শিদাবাদের কল্যাণ সাধন করুন।

---

১ কয়েকবৎসর পূর্বে পরলোক গমন করিয়াছেন।

নবাব-নাজিমদিগের সমাধির উত্তরে একটি প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে মীরজাফরের প্রিয়তমা ভার্যা মণিবেগম ও তাহার পূর্বদিকে তাঁহার অন্যতম ভার্যা বব্বুবেগম শায়িত আছেন। মণিবেগম মীরজাফরের প্রাণাধিক প্রিয়তমা ছিলেন। আমরা সংক্ষেপে মণিবেগম ও বব্বুবেগমের বিবরণ প্রদান করিতেছি ; মণিবেগম ও বব্বুবেগম উভয়েই প্রথমত নর্তকী ছিলেন। বব্বুবেগমের বংশ অনেক দিন হইতে নর্তকীর ব্যবসায় করিত। বব্বুবেগম সম্মন আলি খাঁ নামক জনৈক বিশ্বস্ত মুসলমানের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতার নাম বিশু। সেকেন্দ্রার নিকট বালকুণ্ড নামক স্থানে মণিবেগমের জন্ম হয়। মণির মাতা দারিদ্র্যের কঠোরচক্রে নিষ্পেষিত হইয়া, স্বীয় কন্যাকে বিশুর হস্তে অর্পণ করিতে বাধ্য হয়। বিশু মণিবেগমকে দিল্লীতে লইয়া গিয়া নর্তকীর ব্যবসায় শিক্ষা করায় ; তাহার কন্যা বব্বুও নর্তকীর কার্যে সুশিক্ষিতা হইয়াছিল। যৎকালে মুর্শিদাবাদে সিরাজউদ্দৌলা ও এক্রাম উদ্দৌলার বিবাহ হয়, সেই সময়ে নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁর আদেশে বিশু ও তাহার নর্তকীসম্প্রদায় দশ হাজার টাকায় মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হয়। বিবাহোৎসবের পর মণিবেগমের সহিত মীরজাফরের প্রগাঢ় প্রণয় সংঘটন হওয়ায়, তিনি তাঁহাদিগকে প্রথমত মাসিক ৫ শত টাকা প্রদানের অঙ্গীকারে মুর্শিদাবাদে থাকিতে অনুরোধ করেন এবং কিছুদিন পরে মণিবেগমকে ভার্যারূপে গ্রহণ করেন। অনন্তর বব্বুবেগমের সহিতও তাঁহার পরিণয়-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। মণিবেগমের গর্ভে নজমউদ্দৌলা ও সৈফউদ্দৌলার এবং বব্বুবেগমের গর্ভে মোবারক উদ্দৌলার জন্ম হয়।

মণিবেগমই মীরজাফরের প্রিয়তমা বেগম ছিলেন। সিরাজউদ্দৌলার হীরাঝিলের প্রাসাদ হইতে মীরজাফর যে-সমস্ত হীরা-জহরত প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মণিবেগম তৎসমস্তই অধিকার করেন। নবাব মোবারক উদ্দৌলার অভিভাবক হওয়ার জন্য মণিবেগম ও বব্বুবেগম উভয়েই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু মণিবেগম গবর্নর হেস্টিংসকে অনেক টাকা উৎকোচ দিয়া মোবারক উদ্দৌলার অভিভাবকের পদ লাভ করেন। মণিবেগম ১৮১৩ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে পরলোকগতা হন।[১০] মণিবেগম গদিনসীন বেগমের পদ পাইয়াছিলেন। আলিবর্দী খাঁর বেগম হইতে উক্ত পদের সৃষ্টি হয়। গদিনসীন বেগমেরা বাৎসরিক লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইতেন। মণিবেগমের বৃত্তি হইতে অনেক টাকা সঞ্চিত হইয়াছিল। গবর্নমেণ্ট তাহা নবাব নাজিমকে প্রদান করেন নাই। মুর্শিদাবাদ-চকের মধ্যস্থিত মনিবেগমের বিখ্যাত মসজেদ অদ্যাপি তাঁহার নাম ঘোষণা করিতেছে। তিনি অত্যন্ত দানশীলা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। মুক্তহস্ততার জন্য তিনি 'মাদর-ই-কোম্পানী' বা কোম্পানীর মাতা বলিয়া অভিহিতা হইতেন।

---

১০ Selections from Calcutta Gazettes of the years 1806-15 By H. D. Sandeman, IV, 120-121. Also "Letters of Warren Hastings to his wife" by Grier.

নবাব মনসুর আলির মাতা রাইস্ উন্নেসা বেগমের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রধানা মহিষী শমসজাঁহা বেগম গদিনসীন বেগম হইয়াছিলেন। তিনিও সম্ভ্রান্তবংশের মহিলার ন্যায় আপনার উন্নতহৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিতেন। স্বজন ও দীন-দুঃখী প্রতিপালন তাঁহার একটি প্রধান ব্রত ছিল। যাবতীয় দেশহিতকর কার্যে তিনি সর্বদা ব্যাপৃত থাকিতেন। যেখানে কোন মঙ্গলকর কার্য উপস্থিত হইত, সেইখানে তিনি মুক্তহস্ততার পরিচয় দিতেন। তাঁহার পুত্র ইস্কান্দর আলি মির্জা বা সাধারণের পরিচিত সুলতান সাহেব অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া মাতার হৃদয় শেলবিদ্ধ করিয়া যান। সুলতান সাহেবের ন্যায় তেজস্বী, অমায়িক ও উদারপ্রকৃতি মহানুভব-ব্যক্তি সম্ভ্রান্তবংশীয়দিগের মধ্যে অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। সম্ভ্রান্ত জনগণ হইতে সাধারণ লোক পর্যন্ত তাঁহার সহিত কথোপকথনে বিমল আনন্দ অনুভব করিত। নবাব-নাজিমের বংশধর বলিয়া তাঁহার মনে কোনরূপ শ্লাঘার উদয় হইত না। তাঁহার সমাধি অদ্যাপি জাফরাগঞ্জে বিরাজ করিয়া দর্শকগণের হৃদয়ে শোকোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করিয়া থাকে। তাঁহার মাতাও এক্ষণে তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছেন।

জাফরাগঞ্জের সমাধিভবনের সম্মুখে পথের অপর পার্শ্বে একটি সুন্দর মসজেদ দৃষ্ট হয়; তথায় উপাসনাদি হইয়া থাকে। এই সমাধিভবনে একতিলও স্থান নাই, সমস্তই সমাধিতে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সমাধিভবনের বন্দোবস্ত ভালই আছে। ইহাতে প্রায় একশত কারী বা কোরানাধ্যায়ী প্রতিদিন সমাধিস্থ মৃত ব্যক্তিগণের নিকট উপস্থিত হইয়া কোরানপাঠে তাঁহাদের আত্মার কল্যাণ সম্পাদন করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন নানা কার্যে অন্যান্য অনেক লোকজনও নিযুক্ত আছে। সমাধিভবনের স্থানে স্থানে দুই-চারিটি কুসুম ও অন্যান্য বৃক্ষ জন্মগ্রহণ করিয়া গন্ধ ও ছায়া বিতরণে পরলোকগত ব্যক্তিগণের শান্তিসুখের বৃদ্ধি সাধন করিতেছে।

উধূয়ানালা[১]

অষ্টাদশ শতাব্দীর যে-মহাবিপ্লববাগ্নি বঙ্গদেশে প্রধূমিত হইতে হইতে পলাশী-সমরক্ষেত্রে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, কয়েক বৎসর পর্যন্ত তাহা কখনও প্রধূমিত, কখনও বা ঈষজ্জ্বলিত হইয়া অবশেষে উধূয়ানালায় মুসলমান-গৌরবকে চিরভস্মীভূত করিয়া ফেলে। উধূয়ানালা বাঙ্গলার মুসলমান-গৌরবের শ্মশানভূমি। এইখানে বাঙ্গলার শেষ স্বাধীন নবাব মীর কাসেম আপনার সর্বস্ব বলি দিয়া বঙ্গরাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া, অবশেষে মনস্তাপে ফকীরি গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। যিনি বঙ্গদেশ হইতে ইংরেজক্ষমতা নির্মূল করিবার জন্য মহাবিপ্লবের পুনরবতারণা করিয়াছিলেন, তিনি নিজেই অবশেষে সেই বিপ্লবে শক্তিহীন হইয়া মুঙ্গেরপ্রান্তবাহিনী জাহ্নবীজলে বাঙ্গলার স্বাধীনতা-লক্ষ্মীকে বিসর্জন দিয়া, চিরদিনের জন্য বঙ্গরাজ্য হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। যিনি বঙ্গরাজ্যে মুসলমান সিংহাসন অটল রাখিবার জন্য রণকৌশলে স্বীয় সৈন্যদিগকে ইউরোপীয়গণের সমকক্ষ করিয়া তুলিয়াছিলেন, ইংরেজের অমানুষী চাতুরীতে তাঁহার সেই সমস্ত দক্ষতা ব্যর্থ হইয়া যায়। ইংরেজের রক্তে যিনি বঙ্গভূমিকে অভিষিক্ত করিবার ইচ্ছা করিয়া-ছিলেন, দৈবচক্রে তাঁহারই সৈন্যগণের রক্তে বাঙ্গলার প্রধান প্রধান সমরক্ষেত্র রঞ্জিত হইয়া উঠে। ইংরেজের মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া মীর কাসেম প্রথমতঃ তাহাদিগের জালমধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়েন; অনেক চেষ্টায় সে জাল ছিন্ন করিলেও তিনি একেবারে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। ইংরেজের অব্যর্থ সন্ধানে তাঁহার দূর-প্রসারিণী শক্তিকে চিরদিনের জন্য বিকলাঙ্গী হইতে হয়। মীর কাসেমের সমস্ত আশা-ভরসা উধূয়ানালায় বিনষ্ট হইয়া যায়। উধূয়ার পর্বতশ্রেণী তাঁহার সৈন্যদিগকে বেষ্টন করিয়া রাখিলেও, ইংরেজের রণচাতুরী তাহাদিগকে অনায়াসে ভেদ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। যে-ইংরেজ বণিক্‌দিগের চাতুরীতে ন্যায়ের অচল ও অটল হিমালয় উৎপাটিত হইয়া পড়িত, উধূয়ার ক্ষুদ্র পাহাড়শ্রেণীর এমন কি সাধ্য ছিল যে, তাহাদের গতিরোধ করিতে সমর্থ হইত? ফলতঃ উধূয়ার সুন্দর অবস্থান পাইয়াও ইংরেজহস্তে মীর কাসেমের সৈন্যদিগকে বিধ্বস্ত হইতে হইয়াছিল।

মীর কাসেমের সেনাশিবিরের সম্মুখে ও পার্শ্বে উধূয়ার পাহাড়শ্রেণী নাত্যুচ্চ মস্তক উত্তোলন করিয়া শত্রুপক্ষের গতিরোধার্থ দণ্ডায়মান; পশ্চাদ্ভাগে বর্ষার সলিল-প্রবাহে পরিপূর্ণদেহা উধূয়ানালা ফেন উদগীরণ করিতে করিতে কুলু কুলু ধ্বনিতে গঙ্গাবক্ষে আত্মবিসর্জনে ব্যস্ত; বামে আপনি জাহ্নবী বর্ষার জলপ্লাবনে স্ফীত হইয়া ভৈরব রবে পার্শ্বরক্ষার জন্য নিযুক্ত; দক্ষিণে আরও কতিপয় পর্বতশ্রেণী প্রাচীররূপে অবস্থিত। এই

১ উধূয়ানালা প্রচলিত ইতিহাসে উদয়নালা বলিয়া লিখিত হয়। কিন্তু উধূয়ানালাই ইহার প্রকৃত নাম। তদঞ্চলবাসী ও দেশীয় গ্রন্থকারগণ-কর্তৃক ইহা উধূয়ানালা নামেই অভিহিত হইয়া থাকে।

প্রাকৃতিক অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করিবার জন্য সম্মুখভাগে পরিখা খনন করিয়া মীর কাসেমের সৈন্যগণ নির্ভীকচিত্তে অবস্থান করিতেছিল। তাহারা মনে করিয়া উঠিতে পারে নাই যে, যে-স্থানে দেবতাও সহসা প্রবেশ করিতে পারেন না, সেই স্থানে ইংরেজসৈন্য অনায়াসে প্রবেশলাভ করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু তাহারা জানিত না যে, ইংরেজ-চাতুরীর নিকট দৈবশক্তিও প্রতিহত হইয়া যায়। কেবল তাহাদের এই বিশ্বাসের জন্য সতর্কতার অভাবে ইংরেজসৈন্য রাত্রিযোগে নবাবসেনাশিবিরে প্রবেশ করিয়া, গোলাবর্ষণে তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে এবং কামানধ্বনিতে উধূয়ার পর্বতশ্রেণী বিকম্পিত করিয়া জাহ্নবীহৃদয়ে মহাতরঙ্গের সৃষ্টি করিয়া তুলে। মীর কাসেমের স্বাধীনচিত্ততার জন্য মূর্ছিতা মুসলমান-রাজলক্ষ্মীর যে-অস্ফুট জ্যোতিঃ বাঙ্গলার ভাগ্যাকাশে পুনর্বার ঈষৎ বিকশিত হইতেছিল, উধূয়ানালায় তাহা চিরদিনের জন্য তমসাচ্ছন্ন হইয়া যায়। ইংরেজও নিঃসন্দিগ্ধভাবে বাঙ্গলার একচ্ছত্রতা লাভ করেন। পলাশী হইতে তাঁহাদের যে-শক্তিপ্রবাহ বঙ্গদেশে প্রবাহিত হইতেছিল, মীর কাসেম-কর্তৃক সময়ে সময়ে ঈষৎ প্রতিহত হওয়ায়, উধূয়ানালায় তাঁহারা তাহার পথ অবাধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। আজিও উধূয়ানালা ও তাহার নিকটস্থ পাহাড়শ্রেণী দণ্ডায়মান থাকায় মীর কাসেমের গৌরব-বলি ও ইংরেজ-বিজয়ের ঘোষণা করিয়া সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে।

উধূয়ানালা রাজমহল হইতে প্রায় ৩ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্বে। রাজমহল এক সময়ে বাঙ্গলার রাজধানীপদে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাঙ্গলার প্রাচীন রাজধানী গৌড় মহামারীতে বিনষ্ট হওয়ায়, কিছুকাল টাঁড়ায় রাজধানী স্থাপিত হয়। পরে ১৫৯২ খ্রীঃ অব্দে রাজা মানসিংহ রাজমহলে রাজধানী স্থাপন করেন। লোকে পূর্বে রাজমহলকে আগমহল বলিত। মানসিংহই আগমহলকে রাজমহলে পরিণত করেন। মানসিংহ রাজমহলে আপন বাসনিকেতন ও একটি দেবালয়ও নির্মাণ করিয়া তাহা সুরক্ষিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ফতেজঙ্গ নামে বিহারের মুসলমান শাসনকর্তা তৎকালে রাজমহলে থাকিতেন ; তিনি সম্রাট্ আকবরকে লিখিয়া পাঠান যে, মানসিংহ দেবালয় স্থাপন করিয়া কাফের-ধর্মপ্রচার ও বাসনিকেতন সুরক্ষিত করিয়া স্বয়ং স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনের চেষ্টা করিতেছেন। মানসিংহ এই সংবাদ অবগত হইয়া, রাজমহলকে আকবরনগরে ও দেবালয়টিকে একটি প্রকাণ্ড জুম্মা মসজেদে পরিণত করিয়া ফেলেন। পরে স্বীয় উপাসনার জন্য একটি ক্ষুদ্রায়তন মন্দির নির্মাণ করেন। কথিত আছে যে, এইজন্য মানসিংহ পরে ফতেজঙ্গের সহিত কৌশলপূর্বক বিবাদ বাধাইয়া, তাঁহার বাটীপর্যন্ত সুড়ঙ্গ খননপূর্বক বারুদের দ্বারা পূর্ণ করিয়া উক্ত বাটী উড়াইয়া দেন। ফতেজঙ্গের বাটীর ভগ্নাবশেষ আজিও রাজমহলে দেখিতে পাওয়া যায়। মানসিংহ-স্থাপিত, বারদুয়ারী, জুম্মা মসজেদ, শিবমন্দির প্রভৃতি অদ্যাপি বিরাজ করিতেছে। এই জুম্মা মসজেদে একটি প্রকাণ্ড ইন্দারা আছে ; তথায় সমস্ত দ্রব্য প্রস্তরীভূত হইয়া যায়।

রাজমহল হইতে রাজধানী ঢাকায় অন্তরিত হয় ; অনন্তর সুলতান সুজা পুনর্বার

রাজমহলে রাজধানী স্থাপন করেন। সুজা অনেক মনোহর অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া রাজমহলকে অধিকতর শোভাশালী করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্মিত অট্টালিকার মধ্যে সিংদালান নামে একটি বাটীর কিয়দংশ আজিও গঙ্গাতীরে বিদ্যমান আছে। উহার কষ্টিপ্রস্তর নির্মিত অনেকগুলি স্তম্ভ আজিও সুজার শিল্পানুরাগের পরিচয় দিতেছে। সুজার পর রাজধানী পুনর্বার ঢাকায়, পরে তথা হইতে মুর্শিদাবাদে অন্তরিত হয়। মীর কাসেম মসনদে বসিয়া মুর্শিদাবাদ একরূপ ত্যাগই করিয়াছিলেন। তিনি মুঙ্গেরে অবস্থিতি করিতেন এবং বিহারের যাবতীয় স্থান তিনি সুরক্ষিত ও সুশোভিত করিতে যত্ন পাইয়াছিলেন। রাজমহলে নির্জনবাস করিবার জন্য তিনি নাগেশ্বরবাগ নামক রমণীয় উদ্যানে একটি মনোরম অট্টালিকা নির্মাণ করেন। রমণীপরিবৃত হইয়া বিশ্রাম-সুখ অনুভব করিবার জন্য ইহা নির্মিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি সে বিশ্রাম ভোগ করিবার অবকাশ পান নাই। রাজমহলকে তিনি সুরক্ষিত করিতেও চেষ্টা করিয়াছিলেন। উধুয়ানালা রাজমহলের নিকটেই অবস্থিত, উধুয়ার উপত্যকা সৈন্যগণের অবস্থানের একটি সুন্দর স্থান। ইংরেজদিগের সহিত বিবাদ আরম্ভ হইলে, মীর কাসেম উধুয়ার পার্বত্যপথ অধিকার করিয়া সেই সুদৃঢ় স্থানে সৈন্যসমাবেশপূর্বক, ইংরেজদিগের বিহার-প্রবেশে বাধাপ্রদানে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে ইচ্ছা পূরণ হয় নাই।

মীর কাসেম প্রথমতঃ ইংরেজদিগের সাহায্যেই বাঙ্গলার সুবেদারী লাভ করিয়াছিলেন। মীরজাফরের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ায়, ইংরেজেরা মীরজাফরকে নামমাত্র নবাব স্বীকার করিয়া, প্রথমে মীর কাসেমকে তাঁহার সহকারিরূপে রাজ্যশাসনের ভার দিতে ইচ্ছা করেন। কলিকাতার গভনর ভান্সিটার্টসাহেব সেইজন্য মুর্শিদাবাদে আসিয়া মীরজাফরকে অনুরোধ করিলে, তিনি তাহাতে অস্বীকৃত হওয়ায়, ইংরেজেরা বলপূর্বক মীর কাসেমকে সিংহাসন প্রদান করেন। মীরজাফর অগত্যা মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় বাস করিতে বাধ্য হন। মীর কাসেম সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, বিহার অভিমুখে যাত্রা করেন। সেই সময়ে বাদশাহ আলমগীরের পুত্র আলি গওহর (পরে শাহ আলম), বিহার আক্রমণের চেষ্টা করিতেছিলেন। অতঃপর ইংরেজ ও মীর কাসেমের সহিত শাহ আলমের সন্ধি স্থাপিত হইলে, মীর কাসেম বিহারে অবস্থান করিবার ইচ্ছা করিয়া মুঙ্গেরদুর্গ সুদৃঢ় করেন ও তথায় অবস্থিতি করিতে থাকেন। এই সময়ে বাণিজ্যঘটিত শুল্কব্যাপার লইয়া ক্রমে ইংরেজদিগের সহিত মীর কাসেমের বিবাদ বাধিয়া উঠে। প্রথমতঃ ইংরেজদিগের মধ্যে দুইটি দল হইয়াছিল। এক দল মীর কাসেমের পক্ষপাতী ; এই দলের মধ্যে গবর্নর ভান্সিটার্ট, ওয়ারেন হেস্টিংস প্রভৃতি প্রধান। অন্য দল নবাবের ঘোরতর বিপক্ষ ; এলিস, আমিয়ট প্রভৃতি কাউন্সিলের সভ্যগণ সেই দলের নেতা। এলিস পাটনা কুঠির অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া, মীর কাসেমকে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করায়, তাঁহার প্রতি নবাবের অত্যন্ত ক্রোধ উপস্থিত হয়। এই ক্রোধের জন্য অবশেষে আমিয়ট ও এলিস দুই জনকেই প্রাণ বিসর্জন দিতে হইয়াছিল।

কিন্তু অবশেষে মীর কাসেমও ইংরেজ-কোপানলে দগ্ধ হইয়া বঙ্গরাজ্য হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হন।

ইংরেজেরা আপনাদিগের বাণিজ্যের সুবিধার জন্য কলিকাতা কাউন্সিল হইতে এইরূপ এক নিয়ম জারি করেন যে, কাউন্সিলের অনুমতিপত্র লইয়া, যে-কোন ইংরেজ বিনা শুল্কে সমস্ত পণ্যদ্রব্যের আমদানি-রপ্তানি করিতে পারিবে। কিন্তু অন্যান্য লোকের বাণিজ্য-দ্রব্যের আমদানি-রপ্তানি করিতে হইলে, তাহাদিগকে অধিকপরিমাণে শুল্ক প্রদান করিতে হইবে। এইরূপ নিয়ম প্রচারিত হওয়ায়, যে-সমস্ত নৌকায় কেবল ব্রিটিশ নিশান ও ইংরেজ-সিপাহীর ন্যায় পরিচ্ছদধারী আরোহিগণ থাকিত, তাহারাই নবাবের কর্মচারীদিগের অনুসন্ধান হইতে নিষ্কৃতি পাইত। এই কারণে কেবল কোম্পানী নহে, কোম্পানীর কর্মচারিগণের মধ্যে যাঁহাদের গুপ্তব্যবসায় প্রচলিত ছিল, তাঁহারা পর্যন্ত যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। এই রূপ অবাধ বাণিজ্যে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ব্যবসায় তাঁহাদিগের একচেটিয়া হইয়া উঠিল। দেশীয় ব্যবসায়িগণ ক্রমশঃ অর্থহীন হওয়ায়, তাহাদের ধ্বংসমুখে পতিত হইবার উপক্রম হইল ; নবাবের রাজস্বেরও যথেষ্ট ক্ষতি হইতে লাগিল। সাধারণ বণিকগণ ব্রিটিশ-নিশান ও ইংরেজ-সিপাহীর পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া, অবাধে বাণিজ্যকার্য চালাইতে লাগিল। যে-যে স্থানে নবাবের কর্মচারিগণ অনুমতিপত্রের অনুসন্ধানের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, তত্তৎস্থানে নিকটবর্তী ইংরেজকুঠির অধ্যক্ষ-কর্তৃক ধৃত হইয়া তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা ও অবমাননা ভোগ করিতে হইয়াছিল।

এইরূপে রাজস্বের ক্ষতি হওয়ায়, মীর কাসেম কলিকাতা কাউন্সিলে বারংবার লিখিয়া পাঠাইলেন ; কিন্তু কলিকাতা কাউন্সিল তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। গবর্নর ভান্সিটার্ট কাউন্সিলের সভ্যদিগকে এ বিষয়ে বিবেচনা করিতে বলিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার অনুরোধও গ্রাহ্য হয় নাই। অবশেষে কাউন্সিলের সভ্যগণের পরামর্শানুসারে ভান্সিটার্ট নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, সমস্ত গোলযোগের মীমাংসার জন্য মুঙ্গের যাত্রা করেন। তথায় নবাবের সহিত তিনি এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া আসেন যে, যেখানে ইংরেজেরা শতকরা ৯ টাকা মাশুল দিবেন, দেশীয়দিগকে তথায় শতকরা ২৫ টাকা দিতে হইবে এবং ইংরেজদিগের অনুমতিপত্র ইংরেজ অধ্যক্ষগণের স্বাক্ষরিত হইয়া নবাবের রাজস্ব-কর্মচারিগণ কর্তৃকও পুনঃস্বাক্ষরিত হইবে। ভান্সিটার্ট মুঙ্গের হইতে কলিকাতায় আসিয়া কাউন্সিলে এই সমস্ত বিষয় বিবৃত করিলেন ; কিন্তু সভ্যগণ তাহাতেও স্বীকৃত হইলেন না। তাঁহারা লবণের জন্য শতকরা ২।।০ টাকা মাত্র মাশুল দিতে চাহিলেন এবং যেখানে তাঁহাদের লোকের সহিত নবাবের লোকের গোলযোগ হইবে, ইংরেজ অধ্যক্ষেরাই তাহার বিচার করিবেন বলিয়া প্রকাশ করিলেন।

মীর কাসেম কাউন্সিলের এইরূপ মত শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। অতঃপর তিনি রাজ্যমধ্যে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিবার জন্য কি দেশীয়, কি বিদেশীয়

সমস্ত বণিক্‌দিগকে আদেশ দিলেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে ইংরেজদিগের সর্বনাশ উপস্থিত হইল। কাউন্সিলের সভ্যেরা পুনর্বার আমিয়ট ও হেসাহেবকে নবাবের নিকট পাঠাইলেন, কিন্তু কোন বিষয়েরই মীমাংসা হইল না। ক্রমে উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাদ গুরুতর হইয়া উঠিলে, পরস্পরে যুদ্ধসজ্জায় প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময়ে নবাবের কোন কোন কর্মচারী বন্দী-অবস্থায় কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। আমিয়ট ও হেসাহেব নবাবের নিকট হইতে বিদায় চাহিলে, নবাব ঐ সকল কর্মচারীর মুক্তিপর্যন্ত হেসাহেবকে মুঙ্গেরে থাকিতে বলেন।[২] হেসাহেবকেও বাধ্য হইয়া মুঙ্গেরে থাকিতে হয়। আমিয়ট নৌকাযোগে মুঙ্গের হইতে কলিকাতায় রওনা হইলেন। নবাব রাজ্যের চতুর্দিকে ইংরেজদিগের সহিত বিবাদের ঘোষণা করিয়া দিলেন।

কলিকাতায় আগমনকালে আমিয়ট মুর্শিদাবাদে নবাবের লোকদ্বারা হত হইলেন। এদিকে পাটনার অধ্যক্ষ এলিস্ পাটনা অধিকার করিয়া বসিলেন, কিন্তু মীর কাসেমের সৈন্যগণ তাহা পুনরধিকার করিয়াছিল। যখন উভয় পক্ষের বিবাদ গুরুতর হইয়া উঠে, তখন উভয়েই পরস্পরকে বাধা দিবার জন্য ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেন। মেজর আডাম্‌সের অধীন ইংরেজসৈন্য রণমদে উন্মত্ত হইয়া ধাবিত হইল। মীর কাসেম সৈন্যদিগকে ইউরোপীয় রণকৌশলে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। তিনি মুঙ্গেরে কারখানা করিয়া কামান, বন্দুক, গোলা প্রভৃতি নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। তাঁহার নির্মিত বন্দুকই ইউরোপীয় বন্দুক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া কোন ইংরেজ ঐতিহাসিক উল্লেখ করিয়াছেন।[৩] সমরু নামে একজন ইউরোপীয় এবং গর্গিন খাঁ ও মার্কার প্রভৃতি কয়েকজন আর্মেনীয় তাঁহার সৈন্যদিগকে সুশিক্ষা প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হন। গর্গিন্ খাঁ প্রধান সেনাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। গর্গিন্ খাঁ খাজা পিত্রুস্ নামে কলিকাতার একজন আর্মেনীয় সওদাগরের ভ্রাতা। পিত্রুসের দ্বারা গর্গিন খাঁর সহিত ইংরেজদিগের গোপনে পরামর্শ চলিত, এইরূপ সন্দেহ হওয়ায়, অবশেষে নবাবের আদেশে গর্গিন খাঁ নিহত হন।

১৭৬৩ খ্রীঃ অব্দের ১৯শে জুলাই কাটোয়ার পরপারে পলাশীর নিকট মহম্মদ তকী খাঁর সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ হয়; এই যুদ্ধে মহম্মদ তকী খাঁকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হইয়াছিল।[৪] ২৩শে মুর্শিদাবাদের মোতিঝিলের নিকট নবাবসৈন্য পরাজিত হইয়া সূতীতে পলায়ন করে। ২৫শে ইংরেজেরা মীরজাফরকে পুনর্বার সিংহাসনে উপবেশন করান। ১লা আগস্ট গিরিয়া সমরক্ষেত্রে ইংরেজ ও নবাবসৈন্যের মধ্যে

২ Seir Mutaqherin Trans. Vol. I, p. 237.

৩ Broome's Bengal Army, p. 257.

৪ মহম্মদ তকী খাঁ মীর কাসেমের একজন বিশ্বাসী সেনাপতি ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখরে তাঁহাকে যেরূপ ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, ইতিহাসে তাহা দৃষ্ট হয় না।

ঘোরতর যুদ্ধ ঘটে ; তাহাতে নবাবসৈন্য পরাজিত হইয়া, উধূয়ানালায় উপস্থিত হয়। উধূয়ানালায় পূর্ব হইতেই নবাবের শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছিল। পরাজিত সৈন্যগণ সেই শিবিরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে।

উধূয়ানালার সুন্দর অবস্থানের জন্য মীর কাসেম সেইস্থানে শিবির সন্নিবেশের আজ্ঞা দেন। নবাবশিবির দক্ষিণ-পূর্বদিকে সম্মুখ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিল। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মীর কাসেমের শিবিরের পশ্চাদ্‌ভাগে উধূয়ানালা প্রবাহিত হইতেছিল। উধূয়ানালা রাজমহল পর্বতশ্রেণী হইতে বহির্গত হইয়া উধূয়ার নিকট একটি বিলে পড়িয়া পরে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। নবাব-শিবিরের বাম পার্শ্বে নিজে গঙ্গা পরিখারূপে অবস্থিত, দক্ষিণ পার্শ্বেও কতকগুলি পর্বত প্রাচীররূপে দণ্ডায়মান। শিবিরের সম্মুখভাগে গঙ্গা হইতে পরিখা খনন করিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে প্রায় অর্ধক্রোশ দূরে একটি একক পর্বতের অঙ্গে সম্মিলিত করা হইয়াছিল। এই পর্বতটিকে এক্ষণে পীরপাহাড় কহে। পীরপাহাড় হইতে পুনর্বার পরিখা নিখাত হইয়া, তাহা দক্ষিণদিকে পাহাড়ের নিকটস্থ বাদশাহী সড়ক অতিক্রম করিয়া, কতকগুলি পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। পীরপাহাড়কে সুরক্ষিত করিয়া তথায় প্রহরী নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এই পরিখাকে বিভাগ করিয়া একটি ঝিল বা দাঁড়া বর্ষার জলপ্লাবনে স্ফীত হইয়া পরিখাভ্যন্তরস্থ অনেক ভূভাগ সলিলাবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল। ঐ ঝিলকে এক্ষণে বকাইয়ের দাঁড়া কহে। পরিখার পার্শ্বে মৃৎপ্রাচীর ও বুরুজ নির্মাণ করিযা তাহাতে প্রায় একশতটি কামান সুসজ্জিত করা হইয়াছিল।[৫] মুর্শিদাবাদ হইতে বিহারে গমন করিতে হইলে, তৎকালে একমাত্র সুপ্রসিদ্ধ বাদশাহী সড়ক দিয়া যাইতে হইত। উক্ত সড়ক অষ্টাদশ শতাব্দীতে গঙ্গার তীরেই অবস্থিত ছিল। কিন্তু উধূয়ার দক্ষিণ ও ফুদ্‌কিপুর নামক গ্রামের উত্তর হইতে তাহার আর একটি শাখা প্রথমে দক্ষিণ-পশ্চিম, পরে পশ্চিম, অবশেষে উত্তর-পূর্ব মুখে উধূয়ার পর্বতশ্রেণীর নিকট দিয়া রাজমহলে গঙ্গাতীরস্থ প্রধান সড়কের সহিত মিলিত হয়। রেনেলের জঙ্গলতেরাই বিভাগের মানচিত্র হইতে এই বাদশাহী সড়কের সুন্দর অবস্থান বুঝা যায়। মীর কাসেমের শিবির এই উভয় সড়কই অধিকার করিয়া অবস্থিত ছিল। উধূয়ানালা উক্ত সড়ককে বিভক্ত করায়, নবাব কয়েক মাস পূর্বে উধূয়ানালার উপর ইষ্টক ও প্রস্তর দ্বারা এক সেতু নির্মাণ করিয়া রাখেন।[৬] নবাবসৈন্যেরা এই সেতুকে অত্যন্ত সুরক্ষিত করিয়াছিল।

গিরিয়ার পরাজয়বার্তা শ্রবণ করিয়া মীর কাসেম আরাটুন্ নামে একজন আর্মেনীয়ের অধীন ইউরোপীয় রণকৌশলে শিক্ষিত ৪ হাজার সৈন্য ও দেশীয় সেনাপতি মীরনজফ খাঁ, মীরহেম্মত আলি ও মীরমেহেদী খাঁ প্রভৃতির অধীন ১২ হাজার অশ্বারোহী,

৫ Broome's Bengal Army, p. 382.

৬ Mutaqherin Vol. II, p. 266.

পদাতি ও গোলন্দাজ সৈন্য উধূয়ানালায় পাঠাইয়াছিলেন।[৭] গিরিয়া হইতে পরাজিত সমরু, মার্কার, আসাদউল্লা প্রভৃতির অধীন সৈন্যসমূহ তাহাদের সহিত যোগ দিয়া ৪০ সহস্রেরও অধিক করিয়া তুলে।[৮] মেজর আডাম্‌স গিরিয়াতে দুই দিন বিশ্রাম করিয়া, ৪ঠা আগস্ট উধূয়ানালা অভিমুখে অগ্রসর হইয়া, ১১ই উধূয়া হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্বে ফুদ্‌কিপুর নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করেন।[৯] ইংরেজদিগের দক্ষিণে গঙ্গা ও বামে ঝিল বা বকাইয়ের দাঁড়া ছিল। ইংরেজরা পরিখা খনন করিয়া তথায় বুরুজ নির্মাণ করেন। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন যে, মেজর আডাম্‌সকে তিন সপ্তাহ কাল বুরুজাদি নির্মাণে ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল। চতুর্বিংশতিতম দিবসে তিনি তিনটি বুরুজ হইতে নবাব-শিবির লক্ষ্য করিয়া গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাহাতে নবাব-শিবিরের কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই।[১০] কেবল নদীর সন্নিহিত প্রবেশ-পথের নিকট পরিখা-প্রাচীর অতি সামান্যভাবে ভগ্ন হইয়াছিল।

উধূয়ানালায় ইরেজদিগের সহিত নবাবসৈন্যের প্রকৃত যুদ্ধ হয় নাই। ইংরেজেরা নবাবশিবির ভেদ করিতে সহস্র চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হইতে না পারিয়া, অবশেষে চতুরতা অবলম্বনপূর্বক শিবিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আমরা ক্রমে তাহার উল্লেখ করিব। তৎপূর্বে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে; ঘটনাটি ব্রুম, ম্যালিসন প্রভৃতি ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন নাই। উধূয়ার সুন্দর অবস্থান দেখিয়া মীর কাসেমের সেনাপতিগণ নির্ভীকচিত্তে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সুরাপানে বিভোর হইয়া নর্তকীবৃন্দের কণ্ঠসঙ্গীত শ্রবণে শিবিরমধ্যে রজনীযাপন করিতেন।[১১] কিন্তু মীরনজফ খাঁ নিশ্চিন্ত না থাকিয়া অনুসন্ধানে অবগত হইলেন যে, পরিখার যে-অংশ পর্বতশ্রেণীর সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহার নিকটে ঝিলের একটি স্থানের জল নাতিগভীর হওয়ায়, তাহা অনায়াসে অতিক্রম করিয়া ইংরেজশিবিরে যাওয়া যাইতে পারে। নজফ খাঁ কতকগুলি সুশিক্ষিত সৈন্য লইয়া ঝিলের সেই অল্পগভীর স্থানটি পার হইয়া, ইংরেজ শিবির আক্রমণ করিলেন। তৎপূর্বেই বৃদ্ধ নবাব

৭. Malleson's Decisive Battles of India, p. 166.

৮ Broome's Bengal Army, p. 382.

৯ এই ফুদ্‌কিপুরকে Broome ও Malleson Palkipur বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। উধূয়ার নিকট পাল্কীপুর নামে কোন গ্রাম নাই, এবং ফুদ্‌কিপুরে যে ইংরেজদিগের শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছিল, ইহার নিকটে কাঁঠালবাড়ী নামক স্থানে অদ্যাপি তাহার চিহ্ন বিদ্যমান থাকাই তাহার প্রমাণ। রেনেলের মানচিত্রে Futkipur আছে। মুদ্রাকরপ্রমাদ অথবা লিপিকরপ্রমাদবশতঃ Futkipur স্থলে Palkipur হইয়াছে।

১০ Malleson, p. 167.

১১ Mutaqherin Vol. II, p. 271.

মীরজাফর ইংরেজদিগের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। নজফ খাঁর আক্রমণে তিনি ভীত হইয়া, গঙ্গাবক্ষে নিজ নৌকায় পলায়ন করেন। তাঁহার নৌকা নদীগর্ভে নিমগ্ন হওয়ার উপক্রম হইলে, ইংরেজেরা কতকগুলি তেলিঙ্গাকে তাঁহার সাহায্যের জন্য পাঠাইয়া দেন। নজফ খাঁ ইংরেজশিবির লুণ্ঠনপূর্বক অনেক দ্রব্য লইয়া আপনাদিগের সুরক্ষিত শিবিরে প্রত্যাগত হন।[১২] তিনি আরও দুই-এক বার ইংরেজ শিবির আক্রমণ করিলে, ইংরেজেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া কোন্ পথ দিয়া তিনি উপস্থিত হন, তাহার আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইলেন।

সহসা এক সুযোগ হইল। একটি ইংরেজ সৈন্য কোন কারণে কোম্পানীর কার্য হইতে বিতাড়িত হওয়ায়, মীর কাসেমের সৈন্যদিগের সহিত যোগ দেয়। এক্ষণে সে আবার বিশ্বাসঘাতকতা অবলম্বন করিয়া, ইংরেজদিগের আক্রমণের সুযোগ বলিয়া দিবার জন্য ইংরেজশিবিরে উপস্থিত হইল। সে সেই ঝিল পার হওয়ার পথ জানিত। ইংরেজেরা তাহার পূর্ব অপরাধের ক্ষমা করিয়া, তাহাকে অভয় প্রদান করিলেন। পরে তাহার পরামর্শানুসারে অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা নবাবশিবির আক্রমণে উৎসুক হইলেন।

১৭৬৩ খ্রীঃ অব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর ও হিজরী ১১৭৭ অব্দের ২৬শে সফর রাত্রিশেষে ইংরেজসৈন্য জম্বুকবৃত্তি অবলম্বনপূর্বক উধুয়ানালার শিবির আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়। কাপ্তেন আর্ভিং-এর অধীন একদল সৈন্য ঝিল পার হইয়া এবং কাপ্তেন মোরানের অধীন আর এক দল সৈন্য পরিখা অভিমুখে গমন করিয়া, বিপক্ষদিগকে কৃত্রিম আক্রমণে ভীত করিবার জন্য যাত্রা করিল। আবশ্যক হইলে, মোরান উক্ত কৃত্রিম আক্রমণকে প্রকৃত যুদ্ধে পরিণত করিবার জন্য আদিষ্ট হইলেন। আর একদল সৈন্য মেজর গবর্নরের অধীনতায় তাঁহাদের সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। অবশিষ্ট সৈন্য শিবিররক্ষায় নিযুক্ত থাকিল। আর্ভিং ঝিল পার হওয়ার চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু রাত্রিকালে সেই অল্পগভীর স্থানের নির্ণয় করিতে তাঁহার সৈন্যদিগকে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। তাহারা অনেক কষ্টে ঝিল অতিক্রম করে। কিন্তু নবাবসৈন্য এ বিষয় জানিতে পারিলে, তাহাদিগকে চিরদিনের জন্য ঝিলের জলে বিশ্রামলাভ করিতে বাধ্য করিত। আর্ভিং-এর অধীন ইংরেজসৈন্যগণ ক্রমে ক্রমে প্রাচীরের তলে আসিয়া উপস্থিত হইল। তথায় যে-সমস্ত প্রহরী ছিল, তাহাদিগকে বেয়নেট দ্বারা মৃত্যুমুখে পতিত করিয়া, তাহারা প্রাচীরের উপরে উঠিয়া বসিল। এই সময়ে নবাবসৈন্যগণ জাগরিত হইয়া, ব্যাপার অনুসন্ধান করিতে না করিতে, ইংরেজসৈন্যগণ পীরপাহাড় অধিকার করিয়া লইল। সহসা মশাল প্রজ্বালিত হইয়া, অন্ধকারময়ী রজনীকে আলোকময়ী করিয়া তুলিল। এই সময়ে মোরানের

১২ Mutaqherin, Vol. II, p. 272 নজফ খাঁর আক্রমণ পলাশীতে মোহনলালের আক্রমণের ন্যায় ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ-কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে।

কামানও গর্জন করিয়া উঠিল। মোরানের সৈন্যগণ সেই কামানের ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া, নদীর সন্নিহিত প্রবেশপথের নিকট ইংরেজদিগের কৃত ভগ্নাংশের নিকট উপস্থিত হইল ; পরে অনেক কষ্টে পরিখা পার হইয়া প্রাচীরের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল।

যদি মীর কাসেমের সৈন্যেরা সামান্যমাত্রও সতর্কতা অবলম্বন করিত, তাহা হইলে মোরান কদাচ পরিখা পার হইয়া প্রাচীরে উঠিতে পারিতেন না। মোরানের সৈন্যেরা পীরপাহাড় হইতে অবতীর্ণ আর্ভিং-এর সৈন্যের সহিত করমর্দন করিয়া, নবাবশিবির-ধ্বংসে প্রবৃত্ত হইল। নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ইংরেজ-কামানধ্বনি উধূয়ার পর্বত-শ্রেণীকে বিকম্পিত করিয়া তুলিল ; গঙ্গাসলিলরাশি আন্দোলিত হইয়া তীরে আঘাত করিতে লাগিল। রজনীর অন্ধকার ভেদ করিয়া, মেঘবক্ষ সৌদামিনীর ন্যায় কামান ও বন্দুক হইতে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল ; নবাবসৈন্যগণ যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইবার অবকাশ পর্যন্ত পাইল না ; তাহাদের কিয়ৎসংখ্যক সৈন্য উধূয়ানালার পরপারে সেতুর নিকট দণ্ডায়মান হইয়া, ক্রমাগত ইংরেজাধিকৃত আপনাদিগের শিবির লক্ষ্য করিয়া গোলাবৃষ্টি করিতেছিল। যে উধূয়া পার হওয়ার চেষ্টা করিল, সে অমনি নালাগর্ভে নিমজ্জিত হইল। নবাব-সৈন্যগণ যতক্ষণ পারিল, ইংরেজ-সৈন্যের সহিত যুদ্ধে একে একে প্রাণ বিসর্জন দিল। এই আক্রমণে নবাবপক্ষের প্রায় ১৫ হাজার সৈন্য বিনষ্ট হয় ; তাহাদের অনেকগুলি কামানও ইংরেজেরা হস্তগত করেন। ৫ই সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে সাতটার সময় সমস্ত শিবির ইংরেজদিগের অধিকৃত হইয়া যায়। সমরু ও মার্কারের সৈন্যেরা ইংরেজদিগকে বাধা দিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারে নাই। তাহারা অবশেষে উধূয়া পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। ইংরেজেরা উধূয়া হইতে রাজমহলে উপস্থিত হইয়া, পরে মুঙ্গের অভিমুখে যাত্রা করেন। মীর কাসেম ইতিপূর্বে মুঙ্গের পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহার মুঙ্গের পরিত্যাগের পূর্বে জগৎশেঠ-প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে গঙ্গাজলে নিমজ্জিত করিয়া বধ করা হয়। মীর কাসেম পলায়ন করিয়া প্রথমে অযোধ্যার নবাব সুজা উদ্দৌলার শরণাপন্ন হন ; সুজা উদ্দৌলা পরে মীর কাসেমের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ায়, মীর কাসেম তাঁহার আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া, বঙ্গরাজ্যের পুনরধিকারের আশা বিসর্জন দিয়া, রোহিলখণ্ড অভিমুখে পলায়ন করেন।

এইরূপে উধূয়ানালায় মীর কাসেমের সমস্ত সৈন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পলাশী ও উধূয়ানালা এই দুই স্থানে বাঙ্গলার মুসলমান-গৌরব চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হয়। দুঃখের বিষয়, এই দুই স্থানেই বিশ্বাসঘাতকতা ও চাতুরীর সাহায্যে ইংরেজেরা জয় লাভ করিয়াছিলেন। পলাশী অপেক্ষা উধূয়ানালা আক্রমণে ইংরেজদিগের সাহসের কিঞ্চিৎ প্রশংসা করা যাইতে পারে ; কিন্তু সে সাহসপ্রদর্শনের মূল নবাবসৈন্যের অসতর্কতা। ইংরেজেরা যেরূপ অসমসাহসিকতা অবলম্বন করিয়া উধূয়ানালার শিবির আক্রমণ করিয়াছিলেন, যদি নবাবসৈন্যের একজনমাত্রও সতর্ক থাকিত, তাহা হইলে, তাঁহাদিগকে উধূয়াপর্বতপ্রান্তস্থিত ঝিলজলে চিরদিনের জন্য নিমজ্জিত হইয়া থাকিতে

হইত। আবার, এই অসমসাহসিকতা একজন বিশ্বাসঘাতকের মন্ত্রণার উপর নির্ভর করিয়াছিল। ইংরেজসৈন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, এই অসমসাহসিকতা প্রদর্শন করে নাই। যদি সেই বিশ্বাসঘাতক ইংরেজশিবিরে উপস্থিত না হইত তাহা হইলে, ইংরেজদিগের সাহসের পরিচয় বিঘোষিত হইত কিনা, তাহা কে বলিতে পারে? সুতরাং একজন বিশ্বাসঘাতকের মন্ত্রণানুসারে এরূপ সাহসপ্রদর্শন যে সমধিক প্রশংসনীয়, এ কথা আমাদের মনে স্থান পায় না।

উধূয়ানালার যুদ্ধকে প্রকৃত যুদ্ধও বলা যাইতে পারে না। যদিও নবাবসৈন্যগণ ইংরেজসৈন্য-কর্তৃক শিবিরমধ্যে আক্রান্ত হইয়া কিছুক্ষণ পর্যন্ত প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু তাহা আত্মরক্ষার নিমিত্তই বলিতে হইবে। তাহার মধ্যে অনেকে অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিবার অবকাশ পর্যন্ত পায় নাই। সুতরাং এরূপ যুদ্ধকে একটি প্রধান যুদ্ধ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে না। মীর কাসেমের সহিত ইংরেজদিগের শেষ যুদ্ধ গিরিয়াতেই হইয়াছিল। উধূয়ানালার যুদ্ধকে প্রকৃত যুদ্ধ না বলিয়া, বরং ইংরেজসৈন্য-কর্তৃক নবাবশিবির আক্রমণই বলা যুক্তিযুক্ত। ইংরেজদিগের অসাধু ব্যবহারের জন্য যেমন পলাশীর যুদ্ধ ঘটে, উধূয়ানালা-যুদ্ধের পূর্বকারণও তাহাই। ইংরেজদিগের কৃত অবমাননায় ও অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া, মীর কাসেমকে অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। তিনি ইংরেজদিগের অসদ্ব্যবহারে এতদূর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, কোন দেশীয় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, মীর কাসেম কোন নির্দিষ্ট দিবসে যেখানে যত ইংরেজ ছিল, তাহাদিগের মস্তকচ্ছেদন করিবার জন্য স্বীয় কর্মচারীদিগকে আদেশ দিয়াছিলেন।[১৩] কিন্তু তৎকালে ভাগ্য ইংরেজদিগের যেরূপ সহায় ছিল, তাহাতে মীর কাসেমের শতচেষ্টা কার্যে পরিণত হইতে পারে নাই। তিনি স্বীয় সৈন্যদিগকে ইউরোপীয় রণকৌশলে সুশিক্ষিত করিয়াও ইংরেজদিগের ক্ষমতা হ্রাস করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহার ইউরোপীয় কর্মচারিগণের যথেচ্ছ ব্যবহারে এবং তাঁহার দেশীয় কর্মচারিগণের সাহসাভাব ও বিলাসিতার জন্য তাঁহার অধিকাংশ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। বিশেষতঃ তাঁহার কোন কোন সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতা তাঁহার অনেক কার্যের বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তাঁহার নিজের এক মহাদোষ ছিল যে, তিনি প্রায়ই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতেন না। যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিলে, সৈন্যদিগের যে দ্বিগুণ উৎসাহ হয়, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই।

কোন ইংরেজ লেখক লিখিয়াছেন যে, যদি মীর কাসেমের অধীন সেনাপতিগণ আপনাদিগের সাহসের খর্বতা না দেখাইত, অথবা তিনি সমরক্ষেত্রে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া স্বীয় সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিতে চেষ্টা পাইতেন, তাহা হইলে সে সময় হইতে বঙ্গরাজ্যে ইংরেজদিগের যে সামান্যমাত্র ভূভাগও থাকিত না, তাহা অনেকটা

১৩ Riyaz-us-salatin, p. 382.

নিঃসন্দেহরূপে বলা যাইতে পারে।[১৪] মীর কাসেম হইতে মুর্শিদাবাদ বা বাঙ্গলার মুসলমান-স্বাধীনতা চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হয়।

উধূয়ানালার যে-স্থানে ইংরেজেরা মীর কাসেমের সৈন্যদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, অদ্যাপি সে স্থান সমভাবেই বিরাজ করিতেছে। সেইখানে একখানি নূতন গ্রাম স্থাপিত হইয়াছে ; তাহার নাম উধূয়া। পূর্বে সেই পর্বতময় স্থানে কোন গ্রাম ছিল না ; কিন্তু তথায় একটি প্রাচীন দুর্গ ছিল। এই উধূয়া গ্রামের নিকটে উধূয়ানালা গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে ; কিন্তু বর্ষাকাল ব্যতীত অন্যসময়ে ফুদ্‌কিপুর পর্যন্ত উধূয়ানালার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে উধূয়ানালা যে-স্থানে প্রবাহিত ছিল, এক্ষণে প্রায়ই সেইরূপ ভাবেই আছে। বকাইয়ের দাঁড়ার সহিত উধূয়ানালা মিলিত হইয়াছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে-স্থানে মিলিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা হইতে উত্তর-পশ্চিম দিকে মিলিত হইয়াছে। বর্তমান ফুদ্‌কিপুর উধূয়া হইতে প্রায় এক ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্বে। কিন্তু যে-স্থানে ইংরেজ শিবির সন্নিবেশিত হইয়াছিল, তাহা বর্তমান ফুদ্‌কিপুর হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে। সেই স্থানকে এক্ষণে কাঁঠালবাড়ী কহে। কাঁঠালবাড়ীর পশ্চিমে পাহাড়পুর নামক স্থানে ইংরেজশিবির সন্নিবেশিত হয়। অদ্যাপি তথায় পরিখার চিহ্ন আছে। ফুদ্‌কিপুর প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া তৎসন্নিহিত ক্ষুদ্র পল্লীগুলিও ফুদ্‌কিপুর নামে অভিহিত হইত। ফুদ্‌কিপুর গ্রামের কিছু কিছু স্থান পরিবর্তিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

উধূয়াগ্রামের পূর্বে ও উত্তরে গঙ্গা। যে একক, বিচ্ছিন্ন পাহাড়টি নবাব-শিবিরের রক্ষাস্তম্ভরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল, যাহার দুই পার্শ্ব হইতে একদিকে গঙ্গা ও অন্যদিকে দূরস্থিত পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত পরিখা বিস্তৃত হইয়াছিল, সেই পীরপাহাড় অদ্যাপি সমভাবে বিরাজ করিতেছে। এই পীরপাহাড়ে কিছুকাল পূর্বে একটি দরগা স্থাপিত

---

১৪ "And had not his (Mir Cossim's) subordinate commanders proved deficient in personal courage, or even had he himself had the bravery to animate his troops properly by his own presence in the field, it is more than probable that, the English Company would have been left, from that day without a single foot of ground in these provinces." (Bolts, Consideration on Indian Affairs, p. 43.)

মীর কাসেমের যুদ্ধক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকা সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে, তাঁহার বিশ্বাসঘাতক সোনাপতিগণ পাছে অন্যান্য নবাবের ন্যায় তাঁহাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করে, এইজন্য তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতে সাহসী হইতেন না। "Nor did he hazard his own person in any engagement, where his officers might have made a merit of their treachery in betraying him. These erros which had ruined so many of the Indian princes he carefully avoided." (Transactions in India, p. 46.) অবশ্য এরূপ আশঙ্কা তাঁহার মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু সে বিষয়ে বিশিষ্টরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া তাঁহার যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকাই উচিত ছিল।

হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার অস্তিত্ব নাই; তবে তাহার কিছু চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। মীর কাসেমের বুরুজ ও মৃৎপ্রাচীরের চিহ্ন অদ্যাপি স্থানে স্থানে বিদ্যমান আছে। পরিখা প্রায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু চিহ্ন একেবারে লুপ্ত হয় নাই। প্রসিদ্ধ বাদশাহী সড়ক এক্ষণেও গঙ্গার নিকট ও পর্বতশ্রেণীর নিম্ন দিয়া গিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর সড়কের কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এক্ষণে মুর্শিদাবাদ হইতে রাজমহল অভিমুখে যাইতে হইলে, পীরপাহাড় বর্তমান সড়কের দক্ষিণ দিকে পড়ে। উহা হইতে উত্তর-পশ্চিমে কিছু দূরে দুই-একটি ক্ষুদ্র পাহাড় আছে; তাহাদের নাম ডুমুরী ও বাঘপিঞ্জরা পাহাড়; ইহার নিম্ন দিয়া বর্তমান সড়ক চলিয়া গিয়াছে। ডুমুরী পাহাড় নবাব-শিবিরের অন্তর্গত ছিল। ডুমুরী পাহাড়ের দক্ষিণে কিছুদূরে কয়েকটি ক্ষুদ্র পাহাড় দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাদিগকে চাতরাডিহি পাহাড় বলে। ডুমুরীর পশ্চাৎ দিয়াই বর্তমান উধুয়ানালা প্রবাহিত। ডুমুরীর নিকটেই বকাইয়ের দাঁড়ার সহিত উধুয়ানালা মিলিত হইয়াছে। ইহার নিকটেই নালার উপরে একটি সেতু। এই সেতুই অষ্টাদশ শতাব্দীতে মীর কাসেম কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল এবং ইহাই সেই যুদ্ধকালীন সেতু। এক্ষণে তাহা ভগ্ন হইয়া গিয়াছে; বর্ষাকালীন উধুয়ার খরস্রোত তাহা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। উধুয়ার একটি তীরে তাহার কতক চিহ্ন আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই সেতু হইতে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড বিচ্যুত হইয়া উধুয়াগর্ভে পতিত হইয়াছে; জলাপসরণে সেই সমস্ত প্রস্তরখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। এখন তাহার যেরূপ চিহ্ন আছে, তাহা দেখিয়া কিরূপ সুদৃঢ়ভাবে উক্ত সেতু নির্মিত হইয়াছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। সেই সেতু হইতে উত্তর-পূর্ব দিকে আর একটি সেতু দেখিতে পাওয়া যায়; তাহারও অনেকাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; অবশিষ্টাংশ অদ্যাপি বিরাজ করিতেছে। ইহা পূর্বোল্লিখিত সেতুর ধ্বংসের পর নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যে-স্থান দিয়া ইংরেজেরা প্রথমে কামান দাগিয়াছিলেন, সেস্থানও লোকে নির্দেশ করিয়া থাকে। এক্ষণে তাহাকে জঙ্গলপাড়া কহে। চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া উধুয়া-শিবির আক্রমণ করার কথা ইহার নিকটস্থ স্থানীয় লোকেরা অবগত আছে। ফুদ্‌কিপুর বা কাঁঠালবাড়ীর যে-স্থানে ইংরেজদিগের পরিখা ও বুরুজ নির্মিত হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহাদের চিহ্ন বর্তমান আছে। মীর কাসেমের পরিখা অপেক্ষা ইংরেজদিগের পরিখা অনেক স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। উধুয়ার ভূমি খনন বা কর্ষণ করিলে মধ্যে মধ্যে গোলাগুলি পাওয়া গিয়া থাকে।[১৫]

---

১৫ উধুয়াতে Atkinson Brothers কোম্পানীর একটি পাথরের কুঠি আছে; এই কুঠিতে উধুয়া হইতে যুদ্ধকালীন অনেকগুলি বড় ও ছোট গোলাগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। তথায় একটি তিন হাত দীর্ঘ কামানও সংগৃহীত আছে। অনেকে তাহা মীর কাসেমের কারখানার কামান মনে করিয়া থাকেন। গিরিয়াতেও অনেক গোলাগুলি পাওয়া যায়।

উধুয়ার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব চমৎকারজনক ; বিশেষতঃ বর্ষাকালে ইহা পরম-রমণীয় রূপ ধারণ করে। উধুয়ানালাও গঙ্গাজলে পরিপূর্ণ হইয়া অপূর্ব শোভা বিস্তার করিয়া থাকে। সেই সময় সমস্ত বিল ও জলাভূমি জলে পরিপূর্ণ হইয়া যায় ; অনেক জলচর পক্ষী আসিয়া কলরবে উধুয়াকে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলে। পাহাড়-শ্রেণীর উপরিভাগে বৃক্ষরাজি বর্ষাসলিলস্নাত শ্যামল পত্ররাশিতে সুশোভিত হওয়ায় দূর হইতে বড়ই রমণীয় বলিয়া বোধ হয়। তৎকালে পীরপাহাড় বা ডুমুরীপাহাড় প্রভৃতির উপর আরোহণ করিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মনঃপ্রাণ মোহিত হইয়া যায়। একদিকে উধুয়ানালা খরবেগে প্রবাহিত হইতেছে, অপর পার্শ্বে গঙ্গা উত্তাল তরঙ্গমালা দ্বারা তীরে আঘাত করিতেছেন। চারিদিকে বসুন্ধরা বর্ষার জলপ্লাবনে আপনাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছেন। নানাবিধ পক্ষী মধুর তানে চতুর্দিক মুখরিত করিয়া শূন্যপথে বিচরণ করিতেছে। বর্ষার নূতন জলে অঙ্কুরিত পর্বতগাত্রস্থিত তৃণরাশিমধ্যে গো, মহিষ দলে দলে বিচরণ করিতেছে। এইরূপ নানাবিধ সুন্দর দৃশ্য নয়নপথে পতিত হয়। উধুয়ায় নানাবিধ জলচর পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। সাহেবেরা শিকার করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে উধুয়ায় আগমন করিয়া থাকেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বিভূষিত হইয়া ঐতিহাসিক স্মৃতির সহিত বিজড়িত হওয়ায়, উধুয়া রাজমহল প্রদেশের একটি দর্শনীয় স্থানমধ্যে গণ্য।

বড়নগর

যাঁহার পবিত্র চরণস্পর্শে বঙ্গভূমি পবিত্রীকৃত হইয়াছিল, যাঁহার নামোচ্চারণে বঙ্গের গৃহে গৃহে পুণ্যের লহরী প্রবাহিত হয়, বঙ্গের অসংখ্য নরনারী যাঁহাকে দেবতাবোধে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া থাকে, সেই ব্রাহ্মণ-প্রতিপালিনী, দীন-জননী, সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা-রূপিনী মহারানী ভবানীর সহিত মুর্শিদাবাদের সম্বন্ধ নিতান্ত অল্প ছিল না। যিনি বঙ্গভূমিতে হিন্দু-ধর্ম ও ব্রাহ্মণরক্ষার জন্য প্রকৃত ভবানীরূপে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন, যিনি লক্ষ লক্ষ দীনদুঃখীর অশ্রুজল স্নেহাঞ্চলে মুছাইয়া দিয়াছিলেন, বঙ্গদেশ হইতে সুদূর কাশীধাম পর্যন্ত স্থান যাঁহার অক্ষয় পুণ্যকীর্তির ঘোষণা করিতেছে, মুর্শিদাবাদও তাঁহার সেই পুণ্যচ্ছায়ায় অদ্যাপি স্নিগ্ধ হইয়া আছে। আজিও মুর্শিদাবাদের বড়নগর তাঁহার সেই অতুলনীয় দেবভক্তির কিছু কিছু পরিচয় প্রদান করিতেছে। অরণ্যসম বড়নগরে উপস্থিত হইলে, আজিও ভবানীর সেই পুণ্যকীর্তির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। বড়নগর তাঁহার অতীব প্রিয় বাসস্থান ছিল; তথায় তিনি জীবনের শেষ ভাগ অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বড়নগরের ভাগীরথীতীরেই তাঁহার পুণ্যময় জীবনদীপ চিরনির্বাপিত হয়। তাই বড়নগর হিন্দুর পক্ষে বড় আদরের সামগ্রী; একরূপ তীর্থস্থান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যেখানে মূর্তিমতী অন্নপূর্ণা মহারানী ভবানীসহ মহামিলনে চিরসম্মিলিত হইয়াছিলেন, তাহা হিন্দুর নিকট তীর্থস্থান ব্যতীত আর কি হইতে পারে? তাই বড়নগরের প্রত্যেক অণুপরমাণু আমাদের নিকট মহাপবিত্র বলিয়া বোধ হয়। সেই তীর্থস্থানে মহারানী ভবানীদেবীর স্থাপিত দেব-মন্দিরসমূহ আজিও বর্তমান থাকিয়া তাহার পবিত্রতা রক্ষা করিতেছে। মুর্শিদাবাদে সমাগত প্রত্যেক হিন্দুর সেই পবিত্র তীর্থস্থান দর্শন করা সর্বতোভাবে বিধেয়।

বড়নগর মুর্শিদাবাদের বারাণসী। ইহার চারিদিকই দেবমন্দিরে পরিপূর্ণ। যদিও এক্ষণে তাহা ঘোর অরণ্যে আবৃত হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি দুই-চারি পদ অগ্রসর হইতে না-হইতে একটি-না-একটি দেবমন্দির দৃষ্টিপথে পতিত হইবেই হইবে। মুর্শিদাবাদের অন্য কোন স্থানে এত দেবমন্দির দেখিতে পাওয়া যায় না। বারাণসীতে উপস্থিত হইলে, যেমন প্রত্যেক হিন্দুর মনে এক অনির্বচনীয় শান্ত ভাবের উদয় হয়, মুর্শিদাবাদবাসী ও প্রবাসী হিন্দুদিগের মনে বড়নগরও সেইরূপ শান্ত ভাবের সঞ্চার করিয়া থাকে। বারাণসীর ন্যায় ইহারও পদপ্রান্ত দিয়া পুণ্যসলিলা ভাগীরথী আপনার পবিত্র দেহে তরঙ্গ তুলিয়া প্রবাহিতা হইতেছেন; বারাণসীর ন্যায় বড়নগরের দেবমন্দিরসমূহের শঙ্খঘণ্টারোলে তাঁহার তরঙ্গলহরীও নৃত্য করিয়া উঠে। মহারানী ভবানীর স্থাপিত ভবানীশ্বর শিব বিশ্বেশ্বর ও রাজরাজেশ্বরী দেবী অন্নপূর্ণারূপে বিরাজ করিতেছেন। ভবানীর পুণ্যবতী কন্যা তারার স্থাপিত গোপালমূর্তি বিন্দুমাধবের ও অষ্টভুজ গণেশ ঢুণ্ঢিরাজের স্থল অধিকার করিয়াছেন, এরূপ বলা যাইতে পারে। অন্নপূর্ণার ন্যায় রাজরাজেশ্বরীর ভবন হইতে কোন ক্ষুধার্তই প্রত্যাবৃত্ত হয় না। এই

মুর্শিদাবাদ-কাশী শ্রীহীন ও অরণ্যসম হইলেও আজিও এমন এক পবিত্রতার ধারা ঢালিয়া দেয় যে, তাহাতে সমস্ত অন্তরাত্মা আপ্লুত হইয়া যায়। বৃহৎ বৃহৎ অশ্বত্থ বট প্রভৃতি বৃক্ষাদি দূরব্যাপী শাখাবিস্তারপূর্বক অর্ধভাগীরথীকে ছায়াময়ী করিয়া, বড়নগরকে যেন তপোবনতুল্য করিয়া রাখিয়াছে। যাঁহারা শান্তিপ্রয়াসী, তাঁহারা এই শান্তিনিকেতনে উপস্থিত হইলে, অনায়াসেই মহাশান্তি লাভ করিতে পারিবেন।

বড়নগর ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে এবং বর্তমান আজিমগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন হইতে প্রায় অর্ধক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। বড়নগর পূর্বে সুবিস্তৃত রাজশাহী জমিদারীর রাজধানী ছিল। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর দিন পর্যন্ত বড়নগর মুর্শিদাবাদের একটি প্রধান বাণিজ্যস্থান ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে যে-সমস্ত প্রধান প্রধান আড়ঙ্গ ছিল, বড়নগর তাহাদের মধ্যে অন্যতম।[১] এই সমস্ত আড়ঙ্গে ইউরোপীয়-গণের দালাল-গোমস্তারা প্রতিনিয়তই গতায়াত করিত। বড়নগরের পিত্তল, কাঁসার দ্রব্য অতীব উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। বড়নগরের ঘড়ার কথা বঙ্গবাসীমাত্রেই বিশেষ করিয়া জানিত। এখানে এত অধিক কাংস্যবণিকের বাস ছিল যে, রজনীর শেষভাগে তাহাদিগের বাসন-নির্মাণের শব্দে সমস্ত গ্রামের লোকের নিদ্রাভঙ্গ হইত। এজন্য রাজা বিশ্বনাথের মহিষী রানী জয়মণি বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার আর নহবত রাখিবার প্রয়োজন হইবে না। মুর্শিদাবাদের খাগড়া প্রভৃতি স্থানের অধিকাংশ কাংস্য-বণিকের বাসস্থান পূর্বে বড়নগরেই ছিল। রেনেলের কাশিমবাজার দ্বীপের মানচিত্রে বড়নগরের প্রাধান্য প্রতিপাদনের জন্য তাহার নাম বৃহদক্ষরে লিখিত হইয়াছে। বড়নগর তৎকালীন মুর্শিদাবাদের একরূপ প্রান্তদেশে অবস্থিত ছিল; অষ্টাদশ শতাব্দীর মুর্শিদাবাদ প্রায় বড়নগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাজা উদয়নারায়ণের ধ্বংসের পর রাজশাহী জমিদারী নাটোর রাজবংশের করায়ত্ত হইলে, বড়নগর তাঁহাদের মুর্শিদাবাদের বাসস্থানরূপে নির্দিষ্ট হয়; রাজধানী মুর্শিদাবাদে তৎকালে বঙ্গের প্রায় সমস্ত জমিদারদিগেরই এক-একটি বাসস্থান ছিল। বিশেষতঃ নাটোররাজবংশের আদিপুরুষ রঘুনন্দন মুর্শিদাবাদে নায়েব-কাননগোর কার্য করিতেন বলিয়া, তাঁহাকে মুর্শিদাবাদেই থাকিতে হইত। রঘুনন্দন প্রথমতঃ পুঁটিয়া রাজসংসারে সামান্য কর্মে নিযুক্ত হন; পরে পুঁটিয়ার রাজা দর্পনারায়ণ তাঁহাকে পুঁটিয়ার উকীল নিযুক্ত করিয়া, প্রথমে ঢাকায় নবাবদরবারে পাঠাইয়া দেন; তথা হইতে তিনি মুর্শিদকুলি খাঁর সহিত মুর্শিদাবাদে আগমন করেন। রঘুনন্দন স্বীয় বুদ্ধিমত্তায় ক্রমে নায়েব-কাননগোর পদ প্রাপ্ত হন এবং মুর্শিদকুলি খাঁর প্রিয়পাত্র হইয়া, তাঁহার অনুগ্রহে অনেক জমিদারী লাভ করেন। এই সমস্ত জমিদারী তাঁহার ভ্রাতা রামজীবনের নামে গৃহীত হইয়াছিল। রামজীবনের পুত্র কুমার কালিকাপ্রসাদ রামকান্তকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন এবং তাঁহার জনককে চৌগ্রাম ও ইস্‌লামাবাদ নামে দুই পরগণার জমিদারী প্রদান করেন। রামজীবনের

১ Long's Selection, p. 63.

মৃত্যুর পর কালু কোঙার অল্পবয়সে পরলোকগত হইলে, রামকান্ত নাটোরের সমস্ত জমিদারী ও ঐশ্বর্যের অধীশ্বর হন। এই রামকান্তের পত্নীই ভারতবিখ্যাতা প্রাতঃস্মরণীয়া মহারানী ভবানী।

রানী ভবানী রাজশাহী জেলার অন্তঃপাতী ছাতিম গ্রামের আত্মারাম চৌধুরীর কন্যা; তাঁহার মাতার নাম জয়দুর্গা।[২] নাটোর রাজসংসারে দয়ারাম নামে একজন তিলিজাতীয় কর্মচারী ছিলেন; তাঁহারই চেষ্টায় নাটোর রাজবংশের অসীম সম্পত্তির সুবন্দোবস্ত হইয়াছিল। দয়ারাম বহুদিন পর্যন্ত নাটোর রাজসংসারে কার্য করিয়াছিলেন। এই দয়ারামই বর্তমান দীঘাপতিয়া রাজবংশের আদি পুরুষ। রামকান্ত বাঙ্গলা ১১৫৩ সালে পরলোকগত হইলে, রানী ভবানী তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়া, বাঙ্গলার জমিদারদিগের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া বসেন। তাঁহার সমস্ত জমিদারী হইতে প্রায় দেড় কোটি টাকা কর আদায় হইত; তন্মধ্যে ৭০ লক্ষ সরকারের রাজস্ব দেওয়া হইত।[৩] অবশিষ্ট প্রায় সমস্তই পুণ্যকার্যে ব্যয়িত হইয়া যাইত। তৎকালে বঙ্গের সমস্ত জমিদারদিগের মধ্যে নাটোরবংশের আয় সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল।

রানী ভবানীর ৩২ বৎসর বয়সে বৈধব্যদশা উপস্থিত হয়। তাঁহার তারা নাম্নী একটিমাত্র কন্যা ছিল। অন্য কোন সন্তান জীবিত ছিল না। অল্পবয়সে বৈধব্য অবস্থায় পতিত হইয়া রানী ভবানী হিন্দু রমণীর অবশ্য কর্তব্য ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। রানী ভবানীর নূতন পরিচয় দিবার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই। দেবসেবা, ব্রাহ্মণসেবা, দীন প্রতিপালন, জলাশয় খনন, বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পুণ্যকার্যের জন্য যাঁহার নাম বঙ্গের গৃহে গৃহে প্রবাদবাক্যের ন্যায় বিরাজ করিতেছে, কাশী গয়া প্রভৃতি তীর্থস্থানসমূহে যাঁহার অক্ষয়কীর্তি দেদীপ্যমান রহিয়াছে, যাঁহার প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তর না পাইলে, তৎকালে কোন ব্রাহ্মণসন্তান ব্রাহ্মণ বলিয়াই গণ্য হইত না, তাঁহার আর নূতন পরিচয় কি দিব? তাঁহার সমগ্র পুণ্যকাহিনী এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের কলেবর ধারণ করিতে কদাচ সমর্থ হইবে না; কেবল বড়নগরের সহিত তাঁহার যে-সমস্ত কীর্তি সংসৃষ্ট, তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

রানী ভবানী রাজশাহী জেলার অন্তর্গত খাজুরাগ্রামনিবাসী রঘুনাথ লাহিড়ী নামে জনৈক ব্রাহ্মণতনয়ের সহিত স্বীয় কন্যা তারার বিবাহ প্রদান করেন; কিন্তু রঘুনাথও অল্পবয়সে তারাকে চিরব্রহ্মচারিণী ও ভবানীর বক্ষে শেল বিদ্ধ করিয়া পরলোকগত হন। রানী ভবানীকে অগত্যা একটি দত্তকপুত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হয়। এই দত্তকপুত্রই বঙ্গের সাধকচূড়ামণি রাজযোগী রামকৃষ্ণ। যিনি রাজা হইয়াও সন্ন্যাসীর

২ বড়নগর অঞ্চলে তিনি কস্তুরী নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন।
৩ Holwell's Interesting Historical Events, Pt. I, p. 192.

ন্যায় আদর্শ জীবন দেখাইয়া গিয়াছেন, রানী ভবানী তাঁহাকেই পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। রামকৃষ্ণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, রানী তাঁহার হস্তে বিষয়ভার অর্পণ করিয়া, বড়নগরে ভাগীরথীতীরে আসিয়া বাস করেন এবং তাহা দেবমন্দিরে ভূষিত করিয়া কাশীতুল্য পবিত্র করিয়া তুলেন। মাতার সঙ্গে ধর্মপ্রাণা মাতার উপযুক্ত কন্যা তারাও গঙ্গাবাসিনী হন। ইহার পূর্বে তাঁহারা মধ্যে মধ্যে প্রায়ই বড়নগরে আসিয়া অনেক দিন পর্যন্ত বাস করিতেন।

তাঁহাদের এক সময়ে বড়নগরে অবস্থানকালের একটি গল্প এতদ্দেশে প্রচলিত আছে। গল্পটির মূল কি, তাহা আমরা অবগত নহি। যে সিরাজউদ্দৌলার নামে বাঙ্গলার অনেক অদ্ভুত গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই সিরাজউদ্দৌলাকে অবলম্বন করিয়াই এই গল্পটিরও উৎপত্তি। ভবানীর কন্যা তারা অত্যন্ত রূপবতী ছিলেন। কথিত আছে, এক দিবস তিনি বড়নগরের প্রাসাদশিখরে স্নানান্তে উন্মুক্তকেশে পাদচারণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে বড়নগরের প্রান্তবাহিনী ভাগীরথীবক্ষ দিয়া সিরাজের সাধের তরণী হাসিতে হাসিতে ভাসিয়া যাইতেছিল। সিরাজ তরণী হইতে তারার অপরূপ রূপলাবণ্যদর্শনে উন্মত্ত হইয়া পড়েন এবং মুর্শিদাবাদে গমন করিয়া, তারাকে হরণ করিবার জন্য কতকগুলি লোকজন পাঠাইবার চেষ্টা করেন। সিরাজের লোকজন আসিবার পূর্বে রানী ভবানী এই হৃদয়বিদারক দুঃসংবাদ অবগত হইয়াছিলেন। ইহাতে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত ও চিন্তিত হইয়া পড়েন। তৎকালে বড়নগরের পরপারে সাধকবাগে মস্তারাম বাবাজী নামে জনৈক রামোপাসক বৈষ্ণবের আখড়া ছিল। সাধকবাগের সে আখড়া অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। বাবাজী রানী ভবানীর নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন। তিনি এই সংবাদ অবগত হইয়া স্বীয় আখড়াস্থিত বহুসংখ্যক রামোপাসক বৈষ্ণবকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়া সিরাজের লোকজনকে বাধা দিবার জন্য বড়নগরে পাঠাইয়া দেন। এই সংবাদ পাইয়া সিরাজ-উদ্দৌলা আর তারাকে হরণ করিতে সাহসী হন নাই। প্রবাদ এই ঘটনাটিকে এতদূর অতিরঞ্জিত করিয়াছে যে, মস্তারাম বাবাজী নাকি তপোবলে বৈষ্ণবসৈন্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন!

এক্ষণে এই গল্পটি সম্বন্ধে আমাদের দুই একটি কথা বক্তব্য আছে। প্রথমতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর বড়নগর বর্তমান বড়নগরের ন্যায় অরণ্যানীসমাবৃত ছিল না, তাহা একটি প্রধান আড়ঙ্গ ছিল; তথায় ইউরোপীয়গণ পর্যন্ত ক্রয়বিক্রয়ার্থে উপস্থিত হইতেন। তৎকালে বড়নগরে লোকের এরূপ বাস ছিল যে, তথায় তিলমাত্র স্থান পড়িয়া থাকিতে পাইত না। সেই বড়নগরে বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা, দিবসে স্নানান্তে প্রাসাদশিখরে সহস্র সহস্র লোকের দৃষ্টিসমক্ষে পাদচারণ করিবেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য কি না? দ্বিতীয়তঃ বড়নগরের প্রাসাদ যেস্থানে অবস্থিত ছিল, অদ্যাপি তাহার কিয়দংশ বিরাজ করিতেছে। গঙ্গাবক্ষ হইতে সে প্রাসাদশিখরের উপরিস্থিত লোক দৃষ্টিগোচর হওয়া সুকঠিন। বিশেষতঃ তৎকালে ভাগীরথী বড়নগর হইতে আরও

দূরে প্রবাহিতা ছিলেন। এরূপ অবস্থায় সিরাজের তরণী হইতে তারাকে দর্শন করার সম্ভাবনা থাকিতে পারে কি না ? তবে যদি সিরাজের দূরবীক্ষণ ব্যবহারের কথা বলা হয়, তাহা হইলে সম্ভব হইতে পারে। তৃতীয়তঃ সিরাজ যদি তারাকে বাস্তবিকই হরণ করিবার ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে যুদ্ধে অশিক্ষিত কয়েকজন বৈষ্ণবের ভয়ে, তিনি স্বীয় লোকজনদিগকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ দিতেন কি না ? যেরূপে হউক, তিনি স্বীয় ইচ্ছাপূরণের জন্য কি চেষ্টা পাইতেন না ? কৃতকার্য হউন বা না হউন, অন্ততঃ চেষ্টা করিতে কি তিনি ক্ষান্ত হইতেন ? সিরাজের চরিত্রহীনতার কথা আমরা বরাবরই বলিয়া আসিতেছি ; সে বিষয়ের সমর্থন করার অধিক আমাদের কিছুই নাই। কিন্তু তাই বলিয়া, তাঁহার নামে যে-সমস্ত প্রবাদ ও গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে, তৎসমুদায় বিশ্বাস করিতে আমরা প্রস্তুত নহি। যে সমুদায় গ্রন্থে সিরাজের চরিত্রহীনতার উল্লেখ দেখা যায়, তাহাদের কোন স্থানে সিরাজ-কর্তৃক কোন ব্যক্তিবিশেষের ধর্ম বা সম্মানহানির উল্লেখ নাই ; কেবল তাঁহার সাধারণ চরিত্রহীনতামাত্রই উল্লিখিত হইয়াছে। যাঁহারা সিরাজের শতনিন্দা করিয়াছেন, কোন সম্ভ্রান্তবংশের প্রতি অত্যাচার করিলে, তাঁহারা কি তাহার উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইতেন ? বরং তাহা তাঁহাদিগের মতেরই পরিপোষক হইয়া উঠিত। তবে এই প্রবাদ যেরূপভাবে বিস্তৃত, তাহাতে ইহার কিছু মূল ছিল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তৎসম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনা কি, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। ঘটনাটি আলিবর্দী খাঁর জীবিতকালে ঘটিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় ; সম্ভবতঃ সিরাজের ঐরূপ কোন ইচ্ছা হইয়া থাকিলেও, আলিবর্দীর জন্য তাহার চেষ্টামাত্রও হয় নাই, ইহাই আমাদের ধারণা। প্রবাদ কিন্তু তাহাকে নানা আকারে পল্লবিত করিয়া তুলিয়াছে। হায় ! এই চরিত্রহীনতার জন্য একমাত্র সিরাজই কেবল নিন্দিত হইয়াছেন, কিন্তু তদপেক্ষা শয়তানপ্রকৃতি কয়জনের নাম বাঙ্গলার এইরূপ প্রবাদকাহিনীর মধ্যে গ্রথিত আছে ?

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, রানী ভবানীর সমস্ত সৎকীর্তির উল্লেখ করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কেবল বড়নগরসংক্রান্ত পুণ্যকীর্তির কথামাত্র উল্লিখিত হইবে। আমরা প্রথমতঃ তাঁহার বড়নগরের দৈনন্দিন ক্রিয়ার উল্লেখ করিতেছি। রানী ভবানী প্রতিদিন রাত্রি চারিদণ্ড থাকিতে গাত্রোত্থান করিয়া জপকার্যে উপবিষ্ট হইতেন ; রাত্রি অর্ধদণ্ড থাকিতে জপ শেষ হইলে, পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিয়া স্বহস্তে পুষ্পচয়ন করিতেন। যেদিন অন্ধকার থাকিত, সেদিন ভৃত্যেরা অগ্রপশ্চাৎ মশাল ধরিয়া যাইত। পুষ্পচয়নের পর প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিয়া, বেলা দুই দণ্ড পর্যন্ত ঘাটে বসিয়া জপ, গঙ্গা-পূজা ও শিবপূজা করা হইত। তাহার পর প্রত্যেক দেবালয়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, গৃহে আগমনপূর্বক পুরাণশ্রবণ, শিবপূজা ও ইষ্টপূজা করিতেন। বেলা দুই প্রহর পর্যন্ত এই সমস্ত কার্যে অতিবাহিত হইত। তাহার পর স্বহস্তে রন্ধন করিয়া দশজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতেন ; অবশেষে পরিবারস্থ ব্রাহ্মণসকলের ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া আড়াই প্রহর বেলার পর স্বয়ং হবিষ্যান্ন আহার করিতেন। তদনন্তর দেওয়ান-দপ্তরে

কুশাসনে উপবেশনপূর্বক মুখশুদ্ধি করিয়া কর্মচারিগণকে বিষয়কর্মের আজ্ঞা দিতেন; তাহারা সেই সমস্ত আদেশ লিখিয়া লইত। তৃতীয় প্রহরের পর পুনর্বার ভাষাতে পুরাণশ্রবণ করিতেন। দুই দণ্ড বেলা থাকিতে পুরাণশ্রবণ শেষ হইত। সেই সময়ে কর্মচারিগণ তাঁহার আদেশানুযায়ী লিখনাদি প্রস্তুত করিয়া স্বাক্ষর করাইতে আসিত। রানী এই লিখনাদি শুনিয়া তাহাতে মুদ্রাঙ্কন করিয়া দিতেন। সায়ংকালে পুনর্বার গঙ্গাদর্শন ও গঙ্গাতে ঘৃতপ্রদীপ দিয়া, বাসভবনে আসিয়া রাত্রি চারি দণ্ড পর্যন্ত মালা জপ করিতেন; তাহার পর জলগ্রহণান্তে দেওয়ান-দপ্তরে বিষয়সংক্রান্ত কার্যের আজ্ঞা দিতেন। রাত্রি এক প্রহরের সময় প্রজাদিগের প্রার্থনা শুনিয়া বিচার করিতেন; অবশেষে পৌরজন কে কিভাবে থাকে, অনুসন্ধান লইয়া, রাত্রি দেড় প্রহরের সময় শয্যায় গমন করিতেন।

রানী ভবানী বড়নগর ও তাহার নিকটস্থ অন্যান্য দেবালয়ের জন্য প্রায় লক্ষ টাকার বৃত্তি নির্দেশ করিয়া দেন। এই সমস্ত অর্থ দেবকার্যে ব্যয়িত হইত। তিনি তাহা হইতে এক কপর্দকও গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার নিজের ও তাঁহার সহচরী বিধবা-মণ্ডলীর জন্য অবশেষে তাঁহাকে গবর্নমেণ্টের বৃত্তির উপর নির্ভর করিতে হয়। প্রথমতঃ তিনি মাসিক ৮০০০ টাকা বৃত্তি পাইতেন; পরে উহা কমিতে কমিতে ১০০০ টাকায় পরিণত হয়। যিনি নিজে লক্ষাধিক মুদ্রার সম্পত্তি দেবসেবায় নির্দেশ করিয়াছিলেন, তিনি যে কিজন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট বৃত্তিপ্রার্থিনী হইলেন, ইহা নিতান্ত রহস্যময় সন্দেহ নাই। দেবতার জন্য যে সম্পত্তি অর্পিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা তিনি আত্মোদরপূরণের পক্ষপাতিনী ছিলেন না, ইহা ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে?

এইরূপে কঠোর ব্রহ্মচর্য অবলম্বনপূর্বক দেবসেবায়, ব্রাহ্মণসেবায়, ও দীনপ্রতিপালনে আপনার জীবনকে উৎসর্গীকৃত করিয়া রানী ভবানী ৭৯ বৎসর বয়সে বড়নগরে ভাগীরথীতীরে বিশ্বজননী ভবানীসহ চিরসম্মিলিত হন। যিনি হিন্দু বিধবার অত্যুচ্চ আদর্শ দেখাইয়া, স্বীয় পবিত্র নামকে প্রাতঃস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সেই আদর্শ দিন দিন বঙ্গভূমি হইতে লয় পাইতে বসিয়াছে। বঙ্গদেশে কত রাণী, কত মহারানী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু রানী ভবানীর ন্যায় এমন অপূর্ব আদর্শ আর কখনও শুনিতে বা দেখিতে পাওয়া যায় নাই। বর্তমান সময়ে একজনমাত্র তাঁহার আদর্শ চরিত্রের অনুকরণে আপনার পবিত্র নাম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম মহারানী শরৎসুন্দরী। সেই দ্বিতীয়া ভবানীর পবিত্র চরিত্র কিছুদিনের জন্য বঙ্গভূমিতে হিন্দুবিধবাচরিত্রের আদর্শ দেখাইয়াছিল। রানী ভবানীর সহিত তারাও বড়নগরে বাস করিতেন। বড়নগরে তাঁহার স্থাপিত দেবমন্দিরও আছে। রাজা রামকৃষ্ণ মধ্যে মধ্যে বড়নগরে আসিয়া বাস করিতেন। তিনি বড়নগরের যে স্থানে সাধনাসন করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহার চিহ্ন বর্তমান রহিয়াছে। রামকৃষ্ণ প্রতিদিন বড়নগর হইতে কিরীটেশ্বরীতে সাধনার্থ গমন করিতেন বলিয়া প্রবাদ আছে। রানী ভবানীর জীবিতাবস্থাতেই রামকৃষ্ণের জীবলীলার অবসান হয়।

রামকৃষ্ণের পুত্র বিশ্বনাথের প্রথমা মহিষী রানী জয়মণি নাটোর হইতে বড়নগরে আসিয়া বাস করেন। বিশ্বনাথ কোন বৈষ্ণব গোস্বামীর পরামর্শে ইষ্টমন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। রানী জয়মণিকে ইষ্টমন্ত্র পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করায়, তিনি তাহাতে অস্বীকৃতা হইয়া, রানী ভবানীর নিকট উপস্থিত হন এবং তদবধি তিনি বরাবর বড়নগরেই বাস করিয়াছিলেন। ভবানী জয়মণিকে তাঁহার সমস্ত দেবোত্তর সম্পত্তি দানপত্রদ্বারা অর্পণ করিয়া যান। নাটোরবংশীয়েরা পূর্বে মধ্যে মধ্যে বড়নগরে আগমন করিতেন।

এক্ষণে আমরা রানী ভবানীর বড়নগরস্থ পুণ্যকীর্তির উল্লেখ করিতেছি। তাঁহার সেই সমস্ত পুণ্যকীর্তি এক্ষণে সংস্কারাভাবে শ্রীহীন হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ তাঁহার স্থাপিত ভবানীশ্বর শিবমন্দিরের দুর্দশা দেখিলে বড়ই ব্যথিত হইতে হয়। যিনি ভবানীর নামের পরিচয় দিতেছেন, তাঁহার প্রতি অযত্নপ্রদর্শন যে অতীব দুঃখের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ভবানীশ্বর মন্দির, বড়নগর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মন্দির। ইহার ন্যায় গগনস্পর্শী মন্দির বড়নগরে আর দ্বিতীয় নাই এবং বাঙ্গলার অন্য কোন-স্থানে আছে কিনা সন্দেহ। ভবানীশ্বর মন্দির ভাগীরথীতীর হইতে কিছু পশ্চিমে অবস্থিত। কাশীধামেও রানী ভবানী ভবানীশ্বর নামে এক শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছিলেন। এইরূপ কথিত আছে যে, উভয় ভবানীশ্বর মন্দিরই এক সময়েই নির্মিত হয়। বড়নগরের ভবানীশ্বর মন্দিরে যে-শিলালিপি ছিল, তাহার অন্তর্ধান ঘটিয়াছে; সুতরাং কোন্ অব্দে তাহা নির্মিত হয়, বলিতে পারা যায় না। কাশীর ভবানীশ্বর মন্দিরে এইরূপ লিখিত আছে ঃ—

> "বাণব্যাহৃতিরাগেন্দুসমিতে শকবৎসরে।[৪]
> নিবাসনগরে শ্রীমদ্বিশ্বনাথস্য সন্নিধৌ॥
> ধরামরেন্দ্রবারেন্দ্রগৌড়ভূমীন্দ্রভামিনী।
> নির্মমে শ্রীভবানী শ্রীভবানীশ্বরমন্দিরম্॥"

উক্ত শ্লোক হইতে কাশীর ভবানীশ্বর মন্দিরের নির্মাণকাল ১৬৭৫ শকাব্দ হইতেছে। যদি একসময়ে উভয় ভবানীশ্বর মন্দিরের নির্মাণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে বড়নগরস্থ ভবানীশ্বর মন্দিরের নির্মাণাব্দও ১৬৭৫ শক হয়। খোদিত শিলাখণ্ড না থাকায়, ইহার প্রকৃত সময় নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এই বৃহৎ মন্দিরের চতুঃপার্শ্বে বারান্দা; বারান্দায় আটটি প্রবেশপথ আছে। ইহার নির্মাণকার্য অতীব প্রশংসনীয়। মন্দিরটি এক্ষণে অসংস্কৃত অবস্থায় বর্তমান। ভবানীশ্বর আজিও মন্দিরমধ্যে বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু মন্দিরের চতুঃপার্শ্বস্থ বারান্দায় পারাবতসকল বাস করিয়া অপরিষ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। ইহার প্রতি কোনই যত্ন লওয়া হয় না। ভবানীশ্বর মন্দিরের পশ্চিমে

৪ বাণ=৫, ব্যাহৃতি=৭, রাগ=৬, ইন্দু=১। অঙ্কের বামাগতি নিয়মানুসারে ১৬৭৫ শক হইতেছে।

ভবানীর একমাত্র কন্যা তারার স্থাপিত গোপালমন্দির। এই মন্দিরমধ্যে কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্মিত গোপালমূর্তি বিরাজিত। গোপালমূর্তিটি মনোমুগ্ধকরী। গোপাল হস্ত-প্রসারণপূর্বক যেন কিছু প্রার্থনা করিতেছেন। মন্দিরের বারান্দায় একটি ফোয়ারা রহিয়াছে ; মন্দিরের শিলালিপিতে এইরূপ লিখিত আছে ঃ—

"খশূন্যমিত্রশকে[৫] শ্রীভবানীতনুসম্ভবা।
নির্মমে শ্রীমতী তারা শ্রীমদ্‌গোপালমন্দিরম্‌ ॥"

গোপালমন্দির-বাটীতে একটি শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন। মন্দির-বাটীতে প্রবেশ করিতে হইলে দ্বারের দুই পার্শ্বে তারেশ্বর নামে দুই শিব দৃষ্ট হন। মন্দিরের বাহির চত্বরে গোপালের একটি পর্বমন্দির আছে। দোল প্রভৃতি পর্বোপলক্ষে তথায় গোপালের আগমন হইয়া থাকে। গোপালের সেবারও বেশ সুবন্দোবস্ত আছে। গোপালমন্দিরের পশ্চাতে অর্থাৎ উত্তর দিকে একটি শুষ্ক বিল্বতলায় রাজা রামকৃষ্ণের পঞ্চমুণ্ডীর আসন। বেদীর চিহ্ন আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারই নিকট গোপাল পুষ্করিণী। গোপালমন্দিরের দক্ষিণে রাজরাজেশ্বরীভবন। রাজরাজেশ্বরী-বাটীর তিন দিকের গৃহ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, পূর্বে এই বাটী কিরূপ সমারোহময় ছিল, ইহার ভগ্নাবস্থা হইতে তাহার কতক পরিচয় পাওয়া যায়। কেবল উত্তর দিকে মাতার মন্দিরটিমাত্র বর্তমান আছে। এই মন্দিরমধ্যে এক বিশাল বেদীর উপর দশভুজা সিংহবাহিনী রাজরাজেশ্বরী বিরাজ করিতেছেন। যাঁহার কৃপায় রানী ভবানী রাজরাজেশ্বরী বলিয়া প্রসিদ্ধা হইয়াছিলেন, তিনি আজিও মন্দির উজ্জ্বল করিয়া অবস্থিতা আছেন। এই রাজরাজেশ্বরী মূর্তি স্বয়ং রানী ভবানী-কর্তৃক স্থাপিত।

রাজরাজেশ্বরীর বামে জয়দুর্গা ও করুণাময়ী মূর্তি আছেন ; তাঁহারাও দশভুজা। জয়দুর্গা রাজা রামজীবনের স্থাপিত এবং করুণাময়ী রানী ভবানীর পিত্রালয়ে অবস্থিতি করিতেন। রাজরাজেশ্বরী, জয়দুর্গা, করুণাময়ী তিন মূর্তিই পিত্তলময়ী।

রাজরাজেশ্বরীভবনে পূর্ব-দক্ষিণ দিকে মদনগোপালের মন্দির। মদনগোপালের মূর্তি দারুময়ী। মদনগোপাল রাজশাহীর প্রসিদ্ধ জমিদার রাজা উদয়নারায়ণের বিগ্রহ বলিয়া কথিত। উদয়নারায়ণের সমস্ত জমিদারী রাজা রামজীবনের হস্তে আসায় নাটোরবংশীয়েরা তাঁহার স্থাপিত মদনগোপালের যথারীতি সেবা করিয়া থাকেন। রাজা বিশ্বনাথ বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করায়, মদনগোপালের সেবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দেন। মদনগোপালমন্দিরে মহালক্ষ্মী ও হয়গ্রীব আছেন। হয়গ্রীব কুসুম-খোলার কুসুমেশ্বরের বিগ্রহ বলিয়া কথিত।

মদনগোপালের মন্দিরের পূর্ব-দক্ষিণে চারি বাঙ্গলার মন্দির। এই চারি বাঙ্গলার শিল্পকার্য অতীব প্রশংসনীয়। বড়নগরসমাগত প্রত্যেক লোকই ইহার শিল্পকার্য

৫ খশূন্যমিত্র—১৭০০।

দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া থাকেন। ইহার প্রত্যেক ইষ্টক কারুকার্যময়, নানাবিধ দেব-দেবীর মূর্তিখোদিত ছাঁচে মৃত্তিকাবিন্যাস করিয়া এই সকল ইষ্টক নির্মিত হইয়াছে। এই সকল ইষ্টকে কোন স্থানে দশাবতার, কোন স্থানে দশমহাবিদ্যা, কোথাও রাম-রাবণের যুদ্ধ, কোথাও শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ, এতদ্ভিন্ন রাধাকৃষ্ণ, অসংখ্য শিব ও দেবমূর্তি চতুর্দিকে অঙ্কিত রহিয়াছে। এই সকল মন্দির দেখিলে, পুরাতন শিল্পের ও তৎকালীন লোকদিগেরও স্বধর্মভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। মুর্শিদাবাদের মধ্যে ইহা একটি দর্শনীয় পদার্থ। চারিদিকে চারিখানি বাঙ্গলা বা মন্দির অবস্থিত। প্রত্যেক মন্দিরে তিনটি করিয়া শিব আছেন। বলা বাহুল্য, এই মন্দিরও রানী ভবানীরই প্রতিষ্ঠিত।

চারি বাঙ্গলার সম্মুখে ভাগীরথীতীরে কতিপয় অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষ শাখা প্রসারণ করিয়া একটি ছায়া-নিকেতনের সৃষ্টি করিয়াছে। তাহাদের ছায়াদ্বারা অর্ধভাগীরথী আবৃতা। ইহাদের ছায়াতলে উপবেশন করিলে, মনে পরম শান্তভাবের অভ্যুদয় হইয়া থাকে। এইখানে বসিয়া ভাগীরথীর সলিলোচ্ছ্বাস দর্শনে ও রানী ভবানীর পুণ্যকীর্তি স্মরণে যখন মন পবিত্রভাবে ভরিয়া যায়, তখন দর্শকমাত্রেরই বড়নগরকে প্রকৃত তীর্থস্থান বলিয়াই বোধ হয়।

চারি বাঙ্গলার উত্তরে রাজা বিশ্বনাথের অসম্পূর্ণ হপ্তপরগণার কাছারি। রাজা সাতটি পরগণার জমিদারীকার্য নির্বাহের জন্য কাছারিটি নির্মাণ করিতেছিলেন; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। এক্ষণে তাহা জঙ্গলসমাবৃত হইয়া ভগ্নদশায় পতিত হইয়াছে।

এই সমস্ত মন্দিরের চারিপাশে রাজবাটী ছিল। রাজবাটীর দক্ষিণ দিকের পরিখার চিহ্ন অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। এই পরিখার সহিত একটি ক্ষুদ্র খালের সংযোগ ছিল বলিয়া কথিত আছে। এই পরিখা ও সেই খাল দিয়া প্রতি-রাত্রি তরণী আরোহণে রাজা রামকৃষ্ণ সাধনার্থ কিরীটেশ্বরী গমন করিতেন। ভবানীশ্বর ও গোপালমন্দিরের উত্তর দিকে রাজবাটীর চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহার অধিকাংশই ভগ্নস্তূপে পরিণত; কিয়দংশ সংস্কৃত করিয়া বড়নগরের বর্তমান কুমার বাস করিতেছেন। তাহার মধ্যে একটি পূর্বদ্বারী ঘরের নীচের তলায় রানী ভবানী বাস করিতেন। সেই পবিত্র গৃহ বিদ্যমান থাকিয়া আজিও রাজসংসারের পবিত্রতা রক্ষা করিতেছে। গৃহের বারান্দায় একটি ফোয়ারার হ্রদ আছে। এই বর্তমান রাজবাটীর দক্ষিণে দেওয়ানখানা। তাহার দক্ষিণে রানী ভবানীর ব্রাহ্মণভোজনের বাটী ছিল; তথায় তিনি স্বহস্তে ব্রাহ্মণভোজন করাইতেন।

বর্তমান রাজবাটী হইতে কিছুদূরে উত্তর দিকে অষ্টভুজ গণেশের মন্দির। ইনিই বড়নগরের গ্রাম্যদেবতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইঁহার মূর্তিটি অতীব রমণীয়। গণেশের মূর্তি পাষাণময়ী। মন্দিরমধ্যে একটি ক্ষুদ্র কালীমূর্তি আছেন। প্রবাদ আছে,

উভয়েই ভাগীরথী হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন। মন্দিরের বারান্দায় হলহলি কলকলি নামে দুইখণ্ড সিন্দূরলেপিত প্রস্তরখণ্ড আছে। অদ্যাপি পীড়াশান্তির জন্য মুর্শিদাবাদের অনেক স্থান হইতে লোকজন সমাগত হইয়া হলহলি কলকলির পূজা দিয়া থাকে।

গণেশের মন্দির হইতে উত্তর দিকে মঠবাটী। মঠবাটীর ঠাকুরেরা রানী ভবানীর গুরুবংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ। মঠবাটীতে এক যোড়বাঙ্গলা আছে; তাহারও ইষ্টকে শিল্প-কার্যের পরিচয় পাওয়া যায়। যোড়বাঙ্গলায় তিনটি শিব বিরাজিত আছেন, তাঁহারাও রানী ভবানীর প্রতিষ্ঠিত। ইহার নিকটে কস্তুরীশ্বর শিব; তিনি রানী ভবানীর মাতার স্থাপিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। মঠবাটীতে একটি প্রকাণ্ড তোরণদ্বার আপনার বিশাল মস্তক উত্তোলন করিয়া অদ্যাপি ভাগীরথীতীরে অবস্থিত আছে।

মঠবাটীর উত্তরে দয়াময়ীবাটী। দয়াময়ী পাষাণময়ী কালীমূর্তি। একটি উচ্চ বেদীর উপর তিনি অবস্থিত। তাঁহার মনোহারিণী মূর্তি দর্শন করিলে পাষাণেরও মনে ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। পূর্ণানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ নামে রাজা রামকৃষ্ণের পরম-মিত্র দুইজন সন্ন্যাসীর কথা শুনা যায়। দয়াময়ী ব্রহ্মানন্দের স্থাপিত বলিয়া কথিত। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, পুষ্করিণী খননের সময় তিনি উত্থিতা হইয়াছিলেন। দয়াময়ী মন্দিরটি সংস্কৃত করিয়া অধিকতর রমণীয় করা হইয়াছে। মঠবাটীর ঠাকুর তারিণী-শঙ্কর ইহার সংস্কার করিয়াছেন। দয়াময়ীর বাটীর উত্তরে দেওয়ান দয়ারামের স্থাপিত এক গোপালমূর্তি আছেন। এতদ্ভিন্ন বড়নগরের অরণ্যমধ্যে অনেক শিব-মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা রামকৃষ্ণ যে-শবে বসিয়া সাধন করিতেন, একটি খর্জুরবৃক্ষের তলায় তাহা প্রোথিত আছে বলিয়া বড়নগরের লোকেরা গল্প করিয়া থাকে।

বড়নগরের পরপারে সাধকবাগ। তথায় প্রসিদ্ধ মস্তারাম বাবাজীর আখড়া আছে। এই আখড়ায় রথযাত্রা-উপলক্ষে মহাসমারোহ হইয়া থাকে। পূর্বে এই উপলক্ষে অত্যধিক ধুমধাম হইত। নানাস্থান হইতে বহুলোকের সমাগম হইয়া ধুমধামের মাত্রা অধিকতররূপে বাড়াইয়া তুলে। আখড়ার রামচন্দ্রদেবই প্রসিদ্ধ।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, রানী ভবানী রানী জয়মণিকে সমস্ত দেবসেবার সম্পত্তি দানপত্র দ্বারা অর্পণ করিয়া যান। জয়মণি কুমার দুর্গাচন্দ্রকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। দানপত্রের লিখনদোষে দুর্গাচন্দ্রের সহিত নাটোরবংশের মোকর্দমা উপস্থিত হয়। সেই মোকর্দমার শেষে দেবসেবার সম্পত্তি তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে। নাটোরবংশীয়েরা, রাজরাজেশ্বরীর, বড়নগরের কুমার তারার, গোপালের ও মঠবাটীর ঠাকুরেরা সমস্ত শিবের সেবক বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন। রাজরাজেশ্বরী ও গোপালের সেবার বন্দোবস্ত মন্দ নাই। ক্ষুধার্ত ব্যক্তি মাত্র উপস্থিত হইলে, রাজ-রাজেশ্বরীর বাটীতে প্রসাদ পাইয়া থাকে। শিবগুলির প্রতি বিশেষ কোন যত্ন দেখা যায় না। রাজরাজেশ্বরীর সেবার বন্দোবস্ত থাকিলেও তাহা নাটোরবংশের উপযোগী

নহে। রানী ভবানীর স্থাপিত রাজরাজেশ্বরী সেবায় নাটোর রাজের বিশেষ যত্ন থাকা আবশ্যক। যাঁহার পবিত্র নামের জন্য সমস্ত বঙ্গসমাজ তাঁহাদিগকে নতমস্তকে অভিবাদন করিয়া থাকে, সেই রানী ভবানীর প্রিয় বাসস্থান বড়নগরে দেবসেবার জন্য তাঁহাদিগের যত্নবান্ হওয়া অবশ্য কর্তব্য। জয়মণির পোষ্যপুত্র দুর্গাচন্দ্রের দত্তকপুত্র প্রসিদ্ধ উমেশচন্দ্র। উমেশচন্দ্রের দত্তকপুত্র কুমার সতীশচন্দ্র, এক্ষণে তাঁহার পুত্র বড়নগরে অবস্থিতি করিতেছেন। ভগবান্ তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করিয়া স্বধর্মে মতি প্রদান করুন।

মহারাজ নন্দকুমার

অতীত গৌরবের স্মৃতি জাতীয় জীবনে সঞ্জীবনীশক্তির সঞ্চার করিয়া দেয়। যে-জাতির ইতিহাস অতীত গৌরবে পরিপূর্ণ, সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া অধঃপতনের বিশ্বগ্রাসকর আবর্তমধ্যে নিপতিত থাকিলে, তাহারও অভ্যুত্থানের আশা একেবারে বিলয়প্রাপ্ত হয় না। পূর্ব গৌরবের ধ্যান করিতে করিতে তাহার মৃতপ্রায় দেহে এমন এক বৈদ্যুতিক শক্তির আবির্ভাব হয় যে, সেই মহীয়সী শক্তির বলে সে জাতি অধঃপতনের রসাতলস্পর্শী আবর্ত ভেদ করিয়া মস্তক উত্তোলন করে এবং সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া জয়োল্লাসে দিগ্‌দিগন্তে ধাবিত হয়। জগতের যে-যে জাতির পূর্বমহাত্মাগণ মেদিনীমণ্ডলে কীর্তিকিরণ বিকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন, অধঃপতিত সে জাতির আশালতা চিরউন্মূলিতা হইবার নহে। কোন না কোন দিন তাহা ফুলফলে শোভাশালিনী হইয়া জাতীয় জীবন-শ্মশান হাস্যময় করিয়া তুলিবে। কিন্তু যে-জাতির আদি, মধ্য, অন্ত সমস্তই অন্ধকারময়, পূর্বগৌরবের কোন নিদর্শন অনুসন্ধান করিলেও সহজে অবগত হওয়া যায় না, সে জাতি কখনও যে উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিবে, সেরূপ আশা সুদূরপরাহত। জানি না, বাঙ্গালী জাতির ন্যায় আবহমান কাল হইতে অধঃপতিত এমন জাতি পৃথিবী মধ্যে দ্বিতীয় আছে কিনা।

বাঙ্গলার ইতিহাসপাঠে বাঙ্গালী জাতির পূর্বগৌরবের কোন বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। অবশ্য কোন কোন সময়ে দুই-একজন মহাপ্রাণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সমস্ত জাতির উপর তাঁহাদের ক্ষমতা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। ধর্ম ও সারস্বত জগৎ ব্যতীত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এমন কোন মহাপুরুষের প্রতিভার বিকাশ পায় নাই যে, তিনি সমস্ত জাতীয়-জীবনে মহাশক্তির সঞ্চার করিতে পারিয়াছেন। দুই-চারি জন উচ্ছৃঙ্খল ভৌমিকের কাহিনী ভিন্ন রাজনৈতিক ক্ষেত্রের গৌরব করিবার বাঙ্গালীর পক্ষে আর কিছুই নাই। ধর্ম ও সারস্বত জগতেও যাঁহারা অলৌকিক ব্যাপার সংঘটিত করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যাও এত অল্প যে, একটি বিশাল জাতির পক্ষে তাহাও তাদৃশ অধিক নয় বলিয়াই বোধ হয়। তথাপি সমগ্র জাতির মধ্যে তাঁহাদের ক্ষমতা যতদূর কার্যকরী হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের বিষয় লইয়া কিয়ৎপরিমাণে গৌরব করা যাইতে পারে। ফলতঃ বাঙ্গালীজাতির গৌরবের এমন কিছুই নাই, যাহার ধ্যানে তাহার জীবনীশক্তির সঞ্চার হইতে পারে। রাজনীতির বিশাল ক্ষেত্র তাহার পক্ষে চিরমরুভূমি। সেই মরুভূমিতে এক মহান্ বৃক্ষের বীজ উপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাও শাখাপ্রশাখাসমন্বিত হইয়া আশাজনক ফলোৎপাদন করিতে পারে নাই, অধিকন্তু পরিণামে মহাঝটিকাঘাতে সমূলে উৎপাটিত হইয়া যায়। যে-প্রকাণ্ড পুরুষ আপনার রাজনৈতিক প্রতিভা প্রকাশ করিয়া, ইংরেজ জাতির চক্ষুঃশূল হইয়াছিলেন, আমরা সেই মহারাজ নন্দকুমারেরই কথা বলিতেছি। মহারাজ নন্দকুমারের যেরূপ প্রতিভা ছিল, তাহার পূর্ণ বিকাশ হইলে, বাঙ্গালী জাতির গৌরব করিবার একটা বিষয় হইত।

কিন্তু দুঃখের কথা, সে প্রতিভার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হইতে পারে নাই। ইংরেজের কূটনীতিতে তাহাকে এরূপভাবে আচ্ছাদিত করিয়াছিল যে, তাহা ভেদ করিয়া সে প্রতিভার কিরণলহরী পরিস্ফুট হইতে পারে নাই এবং সময়ে সময়ে তাহা বিপথে ছুটিয়া অধিকতর হীনবল হইয়াও পড়িয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক বিপ্লব বাঙ্গালার ইতিহাসের একটি প্রধান-স্মরণীয় ঘটনা। সেই ঘটনার আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত সকল সময়ে মহারাজ নন্দকুমারের প্রতিভা অল্পবিস্তর প্রকাশ পাইয়াছিল। সেই মহাবিপ্লব-সাগরে মহারাজ নন্দকুমারের বুদ্ধি-তরণী যদি প্রথম হইতে বরাবরই স্থিরভাবে একই উদ্দেশ্যে চালিত হইবার সুযোগ পাইত, তাহা হইলে, আমরা বাঙ্গলারাজ্যের অন্যবিধ অবস্থা দেখিতে পাইতাম। কিন্তু সে বিপ্লবে তাহা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়ায়, তাঁহার সমুদায় শক্তি হতবল হইয়াছিল ; সেইজন্য বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের আশা চির-উন্মূলিত হইয়াছে।

মহারাজ নন্দকুমারের জীবনী-সমালোচনা বড়ই কঠিন ব্যাপার। তাঁহার জীবিতকাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত তাঁহার চরিত্রের উপর একদিকে অসংখ্য কশাঘাত পড়িয়াছে, আবার অন্যদিকে সুস্নিগ্ধ প্রলেপে সে আঘাত দূর করিবার চেষ্টা করাও হইয়াছে। তাঁহার সময়ে যত ইতিহাস বা বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার প্রায় সমস্তই তাঁহার শত্রুপক্ষের কল্পিত। কি মুসলমান লেখক, কি ইংরেজ ঐতিহাসিক, সকলেই একবাক্যে তাঁহার দোষ কীর্তন করিয়া জগতের সমক্ষে বাঙ্গালী-জাতিকে অত্যন্ত হেয় করিয়া তুলিয়াছেন। কোন কোন ইংরেজ লেখক নন্দকুমারের সহিত সমগ্র বাঙ্গালীজাতির উপর এরূপ গালিবর্ষণ করিয়াছেন যে, তাহা শ্রবণ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করার আবশ্যক হইয়া উঠে।[১] আবার কেহ কেহ সেই নন্দকুমারকে "Great Rajah Nundcomar" বলিয়াছেন এবং তাঁহার প্রভুভক্তি ও স্বদেশের স্বত্বাধিকারের প্রতি অনুরাগই সমগ্র ব্রিটিশ জাতির গালিবর্ষণের কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।[২] মহারাজ নন্দকুমারের জীবনের প্রত্যেক কার্য সমালোচনা

১ "Courage, independence, veracity, are qualities to which his constitution and his situation are equally unfavourable."

"What the horns are to the buffalo, what the paw is to the tiger, what sting is to the bee, what beauty, according to old Greek song is to woman, deceit is to the Bengalee. Long promises, smooth excuses, elaborate tissues of circumstantial falsehood, chicanery, perjury, forgery, are the weapons, offensive and defersive of the people of the Lower Ganges.

In Nuncomar, the National character was strongly and with exaggeration personified." (Macaulay's Essay on Warren Hastings.)

২ "And the general obloquy of the English nation, was an

করিয়া প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে, অনেক স্থান ও সময়ের আবশ্যক। বর্তমান প্রবন্ধে তাহার সম্পূর্ণ আলোচনা অসম্ভব। তবে আমরা এ কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, বাস্তবিকই মহারাজ নন্দকুমার তৎকালীন প্রবঞ্চক ইংরেজ কোম্পানীর হস্ত হইতে তাঁহার প্রভুর ও স্বদেশের স্বত্বরক্ষার জন্য আপনার জীবন বলি দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ ছিল; সে বিষয়ের কোন বিরুদ্ধ তর্ক আমাদের মনে স্থান পায় না। তবে তাঁহার সেই উদ্দেশ্য যে একেবারে স্বার্থশূন্য ছিল, সে কথাও সাহস করিয়া বলিতে পারা যায় না। শিবাজী বা রাজসিংহের ন্যায় তাঁহার উদ্দেশ্য মহত্তর বা নির্মলতর না হইতে পারে, তথাপি সেরূপ উদ্দেশ্যেরও যে যথেষ্ট মূল্য আছে, ইহাও অনায়াসে স্বীকার করিতে পারা যায়। বিশেষতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে অন্যান্য বাঙ্গালীর ন্যায় বৈদেশিকের পদলেহন না করিয়া, তিনি যে স্বদেশের স্বত্বস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহা অল্প প্রশংসার কথা নহে।

জগতে নিঃস্বার্থ হিতৈষিতা অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। শিবাজী প্রভৃতি দেবচরিত্রেও তাহার অভাব লক্ষিত হয়। ফলতঃ মানবচরিত্র একেবারে স্ফটিক-নির্মল হওয়া কঠিন। উচ্চ আশা ব্যতীত জগতে কেহ কখনও কোন মহৎ কার্য করিতে পারেন নাই। যদি সেই উচ্চ আশা থাকায় নন্দকুমার চরিত্রহীন হইয়া থাকেন, তজ্জন্য তিনি জগতের চক্ষে একেবারে হেয় হইবেন না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। প্রতারণা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি যে-সমস্ত দোষে তাঁহার চরিত্রকে কালিমামণ্ডিত করা হইয়াছে, আমরা তাহাতে বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারি না। তবে তদানীন্তন সুচতুর ইংরেজের কূটনীতির সহিত তাঁহার প্রতিভা ও বুদ্ধির সংঘর্ষণ ঘটায়, কখন কখন তাঁহাকে যে কূটবুদ্ধির পরিচয় দিতে হইয়াছে, ইহা একেবারে অস্বীকার করিতে পারা যায় না। "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" এই নীতিবলে তাঁহার যতদূর কৌশল ও চতুরতা প্রকাশ করার প্রয়োজন হইয়াছিল, সময়ে সময়ে তিনি ততদূরই প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। তাৎকালিক বাঙ্গালীগণের মধ্যে তাঁহার ন্যায় স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্মভক্ত লোক আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যাইত না। তাঁহার সহস্র দোষ থাকিলেও উল্লিখিত গুণনিকরে তিনি যে বাঙ্গালীর চিরপূজ্য

account of his (Nundcomar's) attachment to his own prince and the liberties of his country.

The character here given of him is that of an excellent patriot, on character which all your lordships in the situations which you enioy, or to which you may be called, will envy the character of a servant who stuck to his master against all foreign encroachment, who stuck to him to the last hour of his life, and had the lying testimony of his master to his services." (Burke's Impeachment of Warren Hastings.)

থাকিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইংরেজ লেখকগণের অথবা বর্তমান সময়ে কোন কোন বাঙ্গালী ইংরেজী লেখকের সহস্র গালিবর্ষণেও মহারাজ নন্দকুমারের গৌরবের লাঘব হইবে না। কেহ কেহ তাঁহাকে সমগ্র বাঙ্গালীজাতির ঘৃণ্য বলিয়া নির্দেশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহাদের কথা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয় না। যাহারা স্বার্থপরতার বশবর্তী হইয়া কোম্পানীর কর্মচারিগণের পাদুকাবহনে আপনাদিগকে কৃতার্থম্মন্য মনে করিয়াছিল, তাহারাই মহারাজ নন্দকুমারের চরিত্রে কলঙ্কবিন্যাসের চেষ্টা পাইয়াছে। তাঁহার পরম শত্রু ইংরেজগণের লেখনীভঙ্গিতে তাহা সাধারণের চক্ষে ভয়াবহ বলিয়াই সহসা বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু তাঁহার জীবনের ঘটনাবলীর আলোচনা করিলে, সে ভ্রম অনায়াসে দূরীভূত হয়। মহারাজ নন্দকুমারের চরিত্র যে একেবারে নির্মল ছিল, সে কথা আমরা বলিতেছি না; তাহাতে স্বার্থ ও উচ্চ আশার মিশ্রণ থাকিতে পারে; কিন্তু ইংরেজ লেখকগণ তাঁহাকে যে-ভাবে চিত্রিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহা যে সম্পূর্ণরূপে হিংসা ও বিদ্বেষপ্রসূত, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে না বলিয়া থাকিতে পারি না।

যাঁহারা ইংরেজ লেখকদিগের অথবা তাঁহাদের অনুকরণকারিগণের রচিত নন্দকুমারচরিত্র পড়িয়া তাঁহাকে ঘৃণা করিয়া থাকেন, আমরা তাঁহাদিগকে সেই পুরুষপ্রধানের জীবনের সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক অনুশীলন করিতে বলি। দেখিবেন, তৎসমূহের মধ্য হইতে তাঁহার চরিত্রের উজ্জ্বলাংশ নিষ্কাশিত হইয়া আসিবে এবং সেই হিংসাপরায়ণ লেখকদিগের বর্ণনা অশ্রদ্ধেয় বলিয়া প্রতীত হইবে। মহামতি বার্ক মহারাজের পরমশত্রু হেস্টিংসের কথা হইতেই নন্দকুমারচরিত্রের মহত্ত্ব প্রদর্শনের চেষ্টা পাইয়াছেন। নন্দকুমারের চরিত্র সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও, তাঁহার প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তা কেহই অস্বীকার করেন নাই; তাঁহার শত্রুপক্ষীয়দিগকেও ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইয়াছে।[৩] অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোন দেশীয় ব্যক্তি তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। তাঁহার রাজনৈতিক প্রতিভার জন্য ইংরেজ প্রভুগণ এতদূর ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা সর্বদা তাঁহাকে দমন করিবার জন্য অশেষবিধ উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হন। তাঁহার দেশীয় শত্রুগণ তাঁহার নিকট অগ্রসর হইতে সাহসী হইত না। নন্দকুমারের ক্ষমতা এতদূর প্রবল ছিল যে, অনেক মহারথীকে তাঁহার আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। ক্লাইব, এমন কি ওয়ারেন্ হেস্টিংসও তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। সিরাজউদ্দৌলা, মীরজাফর, মণিবেগম সকলেই তাঁহার পরামর্শে চলিয়াছিলেন। বিশেষতঃ মীরজাফরবংশীয়েরা তাঁহাকে আপনাদিগের হিতকারী বন্ধু বলিয়া সর্বদা বিবেচনা করিতেন। দেশের সমুদায় রাজা, মহারাজা জমিদার, ভূস্বামী ও সাধারণ প্রজাগণ তাঁহার অত্যন্ত বাধ্য ছিল।

৩ একমাত্র মহারাজ নবকৃষ্ণের নবজীবনীলেখক এন্. এন্. ঘোষসাহেব মহোদয় ইহাও স্বীকার করিতে চাহেন না।

মহারাজ নন্দকুমার প্রথমে এক বিষম ভ্রমে পতিত হন। তজ্জন্যই তিনি বিষময় ফলভোগ করিয়াছিলেন। তিনি তাৎকালিক ইংরেজ বণিক্‌কে চিনিতে না পারিয়া, তাঁহাদের সাহায্যকল্পে যে বিপথে চালিত হইয়াছিলেন, সেই ভ্রমের জন্য তিনি আত্মজীবন বলি দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য হন। তিনিই প্রথমে সিরাজের বিরুদ্ধে ইংরেজদিগকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। পরে সে ভ্রমের সংশোধনার্থ ইংরেজদিগের কবল হইতে মীরজাফর ও তদ্বংশীয়দিগের উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে ইংরেজ-বণিকের জন্য তাঁহার চরিত্রে কলঙ্কপাত হইয়াছে, সেই ইংরেজ-বণিক অবশেষে তাঁহাকে কৌশলক্রমে ফাঁসিকাষ্ঠে লম্বমান করাইয়া আপনাদিগের কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছিল![৪] হিন্দুর দেশে, হিন্দুর সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ণ ব্রাহ্মণের গলদেশে রজ্জু বদ্ধ করাইয়া, হিন্দুর মনে প্রবল অশান্তির সঞ্চার করিয়াছিল! ব্রাহ্মণের দেশে ব্রাহ্মণের দেহপাতে যে রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, তাহা কতদিন স্থির থাকিতে পারে? তাই সেই বণিগ্‌রাজত্বে ভারতবাসীর অশেষবিধ কষ্ট দেখিয়া, শান্তিময়ী রাজরাজেশ্বরী

৪ আমরা মহারাজ নন্দকুমারের চরিত্রসম্বন্ধে যেরূপ আলোচনা করিয়াছি, তাহা হইতে সাধারণে নন্দকুমার সম্বন্ধে আমাদের মতামত অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন। শ্রীযুক্ত সত্যচরণশাস্ত্রী-প্রমুখ আরও দুই-এক জন মহারাজ নন্দকুমার সম্বন্ধে ঐ প্রকার মতামতই প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু নবকৃষ্ণের নবজীবনীলেখক এন্. এন্. ঘোষসাহেব মহোদয়ের নিকট এই সকল আধুনিক বাঙ্গালী লেখকদিগের মত রুচিকর না হওয়ায়, তিনি উক্ত লেখকগণের মতের সমালোচনা করিয়া নন্দকুমার সম্বন্ধে যেরূপ মত প্রকাশ করিযাছেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। তাহার বর্ণনা হইতে সাধারণে বুঝিতে পারিবেন যে, এ পর্যন্ত কোন ইংরেজ বা বাঙ্গালী নন্দ-কুমার সম্বন্ধে এরূপ বিদ্বেষমূলক অতিরঞ্জিত বর্ণনা করেন নাই। ঘোষসাহেবের এরূপ বর্ণনার কারণ এই যে, তিনি নবকৃষ্ণের জাবনীলেখক। কারণ তাঁহার নাযকের প্রতিদ্বন্দ্বী নন্দকুমারকে তাঁহার লেখনী দ্বারা জর্জরিত না করিলে, তাঁহার নবরচিত নবকৃষ্ণ সাধারণের সমক্ষে প্রকাশিত হইতে পারে না। আমরা ক্রমে ক্রমে ঘোষমহাশয়ের মতামতের আলোচনা করিব। আপাততঃ তাঁহার লিখনভঙ্গী সাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়া দেখাইতেছি। ঘোষসাহেব বলিতেছেন ঃ

"History as written by Englishmen in recent times after elaborate research, as written, for instance, by Sir James Stephen, Colonel Malleson, and Mr. Forrest, has in the eyes of impartial readers at any rate, delivered its final verdict on Nuncomar and his trial for forgery. The impression left on the mind of the last generation by the flowing periods of Burke, the ponderous pages of Mill, and the brilliant portraits of Macaulay, cannot but suffer to-day a large degree of effacement. But there are those who will not see, who love to hug an illusion that is beautiful, and who with little ceremony or scarcely an apology dismiss facts that are repellent to the taste. Some recent Bengalee writers have made a hero of Nuncomar. They have represented him as the victim of a conspiracy led by Warren

ভিক্টোরিয়া আমাদিগকে আশ্রয়চ্ছায়া দান করিয়াছিলেন ! আমরা তাঁহার শান্তিচ্ছায়ায় জাতিনির্বিশেষে প্রতিপালিত হইয়া শত শত বৎসরের পদাঘাতে জর্জরিত দেহমনকে

Hastings who employed Impey as his instrument for a judicial murder. Nuncomar was in their judgment, a martyr to his patriotism. He was not only a social leader of the Brahmins, but the political leader of the entire Hindu Community in Bengal, if not the native population generally. Round him Hindu interests and forces were to rally, or at any rate the decaying strength of Mahomedan rulers was to revive ; and he was to stand forth as the deliverer of his native land from a foreign yoke and the founder of a united nation and state. Nubkissen on the other hand, was in the light vouchsafed to these writers a sneak and a coward, a trimmer and traitor who betrayed native interests, and delivered his country, so far as it lay in his little power, into the hands of the English. He abetted Hastings in his attempt to remove his chief accuser and witness of guilt, Nuncomar. By giving false evidence he abetted Impey in his Judicial murder.

"All this view of Nuncomar is excellent romance , it is not history. The writers have very largely drawn on their imagination. They at once ignored and created history. Nuncomar at his best was a shrewd worldly man of business, the mediocre character of whose abilities and the modesty of whose social position are proved by the fact that he did not make a prominent appearance or occupy a distinguished position in public life before he was past fifty. Taken all round he was an ambitious, scheming, intriguing, villain, absolutely selfish, thoroughly unprincipled, dead to a sense of gratitude, prone to abuse of power, faithless as a friend, implacable as an enemy. Almost the whole of his public life is a tissue of crimes—extortion, conspiracy giving bribes, taking bribes, making false complaints, getting up false, case, perjury, subornation of perjury, forgery, the uttering of forged documents and the like. His public life had nothing of public spirit in it. His ambition was wholly personal. The solitary instance of faithfulness in his whole life was his attachment to Mir Jaffir, but even in the service of that potentate he seems to have had no thought except that of self-aggrandisement. He never appears to have excelled in diplomacy, or administration and if he had any influence over Mir Jaffir, if he shaped his policy, and guided his counsels, the best index

সুস্থ করিতে সমর্থ হইয়াছি ; এবং বর্তমান রাজরাজেশ্বরের অনুগ্রহলাভে আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেছি ।

এ প্রবন্ধে মহারাজ নন্দকুমারের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদত্ত হইতেছে । তাঁহার জীবনী সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের আলোক ও অন্ধকারে মিশ্রিত । এজন্য আমরা

to his honesty, wisdom and foresight would be the acts of Mir Jaffir himself, to which a brief reference will presently be made, and which it may be observed in the mean while, exhibit little of either firmness or fairness. In character and aspirations Nubkissen was the very antithesis of Nuncomar.

"The testimony of the best writers in regard to the character of Nuncomar is unanimous."

তাহার পর তিনি মেকলে ও ম্যালেসন হইতে উদ্ধৃত করিয়া তাহা প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন ও পরে বলিতেছেন ঃ—

"In face of such a consensus of opinion, do Bengalees advance their reputation, do they serve the interests of truth, when they put forward this infamous person, this genuine 'Captain-General of iniquity' as one of the noblest specimens of their race, as their champion, leader and representative, their ideal of a hero? No, such a view is essentially unfair to Bengalees and to Brahmins. Nuncomar was not only not the Noblest of Bengalees, but not even a typical or average Bengalee. Macaulay suggests that he was one of the worst specimens of a Bengalee and indeed as much inferior to the average Bengalee as the Italian is to the Englishman and in that view he is absolutely right. No Bengalee has equalled him in villainy."
তাহার পর বারওয়েলের পত্রলিখিত নন্দকুমারের জীবনী স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে নবকৃষ্ণের জীবনীলেখকের ন্যায় মত প্রকাশ করিয়া নন্দকুমারের বিচার ও ফাঁসি সম্বন্ধে নবকৃষ্ণের জীবনীলেখকের যাহা বলা উচিত, সেইরূপ মতামতই প্রকাশ করিয়াছেন । আমরা স্থানে স্থানে তাহার আলোচনা করিতে চেষ্টা পাইব । পরিশেষে নন্দকুমার সম্বন্ধে তিনি শেষ মন্তব্য এইরূপ প্রকাশ করিয়া নন্দকুমারের আত্মাকে, আমাদিগকে ও সাধারণ বাঙ্গালীদিগকে শান্তিলাভের অবকাশ দিয়াছেন । আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"If Nuncomar is an object of sympathy to any class of men, it is because he was hanged. And scarcely has a criminal been more fortunate." তাহার উপর উপসংহার এই—'Nuncomar with indiscriminate spite threw mud at many, and something of it has stuck to each. For himself he posed as an injured innocent, and the mere emphasis and persistency of his protestations have in the eyes of a good many

সাধারণের নিকট তাহার একটি যথাযথ চিত্র প্রদানের চেষ্টা পাইতেছি। নন্দকুমারের পূর্বপুরুষেরা মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর উপবিভাগের অন্তর্গত বাড়ালা গ্রামের নিকট জবুল নামক স্থানে বাস করিতেন। তাঁহারা রাঢ়ীয় শ্রেণী শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ, ও ধবল পীতমুণ্ডী গাঁইভুক্ত। নন্দকুমারের প্রপিতামহ রামগোপাল রায় ভদ্রপুরের মথুর

invested his stories with an air of truthfulness. When however he is judged as he was, and not as he or his sentimental champions have made him out to be, he cannot but come to be recognised as a monumental villain, compared to whom Cethegus was a simple citizen and Titus Oates a man of honour." (Memoirs of Maharaja Nubkissen Bahadur, pp 103-136)

আমরা এক্ষণে ঘোষসাহেবের বর্ণনার যথাসাধ্য আলোচনা করিতে চেষ্টা করিতেছি। তাঁহার প্রথম কথা এই যে, জেম্‌স্ স্টিফেন, ম্যালেসন ও ফরেস্ট প্রভৃতি আধুনিক ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ বহুতর অনুসন্ধানের পর নন্দকুমার ও তাঁহার বিচারের প্রতি যেরূপ মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই চূড়ান্ত বলিয়া নিরপেক্ষ পাঠকবর্গ গ্রহণ করিতেছেন। বার্ক, মিল বা মেকলের বর্ণনা-পাঠে পূর্বকার লোকের মনে যেরূপ ভাবের উদয় হইত, এক্ষণে তাহা অনেকটা মুছিয়া যাইতেছে। কিন্তু কতকগুলি লোক আছে, যাহারা এই সমস্ত দেখিবে না ও শুনিবে না এবং কেবল কল্পনা আশ্রয় করিয়া আপনাদিগের অপ্রীতিকর ঘটনাগুলিকে কৈফিয়ৎ দিয়া এড়াইতে চেষ্টা করিবে। ঘোষসাহেবের প্রথম কথা কতদূর সত্য তাহা আমরা বলিতে পারি না। স্টিফেন প্রভৃতির বর্ণনা পাঠ করিয়া বার্ক, মিলের বর্ণনা যে আধুনিক নিরপেক্ষ পাঠকগণের মনে স্থান পায় না, ইহা আমরা স্বীকার করি না। তিনি নিরপেক্ষ পাঠক কাহাকে বলেন? যাঁহারা নন্দকুমারের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ না করিয়া থাকেন, তাঁহারাই কি নিরপেক্ষ পাঠক? পাঠকগণের মধ্যে নন্দ-কুমারের সহিত সকলের বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয় না; তবে তাঁহাদের মধ্যে কতক-গুলি যদি নন্দকুমারের প্রতি সহানুভূতি দেখান, তাহা হইলে তাঁহারা নিরপেক্ষ পাঠকশ্রেণী হইতে খারিজ হইলেন, আর যাঁহারা নন্দকুমারকে অন্য চক্ষে দেখিয়া থাকেন, তাঁহারা নিরপেক্ষ পাঠক-শ্রেণীভুক্ত হইবেন, ইহা যে কিরূপ সিদ্ধান্ত তাহা ঘোষসাহেবই বলিতে পারেন। ঘোষসাহেব নিজের দৃষ্টিতে নিরপেক্ষ পাঠকের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি যে পক্ষপাতী বিচারক, তাহা কি বুঝিতে পারিতেছেন না? জীবনীলেখকদিগকে যে কতকটা পক্ষপাতিত্ব আশ্রয় করিতে হয়, তাহা কি ঘোষসাহেব অস্বীকার করেন? যাঁহারা নন্দকুমারের জীবনী লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি ঘোষসাহেব যে-সমস্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, নন্দকুমারের প্রতিদ্বন্দ্বী নবকৃষ্ণের জীবনী-লেখক ঘোষসাহেব কি তৎসমুদয় হইতে আপনাকে মুক্ত বিবেচনা করেন? যাহা হউক, আমরা নিরপেক্ষ পাঠক কাহাকে বলে বুঝি না। এই মাত্র বুঝি যে, পাঠকগণের মধ্যে কতজনই বা নন্দকুমারের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকেন, এবং কতজনই বা তাঁহাকে অন্য চক্ষে দেখিয়া থাকেন। সুখের বিষয়, ঘোষসাহেবের মত-পোষক পাঠকের সংখ্যা অধিক বলিয়া আমাদের ধারণা নাই। ইউরোপের কথা ঠিক জানি না; তবে আমাদের এ দেশে যে নাই, ইহাই অনেকটা সত্য। তাহার পর স্টিফেন প্রভৃতির বর্ণনায় যে বার্ক, মিলের বর্ণনাকে নির্বাসিত করিতে পারে নাই, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। স্টিফেনের বর্ণনার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বেভারিজসাহেব যে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা কি ঘোষসাহেব দেখেন নাই?

মজুমদারের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ভদ্রপুর পূর্বে মুর্শিদাবাদ জেলায় ছিল: এক্ষণে বীরভূমের অন্তর্গত হইয়াছে। মথুর মজুমদার অনাচার-দোষে সমাজে অপেক্ষা-কৃত হেয় হন; এজন্য রামগোপালকেও অপদস্থ হইতে হয়। তদবধি তিনিও একরূপ ভদ্রপুরে বাস করিতেন। তৎকালে বাড়ালা গ্রামে বহুসংখ্যক নৈষ্ঠিক কুলীন

ঘোষসাহেবের পুস্তকের কোন স্থানে উক্ত গ্রন্থের উল্লেখ দেখি নাই। আধুনিক বাঙ্গালী লেখক-গণের প্রতি ঘোষসাহেব যেরূপ সমালোচনা করিয়াছেন, বেভারিজের গ্রন্থের কথা স্মরণ হইলে, বোধ হয়, তিনি ততটা করিতে সাহসী হইতেন না। ঐ সমস্ত বাঙ্গালী লেখক আপনাদিগের প্রবন্ধ সম্বন্ধে বেভারিজের গ্রন্থ হইতে অনেক পরিমাণে সাহায্য পাইয়াছেন, তাহা তাঁহারা স্থানে স্থানে প্রকাশও করিয়াছেন। যাহা হউক, তাঁহার স্টিফেনের মত সম্বন্ধে বেভারিজ যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। বেভারিজ স্টিফেনের গ্রন্থের উত্তর দেওয়ার জন্য প্রথমে তাঁহার ঐ গ্রন্থের প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে তিনি উক্ত প্রবন্ধগুলিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া তাহার নাম দিয়াছেন,—"The Trial of Maharaja Nandkumar, a Narrative of a Judicial murder." স্টিফেন সাহেব নিজ গ্রন্থের স্থানে স্থানে বেভারিজের পূর্বলিখিত প্রবন্ধের সমালোচনা করায়, বেভারিজ স্টিফেনের সমালোচনার উত্তরের জন্যই এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এক্ষণে আমরা বেভারিজের কথা উদ্ধৃত করিয়া ঘোষসাহেবকে ও পাঠকগণকে দেখাইতেছি যে. স্টিফেনের মন্তব্য চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হয় নাই, এবং বার্ক ও মিলের বর্ণনা আজিও অনেকের মনে জাগরূক আছে। স্টিফেন সম্বন্ধে বেভারিজ বলিতেছেন :—

"My discouragement, however, was removed when I found that Sir J. Stephen had evidently taken up the subject hastily, and had written his book in a hurry. I think the first ray of hope came from the discovery that he was wrong about the date of the capture of Rhotas and then I found that he did not quote the Provision of Bolaqui's will about Padma Mohan correctly, or notice the expression on the jewels-bond that the jewels were deposited to be *sold*.

Further researches in Calcutta Public Library, and in the Foreign Office, &c. convinced me that Sir J. Stephen's work was thoroughly unreliable, and that we might adopt to himself what he has wrongly and flippantly said about James Mill (II, 149) and say that his trenchant style and *excathedra* air produce an impression of accuracy and labour which a study of original authorities does not by any means confirm."

নিজের স্বাধীন অনুসন্ধান সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন :—

"I have also made much use of the invaluable documents recently discovered in the High Court Record-room." (Preface). উপরি-উক্ত উক্তি-গুলি তাঁহার গ্রন্থের preface বা ভূমিকা হইতে উদ্ধৃত হইল। কিন্তু তিনি গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের মধ্যে নবম বিষয়ে কি লিখিয়াছেন দেখুন :—

ব্রাহ্মণের বাস ছিল ; তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই রামগোপালের সহিত আহারাদি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য রামগোপালকে বড়ই মনঃকষ্টে কাল কাটাইতে

"That Sir J. Stephen has, in his recent book, The Story of Nuncomar and Impeachment of Sir Elijah Impey partly from the zeal of advocacy and partly from his having approached his subject without adequate preparation, without knowledge of Indian history or of the peculiarities of an Indian record, made grave mistakes in his account of the trial and in his observations thereon."

ইহা তাঁহার একটি প্রতিপাদ্য বিষয়, এবং তিনি তাহা সুন্দর রূপে প্রতিপাদনও করিয়াছেন। ঐ সমস্ত স্বাধীন অনুসন্ধান ব্যতীত তিনি আরও অনেক স্থান হইতে কাগজপত্র সংগ্রহ করিয়া অনুসন্ধান করিয়াছেন। তন্মধ্যে ঘোষসাহেব যাঁহার জীবনবৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, সেই নবকৃষ্ণের বংশধরের নিকট হইতেও কাগজপত্র সংগ্রহ করার কথা বেভারিজসাহেব ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং বেভারিজসাহেব যে স্বাধীন অনুসন্ধানের দ্বারা ঐরূপ মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন ; স্টিফেনের পর যখন মিল ও বার্ককে সমর্থন করার জন্য কোন কোন সহৃদয় ইংরেজ লেখককে অগ্রসর হইতে দেখিতেছি, তখন ঘোষসাহেবের কথা কি করিয়া বিশ্বাস করিতে পারি ? বেভারিজসাহেবের গ্রন্থ মহারাজ নন্দকুমার-সম্বন্ধে যে-গুরুতর আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে, তাহা পরবর্তী ইংরেজ ও বাঙ্গালী লেখকগণের কোন কোন গ্রন্থ হইতে বুঝিতে পারা যায়। আমরা এস্থলে একজন ইংরেজ লেখকের মত উদ্ধৃত করিতেছি।

"He (Nundakumar) was in his seventieth year when he entered into a struggle with Warren Hastings, the result of which is well known. In the year 1775, after trial in the Calcutta High Court, Nundakumar was convicted of forgery, and sentenced to be hanged. This case has given rise to endless discussion, and to the production of a work by Sir James Fitz James Stephen, in proof of the Maharaja's guilt. In reply to this, Mr. Beveridge, formerly of the Indian Civil Service, has published a volume which upholds the innocence of Nundakumar. I do not propose to enter into any controversy. Let those who wish to form an opinion read the available literature on the subject, *Personally I think with Mr. Beveridge, that the execution of Nundakumar was a grave miscarriage of justice.* It is one of the virtues of the past that is past and no good can come from a re-opening of the question." (Walsh's History of Murshidabad District, p. 223.) বস্টিডও বেভারিজের অনুসন্ধানের কথা উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই।

আর আধুনিক বাঙ্গালী লেখকগণের অভিমত ঘোষসাহেব নিজেই সমালোচনা করিয়াছেন। সুতরাং জেমস্ স্টিফেন প্রভৃতির গ্রন্থপাঠের পর ইংরেজ ও বাঙ্গালীর মধ্যে অনেকে এক্ষণেও মিল ও বার্কের বর্ণনাকে অশ্রদ্ধের বলিয়া মনে করেন না। তবে ঘোষসাহেবের মতাবলম্বিগণের কথা

হইত। রামগোপাল ভদ্রপুরে নূতন বাসভবন করিলেও জবুলের বাস একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই ; মধ্যে মধ্যে তথায়ও অবস্থিতি করিতেন। রামগোপালের

স্বতন্ত্র। আমরা এতক্ষণ জেমস্ স্টিফেনেরই বিষয় বলিলাম। ঘোষসাহেব অন্য যে দুই জন ঐতিহাসিকের কথা বলিয়াছেন, তাঁহারা যে এ বিষয়ে স্বাধীন অনুসন্ধান না করিয়া স্টিফেনের গ্রন্থের উপর অনেক স্থানে নির্ভর করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের গ্রন্থ পাঠ করিলে বুঝা যায়। ম্যালেসন বহুস্থলে সে কথা স্বীকার করিয়াছেন, যথা—

"In his admirable work, already quoted, Sir James Stephen has commented on the manner in which after Hastings had quitted the Council chamber, the majority had conducted their business." (Malleson's Life of Warren Hastings, p. 212.)

আর এক স্থানে বলিয়াছেন ঃ—

"From the above facts, which are incontestable, Sir James Stephen to whose summary I have been so much indebted, draws the following conclusions."

"It is, I think, impossible to dispute the logical accuracy of the conclusion arrived at by Sir James Stephen." (p. 227)

আবার বলিতেছেন ঃ—

"The curious reader will find these recorded and commented upon in the valuable work from which I have so often quoted." (p. 235)

এইরূপ অনেক স্থলেই আছে, সুতরাং ম্যালেসন যে এই বিষয়ে কোনরূপ স্বাধীন অনুসন্ধান না করিয়া, স্টিফেনের গ্রন্থই নির্ভর করিয়া আপনার মতামত নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ম্যালেসন একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক, এবং অনেক স্থলে তিনি নিরপেক্ষ মতও প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি স্টিফেনের চর্বিত চর্বণ ব্যতীত আর কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ফরেস্টও যে স্টিফেনকে অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই গ্রন্থ হইতে বুঝা যায়। তবে তিনি অনেকদিন সরকারী কাগজপত্র দেখাশুনা করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহা হইতে পূর্বপ্রকাশিত কাউন্সিলের বিবরণ ব্যতীত এ সম্বন্ধে তিনি নূতন কিছু আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার গ্রন্থ হইতে বুঝা যায় না, এবং ম্যালেসন ও ফরেস্ট হেস্টিংসের জীবনী লিখিতে আরম্ভ করায়, মেকেলের উক্তি-অনুসারে জীবনীলেখকেরা যে সকল কথায় বিশ্বাস করেন না, ইহাও বুঝিতে হইবে। অতএব নন্দকুমারের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া যাহারা তাঁহার সম্বন্ধে অনুকূল মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা যে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই, ইহা এক্ষণে আমরা অনায়াসে বলিতে পারি কিনা ? ঐ সমস্ত লেখক কিছু দেখাশুনাও করিয়াছেন, এবং কেবল কল্পনার আশ্রয় লইয়া কৈফিয়ৎ দ্বারা এড়াইতে চেষ্টা করেন নাই। তাঁহারা বিচক্ষণ লেখকদিগের মত অনুসরণ করিয়া এবং আপনারাও কিছু কিছু স্বাধীন অনুসন্ধানের দ্বারা নন্দকুমার সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। ঘোষসাহেব নন্দকুমারের প্রতিদ্বন্দ্বী নবকৃষ্ণের জীবনীলেখক হইয়া কতকটা যে পক্ষপাতিত্ব দোষে অন্ধ হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার নবকৃষ্ণচরিত্রে যতদূর কল্পনার খেলা দেখান হইয়াছে, এবং তিনি নবকৃষ্ণসম্বন্ধীয় অনেক ঘটনা কৈফিয়ৎ দ্বারা যেরূপ সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, নন্দকুমারের জীবনী-

কনিষ্ঠ পুত্র চণ্ডীচরণের প্রথমা পত্নীর গর্ভে পদ্মনাভের জন্ম হয়। এই পদ্মনাভই মহারাজ নন্দকুমারের পিতা। ভদ্রপুরেই মহারাজ নন্দকুমারের জন্ম হয়। তাঁহার

লেখকেরা ততদূর করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। তাঁহার লিখিত নবকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁহারই উক্তি প্রযোজ্য হইতে পারে। নবকৃষ্ণসম্বন্ধীয় সমস্ত ঘটনার উল্লেখ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তবে নন্দকুমারের সহিত যে যে স্থানে নবকৃষ্ণের সম্বন্ধ আছে, সেই সেই স্থানে ঘোষসাহেব কিরূপে নবকৃষ্ণকে সমর্থন করিয়াছেন, তাহা আমরা উল্লেখ করিয়া দেখাইব যে, তাঁহারই উক্তি তাঁহারও প্রতি প্রযোজ্য হইতে পারে কিনা?

ঐ সমস্ত ভণিতার পর শ্রীযুক্ত ঘোষসাহেব বলিতেছেন যে, কতকগুলি আধুনিক বঙ্গীয় লেখক নন্দকুমারকে একটি মহাপুরুষ করিয়া তুলিয়াছেন, এবং তাঁহারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, হেস্টিংস চক্রান্ত করিয়া ইম্পে সাহেবের দ্বারা নন্দকুমারকে বৈচারিক হত্যার বলিস্থানীয় করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখন-ভঙ্গী দেখিয়া বোধ হয়, যেন এই তত্ত্বটি আধুনিক বঙ্গীয় লেখকগণের মস্তিষ্কপ্রসূত। কারণ এই তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখকগণের কথা পর্যন্ত বলিতে তিনি বিস্মৃত হইয়াছেন। নন্দকুমার hero বা মহাপুরুষ, ইহা বাঙ্গালী লেখকগণের কল্পিত কথা নহে; তাহা বার্ক প্রভৃতি মনীষিগণ পূর্বে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আমরা পূর্বেই বার্কের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি, আবার উল্লেখ করিয়া দেখাইতেছি যে, ইহা বাঙ্গালী লেখকগণের মস্তিষ্কপ্রসূত উক্তি নহে; সহৃদয় ইংরেজের আন্তরিক বাণী। বার্ক বলিতেছেন, "The character here given of him is that of an excellent patriot." এবং বার্ক তাঁহাকে 'Great Rajah Nundcomar' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বেভারিজসাহেবেরও ঐরূপ মত। বাঙ্গালী লেখকগণের অপরাধ যে, তাঁহারা এই সকল সহৃদয় ইংরেজের বাণীর প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, বঙ্গদেশে নন্দকুমার সম্বন্ধে যে-বিশ্বাস আছে, বাঙ্গালী লেখকগণ তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয় খাতের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া, ঘোষসাহেব সাধারণ বঙ্গবাসীর হৃদয়ের কথা জানিবার অবকাশ পাইয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। তাহার পর হেস্টিংস যে ইম্পেসাহেবের সাহায্যে নন্দকুমারের হত্যা সম্পাদন করিয়াছিলেন, ইহাও কি আধুনিক বাঙ্গালী লেখকগণের মস্তিষ্কপ্রসূত? আর কেহ কি এ বিষয়ে কোন কথাই পূর্বে প্রকাশ করেন নাই? ঘোষসাহেব কি সে সমস্ত কথা অবগত নহেন? এক্ষণে আমরা ঐ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখকগণের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি যে, ইহা কেবল বাঙ্গালী লেখকগণের উক্তি নহে। নন্দকুমারের হত্যার একদিন পরে, কাউন্সিলের অন্যতম সভ্য ফ্রান্সিসসাহেব মান্দ্রাজে সার এডওয়ার্ড হিউজেস সাহেবকে লিখিয়াছিলেন ঃ—

Francis to Sir Edward Hughes at Madras, August 7, 1775.

"The death of Rajah Nundkumar, will probably surprise you. He was found guilty of a forgery committed seven or eight years ago : Condemned, executed on Saturday last. My brother-in-law in virtue of his office was obliged to attend him. Through every part of the ceremony he behaved himself with the utmost dignities and composure, and met his fate with an appearance of resolution, that approached to indifference. Strange judgments, I fancy, will be formed of this event in England. Whether he was guilty or not the crime

জন্মভবনের চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। নন্দকুমারের পূর্বপুরুষেরা ভদ্রপুরে বাস করিলেও অনেক দিন পর্যন্ত জবুলে তাঁহাদের পুরাতন বাসভবন বিদ্যমান ছিল।

---

laid to his charge, *I believe no man here has a doubt that, if he had never stood forth in politics, his other offences would not have hurt him.* This is a delicate subject, and rather open to speculation than discussion."

নন্দকুমারের মৃত্যুসময়ে লোকের মনে কিরূপ ধারণা হইয়াছিল, তাহা ফ্রান্সিস ব্যক্ত করিয়াছেন। তবে তিনি হেস্টিংসের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া ঘোষসাহেবের নিকট তাঁহার উক্তি অগ্রাহ্য হইতে পারে। আমরা কিন্তু তাহা অগ্রাহ্য করিতে সাহস করি না। তাহার পর ১৭৮৬ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত 'Transactions in India' নামক গ্রন্থে কিরূপ লিখিত হইয়াছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। গ্রন্থখানি হেস্টিংসের বিচারারম্ভের পূর্বেই লিখিত হইয়াছিল। উক্ত গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে ঃ—

"Circumstances were implicated in this transaction which roused and interested the feelings and attention of all considerate persons in both countries. A man of illustrious rank and distinction, suffering death for a crime not capital by the laws under which be lived, and punished in this manner, only in consequence of a foreign and posterior institution ; the commencement of the prosecution at the critical moment when Nundcomar stood forward to convict the Governor-General of the most abandoned prostitution of the authority, under which he filled the highest situation in the patronage of the company, the extreme unrelenting rigour with which the process was carried on, in direct violation of all those regards and decencies which the remotest antiquity and universal usage, had rendered, the virulent eagerness of Mr. Hastings, and his partizans to expose, to blacken, to criminate, and even to execute and vilify the character of an individual, thus hapless and degraded ; and the gross profusion of foul intemperate language which stamps every apology which has yet been offered for these proceedings, are premises on which few competent and impartial judges would be apt to conclude, that in this *political trial* no species of sympathy subsisted between the Governor-General and the Supreme Court. Justice, the subtle security of property and life, when impartially administered was in this instance converted into a dastardly engine of tyranny. (Transactions in India, pp, 246-48.)

তাহার পর বার্কের এ বিষয়ে কিরূপ মত, তাহা তাঁহার 'Impeachment of Warren Hasting' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে। তাঁহার মত উদ্ধৃত করিতে হইলে, গ্রন্থখানির অধিকাংশ

অদ্যাপি জগুল গ্রামে তাঁহাদের বাসস্থানের চিহ্ন বর্তমান আছে, এবং মহাতপ নামে একটি পুষ্করিণী তাঁহাদের পূর্ব বাসের পরিচয় দিতেছে !

উদ্ধৃত করিতে হয়। হেস্টিংসের বিচারে এই বিষয় সম্বন্ধে অন্যান্য মনীষীর মত Debbrette's History of the Trial of Warren Hastings, Minutes of Evidence of Hastings' Trial প্রভৃতি গ্রন্থে বিস্তৃত রূপে লিপিবদ্ধ আছে। তাহার পর মিল বলিতেছেন :—

"No transaction, perhaps, of this whole administration more deeply tainted the reputation of Hastings, than the tragedy of Nuncomar. At the moment when he stood forth as the accuser of the Governor-General, he was charged with a crime, alleged to have been committed five years before ; tried, and executed ; a proceeding which could not fail to generate the suspicion of guilt, and of an inability to encounter the weight of his testimony, in the man whose power to have prevented, or to have stopped (if he did not cause) the prosecution ; it is not easy to deny.

The severest censures were very generally passed upon this trial and execution ; and it was afterwards exhibited as matter of impeachment against both Mr. Hastings, and the judge who presided in the tribunal." (Mill's History of British India, Vol. III, p. 640). উইলিয়ম উইলবারফোর্সেরও ঐরূপ মত। মেকলে বলিতেছেন :—

"On a sudden, Calcutta was astounded by the news that Nuncomar had been taken up on a charge of felony, committed, and thrown into the common gaol. The crime imputed to him was that six years before he had forged a bond. The ostensible prosecutor was a native. But it was then, and still is, the opinion of every body, idiots and biographers excepted, that Hastings was the real mover in the business."

Of Impey's conduct it is impossible to speak too severely. We have already said that, in our opinion, he acted unjustly to respite Nuncomar. No rational man can doubt that he took this course in order to gratify the Governor-General. If we had ever had any doubts on that point, they would have been dispelled by a letter which Mr. Gleig has published. Hastings, three or four years later, described Impey as the man "to whose support he was at one time indebted for the safety of his fortune, honour, and reputation." These strong words can refer only to the case of Nuncomar ; and they must mean that Impey hanged Nuncomar in order to support Hastings.

খ্রীস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মহারাজ নন্দকুমারের জন্ম হয়। তাঁহার জন্ম-সময়েই হউক, অথবা কিছু পূর্বে বা পরেই হউক, শাহানশাহ আওরঙ্গজেব ইহলোক

It is therefore, our deliberate opinion that Impey, sitting as a judge, put a man unjustly to death in order to serve a political purpose." (Essay on Warren Hastings). Memoirs of Sir Philip Francis-প্রণেতা Merivale বলিতেছেন :—"Yet when Hastings, through Sir Elijah Impey, the chief justice, took Nuncomar's life by way of reply, Francis seems to have been paralysed by their determination. This judicial murder —for such it undoubtedly was—does not appear noted in his correspondence with any of that bitter indignation which was accustomed to lavish on for less flagrant subject." (Vol. II, p. 35.) বেভারিজ সাহেব গ্রন্থের নাম দিয়াছেন, The Trial of Maharaj Nandakumar, a Narrative of a Judicial murder, এবং তাঁহার তৃতীয় প্রতিপাদ্য বিষয়ে তিনি এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন ঃ—"That there is strong circumstantial evidence that Hastings was the real prosecutor." তাঁহার গ্রন্থে তিনি নানা প্রমাণ প্রয়োগের সহিত ইহা প্রতিপন্নও করিয়াছেন। ১৯০২ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত ওয়াল্‌শ্‌ সাহেবের মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। আবার এ স্থলেও ওয়াল্‌শ্‌ সাহেবের মত উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতেছে। "Personally I think with Mr. Beveridge that the execution of Nundakumar was grave miscarriage of justice." (Walsh's History of Murshidabad District, p. 223.)

১৭৭৫ খ্রীঃ অব্দের ৫ই আগস্ট তারিখে মহারাজের হত্যা সম্পাদিত হয়। উক্ত অব্দের ৭ই আগস্ট তারিখের পর হইতে ১৯০২ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত ইংরেজ লেখকগণের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমরা সাধারণের নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি, ইহা কি আধুনিক বাঙ্গালী লেখকগণের মস্তিষ্কপ্রসূত যে, হেস্টিংস ইম্পের সাহায্যে মহারাজের হত্যাকাণ্ড সম্পাদন করাইয়াছিলেন? আধুনিক বাঙ্গালী লেখকগণ কেবল কি কারণে ঘোষসাহেরেব সমালোচ্য হইলেন, তাহা ঘোষ-সাহেবই বলিতে পারেন। ফলতঃ ইহা বাঙ্গালী লেখকগণের কল্পিত উক্তি নহে। নন্দকুমারের মৃত্যু হইতে আজ পর্যন্ত সাধারণের এইরূপই বিশ্বাস। মেকলের কথানুসারে নির্বোধ ও জীবনীলেখকগণই কেবল ইহাতে অবিশ্বাস করিতে পারেন। ঘোষসাহেব যে শেষোক্ত শ্রেণীভুক্ত, তাহা বোধ হয়, স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে না। তাহার পর ঘোষসাহেব বলিতেছেন যে, নন্দকুমার ঐ সকল লেখকগণের বিচারে স্বদেশহিতৈষিতার জন্য জীবন বলি দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নন্দকুমারকে কেবল যে আধুনিক বাঙ্গালী লেখকগণ martyr বা দেশহিতার্থে হত বলেন, তাহা নহে। সাধারণ লোকের তাহাই বিশ্বাস। এস্থলেও আমরা ওয়াল্‌শ্‌ সাহেবের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি,—"Mr. Justice Beveridge has pointed out that the execution of Nundakumar was a judicial murder; and the popular feeling is that he was a *martyr*." (Walsh's History of Murshidabad District, p. 222.) বার্ক বলিতেছেন, "The character here given of him is that of an excellent patriot." (Impeachment of Warren Hastings.) যদি দেশের লোকের বিশ্বাস ও সহৃদয় ইংরেজগণের উক্তি অবলম্বন

পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ভারতের চতুর্দিকে ঘোর রাজনৈতিক বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গলারাজ্য তৎকালে কার্যদক্ষ নবাবাগ্রণী মুর্শিদকুলীর তর্জনীতাড়নে স্থিরভাবে শাসিত হইতেছিল। মুর্শিদকুলীর রাজস্ববন্দোবস্ত বাঙ্গলার ইতিহাসের একটি সর্বপ্রধান ঘটনা। তাঁহার রাজস্বকার্যের জ্ঞান ও দক্ষতা তৎকালে

করিয়া বাঙ্গালী লেখকগণ নন্দকুমারকে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, তাঁহারা যে একটি গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন, ইহা বোধ হয় কেহই বিবেচনা করিবেন না। তাহার পর ঘোষসাহেব বলিতেছেন যে, উক্ত লেখকগণের মতে নন্দকুমার যে কেবল ব্রাহ্মণসমাজের নেতা ছিলেন এমন নহে, কিন্তু বঙ্গদেশস্থ সমস্ত হিন্দু-জাতির অন্ততঃ সমস্ত বাঙ্গালী হিন্দুব নেতা ছিলেন। হিন্দুদিগের ভগ্ন যন্ত্র ও শক্তি তাঁহাতেই পুনর্মিলিত হইয়াছিল; অন্ততঃ তাঁহারই জন্য ধ্বংসমুখে পতিত মুসলমান শাসনকর্তৃগণের শক্তি সঞ্জীবিত হইতেছিল, এবং তিনি বৈদেশিকগণের হাত হইতে স্বদেশ রক্ষা করিয়া একটি মিলিত জাতি ও রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতৃরূপে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। ইহাও বাঙ্গালী লেখকগণের কথা নহে। নন্দকুমার যে তাৎকালিক বঙ্গীয় হিন্দুগণের নেতা ছিলেন, তাহা নবকৃষ্ণের জীবনীলেখক ব্যতীত আর সকলেই স্বীকার করিবেন, এবং তিনি যে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অন্যতম নেতা ছিলেন, তাহাও প্রকৃত কথা। কলিকাতার ন্যায় নবপ্রতিষ্ঠিত নগরের নবসমাজে কর্তৃত্ব করিয়া যদি কেহ কেহ বঙ্গীয় হিন্দুগণের নেতৃস্বরূপে উত্থিত হইতে পারেন, তাহা হইলে, হিন্দু, বৌদ্ধ, পাঠান ও মোগল, পরিশেষে ইউরোপীয়গণের অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদে রাঢ়ীয়. বারেন্দ্র প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণশ্রেণীর ও উত্তররাঢ়ীয় প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত কায়স্থগণেব দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত প্রাচীন সমাজে একাধিপত্য করিয়া মহারাজ নন্দকুমার যদি হিন্দু বা ব্রাহ্মণসমাজের নেতা না হন, তাহা হইলে এদেশের লোকের যে বিচারশক্তি একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে, ইহা ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? যিনি আপনার রাজনৈতিক প্রতিভাবলে ক্রমে তাৎকালিক হিন্দুর পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ পদ নবাব-নাজিমের দেওয়ানী পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমস্ত বঙ্গরাজ্যের রাজস্ব বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তিনি যদি হিন্দুসমাজের নেতা না হন, তাহা হইলে আর কে হইতে পারে, তাহা আমরা বলিতে পারি না। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বা মহারানী ভবানীর ন্যায় নন্দকুমার সামাজিক ভাবে সমস্ত ব্রাহ্মণসমাজের নেতা না হইলেও, তিনি যে মুর্শিদাবাদের ব্রাহ্মণসমাজের নেতা ছিলেন, ইহা সত্য কথা। তাঁহারই সম্মানের জন্য অদ্যাপি তাঁহার দৌহিত্রবংশীয়েরা প্রাচীন সৈদাবাদ-সমাজের সমাজপতিরূপে পরিগণিত। ব্রাহ্মণসমাজের অন্যতম নেতা হওয়ায় ও রাজনৈতিক প্রতিভায় বাঙ্গালীগণের সর্বশ্রেষ্ঠ হইযা সর্বশ্রেষ্ঠ পদ লাভ করায় তিনি যে হিন্দুসমাজেরও নেতা হইয়াছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। সাহেবেরা তাঁহাকে ব্রাহ্মণসমাজের নেতা বলিয়াই জানিতেন। আমরা একজনের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।—

"The privileges of Brahmins are deemed, in every part of India inviolable. They commute capital punishment and are exempted, by what may be called the common law of the country, from every species of personal outrage. *Nuncomer was at the head of this sacred cast,* whom the Hindoos regard everywhere with idolatrous veneration." (Transaction in India, p. 245.)

বাঙ্গলারাজ্যে প্রবাদবাক্যের ন্যায় প্রচলিত হইয়াছিল এবং সকলেই তৎকালে মুর্শিদকুলীর দৃষ্টি-আকর্ষণের জন্য রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যুৎপত্তি দেখাইতে চেষ্টা

তৎকালে মহম্মদ রেজা খাঁ মুসলমানসাধারণের ও নন্দকুমার হিন্দুসাধারণের যে মুখপাত্র ছিলেন, তাহা সকল ঐতিহাসিকই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। তাহার পর নন্দকুমার যে বৈদেশিকগণের হস্ত হইতে স্বদেশ ও স্বীয় প্রভু মীরজাফরের উদ্ধারসাধনের জন্য চেষ্টা করিয়া ইংরেজজাতির চক্ষুঃশূল হইয়াছিলেন, ইহা জলন্ত সত্য—আধুনিক বাঙ্গালী লেখকগণের কল্পিত উক্তি নহে। যাঁহারা সে সময়ের ইতিহাস বা কাগজপত্র পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিবেন। আমরা প্রথমতঃ তাঁহার সম্বন্ধে হেস্টিংস কিরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

"He (Mr. Hastings) thinks it but justice to make a distinction between the violation of a trust, and an offence committed against our government, by a man who owed it no allegiance, nor was indebted for protection ; but on the contrary, was the actual servant and minister of a master whose interest naturally suggested that kind of policy which sought by foreign aids, and the diminution of the power of the Company, to raise his own consequence and re-establish his authority. He has never been charged with any infidelity to the Nabob Meer Jaffir, the constant tenor of whose politics, from his first accession to the nizamat till his death correspond in all points so exactly with the artifices which were detected in his minister, that they may be as fairly ascribed to the one as to the other ; their immediate object was, beyond question the aggrandisement of the former, though the latter had ultimately an equal interest in their success. The opinion which the Nabob himself entertained, of the services and of the fidelity of Nuncomar evidently appeared, in the distinguished works which he continued to shew him of his favour and confidence to the latest hour of his life. His conduct in the succeeding administration appears not only to have been dictated by the same principles, but if we may be allowed to speak favourably of any measures which oppose the views of our government, and aimed at the support of our adverse interest, surely it was not only *not* culpable but even *praise-worthy.* He endeavoured (as appears by the extracts before us) to give consequence to his Master, and to pave the way to his independence by attaining a firman from the king for his appointment to the subaship ; and he opposed the promotion of Mahamed Raza Cawn because he looked upon it as a supercession of the rights and authority of the Nabob." (Extract of the proceedings of the Committee of Circuit at Cossimbazar, dated 28th of July 1772).

পাইতেন। মহারাজ নন্দকুমারের পিতা পদ্মনাভও রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয়ে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং নন্দকুমারকেও বাল্যকাল হইতে সেই বিষয়ে শিক্ষিত হওয়ার

তাহার পর বার্কের পূর্বোল্লিখিত উক্তি পুনরুদ্ধৃত করিলে, বোধ হয় এ বিষয়ের পর্যাপ্ত প্রমাণ প্রদর্শিত হইবে। "and the general obloquy of the English nation, was an account of his *attachment to his own prince and the liberties of his country*.

The character here given of him is that of an excellent patriot, on character which all your lordships in the several situations which you enjoy, or to which you may be called will envy ; the character of servant who stuck to his master against all foreign encroachment who stuck to him to the last hour of his life, and had the lying testimony of his master to his services." (Impeachment of Warren Hastings). সুতরাং মহারাজ নন্দকুমার যে স্বীয় প্রভুর ও স্বদেশের উদ্ধারার্থ ইংরেজগণের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়া অবশেষে জীবন বলি দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ইহাও আধুনিক বাঙ্গালী লেখকগণের কল্পিত উক্তি নহে। তাহার পর নবকৃষ্ণসম্বন্ধে ঘোষসাহেব উক্ত লেখকগণের যে মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, সকলের ঐ প্রকার কঠোর মত না হইলেও, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি যে-কোন বিষয়ে মহারাজ নন্দকুমারের সমকক্ষ ছিলেন না, ইহাও কাল্পনিক কথা নহে। যাঁহারা নিরপেক্ষ, তাঁহারা দুই জনেরই ক্ষমতা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন ; তজ্জন্য আমরা অপ্রীতিকর বিষয়ের অবতারণা করিয়া গ্রন্থ কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করি না। তবে তিনি যে নন্দকুমারের বিচারের সময় সাক্ষ্যপ্রদানে প্রতিদ্বন্দ্বীর ভাব দেখাইয়াছিলেন, ঘোষসাহেব সহস্রপ্রকারে তাহার সমর্থনের চেষ্টা করিলেও নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রকেই উহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমরা যথাস্থানে সে সম্বন্ধে ঘোষসাহেবের উক্তির আলোচনা করিব। ইহার পর ঘোষসাহেব বলিতেছেন, —নন্দকুমার সম্বন্ধে উক্ত লেখকগণের যে মত উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা ইতিহাস নহে, কিন্তু সুন্দর উপাখ্যান। লেখকগণ অধিক পরিমাণে কল্পনা আশ্রয় করিয়াছেন, এবং তাঁহারা প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা পরিত্যাগ করিয়া আপনার ইতিহাসের সৃষ্টি করিয়াছেন। ঘোষসাহেবের এই উক্তিগুলি যে অতিসাহসের কথা তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা উপরে যে সমস্ত বিষয়ের প্রমাণ প্রদর্শন করিলাম, তাহা হইতে সাধারণে বিচার করিয়া দেখিবেন যে, বাঙ্গালী লেখকগণ প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা নির্দেশ করিয়াছেন, কি তাঁহারা ইতিহাসের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার পর ঘোষসাহেব তাঁহার মহাপুরুষসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহারও দুই এক স্থান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি যে, বাঙ্গালী লেখকগণ তথাকথিত ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছেন, কি ঘোষসাহেব উক্ত ইতিহাসসৃষ্টির পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। ঘোষসাহেব নবকৃষ্ণ-সম্বন্ধে বলিতেছেন— "Maharaja Nubkissen was the maecenas of Bengal. *There never was in this province a more munificent or more enthusiatic patron of letters and the fine arts*. His home was the favourite resort of men of learning. *His sabha (Association) of Pandits was pre-eminently the first in the land. It has been popularly compared to the famous councils of Vikramaditya*. It included men like Jugannath Tarkapanchanan, Vaneswar Vidyalankar, Radhakant Tarkabagish

জন্য সর্বদা যত্ন করিতে বলিতেন। অল্পকাল হইতে নন্দকুমারের বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল। তিনিও পিতার ন্যায় রাজস্ববিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে লাগিলেন।

Sreekant, Kamalakant, Balaram and Sunkar." (p. 184) হায়! মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, হায়! মহারানী ভবানী, তোমাদের নাম পর্যন্তও কি এক্ষণে এই হতভাগ্য বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে? তাই নবকৃষ্ণের জীবনীলেখকের অন্তঃকরণে নিমেষের জন্য তোমাদের কথাটি পর্যন্ত উদিত হয় নাই! শ্রীকান্ত, কমলাকান্ত, বলরাম, শঙ্কর, তোমরা কি নবকৃষ্ণের সভাসদ্ ছিলে? কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত কি তোমাদের কোনই সম্বন্ধ ছিল না? হায়! কৃষ্ণচন্দ্র, তোমার সভাকে যে বঙ্গবাসিগণ চিরকাল বিক্রমাদিত্যের সভা বলিয়া থাকে, এতদিনে তুমি বুঝি তোমার সেই উপাধি হইতে বিচ্যুত হইলে! তোমার বংশধর আজিও নবদ্বীপ পণ্ডিতসমাজের কর্তা বলিয়া দেশপূজ্য হইলে কি হইবে? আজ নবকৃষ্ণের জীবনীলেখক নবকৃষ্ণকে কেবল নন্দকুমারের নহে, তোমাদের অধিকৃত স্থানে বসাইয়া জগতে ঐতিহাসিক সত্যপ্রচারে ব্রতী হইয়াছেন! আজ ইংলণ্ডের নরনারীগণের নিকট তিনি নব ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রচার করিতেছেন। এদেশের লোকেরা আজিও তাহার বর্ণনা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে কি না বলিতে পারি না। অথবা হতভাগ্য বঙ্গদেশে সমস্তই সম্ভবযোগ্য হইতে পারে। এক্ষণে সাধারণকে জিজ্ঞাসা করি, ঘোষসাহেবের উপরি-উক্ত বর্ণনা কি ঐতিহাসিক সত্য, না উহা আরব্য উপন্যাস? যিনি এইরূপ ঔপন্যাসিক বর্ণনাকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা মনে করেন না, তিনি কোন্ সাহসে অন্য লেখকদিগের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করেন, তাহা সাধারণে বলিয়া দিতে পারেন কি? আবার Nubkissen and the English Conquest নামক অধ্যায়ে ঘোষসাহেব বলিতেছেন:—"What learned historians have been able to observe after a long and careful observation, Nubkissen saw at once with the shrewd eye of a practical statesman. Nubkissen, so far as he helped the consummation, did so out of the same necessity which compelled Englishmen to invite William of Orange to occupy the throne rendered vacant by the constructive abdication of James II.

Nubkissen was carried along the tide; at the same time he was one of the chief forces that contributed to the consummation, posterity has no reason to regret his policy or his actions, on the contrary, it should be grateful for his services." হায় জগৎশেঠ মহাতবচাঁদ, হায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, ইতিহাসে যে তোমাদিগকে ভারতে ব্রিটিশরাজ্যস্থাপনের মূল বলিয়া পাঠ করিয়া থাকি। কিন্তু এক্ষণে ঘোষসাহেবের নিকট নূতন ঐতিহাসিক তত্ত্ব অবগত হইতে হইতেছে। আমরা ঘোষসাহেবকে জিজ্ঞাসা করি, কোন্ ইতিহাস বা প্রবাদানুসারে তিনি এই সমস্ত ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করিলেন, তাহা আমাদিগকে বলিয়া দিতে পারেন কি? গবর্নমেণ্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগে বা পররাষ্ট্র বিভাগে, অথবা বোর্ড অব রেভিনিউ-এর কোন্ কাগজে, অথবা অর্মে, স্টুয়ার্ট বা মিল কোন্ ঐতিহাসিকের গ্রন্থে, কিংবা হলওয়েল, স্ক্রাফ্টন, পার্কার, ভান্সিটার্ট, ভেরেলস্ট, বোল্টস্ কাহার বর্ণনামধ্যে এ সত্যটি অন্তর্নিহিত আছে যে, ভারতের বা বাঙ্গলার কল্যাণের জন্য ইংরেজদিগকে আহ্বান করা নবকৃষ্ণের রাজনৈতিক মস্তিষ্কে প্রথমে প্রবেশলাভ করিয়াছিল? মাসিক ৬০ টাকা বেতনের মুন্সীর যে এরূপ রাজনৈতিক

পদ্মনাভের রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা থাকায়, তিনি সরকারের কার্যে নিযুক্ত হন। ক্রমে ক্রমে তিনি আমীনের কার্যে নিযুক্ত হইয়া ফতেসিংহ, ঘোড়াঘাট

শক্তি ছিল, তাহা আমরা এই প্রথম শুনিলাম। নবকৃষ্ণ যে ৬০ টাকা বেতনের মুন্সী ছিলেন, ঘোষসাহেব তাহা অস্বীকার করিলেও আমরা হীরাঝিল প্রবন্ধে তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি। আমরা কি এক্ষণে ঘোষমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে, ইহা ইতিহাস না উপন্যাস? ইহা যদি উপন্যাস না হইয়া ইতিহাস হয়, তবে আধুনিক বাঙ্গালী লেখকগণের যে মহাপরাধ হইয়াছে, তাহা বোধ হয় কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি স্বীকার করিবেন না। নবকৃষ্ণসম্বন্ধে ঘোষ-মহাশয়ের অন্যান্য উক্তি তুলিয়া তাহার সমালোচনায় আমরা অপ্রীতিকর বিষয়ের অবতারণা করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু ঘোষমহাশয়কে আমরা পুনর্বার বলিতেছি যে, যিনি স্বীয় গ্রন্থের প্রতিপত্র অতিরঞ্জনের তুলিকা দ্বারা অঙ্কিত করিয়া স্বীয় নায়ককে মহাপুরুষ করিয়া তুলিয়াছেন, অন্য লেখকদিগের ঐতিহাসিক ঘটনা পরিত্যাগ করার জন্য ও নব ঐতিহাসিক ঘটনা সৃষ্টি করার জন্য দোষারোপ করা তাঁহার পক্ষে অতিসাহসের কার্য বলিয়াই অনুমিত হয়। তাহার পর নন্দকুমার সম্বন্ধে তিনি যেরূপ অনুদার মন্তব্য প্রকাশ করিয়া, তাঁহাকে যে সমস্ত বিশেষণে বিভূষিত করিয়াছেন, এবং তন্মধ্যে দুরাত্মা বা villain কথাটি প্রয়োগ করিয়া যেরূপ চূড়ান্ত অনৌদার্য দেখাইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমরা অধিক কি বলিব, তাহা সাধারণের কিরূপ রুচিকর হয় তাহা তাঁহারাই বুঝিবেন। নন্দকুমারের শত্রুপক্ষীয় দুই এক জন ইংরেজ ব্যতীত কোন নিরপেক্ষ লেখক এমন কি মেকলের ন্যায় লেখকও নন্দকুমারকে দুরাত্মা বা villain বলিয়া অভিহিত করেন নাই। প্রায় সার্ধশত বৎসর পূর্বে মৃত একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রতি এরূপ অনুদার মন্তব্য ঘোষসাহেবের ন্যায় বিচক্ষণ লেখকের লেখনী হইতে কিরূপে বহির্গত হইল, তাহা ভাবিতেও কষ্ট ও বিস্ময় উপস্থিত হয়। পাইওনিয়ারপ্রমুখ ইংরেজ সম্পাদকদিগেরও তাহা রুচিকর হয় নাই। নবকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, শিবাজী বা প্রতাপসিংহ হউন, ক্ষতি নাই; কিন্তু তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে যে দুরাত্মা বলিয়া অভিহিত করিতে হইবে, ইহা কি নিরপেক্ষ, উদার জীবনীলেখকের কর্তব্য? ঘোষসাহেব নন্দকুমারের ক্ষমতাও মধ্যবিধ বা সাধারণ রকমের ছিল বলিতেও ত্রুটি করেন নাই; একথা কিন্তু তাঁহার কোন শত্রুও বলে নাই। তাঁহার ক্ষমতা অসীম ছিল বলিয়াই তাঁহার ঐরূপ দুর্দশা ঘটিয়াছিল। সুতরাং ইহাও ঘোষসাহেবের ঐতিহাসিক সত্য নহে। তাহার পর তিনি নন্দকুমার ও মীরজাফরের সম্বন্ধের বিষয় উল্লেখ করিয়া মীরজাফরের যে প্রাধান্য দিয়াছেন, তাহাও ঐতিহাসিক সত্য নহে। পূর্বোল্লিখিত হেস্টিংসের মন্তব্য হইতে তাহা সাধারণে বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। ইহার পর ম্যালেসন ও মেকলে হইতে দুইচারি পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করিয়া ঘোষসাহেব বলিতেছেন যে, এইরূপ মতসামঞ্জস্যের পর কি বাঙ্গালীরা নন্দকুমারকে আপনার জাতির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিবে? দুইজন ইংরেজের মতসামঞ্জস্যে যদি নন্দকুমার দূরীভূত হন, হউন, ক্ষতি নাই; কিন্তু ঘোষসাহেবের মহাপুরুষ কয়জনের মতসামঞ্জস্যে দণ্ডায়মান হইবেন, তাহাও আমরা একবার জিজ্ঞাসা করিয়া রাখি। ঘোষসাহেব মেকলের মন্তব্যসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পর্যাপ্ত মন্তব্য নহে বলিয়া আমাদের ধারণা। কারণ মেকলে ইংরেজের সহিত ইটালীয়ের যে সম্বন্ধ, অন্য বাঙ্গালীর সহিত নন্দকুমারের সেইরূপ সম্বন্ধ বলিলেও তখন সমস্ত বাঙ্গালী জাতির চিত্র অঙ্কিত করিয়া নন্দকুমারে সেই চিত্র শরীরী হইয়াছিল বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তখন ঘোষসাহেব নন্দকুমারকে কালিমা-মণ্ডিত করিয়া অন্য বাঙ্গালীকে বিশেষতঃ তাঁহার নায়ককে উজ্জ্বল করিয়া তুলিলে

ও সাতসইকা পরগণার রাজস্বসংগ্রহের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মুর্শিদকুলী খাঁ অনেক জমিদারের হস্ত হইতে জমিদারী গ্রহণ করিয়া তৎসমুদায়ের রাজস্বসংগ্রহার্থ কতকগুলি আমীন নিযুক্ত করেন। যদিও পরিশেষে তিনি ও তাঁহার পরবর্তী নবাবগণ

পর্য্যাপ্ত হইতেছে না। আমরা মেকলের বর্ণনার ঘোরতর বিরোধী হইলেও তিনি বাঙ্গালীর সম্বন্ধে যাহা চিত্র করিয়াছেন, অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনেকগুলি প্রধান প্রধান বাঙ্গালী চরিত্রে যে তাহার কিয়দংশ প্রতিফলিত হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। নন্দকুমারে যদি সে দোষ বর্তিয়া থাকে, তাহা হইলে অন্যান্য বাঙ্গালী বিশেষতঃ তাঁহার নায়ক যে অব্যাহতি পাইবেন, ইহা ঘোষসাহেব বলিতে পারেন, কিন্তু কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি তাহা স্বীকার করিবেন না। ম্যালেসনও সত্য কথা বলিয়াছেন যে, বঙ্গের রাজধানী মুর্শিদাবাদে বহুদিন পর্যন্ত ষড়যন্ত্র চলিয়াছিল, এবং উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণও তাহা পরিচালন করিতেন। বাস্তবিক তখন বাঙ্গালীসাধারণের না হইলেও, রাজকার্যে নিযুক্ত প্রধান প্রধান বাঙ্গালীদিগের যেরূপ নৈতিক দুরবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহাতে রাজকার্যে নিযুক্ত ব্রাহ্মণগণেরও যে অধঃপতন ঘটিয়াছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কারণ নন্দকুমারকেও ব্রাহ্মণগণের সারল্য পরিত্যাগ করিয়া কূটনীতি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। ইহাকে আমরা ব্রাহ্মণের পক্ষে অবনতি ব্যতীত আর কি বলিতে পারি? ঘোষসাহেব মেকলে ও ম্যালেসনের মন্তব্য নন্দকুমারের স্কন্ধে চাপাইয়া অন্যান্য বাঙ্গালীকে ও তৎসঙ্গে স্বীয় নায়ককে যেরূপ রক্ষা করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহাও প্রকৃত ঐতিহাসিকের কার্য নহে। নবকৃষ্ণসম্বন্ধেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ ও বাঙ্গালীগণের মধ্যে অনেকের বিরুদ্ধ মত ছিল, তাহাও অবগত হওয়া যায়। নবকৃষ্ণসম্বন্ধে অপ্রীতিকর বিষয়ের উল্লেখ করার ইচ্ছা না থাকিলেও ঘোষসাহেবের উক্তির উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনবোধে আমরা বার্ক প্রভৃতির বাক্য উদ্ধৃত না করিয়া কেবল এই স্থলে জনৈক নিরপেক্ষ উচ্চপদস্থ ইংরেজের মত মাত্র উদ্ধৃত করিয়া সাধারণকে দেখাইতে ইচ্ছা করিতেছি। ইংলণ্ডে হেস্টিংসের নামে ভিন্ন ভিন্ন অভিযোগের যে বিচার হইয়াছিল, তন্মধ্যে একটি বিষয় ছিল যে, তিনি নবকৃষ্ণের নিকট হইতে ৩ লক্ষ টাকা উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছিলেন। হেস্টিংস বলিয়াছিলেন যে, প্রথমে তিনি তাহা ঋণস্বরূপে গ্রহণ করেন; কিন্তু পরিশেষে দেখা যায় যে, তাহা হেস্টিংসের বা কোম্পানীর উপহারস্বরূপে পরিণত হইয়াছিল। এই বিষয়ের মন্তব্য প্রকাশচ্ছলে ইংলণ্ডের লর্ড চান্সেলার লর্ড লফবরো যাহা বলিয়াছিলেন, আমরা কেবল তাহারই কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি।

"His Lordship said, it was scarcely in the human imagination to conceive in possibility a transaction more unaccountable, more scandalous, or more unjustifiable in a Governor-General to such an individul as Nubkissen. He says in his defence he wanted money, and he sent to a notorious money-lender to borrow three lacks of rupees. The man comes, brings him the three lacks, and when he is about to fill up the bonds, he desires him rather to accept the money than execute the bonds." (Debate of the House of Lords, on the evidence delivered in the Trial of Warren Hastings Esquire, pp. 176-77)। রাজকার্যে নিযুক্ত অধিকাংশ বাঙ্গালীর অনেক পরিমাণে অবনতি ঘটিয়াছিল বলিয়াই আমরা ইংলণ্ডের উচ্চপদস্থ লোকদিগের মুখ হইতে ঐরূপ মন্তব্য শুনিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। বাস্তবিকই তৎকালে বঙ্গদেশের পদস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে একটি অবনতির স্রোত

জমিদারদিগের মধ্যে অনেককে নিজ নিজ জমিদারী প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন, তথাপি আমীনী পদের একেবারে লোপ হয় নাই। পদ্মনাভ মুর্শিদকুলী কিংবা তাঁহার পরবর্তী কোন্ নবাবের সময়ে উক্ত পরগণাত্রয়ের আমীনী পদে প্রথম নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। উক্ত পরগণাত্রয় হইতে ২।।০ লক্ষ টাকার রাজস্ব আদায় করিতে হইত। ফতেসিংহ এক্ষণে মুর্শিদাবাদ জেলায় রহিয়াছে; কিন্তু ঘোড়াঘাট রঙ্গপুরের ও সাতসইকা বর্ধমানের অন্তর্ভূত হইয়াছে। পদ্মনাভ রাজস্ব-সংগ্রহকার্যের সহায়তার জন্য পুত্র নন্দকুমারকে নিজের নায়েব বা সহকারী নিযুক্ত করেন।

রাজস্ববিষয়ে নন্দকুমারের দক্ষতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকায়, নবাব আলিবর্দী খাঁর রাজত্বসময়ে তিনি হিজলী ও মহিষাদলের আমীন নিযুক্ত হইয়া উক্ত পরগণাত্রয়ের রাজস্বসংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। সরকারের আয় বৃদ্ধি দেখাইতে চাহিলে, জমিদার ও প্রজাদিগের সুবিধার প্রতি হস্তক্ষেপ না করিলে চলে না। নন্দকুমার সরকারের আয় বৃদ্ধি করিতে গিয়া নিজেই মহাবিপদে পতিত হইলেন। আলিবর্দীর সময়ে রায়রায়ান চায়েন রায় খালসার দেওয়ানীপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। জমিদার ও প্রজারা তাঁহার নিকট নন্দকুমারের নামে অভিযোগ উপস্থিত করে এবং সেই সময়ে

প্রবাহিত হইযাছিল। সেইজন্য স্টিফেনসাহেব নন্দকুমারের প্রতি একটু উদারতা দেখাইয়া সত্য সত্যই বলিয়াছেন—

"Of all the provinces of the Empire none was so degraded as Bengal and till he was nearly sixty years old Nuncomar lived the worst and most degraded part of the unhappy Province."

ফলতঃ তৎকালে বাঙ্গলার ন্যায় ভারত-সাম্রাজ্যের কোন প্রদেশে এরূপ নৈতিক অবনতি ঘটে নাই। নন্দকুমার সেই দেশে অবস্থিতি করার জন্য যে কূটনীতি অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণজনসুলভ সারল্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু তাঁহার শত্রুপক্ষ বা হেস্টিংসের জীবনী-লেখকগণ অথবা ঘোষসাহেব নন্দকুমারকে যেরূপ ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, আমরা এক্ষণেও সাহস-সহকারে বলিতেছি যে, তাহা নন্দকুমারের প্রকৃত চরিত্র নহে। অষ্টাদশ শতাব্দীর অবনত বাঙ্গালীগণের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া তিনি যে প্রভুভক্তি ও স্বদেশবাৎসল্য দেখাইয়াছিলেন, তাঁহার সহস্র দোষ থাকিলেও কেবল উক্ত দুই শ্রেষ্ঠ গুণের জন্য তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলা যাইতে পারে। যিনি ওয়াট্‌সনের নাম জাল এবং আমীরচাঁদের সর্বনাশ সাধন করিয়া তাহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, এবং যিনি চেৎসিংহের ও অযোধ্যার বেগমের প্রতি অত্যাচার ও দুই হস্তে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া আপনার মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁহারা যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতৃরূপে ব্রিটিশ নরগণের নিকট গৌরবের পাত্র হইতে পারেন. তাহা হইলে স্বীয় প্রভু ও স্বদেশের কল্যাণের জন্য যিনি ইংরেজ জাতির চক্ষুঃশূল হইয়া আপনার জীবন বলি দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাঁহার অন্যান্য দোষ থাকিলেও তাঁহাকেও বাঙ্গালী জাতির গৌরবের স্থল বলিয়া জগতের সমক্ষে, প্রকাশ করা অন্যায় বলিয়া আমরা বিবেচনা করি না।

নন্দকুমারের নিকট সরকারের প্রায় ৮০ হাজার টাকা পাওনা হয়। নন্দকুমারের শত্রুগণ মনে করিতে পারেন যে, নন্দকুমার উক্ত টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক নন্দকুমার তাহা করেন নাই। রাজস্ববিষয়ে কার্য করিতে গেলে, যেরূপ প্রভু ও কর্মচারীর মধ্যে দেনাপাওনা হয়. নন্দকুমারের নিকট সেরূপই পাওনা হইয়াছিল। তৎকালে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যাইত; অনেক কর্মচারীর নিকট মৃত্যুসময় পর্যন্ত টাকা পাওনা থাকিত। বাঙ্গলার রাজস্ববিভাগের প্রধান কাননগো বঙ্গাধিকারিগণের ফার্মানে আমরা ইহার প্রমাণ দেখিতে পাই। কোন বঙ্গাধিকারী প্রধান কাননগো পদে নিযুক্ত হওয়ার সময় যে ফার্মান বা নিয়োগপত্র প্রাপ্ত হইতেন, তাহার পূর্বে তাঁহাকে তাঁহার পূর্বপুরুষগণের নিকট প্রাপ্য সমস্ত সরকারী অর্থ পরিশোধ করিতে হইত। পরে তাঁহারা আপনার নিয়োগসম্বন্ধে নজর দিয়া উক্ত ফার্মান প্রাপ্ত হইতেন। সুতরাং রাজস্ববিভাগের কার্য করিতে গেলে, এরূপ দেনাপাওনা নিকাশের পূর্ব পর্যন্ত প্রায়ই থাকিয়া যায়। বর্তমান সময়েও এইরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

নন্দকুমারের নামে অভিযোগ উপস্থিত হইলে, চায়েন রায় আর তাঁহাকে উক্ত পদে রাখিতে ইচ্ছা করেন নাই। তিনি নন্দকুমারকে মুর্শিদাবাদে আহ্বান করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সরকারের প্রাপ্য টাকার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। সহসা রাজস্ববিভাগের কার্য হইতে অপসৃত হইলে, অর্থ সংগ্রহ করা হয় না; এই জন্য নন্দকুমারকে অত্যন্ত কষ্টে পতিত হইতে হয়। রায়রায়ানও তাঁহার প্রতি অযথা অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। পুত্রের দুরবস্থার কথা শুনিয়া পদ্মনাভ নিজে সমস্ত অর্থ পরিশোধ করিয়া নন্দকুমারকে লাঞ্ছনা হইতে অব্যাহতি প্রদান করেন। নন্দকুমারের শত্রুপক্ষীয়েরা বলিয়া থাকেন, পদ্মনাভ সেই সময়ে নন্দকুমারের প্রতি এতদূর বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, তদবধি আর তাঁহার মুখদর্শন করিতেন না।[৫] এ কথার কোন মূল্য আছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না। কারণ যে পদ্মনাভ নিজেই রাজস্ববিভাগে কার্য করিতেন, তিনি কি জানিতেন না যে, রাজস্ববিভাগের কার্য করিতে গেলে, প্রভুর নিকট দেনাপাওনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। হয়তো অনেক সময়ে তাঁহার নিজের নিকট সরকারী অর্থ পাওনা হইয়াছিল। পুত্রের নিকট সরকারের অর্থ পাওনা ছিল বলিয়া তিনি পুত্রের মুখদর্শন করিতেন না, ইহা যাঁহাদের ইচ্ছা হয় বিশ্বাস করিতে পারেন, আমরা কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না।

নন্দকুমার কার্য হইতে অপসৃত হইয়া, নবাব শা আমেদ জঙ্গের নায়েব হোসেন কুলী খাঁর নিকট কার্যপ্রার্থনায় উপস্থিত হন। রায়রায়ান নন্দকুমারের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ায়, তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে হোসেন কুলী খাঁকে লিখিয়া পাঠাইলে, হোসেন কুলী খাঁ তাঁহাকে কার্য প্রদান করিতে অসম্মত হন। তাহার পর তিনি আলিবর্দী খাঁর প্রধান সেনাপতি মস্তাফা খাঁর নিকট প্রায়ই যাতায়াত করিতেন। এই সময়ে মস্তাফা

৫ Barwell's letter to his sister

খাঁর সহিত আলিবর্দীর বিবাদের সূচনা হয়। সরকারের নিকট মস্তাফা খাঁর সৈন্যদিগের বেতন প্রাপ্য হওয়ায়, নবাব কতকগুলি জমিদারের নিকট হইতে তাহা আদায় করিয়া লওয়ার জন্য মস্তাফা খাঁকে আদেশ দেন। সৈন্যদিগকে বেতন আদায়ের ভার দিলে কিরূপ ব্যাপার উপস্থিত হইতে পারে, তাহা সাধারণে অনায়াসে বুঝিতে পারেন। জমিদারেরা আপনাদিগের আসন্ন বিপদ দেখিয়া নন্দকুমারের শরণাপন্ন হন এবং তাঁহাকে তাঁহাদের জামীন হইবার জন্য অনুরোধ করেন। নন্দকুমার তাঁহাদিগের উপকার করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া মস্তাফা খাঁর নিকট তাঁহাদের জামীন হইলেন। মস্তাফা খাঁর উদ্দেশ্য অন্যরূপ ছিল। তিনি শীঘ্র শীঘ্র আপনার প্রাপ্য অর্থ আদায় করিয়া বাঙ্গলা হইতে বিহারে যাইবার ইচ্ছা করেন এবং আলিবর্দীর নিকট হইতে বিহার অধিকার করিয়া আপনি তথায় স্বাধীন শাসনকর্তা হইবার আশা করিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি উক্ত অর্থের জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। কিন্তু নন্দকুমার সেই সমস্ত জমির রাজস্ব তাঁহাকে সত্বর দিতে পারেন নাই। কারণ, জমিদারেরা তাঁহাকে সে অর্থ অত্যল্প কালের মধ্যে প্রদান করিতে সমর্থ হন নাই। নন্দকুমারের নিকট সেই সমস্ত জমির অর্থ পাওনা হওয়ায় মস্তাফা খাঁ তাঁহার প্রতি যারপরনাই বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া রায়রায়ান রায়ের নিকট পাঠাইতে উদ্যত হন। নন্দকুমার এই সংবাদ পাইয়া কলিকাতায় পলায়ন করেন। কেহই তাঁহার পলায়নের কথা অবগত ছিল না। তাহার পর আলিবর্দীর সহিত মস্তাফা খাঁর বিবাদ পরিপক্ক হইয়া উঠিলে, মস্তাফা খাঁ প্রাণ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এই সময়ে চায়েন রায়ও পরলোকগত হইয়াছিলেন। ঐ সমস্ত ঘটনার পর নন্দকুমার আবার মুর্শিদাবাদে আগমন করিয়া মুৎসুদ্দীগণের বিশেষ অনুরোধে সরকার হইতে পরগণা সাতসইকার রাজস্বসংগ্রহের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

তৎকালে তিনি হুগলীনিবাসী শেখ হাবাৎউল্লার নিকট হইতে দুই সহস্র টাকা কর্জ লন। সাতসইকায় কিছুদিন কার্য করার পর তিনি মুর্শিদাবাদে আসিয়া পুনরায় হিসাবাদি বুঝাইয়া দেন। তাহার পর তিনি হুগলীতে জীবিকানির্বাহের জন্য গমন করেন। সেই সময়ে হাবাৎউল্লা তাহার প্রাপ্য অর্থের জন্য তাঁহাকে ৫ দিন আটক করিয়া রাখে। তাহার পর তিনি শেখ রস্তম নামক জনৈক ব্যক্তির জামীনে মুক্তি লাভ করেন। শেখ রস্তম কমলউদ্দীনের পিতা। এই কমলউদ্দীনই নন্দকুমারের বিরুদ্ধে অবশেষে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে। তৎকালে তিনি এতদূর অর্থকষ্টে পতিত হইয়াছিলেন যে, হুগলী হইতে চন্দননগরে গমন করিয়া ২০০০ টাকা মূল্যের শাল ১২০০ টাকায় বিক্রয় করিয়া, তাহা হইতে ১০০০ টাকা দেনাশোধের জন্য প্রদান করেন; অবশিষ্ট ২০০ টাকা লইয়া পুনর্বার মুর্শিদাবাদে আসিতে বাধ্য হন। এই সময়ে হুগলীর ফৌজদার মহম্মদ ইয়ারবেগ খাঁ পদচ্যুত হওয়ায়, হেদায়ৎ আলি খাঁ তৎপদে নিযুক্ত হন।

নন্দকুমার মুর্শিদাবাদে আসিয়া প্রায়ই যুবরাজ সিরাজউদ্দৌলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। তখন তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠে। যুবরাজের

সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়ার জন্য তাঁহাকে অশ্ব ও পরিচ্ছদাদি ঋণ করিয়া ক্রয় করিতে হইত। পরে তৎসমস্ত অর্ধমূল্যে বিক্রয় করিয়া, কিয়ৎপরিমাণে দোকানদার-দিগের দেনা শোধ করিতে বাধ্য হইতেন। তৎকালে ভাগ্য নন্দকুমারের প্রতি এতদূর অপ্রসন্ন হইয়াছিলেন যে, তিনি যেখানে যাইতেন, সেইখানে তাঁহার বিপদ উপস্থিত হইত। একদিন সিরাজউদ্দৌলা তাঁহার প্রাসাদের কোন নির্জন স্থানে বসিয়া আছেন, নন্দকুমার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া কানে কানে কি কথা বলেন। তাহাতে সিরাজ নন্দকুমারের প্রতি এতই ক্রুদ্ধ হন যে, তাঁহাকে এক বংশখণ্ডের দ্বারা প্রহার করিতে আদেশ দেন। নন্দকুমারের শরীর সবল থাকায়, তিনি সে বিপদ হইতে রক্ষা পান। সিরাজকে তিনি কি বলিয়াছিলেন, তাহা কেহই জানিতে পারে নাই। যে সময়ে নন্দকুমার সিরাজের নিকট যান, সেই সময় সিরাজ বিলাসের তরঙ্গে ভাসমান হইতেছিলেন, তাঁহার মনোগত ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিলে তাঁহার প্রাণে সহ্য হইত না। হয়ত, নন্দকুমার সিরাজের যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে ও তাঁহার ভাবী কল্যাণের কোন কথা কহিয়া থাকিবেন। নতুবা সিরাজ এরূপ বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে আদেশ দিবেন কেন? তাঁহার বিলাসবিভ্রমের উপযোগী কোন কথা বলিলে, নিশ্চয়ই তিনি ক্রুদ্ধ হইতেন না; বরং আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করিতেন। সুতরাং নন্দকুমার তাঁহার ভাবী মঙ্গলের কোন কথা বলিয়া থাকিবেন, এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। অথবা নির্জনা-বাসে উপস্থিত হওয়ায়, তাঁহার বিলাসের বিঘ্নোৎপাদনের আশঙ্কায় সিরাজ তাঁহার প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করিতেও পারেন।

সিরাজের মঙ্গল করিতে গিয়া নন্দকুমার তাঁহার ক্রোধের পাত্র হইলেও, সিরাজ চিরদিনের জন্য তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হন নাই। উক্ত ঘটনার কিছুদিন পরে নন্দকুমার আবার সিরাজের আদেশে, কার্যলাভের জন্য হুগলীর ফৌজদার হেদায়ৎ আলি খাঁর নিকট প্রেরিত হন। হেদায়ৎ আলি খাঁ শুনিয়াছিলেন যে, নন্দকুমার হুগলীর দেওয়ানীর জন্য আবেদন করিয়াছেন; নন্দকুমারকে তাঁহার উক্ত পদ দিবার ইচ্ছা না থাকায়, তিনি নানারূপ ছলে ও কৌশলে তাঁহার প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহাকে অবমানিত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে নন্দকুমার হেদায়ৎ আলির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য, স্বীয় ভ্রাতা রাধাকৃষ্ণকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহাতে এইরূপ লিখিত হয় যে, সূর্যকুমার মজুমদারের নিকট হইতে হেদায়ৎ আলির নামে এরূপ ভাবে একখানি পত্র লইতে হইবে, যেন সে আর নন্দকুমারকে কষ্ট প্রদান না করে। নন্দকুমার ব্যতিব্যস্ত হইয়া এই পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই পত্র অদ্যাপি তাঁহার দৌহিত্রবংশীয় কুঞ্জঘাটার কুমারের নিকট বিদ্যমান আছে। উক্ত পত্রে স্থান বা তারিখের কোন উল্লেখ নাই।[৬] নন্দকুমার হেদায়ৎ আলির অত্যাচার ও অবমাননা

৬ পত্রখানির নকল পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। সত্যচরণ শাস্ত্রী এই পত্রখানিকে হাবাৎউল্লার

অসহ্য বোধ করিয়া পুনর্বার মুঁশিদাবাদে গমন করেন। মুঁশিদাবাদে আসিয়া তাঁহার দুরবস্থার একশেষ হয়। ইহার পর মহম্মদ ইয়ারবেগ খাঁ পুনর্বার ফৌজদারপদে নিযুক্ত হন।

এই সময়ে নন্দকুমার ইয়ারবেগের বন্ধু সাদেকউল্লার নিকট প্রায়ই যাতায়াত করিতেন। সাদেকউল্লা নন্দকুমারের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, কার্যকলাপ প্রভৃতি বিশেষরূপে জানিতেন। নন্দকুমারের সহিত ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হওয়ায়, সাদেকউল্লা পুনরায় ইয়ারবেগের সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দেন। নন্দকুমার তৎকালে হুগলীর দেওয়ানী-পদের প্রার্থী ছিলেন; কিন্তু লহরীমাল নামে[৭] এক ব্যক্তির প্রতি ইয়ারবেগের অত্যন্ত বিশ্বাস থাকায়, তিনি লহরীমালকে দেওয়ানী প্রদান করেন; অগত্যা নন্দকুমারকে হুগলী পরিত্যাগ করিয়া মুঁশিদাবাদে আসিতে হয়। কিছুকাল পরে লহরীমাল অকৃতজ্ঞভাবে হুগলী-বন্দরের শুল্ক ফৌজদারের হস্ত হইতে পৃথক করিয়া লন। ইহাতে ইয়ারবেগ তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া অপর কোন ব্যক্তিকে দেওয়ানী-পদ প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন এবং সাদেক-উল্লার অনুরোধে অবশেষে নন্দকুমারকে হুগলীর দেওয়ানী-পদ প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতে ক্রমে ক্রমে নন্দকুমারের ভাগ্যোদয় হইতে আরম্ভ হয় এবং তদবধি তিনি দেওয়ান নন্দকুমার নামে অভিহিত হইতে থাকেন। নন্দকুমার সর্বদা দক্ষতার সহিত কার্য করিয়া ইয়ারবেগকে অত্যন্ত সন্তুষ্ট রাখিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইয়ারবেগের ভাগ্যে অধিক দিন হুগলী ফৌজদারী পদে প্রতিষ্ঠিত থাকা ঘটিয়া উঠে নাই; তিন বৎসর পরে তিনি কোন কারণে পদচ্যুত হইয়া স্বীয় দেওয়ান নন্দকুমারকে লইয়া সমস্ত নিকাশ বুঝাইয়া দিবার জন্য মুঁশিদাবাদে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকাশাদি বুঝাইতে এক বৎসর সময় লাগিয়াছিল। ইতিমধ্যে সর্বজনপ্রিয় নবাব আলিবর্দী খাঁ মহবৎ জঙ্গের মৃত্যু হইল এবং নবাব সিরাজউদ্দৌলা বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার মসনদে উপবিষ্ট হইলেন।

সিরাজ যৎকালে কলিকাতায় ইংরেজদিগকে দমন করিয়া তাঁহাদের দুরভিসন্ধি বিশেষ রূপে বুঝিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তৎকালে হুগলীতে কোন ফৌজদার ছিল না। ইয়ারবেগ মুঁশিদাবাদে নিকাশ দিতে ব্যস্ত ছিলেন; এরূপ সময়ে পাছে ইংরেজেরা কোনরূপে আবার বাঙ্গলায় প্রবিষ্ট হন, সেইজন্য তিনি মাণিকচাঁদকে কলিকাতায় ও মির্জা মহম্মদ আলিকে হুগলীর ফৌজদার পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত মির্জা মহম্মদ আলির দ্বারা হুগলীর ন্যায় প্রসিদ্ধ বন্দরের শাসনকার্য সুচারুরূপে

সহিত নন্দকুমারের গোলযোগের পত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। পত্রে হিদাত্যুল্লা আছে, হাবাৎউল্লা নাই।

৭ এই লহরীমাল মুঁশিদকুলীর বিশ্বস্ত কর্মচারী লহরীমাল কি না বলা যায় না। সম্ভবতঃ তিনি মুঁশিদকুলীর সময়ের লহরীমালই হইবেন।

সম্পন্ন হওয়া কঠিন মনে করিয়া, তিনি শেখ ওমারউল্লাকে হুগলীর ফৌজদারী প্রদান করেন। নন্দকুমার সেই সময়ে মুর্শিদাবাদে ইয়ারবেগের হিসাব-নিকাশাদি বুঝাইতেছিলেন। তিনি হুগলীর দেওয়ানীর জন্য আবেদন করিলে, তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য হইল। কারণ তৎকালে তাঁহার ন্যায় চতুর ও কার্যদক্ষ জনৈক লোকের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছিল এবং পূর্বে দেওয়ানী কার্য করায়, তাঁহার উক্ত কার্যে বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল ; এজন্য তিনি পুনর্বার ওমারউল্লার দেওয়ানী-পদে নিযুক্ত হইলেন। কিছুদিন পরে ওমারউল্লার পদচ্যুতি ঘটে। তখন নবাব সিরাজউদ্দৌলা নন্দকুমারকে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি মনে করিয়া এবং তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও কার্যদক্ষতা বিশেষরূপে অবগত থাকায় হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

সেই সময়ে কর্ণেল ক্লাইব ফরাসীদিগের নিকট হইতে চন্দনগর অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। চন্দননগর অধিকার করিতে গেলে, নবাবের রাজ্যের মধ্যে অনেক উৎপাত করিতে হয়। যদিও ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি ইংরেজদিগের সহিত নবাবের যে সন্ধি স্থাপিত হয় এবং তদনুসারে ইংরেজেরা নবাবের রাজ্যে কোন-রূপ গোলযোগ করিবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুত হন, তথাপি তাঁহারা সে প্রতিজ্ঞা ক্রমে ভঙ্গ করিতে আরম্ভ করেন। নবাব তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এজন্য তিনি ইংরেজদিগকে চন্দননগর আক্রমণ করিতে নিষেধ করিয়া রাজা দুর্লভরামের অধীন একদল সৈন্য হুগলীতে পাঠাইয়া দিলেন, এবং প্রয়োজন হইলে, ফরাসীদিগের সাহায্যার্থ নন্দকুমারকে চেষ্টা করিতে লিখিয়া পাঠাইলেন। ইংরেজেরা দেখিলেন যে, বিষম অনর্থ উপস্থিত ; এই সময়ে যদি নবাবসৈন্য হুগলীতে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং নন্দকুমারের ন্যায় চতুর ফৌজদার যদি ইংরেজদিগের কৌশল বুঝিতে পারেন, আর তিনি ফরাসীদিগের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হন, তাহা হইলে চন্দননগর আক্রমণ করা দুরূহ হইবে। এইজন্য তলে তলে তাঁহারা আমীরচাঁদকে (উমিচাঁদ) দিয়া নন্দকুমারকে হস্তগত করিতে চেষ্টা করিলেন। আমীরচাঁদ হুগলীতে উপস্থিত হইয়া নন্দকুমারকে ইংরেজদিগের বলবীর্যের কথা জানাইয়া তাঁহাদের সহিত বন্ধুত্বস্থাপনের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। তিনি নন্দকুমারকে জানাইলেন যে, জগৎশেঠ প্রভৃতি যাবতীয় প্রধান কর্মচারী ইংরেজদিগের সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। যে পক্ষে জগৎশেঠ, সে পক্ষের জয় অবশ্যম্ভাবী এবং সিরাজের প্রত্যেক কর্মচারী ও দেশের সকলে ইংরেজদিগের সহায়তা করিতে প্রস্তুত ; এরূপ ক্ষেত্রে সিরাজের রাজ্যচ্যুতি নিশ্চয়ই ঘটিবে। অতএব আপনার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য ইংরাজদিগের সহিত বন্ধুত্বস্থাপন করা উচিত।

নন্দকুমার অনেক বিবেচনার পর সিরাজের ভবিষ্যৎ বাস্তবিকই ঘোরতর অন্ধকারময় দেখিয়া, ইংরেজদিগের সহিত বন্ধুত্বস্থাপনের ইচ্ছা করিলেন। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন যে, ইংরেজেরা সেই সময়ে আমীরচাঁদকে দিয়া নন্দকুমারকে ১২০০০

হাজার টাকা প্রদান করিয়াছিলেন।[৮] কিন্তু এই ১২০০০ হাজার টাকা প্রদানের বিষয়ে আমাদের কিছু সন্দেহ আছে। নন্দকুমার এরূপ নীচান্তঃকরণ ছিলেন না যে, ১২ হাজার টাকার ন্যায় সামান্য অর্থে তিনি এইরূপ পাপজনক কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সিরাজের পরিণাম চিন্তা করিয়াই ইংরেজদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়াই অনুমান হয়। তাহার পর তিনি ফরাসীদিগের সাহায্যের জন্য প্রেরিত নিজের সৈনিকদিগকে ফিরিয়া আসিতে আদেশ দেন এবং রায়দুর্লভ উপস্থিত হইলে, তাঁহাকেও ফিরিয়া যাইতে বলিয়া পাঠান। নন্দকুমার নবাবকে এইরূপ লিখিয়া পাঠাইলেন যে, ইংরেজেরা যেরূপ বলশালী, তাহাতে ফরাসীদিগের সাহায্য করিতে গেলে, আপনাদিগের অবমাননার সম্ভাবনা আছে ; সেরূপক্ষেত্রে ফরাসীদিগের সাহায্য করিতে যাওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। নন্দকুমার যদি আমীরচাঁদ-কর্তৃক প্রণোদিত না হইয়া, প্রভুকে ঐরূপ লিখিয়া পাঠাইতেন, তাহা হইলে, আমরা তাঁহার কোনরূপ দোষ মনে করিতাম না। কিন্তু তিনি যখন চতুরতাপূর্বক প্রভুকে সতর্ক হইবার জন্য লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তখন যে তিনি সর্বথা নিন্দনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

যাহাই হউক, নন্দকুমার ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে ইংরেজদিগের সহায়তা করা ব্যতীত নবাবের বিরুদ্ধাচারণ কিংবা তাঁহাকে পদচ্যুত করার ন্যায় আর কোন ভীষণ অপরাধে অপরাধী নহেন। তিনি অন্যান্য কর্মচারীদিগের ন্যায় সিরাজউদ্দৌলাকে ইচ্ছাপূর্বক পদচ্যুত করিতে চেষ্টা করেন নাই। অথবা সেই প্রভুহত্যামূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন না। কিন্তু ইংরেজদিগকে প্রকারান্তরে সহায়তা করায়, প্রভুর প্রতিও যে তাঁহার অকৃতজ্ঞতা দেখান হইয়াছে, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই অকৃতজ্ঞতার জন্য, তাঁহার নবপরিচিত বন্ধু ইংরেজদিগের হস্তে তাঁহাকে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া, অবশেষে আপনার জীবন বলি দিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। সিরাজের অজ্ঞাতসারে ইংরেজদিগের সহায়তা করা নন্দকুমার চরিত্রের যে একটি প্রধান কলঙ্ক, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

নন্দকুমারের শত্রুপক্ষীয়েরা বলিয়া থাকেন যে, তিনি নিজেই রামকৃষ্ণ বসু নামক জনৈক ব্যক্তিকে ক্লাইবের নিকট পাঠাইয়া তাঁহার বন্ধুতার প্রার্থী হইয়াছিলেন।[৯] একথা যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যিনি এরূপ কথা বলিতে পারিয়াছেন, তিনি নন্দকুমারের সমস্ত কার্য কালিমামণ্ডিত করিয়া নন্দকুমার চরিত্রকে ভয়াবহ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা অর্মে প্রভৃতি প্রাচীন ঐতিহাসিক-গণের বিবরণ হইতে দেখাইয়াছি যে, ইংরেজেরাই আপনাদিগের কার্যোদ্ধারের জন্য আমীরচাঁদের দ্বারা তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। নন্দকুমার পূর্ব হইতে ক্লাইবসাহেবের বন্ধুত্বের প্রয়াসী হইলে, ইংরেজেরা সহস্র সহস্র মুদ্রা লইয়া তাঁহার

৮ Orme's Indostan, Vol. II, p. 137.
৯ Barwell's letter to his sister.

পদতলে উপস্থিত হইতেন না। যে ক্লাইবসাহেব প্রতারণার দ্বারা আমীরচাঁদের সর্বনাশ করিয়াছিলেন, তিনি এতদূর নির্বোধ ছিলেন না যে, যে নন্দকুমার তাঁহাদের বন্ধুত্বের প্রয়াসী, তাঁহাকে আবার অর্থ দিয়া শান্ত করিতে চেষ্টা পাইবেন। এরূপ অনেক স্থলে নন্দকুমার চরিত্রকে যৎপরোনাস্তি কলুষিত করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। নন্দকুমারের সহায়তায় ইংরেজেরা চন্দননগর অধিকার করিলেন। সিরাজ-উদ্দৌলা এ কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এইজন্য তিনি তাঁহার স্থলে আর এক জন নূতন ফৌজদার হুগলীতে পাঠাইলেন।[১০] ইহার পর নন্দকুমার কিছুদিন পর্যন্ত কি ভাবে কালযাপন করিয়াছেন, তাহা বিশেষরূপে জানা যায় না। বিশেষতঃ সেই সময়ে সমস্ত বঙ্গরাজ্যে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। ইংরেজেরা সিরাজের সর্বনাশ করিতে উদ্যত হইলেন ; সিরাজের প্রধান কর্মচারিগণ সকলেই এক ষড়যন্ত্রের আয়োজন করিয়াছিলেন ; কিন্তু নন্দকুমার যে তাহার মধ্যে ছিলেন না, ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। তাহার পর পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজেরা বিজয়ী হইয়া মীরজাফর খাঁকে মসনদে বসাইলেন।

মীরজাফর মসনদে বসিলে রায়দুর্লভ তাঁহার দেওয়ান হইলেন। মুতাক্ষরীনে লিখিত আছে যে, মীরজাফরের সিংহাসনে উপবেশন করার পর নন্দকুমার ক্লাইবের মুন্সী ও দেওয়ান হন।[১১] এ কথা নিতান্ত অবিশ্বাস্য নহে ; কারণ ইংরেজদিগের সহায়তা করায় এবং তজ্জন্য তাঁহার পদচ্যুতি ঘটায়, ক্লাইব নন্দকুমারকে যে সাহায্য করিবেন, ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। তবে ক্লাইবের সকল কথা বিশ্বাস করাও কঠিন। যাহা হউক, মুতাক্ষরীনের কথা স্বীকার করিতে গেলে, নন্দকুমার সে সময়ে ক্লাইবের দেওয়ান ও মুন্সী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের সময় কিন্তু রামচাঁদ ক্লাইবের দেওয়ানের ও নবকৃষ্ণ মুন্সীর কার্য করিতেন বলিয়া উল্লিখিত হন। আবার কলিকাতার বড়বাজারের কাশীরাম নামে এক ব্যক্তি ক্লাইবের দেওয়ান ছিলেন বলিয়া শুনা যায়। নবাব হওয়ার পর হইতেই মীরজাফর পাটনার শাসনকর্তা রামনারায়ণকে উচ্ছেদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। ক্লাইব রামনারায়ণের রক্ষার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। এই সময় নন্দকুমার অনেকবার ক্লাইবের উকীল হইয়া নবাবের নিকট গিয়াছিলেন। ইহার পর ক্লাইব সসৈন্যে পাটনায় যাত্রা করিলে, নন্দকুমার তাঁহার সঙ্গে তথায় গমন করেন। ক্লাইব নন্দকুমারের চতুরতা, বুদ্ধিমত্তা ও কার্যদক্ষতায় এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, সর্বদা তাঁহাকে সঙ্গে রাখিতেন এবং যাবতীয় গুরুতর কার্যে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। রাজা দুর্লভরামও নন্দকুমারকে পাটনায় যাইতে দেখিয়া তাঁহাকে আপনার উকীল নিযুক্ত করিয়া, ক্লাইবের সহায়তার জন্য সমস্ত ব্যয় স্বয়ং নন্দকুমারের হস্তে প্রদান করেন। তাহার পর রাজা

১০ Orme's Indostan, Vol. II, p. 194.

১১ Seir Mutaqherin, Vol. II, p. 378.

দুর্লভরাম নিজেই পাটনায় উপস্থিত হন। তৎকালে নন্দকুমারের ক্ষমতা এতদূর প্রবল হইয়াছিল যে, সাধারণে তাঁহাকে 'কালা কর্নেল' বলিত।[১২] পাটনা হইতে তাঁহারা পুনর্বার মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হন।

এই সময়ে ক্লাইব নন্দকুমারের উপর এতই সন্তুষ্ট ছিলেন যে, তাঁহাকে পুনর্বার হুগলী ও হিজলী প্রভৃতির দেওয়ানী প্রদান করিতে নবাবকে বিশেষরূপে অনুরোধ করেন। এই সময়ে আমীর বেগ খাঁ হুগলী, হিজলী প্রভৃতি প্রদেশের ফৌজদার ছিলেন। নবাব ক্লাইবের অনুরোধে নন্দকুমারকে সেই সকল প্রদেশের দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন। সেই সময়ে কোম্পানীও নন্দকুমারের কার্যে ও ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আপনাদের অধীনতায় একটি পদ প্রদান করেন।

মীরজাফর পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে ইংরেজদিগকে অনেক অর্থ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন; কিন্তু সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া দেখেন যে, রাজকোষ শূন্য। অগত্যা ইংরেজদিগকে তিনি সে টাকার বিনিময়ে বর্ধমান প্রভৃতির রাজস্ব ছাড়িয়া দেন। কোম্পানী নন্দকুমারকে তাঁহাদিগের প্রতি অনুরক্ত বিবেচনা করিয়া, ১৭৫৮ খ্রীঃ অব্দের ১৯শে আগস্ট তাঁহাকে ঐ সমস্ত স্থানের তহশীলদার নিযুক্ত করিলেন। নন্দকুমারের প্রতি এইরূপ ভার অর্পিত হইল যে, তিনি রাজাদিগকে কিস্তি কিস্তি আহ্বান করিয়া কোম্পানীর রাজস্ব আদায় করিবেন।[১৩] পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে মুর্শিদাবাদের নবাবদরবারে একজন করিয়া রেসিডেন্ট রাখা স্থির হয়। ১৭৫৮ খ্রীঃ অব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস উক্ত রেসিডেন্টপদে নিযুক্ত ছিলেন। বর্ধমান প্রভৃতির রাজস্ব আদায় লইয়া নন্দকুমারের সহিত তাঁহার মনোবিবাদ উপস্থিত হয়। ক্রমে সেই মনোবিবাদ শত্রুতায় পরিণত হওয়ায়, হেস্টিংস সেই ব্রাহ্মণকে বৃদ্ধবয়সে ফাঁসীকাষ্ঠে লম্বমান করাইয়া নিজ মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। আমরা ক্রমে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি।

সিংহাসনে আরোহণ করার পর হইতেই মীরজাফর অত্যন্ত অর্থাভাব অনুভব করেন। সেইজন্য তিনি রায়দুর্লভকে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করিতেন এবং সময়ে সময়ে শেঠদিগের নিকট হইতে অর্থ লইয়া তাঁহাদিগকেও যৎপরোনাস্তি উৎপীড়িত করিতে থাকেন। ক্রমে ক্রমে রায়দুর্লভের সহিত নবাবের বিবাদ গুরুতর হইয়া উঠে। সেই সময়ে মীরণ ঢাকার শাসনকর্তা ছিলেন, তিনি রাজা রাজবল্লভকে আপনার দেওয়ান নিযুক্ত করেন ও রায়দুর্লভকে ঢাকাবিভাগের নিকাশ দিতে বলেন। রায়দুর্লভ চতুর্দিক হইতে উত্ত্যক্ত হইয়া কলিকাতায় আসিতে কৃতসঙ্কল্প হন। মীরণ তাঁহাকে বাধা দিয়া বলেন যে, যতদিন নবাবসৈন্যগণের বেতন দেওয়া না হয়, ততদিন তিনি কলিকাতায় যাইতে পারিবেন না। নন্দকুমার বরাবরই রায়দুর্লভের পক্ষে ছিলেন। তিনি তাঁহাকে মুর্শিদাবাদ হইতে কাশীমবাজারে লইয়া আসেন এবং পরে কলিকাতায়

১২ Barwell's letter to his sister.
১৩ Long's Selection, p. ·155.

ইংরেজদিগের আশ্রয়ে পাঠাইয়া দেন ; নিজেও হুগলী আসিয়া স্বীয় কার্য সম্পন্ন করিতে থাকেন।

রায়দুর্লভ কলিকাতায় গমন করিলে, নবাব তাঁহার প্রতি ইংরেজদিগের বিদ্বেষ জন্মাইবার জন্য অশেষবিধ চেষ্টা করেন। এই সময়ে একটি ব্যাপার উপস্থিত হয়। নবাব একদিন মস্জেদে যাইতেছিলেন, সেই সময়ে খোজা হাদী নামে একজন কর্মচারীর কতকগুলি লোক নবাবের পথরোধ করে। নবাব তাহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, এইরূপ প্রকাশ করেন যে, রায়দুর্লভই নবাবকে হত্যা করিবার জন্য খোজা হাদীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তাহা প্রমাণ করিবার জন্য একখানি পত্রও প্রকাশ করেন। কিন্তু সে পত্র জাল বলিয়া অনুমিত হয়। মীরজাফর সেই পত্র সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা পান এবং নন্দকুমারে সহিত ক্লাইবের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ জানিয়া, তাঁহাকে এইরূপ ভাবে পত্র লেখেন যে, যদি ঐ পত্র সত্য বলিয়া ইংরেজদিগের বিশ্বাস জন্মাইতে পার, তাহা হইলে, আমি তোমাকে উপাধি ও জায়গীর প্রদান করিব। ইহা কিন্তু ইংরেজ ঐতিহাসিকের কথা।[১৪] নন্দকুমার উক্ত পত্র ক্লাইবের হস্তে প্রদান করেন। উক্ত পত্র নবাব মীরজাফর খাঁর স্বহস্তলিখিত। নন্দকুমার রাজা দুর্লভরামের অত্যন্ত হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন বলিয়া, তাঁহার বিরুদ্ধে নবাবের কদাভিপ্রায়পূরণের সহায়তা করেন নাই। এইজন্য নবাব মীরজাফর আলি খাঁ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন।

নন্দকুমার যৎকালে ইয়ারবেগ খাঁর সময়ে হুগলীর দেওয়ানী কার্য করিয়াছিলেন, সেই সময়ে উক্ত খাঁর নিকট তাঁহার অনেক টাকা প্রাপ্য ছিল। এক্ষণে তিনি ইয়ার-বেগের নিকট সেই অর্থের দাবী করিলেন। ইয়ারবেগ নন্দকুমারের প্রভূত ক্ষমতা জানিয়া তাঁহাকে ১৪ হাজার টাকা প্রদান করিয়া, তাঁহার দাবী হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে সমর্থ হন। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, নবাব মীরজাফর খাঁ নন্দকুমারের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। হুগলীতে অবস্থান কালে, নন্দকুমার, ফৌজদার আমীর বেগ খাঁকে সময়ে সময়ে অনেক বিষয়ে উপদেশ দিতেন। নবাব তজ্জন্য আমীর বেগের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হওয়ায়, আমীর বেগ হুগলীর ফৌজদারী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। নন্দকুমারও নবাবের ক্রোধের পাত্র হওয়ায়, হুগলী পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় গমন করেন। রাজা দুর্লভরাম পূর্ব হইতেই কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছিলেন এবং নবাবের প্রধান হরকরা রাজারাম সিংহও সেই সময়ে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। অবশেষে নন্দকুমারও তথায় উপস্থিত হইলেন। সকলেই নবাবের অযথা ক্রোধের ও অত্যাচারের জন্য আপন আপন কার্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা দিল্লীতে বাদশাহের নিকট উকীল পাঠাইয়া পুনর্বার সরকারী পদের প্রার্থী হইলেন। দুর্লভরাম বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী,

১৪ Orme's Indostan, Vol. II, p. 362.

নন্দকুমার নায়েব দেওয়ানী ও রাজারাম সিংহ আপনার পূর্বপদের প্রার্থনা করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে রাজা দুর্লভরামের সহিত নন্দকুমারের সৌহার্দ কিঞ্চিৎ শিথিল হয়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, নন্দকুমার স্বীয় পুত্র গুরুদাসের জন্য কাননগো পদের প্রার্থী হইয়াছিলেন বলিয়া রাজা দুর্লভরাম তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন।[১৫] রাজা দুর্লভরামের এরূপ অসন্তোষের কারণ কি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। নন্দকুমার স্বীয় পুত্রের জন্য পদপ্রার্থী হইলে, দুর্লভরামের বিরক্ত হইবার বিশেষ কোন কারণ দেখা যায় না।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, নন্দকুমার কোম্পানী-কর্তৃক বর্ধমান প্রভৃতির রাজস্বসংগ্রহের ভারপ্রাপ্ত হন এবং তাহা লইয়াই হেস্টিংসের সহিত তাঁহার বিবাদ আরম্ভ হয়। নদীয়ার রাজস্ব অনেক দিন হইতে পাওনা ছিল। এজন্য নন্দকুমার রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, কোম্পানীর প্রাপ্য রাজস্ব নিরূপিত সময়ের মধ্যে প্রদান না করিলে, তাঁহাকে বন্দী-অবস্থায় থাকিতে হইবে। রাজা ভীত হইয়া কলিকাতায় আসিয়া ইংরেজদিগের শরণাপন্ন হইলেন এবং কোন রূপে রাজস্বের বন্দোবস্ত করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। নন্দকুমার এই সময়ে বর্ধমানরাজের নিকটও খাজনার জন্য পিয়াদা প্রেরণ করেন এবং কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার দেয় রাজস্ব মাসে মাসে বন্দোবস্ত করিবার জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন। প্রথমে এইরূপ কথা হয় যে, বর্ধমান ও নদীয়ার খাজনা মুর্শিদাবাদের রাজকোষে জমা হইয়া, পরে তথা হইতে কলিকাতায় ইংরেজদিগের নিকট প্রেরিত হইবে। কিন্তু পরে কলিকাতা কাউন্সিলের সভ্যেরা স্থির করিলেন যে, তাহাতে অসুবিধা ঘটিবে। সুতরাং তাঁহারা উক্ত প্রদেশদ্বয়ের রাজস্ব আদায়ের জন্য একজন লোকের প্রয়োজন বোধ করেন। ক্লাইবের অনুরোধে নন্দকুমারকে উক্ত পদ প্রদত্ত হয়। নন্দকুমার হুগলী আসিয়া উক্ত প্রদেশদ্বয়ের খাজনা আদায়ের অনুমতি প্রাপ্ত হন এবং তজ্জন্য তাঁহাকে একটি খেলাতও প্রদত্ত হয়।

নন্দকুমার বর্ধমানরাজের নিকট খাজনা চাহিয়া পাঠাইলে, তিনি মুর্শিদাবাদে সংবাদ প্রেরণ করেন। তৎকালে হেস্টিংসসাহেব মুর্শিদাবাদে রেসিডেন্টের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি বর্ধমানরাজের পত্র পাইয়া নন্দকুমারের উপর বিরক্ত হন। এই সময়ে নন্দকুমারও হেস্টিংসকে তাঁহার নিয়োগ ও খেলাতপ্রাপ্তির কথা লিখিয়া পাঠান। হেস্টিংসের নিজের হস্ত দিয়া সে টাকা কলিকাতায় প্রেরিত না হওয়ায়, তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন। তাঁহার হস্ত দিয়া কোম্পানীর টাকা প্রেরিত হইলে, তাঁহার যে অনেকরূপ সুবিধা হয়, ইহা বোধ করি আর স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিতে হইবে না; এবং নন্দকুমারকে সেই সুবিধার অন্তরায় হইতে দেখিয়া, নন্দকুমারের প্রতি হেস্টিংসের অসন্তোষের বীজ রোপিত হয়; সেই বীজ ক্রমে বর্ধিত হইয়া মহান্ বৃক্ষে পরিণত হইয়াছিল। হেস্টিংস বর্ধমানরাজের ও নন্দকুমারের

১৫ Barwell's letter.

পত্র পাইয়া ক্লাইবকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, পূর্বে বর্ধমান ও নদীয়ার রাজস্ব মুর্শিদাবাদে পাঠাইবার কথা হয়; এক্ষণে হুগলীতে পাঠাইবার জন্য নন্দকুমার বর্ধমানরাজের নিকট অন্যায়পূর্বক পিয়াদা পাঠাইতেছে এবং তাহার পত্রে অবগত হইলাম যে, বর্ধমান ও নদীয়ার রাজস্ব আদায়ের জন্য আপনি তাহাকে খেলাত প্রদান করিয়াছেন। ক্লাইব তাহার প্রত্যুত্তরে লিখিয়া পাঠান যে, নন্দকুমারকে নদীয়া ও বর্ধমানের রাজস্বসংগ্রহের জন্য কাউন্সিলের সভ্যগণ নিযুক্ত করিয়াছেন এবং তাঁহারাই তাহাকে প্রকাশ্যভাবে খেলাত দিয়াছেন। বর্ধমান ও নদীয়ার রাজস্ব হুগলীতে পাঠাইবার জন্য স্থির করা হইয়াছে। বর্ধমান ও নদীয়া হইতে যে আমরা এত টাকা পাইয়া থাকি, তাহা নবাবকে জানিতে না দেওয়াই মুর্শিদাবাদে টাকা না প্রেরণ করার উদ্দেশ্য। সেইজন্য হুগলীতে প্রেরণ করাই স্থির হয়। আপনি বর্ধমানরাজকে নন্দকুমারের আদেশ প্রতিপালন করিতে ও তাঁহাকে কলিকাতায় আসিতে লিখিয়া পাঠাইবেন।[১৬] হেস্টিংস ক্লাইবকে পুনর্বার লিখিয়া পাঠাইলেন যে, নন্দকুমার মহিষাদলে গোমস্তার হিসাব তলব করিয়াছে। আমার বিশ্বাস, এ সমস্ত আপনাদের বিনা অনুমতিতেই হইতেছে। বোধ করি, আপনাদের এরূপ বিবেচনা হইবে না যে, যতদিন নন্দকুমার নিজের অবসরক্রমে আমার হস্ত হইতে সমস্ত কার্যের ভার গ্রহণ না করিবে, ততদিন পর্যন্ত আমাকে তাহার কার্যের জন্য মোরাদবাগে অবস্থিতি করিতে হইবে। ক্লাইব ইহার কি উত্তর দেন, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। কিন্তু হেস্টিংস ক্লাইবকে নন্দকুমারের উপর নবাবের বিরক্তির কারণ লিখিয়া পাঠাইলে, ক্লাইব তাঁহাকে লেখেন যে, ইংরেজদিগের প্রতি অনুরক্তি ও রায়দুর্লভের পক্ষ অবলম্বন করায়, নবাব নন্দকুমারের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, অন্য কোনই কারণ নাই। হেস্টিংস নন্দকুমারের প্রভুত্ব খর্ব করিতে চেষ্টা করায় এবং ক্লাইব ক্রমাগত সমর্থন করিতে থাকায়, নন্দকুমারের প্রতি হেস্টিংসের ক্রোধ দিন দিন বর্ধিত হইয়া উঠে।

ক্লাইবের বিলাতযাত্রার পর ভান্সিটার্টসাহেব কলিকাতার গবর্নর হইয়া আসেন। তিনি প্রথমতঃ নন্দকুমারের কার্যদক্ষতার জন্য তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হন। কিন্তু এতদ্দেশীয় ইংরেজদিগের কুপরামর্শে ক্রমে নন্দকুমারের প্রতি বিদ্বেষ উপস্থিত হয়। হেস্টিংস ভান্সিটার্টসাহেবের একজন পরমবন্ধু ছিলেন, সুতরাং নন্দকুমারের প্রতি বিদ্বেষ জন্মাইতে তিনি যে একজন প্রধান সহায় ছিলেন, এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। ভান্সিটার্ট আসিয়া বৃদ্ধ মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া মীর কাসেমকে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার মসনদে বসাইলেন। মীর কাসেমের রাজত্বকালে শাহজাদা আলি গওহর (পরে সম্রাট শাহ আলম), বিহার আক্রমণপূর্বক ইংরেজক্ষমতা দূরীভূত করিয়া, সমস্ত বঙ্গরাজ্য আপনার অধিকারে আনয়নের চেষ্টা করেন। মীর কাসেম সেই সময়ে বিহারে অবস্থিতি করিতেছিলেন।

১৬ Glieg's Memoirs of W. Hastings, Vol. I, pp. 64-65.

এদিকে অন্যায়রূপে পদচ্যুত নবাব মীরজাফর কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। নন্দকুমারের উপর তাঁহার পূর্বে যে ক্রোধ হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার উপশম হয়। তিনি নন্দকুমারকে আপনার সমস্ত দুঃখের কথা ও অত্যাচারের কথা জানাইলে, ক্রমে নন্দকুমারেরও জ্ঞানসঞ্চার হইতে আরম্ভ হয়। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ইংরেজেরা এক্ষণে দেশের সর্বময় কর্তা হইয়া উঠিতেছেন ; যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই তাঁহারা নবাব করিতেছেন। নবাবের ক্ষমতা দিন দিন হ্রাস হওয়ায়, সমস্তই ইংরেজদিগের একাধিকৃত হইতেছে। ইংরেজদিগের সহিত বহুদিনের সম্বন্ধে তিনি তাঁহাদের সমস্ত চাতুরী ও কৌশল বুঝিতে পারিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ইংরেজেরা দেশের রাজা হইতে চলিয়াছেন, মুসলমান রাজত্বেরও প্রায় অবসান ঘটিয়া আসিয়াছে। তাঁহারা কাল সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছেন, আজ মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন ; আবার দুইদিন পরে হয়ত মীর কাসেমেরও সেইরূপ দশা ঘটাইবেন। সুতরাং যাহাতে ইংরেজদিগের এই ক্ষমতা হ্রাস করিতে পারেন, তজ্জন্য তিনি মনোযোগী হইলেন। তিনি জানিয়াছিলেন যে, মুসলমানরাজত্বে হিন্দুদিগের বিশেষতঃ বাঙ্গালীজাতির যেরূপ সুবিধা ছিল, বণিক্ ইংরেজরাজত্বে সেরূপ হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। তাঁহারা উচ্চপদে স্বজাতি ব্যতীত কখনও বাঙালীকে নিযুক্ত করিবেন না। পদে পদে তাঁহাদের চাতুরী ও বিশ্বাসঘাতকতা দেখিয়া নন্দকুমারের ইংরেজ-অনুরাগের শৈথিল্য জন্মিল। তিনি মীরজাফরকে পুনরায় সিংহাসনে বসাইতে উৎসুক হইলেন। মীরজাফর অপেক্ষা মীর কাসেম যে উপযুক্ত ছিলেন, তাহা তিনি জানিতেন। কিন্তু মীর কাসেম যখন ইংরেজদিগের অনুগ্রহে নবাবী পাইয়াছেন, তখন তিনি সহসা তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না বলিয়া, তাঁহার বিশ্বাস হইল। যদিও পরে মীর কাসেম ইংরেজদিগের ব্যবহারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার হিন্দুদিগের প্রতি তাদৃশ শ্রদ্ধাও ছিল না। এই সকল কারণে তিনি মীরজাফরের পক্ষ অবলম্বন করিয়া, ইংরেজদিগের প্রভুত্বহ্রাসের জন্য উদ্যোগী হইলেন। তিনি মীর কাসেমকেও হস্তগত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

নন্দকুমার মীরজাফরকে পুনরায় মসনদে বসাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মীরজাফর এতদূর ভীত ছিলেন যে, নন্দকুমারের পরামর্শে যদি কাহাকেও গোপনে পত্রাদি লিখিবার আবশ্যক হইত, তিনি পারিয়া উঠিবেন না বলিয়া প্রকাশ করিতেন। সুতরাং নন্দকুমার নিজের স্কন্ধে সমস্ত ভার লইয়া কার্য করিতে উদ্যোগী হইলেন। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, শাহ আলম তৎকালে বিহারে ছিলেন। নন্দকুমার তদীয় সাহায্যে, ফরাসীদিগের ও অন্যান্য লোকের সহিত ইংরেজপ্রভুত্বনাশের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার একখানি পত্র ইংরেজদিগের হস্তগত হয়। এজন্য ভান্সিটার্ট তাঁহার কার্যকলাপ পরিদর্শনার্থ একদল প্রহরী নিযুক্ত করেন

এবং তাঁহার বাটী হইতেও অনেক পত্রাদি প্রাপ্ত হন। হেস্টিংস সেই সমস্ত পত্র লইয়া মহা ধূমধাম করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি মুক্তিলাভ করেন।

এই সময়ে ইংরেজকর্মচারিগণ আপনাদিগের গুপ্তব্যবসায়ের জন্য কোম্পানীর অনেক ক্ষতি ও দেশমধ্যে নানারূপ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। নন্দকুমার সেই বিষয়ে জাফর খাঁর মোহরসংবলিত একখানি পত্র ক্লাইবকে ও আর একখানি কোম্পানীকে লিখিয়া পাঠান। উক্ত দুইখানি পত্রও ইংরেজকর্মচারীদিগের হস্তগত হওয়ায়, তাঁহারা নন্দকুমারের প্রতি ভয়ানক অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন। এই সময় হইতে ইংরেজকর্মচারীদিগের মধ্যে দুইটি দল হয়; একদলে ভান্সিটার্ট ও হেস্টিংস, অপর দলে আমিয়ট ও এলিস্ প্রধান ছিলেন এবং নবাব মীর কাসেমেরও ইংরেজদিগের প্রতি বিদ্বেষের সূচনা হয়। নন্দকুমার মীর কাসেমের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে সৎ পরামর্শ দিবার জন্য তাঁহার দরবারে কোন কার্য করিতে ইচ্ছুক হন। এলিস্ ও আমিয়টের সঙ্গে নন্দকুমারের অনেকটা পরিচয় ছিল। সেই সময়ে কর্নেল কূট কলিকাতায় আসিলে ও বিহারের গোলযোগ নিবারণের জন্য তাঁহার পাটনায় যাওয়ার কথা হইলে, এলিস্ ও আমিয়টের পরামর্শানুসারে নন্দকুমার তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন। কূট বরাবরই নন্দকুমারকে জানিতেন। তিনি নন্দকুমারকে সঙ্গে করিয়া পাটনা যাত্রা করিতে ইচ্ছুক হইলেন; কিন্তু ভান্সিটার্ট তাহাতে আপত্তি করিলেন। অবশেষে কূটের বিশেষ ইচ্ছা হওয়ায় এইরূপ স্থির হয় যে, কূটের রওনা হওয়ার কিছুদিন পরে নন্দকুমার যাত্রা করিবেন।

কূট নন্দকুমারকে হুগলীর ফৌজদারী দিবার জন্য মীর কাসেমকে অনুরোধ করেন; কিন্তু মীর কাসেম তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। কিন্তু নন্দকুমারকে গ্রহণ না করায়, মহাভ্রমের কার্য করিয়াছিলেন। মীর কাসেম তদানীন্তন প্রবঞ্চক ইংরেজ বণিকদিগের দমনের জন্য যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, যদি নন্দকুমারের ন্যায় একজন উপযুক্ত ব্যক্তি তাঁহার পরামর্শদাতা থাকিতেন, তাহা হইলে, তিনি যেরূপ বুদ্ধিমান ও ক্ষমতাশালী পুরুষ ছিলেন, তাহাতে তাঁহার চেষ্টা অনেক পরিমাণে সফল হইতে পারিত। নন্দকুমারকে ফৌজদারী না দেওয়ায় তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। সেই সময়ে একখানি পত্র ইংরেজদিগের হস্তগত হয়। তাহার উপরিভাগে রামচরণ রায় নামে এক ব্যক্তির মোহর খোদিত ছিল; কিন্তু পত্রের মধ্যে বাদশাহের সেনাপতি কামগার খাঁ প্রভৃতিকে উদ্দেশ্য করিয়া অনেক কথা লিখিত থাকে এবং আর একখানি পত্র ফরাসী লসাহেবকে লিখিত হয়। লসাহেব তৎকালে বিহারে ছিলেন। বলা বাহুল্য তাঁহারা সকলেই বাদশাহের পক্ষ হইয়া, ইংরেজদিগকে দমন করিতে চেষ্টা করেন। সেই পত্র নন্দকুমারের লিখিত বিবেচনা করিয়া, ইংরেজেরা পুনর্বার তাঁহাকে প্রহরিবেষ্টিত অবস্থায় রাখেন। এইরূপ অবস্থায় নন্দকুমারকে প্রায় এক বৎসর কাটাইতে হইয়াছিল। তিনি বন্দী-অবস্থায় থাকিয়া গবর্নর ভান্সিটার্টকে লিখিয়া পাঠান যে, আমার শত্রুপক্ষীয়েরা মিথ্যা অপবাদ দিয়া আমার এইরূপ অবস্থা করিয়াছে।

যদি আমাকে বিশ্বাস না করেন, তাহা হইলে আমাকে নিষ্কৃতি প্রদান করুন, আমি সপরিবারে অন্যত্র বাস করিতেছি।[১৭] কিন্তু গভর্নর তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য করেন নাই।

অতঃপর ইংরেজদিগের সহিত মীর কাসেমের ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয় এবং ইংরেজেরা পুনর্বার মীরজাফরকে নবাবী প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন। মীরজাফর এবার নন্দকুমারকে ছাড়িতে চাহিলেন না; তিনি নন্দকুমারকে নিজের দেওয়ান করিবার জন্য কাউন্সিলের সভ্যদিগকে বারংবার পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। সভ্যগণ প্রথমে কিছুতেই স্বীকৃত হন নাই; পরে মীরজাফর খাঁর অত্যন্ত অনুরোধে তাঁহারা নন্দকুমারকে মীরজাফরের দেওয়ান হইতে অনুমতি দিলেন। মীরজাফর তাঁহাকে খালসার দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করিয়া, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মীর কাসেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। পরে বাদশাহের সহিত তাঁহাদের সন্ধি স্থাপিত হইলে, নবাব তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া নন্দকুমারকে 'মহারাজ' উপাধি প্রদান করাইলেন এবং অবশেষে নিজেও সে উপাধি দৃঢ় করিয়া দিলেন। তদবধি দেওয়ান নন্দকুমার মহারাজ নন্দকুমার নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, নন্দকুমার ইংরেজদিগের হস্ত হইতে মীরজাফরকে উদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। মীর কাসেমকে পদচ্যুত করিয়া পুনর্বার মীরজাফরকে নবাবী দেওয়ায়, ইংরেজদিগের প্রতি তাঁহার ঘৃণা আরও বর্ধিত হয় এবং তাঁহাদের চাতুরী তিনি আরও স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারেন। তিনি ক্রমাগত ইংরেজক্ষমতা-হ্রাসের উপায় দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিহারে গমন করিলে, মীর কাসেম ইংরেজদিগের হস্তে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া, বাদশাহ শাহ আলম ও অযোধ্যার নবাব-উজীর সুজা উদ্দৌলার শরণাপন্ন হন। কাশীর রাজা বলবন্ত সিংহ, সুজা উদ্দৌলার পক্ষীয় একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন। এই বলবন্ত সিংহ কাশীর উৎপীড়িত রাজা চেৎসিংহের পিতা। নন্দকুমার, বাদশাহ ও নবাব-উজীরকে ইংরেজ-দিগের ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বী দেখিয়া, ইংরেজদিগের ক্ষমতা হ্রাসের জন্য তাঁহাদের সহিত নানারূপ পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি উক্ত বিষয়ে বলবন্ত সিংহকে যে-সকল পত্র লেখেন, তন্মধ্যে একখানি পত্র ইংরেজদিগের হস্তগত হওয়ায়, ইংরেজেরা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। ইংরেজসেনাপতি জেনারেল কার্নাক তাঁহাকে প্রহরি-হস্তে সমর্পণ করিয়া, কলিকাতায় পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে, সকলে মধ্যস্থ হইয়া তাঁহার ক্রোধের উপশম করিয়াছিলেন। এই সময়ে রাজা নবকৃষ্ণও নাকি নন্দকুমারের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। নবকৃষ্ণ তৎকালে মেজর আডাম্‌সের বেনিয়ানের কাজ করিতেন।

বক্সারের যুদ্ধের পর বাদশাহ ও নবাব-উজীরের সহিত ইংরেজদিগের সন্ধি স্থাপিত

১৭ Long's Selection, p. 310.

হইলে, মীরজাফর ও নন্দকুমার কলিকাতায় আসিলেন। কাউন্সিলের সভ্যেরা পূর্ব হইতেই নন্দকুমারের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন, এক্ষণে আরও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন। তাহার পর, নন্দকুমার নবাবের সহিত মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হন। মীরজাফরের দ্বিতীয় বার সিংহাসনে আরোহণের সময় নন্দকুমার খালসার দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হন। এক্ষণে তিনি বঙ্গদেশের সর্বময় কর্তা হইয়া উঠিলেন। রাজা, জমিদার সকলে তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। নবাব কাসেম আলি খাঁ হিন্দু জমিদারদিগকে অত্যন্ত উৎপীড়িত করিয়াছিলেন, কাহাকে কাহাকেও মুঙ্গের দুর্গে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইংরেজদিগের সহিত তাঁহার ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হওয়ায়, রাজ্যমধ্যে রাজস্ব আদায়েরও বিলক্ষণ গোলযোগ উপস্থিত হয়। অনেকের রাজস্ব বাকী পড়িয়া যায়। পাছে, আবার জমিদারদিগের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার হয়, সেইজন্য তাঁহারা নন্দকুমারের শরণাগত হইলেন। নন্দকুমার দেখিলেন যে, জমিদারদিগের নিকট যত পাওনা রহিয়াছে, তাঁহারা কখনও একেবারে তাহা পরিশোধ করিতে পারিবেন না। সেইজন্য তিনি কতক ছাড়িয়া দিয়া কতক বা কিস্তি কিস্তি দেওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাদিগকে নিষ্কৃতি দিলেন। মীর কাসেমের সময় কোম্পানীর গৃহীত প্রদেশ ব্যতীত সমস্ত বঙ্গদেশে ২,৪১,১৮,৯১২ টাকা রাজস্ব বন্দোবস্ত হইয়াছিল। কিন্তু ১৭৬২-৩ খ্রীঃ অব্দে ৬৪,৫৬,১৯৮ টাকা মাত্র রাজস্ব আদায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ এই যে, মীর কাসেম অধিক পরিমাণে রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন ও ইংরেজদিগের সহিত তাঁহার বিবাদ সংঘটিত হওয়ায় রাজ্যমধ্যে যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তজ্জন্য রাজস্ব আদায়ের পক্ষে নানারূপ বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। নন্দকুমার সেই অতিরিক্ত করভারের লাঘব করিয়া ১৭৬৩-৪ খ্রীঃ অব্দে ১,৭৭,০৪,৭৬৬ টাকা ও ১৭৬৪-৫ খ্রীঃ অব্দে ১,৭৬,৯৭,৬৭৮ টাকা রাজস্ব বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সময় পর্যন্তও বিপ্লবপীড়িত জমিদার ও প্রজাগণের অবস্থা ভাল না হওয়ায়, উক্ত দুই বৎসরে অনেক টাকা রাজস্ব বাকী থাকিয়া যায়। আমরা দেখিতে পাই যে, প্রথম বৎসরে ৭৬,১৮,৪০৭ ও দ্বিতীয় বৎসরে ৮১,৭৫,৫৩৩ টাকা মাত্র রাজস্ব আদায় হইয়াছিল।

নন্দকুমারের রাজস্ববন্দোবস্ত মীর কাসেমের অপেক্ষা অল্প হওয়ায়, শত্রুগণ তাঁহাকে এই বলিয়া দোষ দিয়া থাকেন যে, তিনি জমিদারদিগকে অব্যাহতি দিয়া নিজে অনেক টাকা লাভ করিয়াছিলেন।[১৮] অবশ্য তৎকালে রাজস্ববন্দোবস্তকার্যে বন্দোবস্তকারীর কিছু কিছু প্রাপ্য হইত বটে, কিন্তু নন্দকুমার প্রভুর ক্ষতি করিয়া জমিদারদিগের সহিত এরূপ বন্দোবস্ত কখনও করেন নাই। কারণ তাঁহার প্রভু মীরজাফর খাঁ তাঁহার সে বন্দোবস্তে অসন্তুষ্ট হন নাই। তিনি নন্দকুমারকে মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত বিশ্বাস এবং তাঁহারই পরামর্শানুসারে কার্য করিয়াছিলেন। মীরজাফরের অর্থের প্রয়োজন নিতান্ত

১৮ Barwell's latter.

অল্প ছিল না। এই অর্থের জন্য রাজা দুর্লভরাম ও শেঠদিগের সহিত তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হয়। সুতরাং জমিদারদিগকে বিনা কারণে অব্যাহতি দিলে, তিনি নন্দকুমারের প্রতি যে সন্তুষ্ট থাকিতেন, এ কথা আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, জমিদার ও প্রজাগণ মীর কাসেমের করভারে প্রপীড়িত এবং ১৭৬৩ খ্রীঃ অব্দের ঘোর বিপ্লবে অভিভূত হওয়ায়, নন্দকুমার করভারের লাঘব করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার পর মহম্মদ রেজা খাঁও দেওয়ানীর প্রথম বৎসরে করভারের লাঘব করিয়াছিলেন।[১৯] সুতরাং নন্দকুমারের প্রতি দোষারোপ যে তাঁহার শত্রুপক্ষের বিদ্বেষপ্রসূত তাহাতে সন্দেহ নাই। নন্দকুমারের প্রতি মীরজাফরের

---

১৯ আমরা নিম্নে মীর কাসেম, নন্দকুমার ও মহম্মদ রেজা খাঁর বন্দোবস্ত ও আদায়-অনাদায়ের এক তালিকা প্রদান করিতেছি ঃ

"Statement B. years	Gross Settlement	Collection	Balance
1169—A. D. 1762-3	2,41,18,912	64 56,198	1,76,62,713
Cossim Ali			
1170—1763-4	1,77,04,766	76,18,407	1,00,86,358
Nund Comar			
1171—1764-5	1,76,97,678	81,75,53	95,22,144
Ditto			
1172—1765-6			
Mahd. Reza Khan	1,60,29,011	1,47,04,875	13,24,135"

(5th Report).

উপরি উক্ত তালিকা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, মীর কাসেমের সময় রাজস্ব বন্দোবস্ত অধিক পরিমাণে হওয়ায় পরবর্তী কালে ক্রমে তাহার লাঘব করিতে হইয়াছিল। এইরূপ লঘূকরণের জন্য যদি নন্দকুমার অপরাধী হন, তাহা হইলে কোম্পানীর রাজস্ব বন্দোবস্তকারী রেজা খাঁ যে আরও দোষী হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাস্তবিক নন্দকুমার বা রেজা খাঁ দোষী নহেন। তাঁহারা জমিদার ও প্রজার অবস্থা বুঝিয়াই পূর্বাপেক্ষা লঘুপরিমাণে রাজস্ব বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। অবশ্য নন্দকুমার অপেক্ষা রেজা খাঁ অধিক পরিমাণে রাজস্ব আদায় করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তজ্জন্য তিনি যে নন্দকুমার অপেক্ষা উক্ত বিষয়ে বিশেষরূপ পারদর্শী ছিলেন, তাহা বিবেচনা করার কারণ নাই। কারণ, ১৭৬৩ খ্রীঃ অব্দের ঘোরতর বিপ্লবের পরই নন্দকুমারকে রাজস্ব আদায়ে প্রবৃত্ত হইতে হয়। রেজা খাঁ তাহার দুই বৎসর পরে দেশের শান্তির অবস্থায় বন্দোবস্তের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তথাপি কোম্পানীর আদেশানুসারে তিনি জমিদার ও প্রজাগণের নিকট রাজস্ব আদায়ের জন্য পীড়াপীড়ি করায়, ভবিষ্যতে তাহার ফলে বঙ্গদেশে ছিয়াত্তরে মন্বন্তর ঘটিয়াছিল। কোম্পানীর আমলে রাজস্ব আদায়ের কঠোরতা যে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের অন্যতম কারণ, তাহা নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং মীর কাসেম ও রেজা খাঁর বন্দোবস্তের মধ্যবর্তী বন্দোবস্তই যে কল্যাণকর হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই।

এরূপ বিশ্বাস ছিল যে, যতদিন পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন ততদিন নন্দকুমারকে রাজ্যের সর্বময় কর্তা করিয়া রাখিয়াছিলেন। নবাব তাঁহার প্রতি সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। নন্দকুমার তাঁহার স্বত্বাধিকারের জন্য ইংরেজদিগের সহিত ক্রমাগত তর্ক-বিতর্ক করিতে প্রবৃত্ত হন। ইংরেজেরা নবাবের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া তাঁহাকে সাক্ষীগোপালের ন্যায় রাখিতে চেষ্টা পাইতেন। নন্দকুমারও যাহাতে তাঁহাকে স্বাধীনভাবে রাখিতে পারেন, তজ্জন্য অত্যন্ত চেষ্টা করিতেন। তিনি ইংরেজদিগকে নবাবের সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে দিতেন না।

এইরূপে নবাবের শাসনকার্যের উপর হস্তক্ষেপ লইয়া তাঁহার সহিত ইংরেজদিগের বিবাদ গুরুতর হইয়া উঠিল। তিনি যতই প্রভুর পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহার ক্ষমতা-বৃদ্ধির চেষ্টা পান, ইংরেজেরা ততই বাধা দিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা যাহা ইচ্ছা করিতেন, নন্দকুমার নবাবকে তাহা অস্বীকার করিতে পরামর্শ দিতেন। প্রায় দুই বৎসরকাল উভয়পক্ষের এইরূপ তর্ক-বিতর্ক চলিতে চলিতে, নবাব মীরজাফর খাঁ ১৭৬৫ খ্রীঃ অব্দে মানবলীলা সংবরণ করিলেন। নবাব মীরজাফর খাঁ নন্দকুমারের প্রতি এরূপ সন্তুষ্ট ছিলেন যে, তাঁহার অনুরোধে অন্তিমকালে কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত পান করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করেন এবং তাহাই তাঁহার শেষ জলপান।[২০] নন্দকুমার যাঁহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া ইংরেজদিগের শত্রু হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রাণত্যাগের পর তিনি অত্যন্ত ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়েন। ইংরেজেরা সুযোগ পাইয়া, তাঁহাকে দমন করিবার জন্য বিশেষরূপে যত্নবান হইলেন। মীরজাফরের প্রতি অনুরাগ ও স্বদেশের স্বত্বাধিকারের জন্য চেষ্টা করায়, ইংরেজেরা যে তাঁহার ঘোরতর শত্রু হইয়া উঠেন, ইহা স্বয়ং হেস্টিংস ও বার্কের ন্যায় মহানুভব ইংরেজেরাও স্বীকার করিয়াছেন। মীরজাফরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র নজমউদ্দৌলা বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার মসনদে বসিলেন। নন্দকুমার তাঁহাদের বংশের হিতৈষী হওয়ায়, তিনি তাঁহাকে দেওয়ান রাখিবার জন্য কলিকাতা কাউন্সিলের নিকট অত্যন্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন। কাউন্সিলের সভ্যেরা তাঁহাদের পরম শত্রু নন্দকুমারকে দেওয়ানী দিতে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। ইহার পূর্বে ভান্সিটার্টসাহেব বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন। ভান্সিটার্ট বিলাতে গেলে, ক্লাইব পুনর্বার বাঙ্গলার গবর্নর হইয়া আসিলেন।

বিলাত যাওয়ার পূর্বে ভান্সিটার্ট নন্দকুমারের বিরুদ্ধে এক কৌশল করিয়াছিলেন। তজ্জন্য নন্দকুমারের হিতৈষী ও প্রতিপালক লর্ড ক্লাইবও তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হন। ভান্সিটার্ট যে-সকল কাগজে নন্দকুমারের দোষের কথা লিপিবদ্ধ করেন, সেগুলি পুস্তকাকারে বাঁধাইয়া স্বীয় ভ্রাতা জর্জ ভান্সিটার্টকে দিয়া যায় এবং কাউন্সিলে পাঠ করিতে অনুরোধ করেন। ক্লাইব উপস্থিত হইলে, ভান্সিটার্ট সেই পুস্তক কাউন্সিলে

২০ Seir Mutaqherin Trans., Vol. II, p. 342.

পাঠ করিয়াছিলেন।[২১] তদবধি ক্লাইব নন্দকুমারের উপর এতই বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার কোন উপদেশই শুনিতেন না। তিনি নন্দকুমারকে দেওয়ানী দেওয়া দূরে থাকুক, তাঁহাকে কলিকাতা হইতে নির্বাসিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্লাইব মহম্মদ রেজা খাঁকেই নায়েব সুবার পদ প্রদান করিয়া জগৎশেঠ ও দুর্লভরামকে তাঁহার সাহায্যের জন্য নিযুক্ত করিলেন। ভান্সিটার্টের লিখিত বিবরণে বিশ্বাস করিয়া ক্লাইব মনে করিয়াছিলেন যে, পাছে আবার নন্দকুমার বাদশাহ ও ফরাসীদের সহিত মন্ত্রণা করেন, তজ্জন্য তিনি তাঁহাকে কলিকাতা হইতে স্থানান্তরিত করিয়া চট্টগ্রামে পাঠাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। এই সংবাদ শ্রবণে নন্দকুমারের পরিবারের মধ্যে এক বিষাদ-কোলাহল উপস্থিত হয়; নন্দকুমারও ভীত হইয়া পড়েন।

সৌভাগ্যক্রমে একটিমাত্র কারণে তিনি সে যাত্রা নিষ্কৃতি লাভ করিতে সমর্থ হন। রাজা নবকৃষ্ণ কাউন্সিলের সভ্যদিগকে বলিয়াছিলেন যে, নন্দকুমারের ন্যায় ষড়যন্ত্রকারী লোককে চট্টগ্রামের ন্যায় দূর দেশে পাঠাইলে, ভবিষ্যতে নানারূপ গোলযোগ ঘটিতে পারে। অতএব তাঁহাকে প্রহরিবেষ্টিত করিয়া কলিকাতাতে রাখাই আবশ্যক। নবকৃষ্ণের সেই পরামর্শানুসারে ক্লাইব প্রভৃতি তাঁহাকে চট্টগ্রামে না পাঠাইয়া কলিকাতায় প্রহরিবেষ্টিত করিয়া রাখেন। ইহাতে তাঁহার প্রতি নবকৃষ্ণের কিরূপ ভাব ছিল, তাহা সকলেই সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিতেছেন।[২২] তাহার পর

২১ Seir Mutaqherin Trans., Vol. II, p. 376-77.

২২ শ্রীযুক্ত এন্‌. এন্‌. ঘোষসাহেব মহোদয় নবকৃষ্ণের এই ব্যবহারকে সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; আমরা প্রথমে কাউন্সিলের মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া, পরে ঘোষসাহেবের মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি, এবং সে সম্বন্ধে আমাদেরও যাহা বক্তব্য তাহাও প্রকাশ করিব।—

"But our well-known friend Nubkissen Moonshe, has lately given us a very sound advice. He says that an intriguing man Nuncomar should not be sent to Chittagong, at a considerable distance from Calcutta, on the contrary he should be detained at Calcutta under strict surveillance. It is therefore ordained that Nuncomar be detained at Calcutta under surveillance as a state-prisoner." (Proceedings of Select Committee, 19th July, 1765.)

উপরি-উক্ত মন্তব্য পাঠ করিলে নন্দকুমারের প্রতি নবকৃষ্ণের কিরূপ ভাব ছিল, তাহা সুস্পষ্ট-রূপেই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু ঘোষসাহেব তাঁহার নায়ককে কিরূপভাবে সমর্থন করিয়াছেন, তাহাও একবার সাধারণে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আমরা ঘোষসাহেবের মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি।

"This does not by any means show Nubkissen's enmity to Nuncomar. When a boy is convicted of an offencc, and his parent pleads that the young fellow would be demoralised by the company

নন্দকুমার অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। কোম্পানী বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করিলে, ক্লাইব মহম্মদ রেজা খাঁকে নায়েব-দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন। পূর্বে তিনি নায়েব-সুবা হইয়াছিলেন; এক্ষণে আবার নায়েব-দেওয়ান হইয়া বাঙ্গলার সর্বেসর্বা হইয়া উঠিলেন। তৎকালে নন্দকুমার ও মহম্মদ রেজা খাঁ উভয়েই উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। নন্দকুমার যেমন হিন্দুসমাজের নেতা ছিলেন, মহম্মদ রেজা খাঁও সেইরূপ মুসলমানসমাজে নেতৃত্ব করিতেন। এই দুইজনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবশেষে বঙ্গদেশে ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হয়। মহম্মদ রেজা খাঁ বাঙ্গলার সর্বময় কর্তা হইয়া, দেশে যেরূপ অরাজকতার প্রাদুর্ভাব বাড়াইয়াছিলেন, তাহা বঙ্গবাসিমাত্রেই অবগত আছেন। তাঁহার সেই অত্যাচারের ফল বঙ্গের করাল দুর্ভিক্ষ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের নিদারুণ হাহাকার! আমরা পরে সে কথার উল্লেখ করিব।

---

of criminals in a jail and might be dismissed with a wholesome flogging which he might never forget, is it difficult to guess the motive of the plea? It is not the infliction of flogging but the avoidance of jail, and the spirit that prompts the suggestion is one of tenderness and not of severity. It is easy to read the same spirits in Nubkissen's suggestion in the present case. The surveillance is a mere excuse to recommend the suggestion to the official mind, the real motive is the desire to share an exalted Brahman the indignity of deportation. If the recommendation as put in the official proceedings is to be understood literally. It has the fatal fault of proving too much. Deportation is a punishment held to be specially suitable to turbulent and disaffected persons, and if Nuncomar was not to be sent away to Chittagong because he was 'intriguing man' that would be a good argument for retaining in Calcutta, 'under surveillance' all dangerous characters at all times. Was surveillance or imprisonment impossible at Chittagong?" (Ghose's Memoirs of Nubkissen, pp. 112-113)

এই ঘোষসাহেব আবার অন্যান্য লেখকদিগকে বলিযাছেন যে, তাঁহারা কৈফিয়ৎ দ্বারা ঘটনা সকল এড়াইতে চেষ্টা করিয়াছেন। পিতাপুত্রের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ঘোষসাহেব নবকৃষ্ণের ও নন্দকুমারের সেইরূপ সম্বন্ধ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। জীবনীলেখক হইলে যে একেবারে অন্ধ হইতে হয়, তাহা আমরা জানিতাম না। যাঁহার রচনার মধ্যে এইরূপ সমর্থনের চেষ্টা অনেক স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে, তিনি কোন্ সাহসে অন্যান্য লোকদিগের প্রতি কটাক্ষপাত করেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এক্ষণে ঘোষসাহেবের প্রতি সেই প্রসিদ্ধ সংস্কৃতবাক্য —"রাজন্ সর্ষপ-মাত্রাণি পরছিদ্রাণি পশ্যসি।' আত্মনো বিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যসি॥" প্রযুক্ত হইতে পারে কিনা, তাহা সাধারণে বিচার করিয়া দেখিবেন। ফলতঃ ঘোষসাহেব নবকৃষ্ণকে সমর্থনের চেষ্টা করিলেও সাধারণের নিকট ইহাই প্রতীত হইবে যে, নবকৃষ্ণ নন্দ-

নন্দকুমার কার্যচ্যুত হইয়া এক্ষণে নীরবে কাল কাটাইতে লাগিলেন। সে সময়ে তিনি প্রায়ই কলিকাতায় বাস করিতেন। কলিকাতার যেস্থানে বীডন উদ্যান রহিয়াছে, তথায় নন্দকুমারের আবাসবাটী ছিল। ইহার নিকট আজিও একটি স্ট্রীট তাঁহার পুত্র রাজা গুরুদাসের নাম ঘোষণা করিতেছে। ক্লাইব ভারতবর্ষে আসিয়া ভান্সিটার্ট-রাজত্বের অনেক প্রকার নিন্দাবাদ শ্রবণ করেন এবং তাহার তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু কাহারও উপর সে ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। অবশেষে তাঁহাকে নন্দকুমারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সেই সময়ে তিনি অনুসন্ধানের দ্বারা বুঝিতে পারিলেন যে, ভান্সিটার্ট নন্দকুমারের বিরুদ্ধে অনেক কথা বিদ্বেষবশতঃই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি নন্দকুমারকে আবার স্নেহচক্ষে দেখিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে ভান্সিটার্টরাজত্বের একটি আমূল বিবরণ লিখিতে বলেন। নন্দকুমার তাহার এক বৃহৎ তালিকা প্রস্তুত করিয়া দেন।[২৩] ক্লাইব সেই তালিকা লইয়া বিলাতে রওনা হন।

ক্লাইব বিলাতে চলিয়া গেলে, ভের্লেস্টসাহেব তাঁহার স্থানে কলিকাতার গবর্নর হইয়া আসেন। ভের্লেস্টের সহিত নন্দকুমারের বিশেষরূপ পরিচয় হয়। কিন্তু বিপক্ষেরা ক্রমশঃ নন্দকুমারের প্রতি তাঁহারও বিরক্তি জন্মাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে কলিকাতায় আর একজন তাঁহার বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠেন, তিনি রাজা নবকৃষ্ণ। রাজা নবকৃষ্ণ চিরদিন নন্দকুমারের প্রতিযোগী ছিলেন। যখন নন্দকুমারের প্রতিভায় দেশ আলোকিত, তিনি দেশের মধ্যে গণ্যমান্য বাঙ্গালী, ও

কুমারের প্রতি শ্রদ্ধা বা স্নেহবশতঃ কাউন্সিলের সভ্যদিগকে নন্দকুমারকে প্রহরিবেষ্টিত করিয়া কলিকাতায় রাখিতে পরামর্শ দেন নাই। তিনি প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বীর ন্যায়ই পরামর্শ দিয়াছিলেন। আমরা উপরে কাউন্সিলের মন্তব্য হইতে দেখাইয়াছি যে, নবকৃষ্ণ নন্দকুমারকে কি জন্য কলিকাতায় প্রহরিবেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু বারওয়েল তাঁহার ভগিনীর পত্রে ঐ সম্বন্ধে কিরূপ লিখিয়াছেন দেখুন ঃ—

"But Maharaja Nubkissen represented that as Maharaja Nuncomar was a Brahmin, it was not right to punish him too severely, therefore his sentence of punishment to Chittagong was left unexcuted."

এই বারওয়েল সাহেবের পত্রে নন্দকুমারসম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা কেহ কেহ অভ্রান্ত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। যদি কেহ তাহাতে সন্দেহ করেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাদের নিকট অপরাধী বলিয়া স্থির হইবেন। যে বারওয়েল কাউন্সিলের সভ্য হইয়া তাঁহার পূর্বতন মন্তব্যগুলি দেখিবার অবকাশ পান নাই, ও খোসগল্প অবলম্বন করিয়া উপরি-উক্ত ঘটনাকে অন্যরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার নন্দকুমারসম্বন্ধীয় বর্ণিত সমস্ত ঘটনা বিশ্বাসযোগ্য কিনা, তাহা সাধারণে বিবেচনা করিবেন। ফলতঃ বারওয়েলের পত্রে নন্দকুমারের যে জীবনী প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে বিদ্বেষ ও অতিরঞ্জনের পূর্ণমাত্রাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেজন্য আমরা অনেক স্থলে বারওয়েলের বর্ণনাকে সতর্কতার সহিত গ্রহণ করিয়াছি।

২৩ Seir Mutaqherin Trans., Voll. II, p. 401.

তাঁহার বুদ্ধিমত্তায় ইংরেজেরাও স্তম্ভিত, সে সময়ে নবকৃষ্ণ মুন্সীগিরি বা বেনীয়ানী করিতেন। নন্দকুমারের শ্রীবৃদ্ধি তাঁহার প্রাণে সহ্য হইল না। তিনি বরাবরই নন্দকুমারকে হিংসার চক্ষে দেখিতেন। যখন ক্লাইব নন্দকুমারকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন, সেই সময় নবকৃষ্ণ তাঁহার অধীনতায় সামান্য মুন্সীগিরি কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। নন্দকুমারের এত সম্মান তাঁহার প্রাণে সহ্য হইবে কেন? তাহার পর যে অবধি তিনি ইংরেজদিগের চক্ষুঃশূল হইয়া উঠেন, তখন হইতে নবকৃষ্ণ তাঁহার নিন্দা করিয়া ইংরেজমহলে আপনার প্রতিপত্তি বাড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারই পরামর্শক্রমে ইংরেজেরা নন্দকুমারের উপর মহাক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। ক্রমে নন্দকুমারের পতন হইলে, নবকৃষ্ণ বাঙ্গালীদিগের মধ্যে ক্ষমতাবান্ হইয়া উঠেন। যথেষ্ট অর্থ ও নানাবিধ পদের ক্ষমতা লাভ করিয়া, তিনি দেশের লোকের উপর স্বীয় ক্ষমতা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। সকলে আসিয়া নন্দকুমারের আশ্রয় লয়।

আমরা দেখাইয়াছি যে, যে ব্যক্তি নন্দকুমারের আশ্রয় লয়, তিনি শত বিপদ মাথায় লইয়াও তাহার উপকারে অগ্রসর হন। তজ্জন্য তিনি নিজে কতই না কষ্ট পাইয়াছেন, তথাপি লোকের উপকার করিতে বিরত হন নাই। নবকৃষ্ণ উৎকোচ-গ্রহণ ও গৃহস্থের পরিবারবর্গের সতীত্ব নাশ প্রভৃতির দ্বারা নিন্দনীয় হইয়া উঠেন, অন্ততঃ এই মর্মে তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত হয়। যদিও তাৎকালিক ইংরেজদিগের প্রিয়পাত্র, নবকৃষ্ণ তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন, তথাপি সাধারণ লোকের মনে সে সমস্ত অভিযোগ একেবারে মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয় নাই। আমরা দুই একটি মোকর্দমার উল্লেখ করিতেছি। রামনাথ দাস নামে এক ব্যক্তি নবকৃষ্ণের নামে ৩৬ হাজার টাকা উৎকোচগ্রহণের অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিল।[২৪] গোকুল সোনার নামে আর একজন এই বলিয়া আবেদন করিয়াছিল যে, রাম সোনার ও রাম বেনিয়া নামে নবকৃষ্ণের দুইজন লোক একজন হরকরার সহিত তাহার বাটীতে প্রবেশ করিয়া নবকৃষ্ণের জন্য তাহার ভগিনীকে বলপূর্বক ধরিয়া লইয়া যায়। নবকৃষ্ণ তাহাকে একরাত্রি আবদ্ধ রাখিয়া তাহার সতীত্ব নষ্ট করেন।[২৫] নীবু নামক আর একটি ব্রাহ্মণীর সতীত্ব নষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার স্বামী অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছিল। কিন্তু নবকৃষ্ণ এই সমস্ত অভিযোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন।[২৬] নন্দকুমারের শত্রুপক্ষীয়েরা বলেন যে, এই সমস্ত মিথ্যা অভিযোগ নন্দকুমারের পরামর্শ-ক্রমেই উপস্থাপিত করা হয়। রাজা নবকৃষ্ণ ঐ সকল ভয়াবহ কার্য করিয়াছিলেন কিনা, জানি না। কিন্তু তৎকালে ধর্ম ও নীতিহীন, স্বার্থপর লোকদিকের অসাধ্য

২৪ Bolt's Indian Affairs, p. 100. Also Long's Selection.
২৫ Bolt's Indian Affairs, p. 96.
২৬ Barwell's Letter, also Long's Selection.

কোন কার্যই ছিল না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। নন্দকুমার কিঞ্চিৎ স্বার্থপর হইলেও তাঁহার চরিত্র অতীব পবিত্র ছিল, তিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণের ন্যায় ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন। ঐ সমস্ত পাপের কার্য তাঁহার মনে অত্যন্ত আঘাত দিত এবং বিপন্নের উদ্ধারের জন্য তাঁহার হৃদয় সর্বদা বিচলিত হইত। উৎপীড়িত লোকেরা তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তিনি তাহাদের কল্যাণের ও স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর ক্ষমতাহ্রাসের জন্য নবকৃষ্ণের অত্যাচারের প্রতিবিধানের উপায় বলিয়া থাকিবেন এবং তাহাদিগকে তজ্জন্য সাহায্যও করিতে পারেন। এইজন্য তিনি শত্রুপক্ষীগণ-কর্তৃক ঐ সকল ব্যক্তিকে মিথ্যা অভিযোগে উত্তেজিত করিয়াছেন বলিয়া কথিত হইয়া আসিতেছেন।[২৭] লোকের উপকার করিতে গিয়া এরূপ অনেক স্থলে নন্দকুমার শত্রুপক্ষীয়গণ-কর্তৃক নিন্দিত ও অপদস্থ হইয়াছেন।

---

২৭ নবকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি প্রথমে কলিকাতার জমিদার চার্লস ফ্লয়ারের নিকট উপস্থাপিত হয়। তিনি তাহাতে বিশ্বাস না করিয়া পরে কাউন্সিলে প্রেরণ করেন। কাউন্সিল হইতে নবকৃষ্ণ অব্যাহিত পান। নন্দকুমার ও বোল্টস্‌সাহেবের দ্বারা এই সমস্ত মোকর্দমা উপস্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া, কাউন্সিলের সভ্যেরা মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। বোল্টস্‌সাহেব তাৎকালিক কোম্পানীর কর্মচারিগণের অত্যাচারের প্রতিবাদ করিতেন বলিয়া, তাঁহারা বোল্টস্‌সাহেবের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং তাঁহাকে নানারূপে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করিতেন। নন্দকুমারও সেইজন্য তাঁহাদের বিদ্বেষভাজন হইয়াছিলেন। নবকৃষ্ণের সহিত বোল্টস্‌ ও নন্দকুমার উভয়েরই অসদ্ভাব ছিল। নবকৃষ্ণ আপনার জবাবপত্রে বোল্টস্‌ ও নন্দকুমারের বিষয় বিশেষরূপে উল্লেখ করায়, কাউন্সিলের সভ্যেরা আপনাদের প্রিয়পাত্র নবকৃষ্ণকে প্রমাণাভাব বলিয়া যে নিষ্কৃতি দিবেন তাহাতে বৈচিত্র্য কি? নবকৃষ্ণকে নিষ্কৃতি দিয়া তাঁহারা বোল্টস্‌কে এদেশ হইতে বিদায় লইতে ও নন্দকুমারকে গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকিতেও মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কাউন্সিলের বিচার চূড়ান্ত বলিয়া যাঁহারা বিশ্বাস করিতে চান, করিতে পারেন, সে বিষয়ে আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু আমরা যে বিষয়ের উল্লেখ করিলাম, তাহাতে ন্যায্য বিচার হওয়ার সম্ভাবনা কি না, তাহাও একবার তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া রাখি। নবকৃষ্ণ ঐ সমস্ত অপরাধ না করিতে পারেন, কিন্তু নন্দকুমারের নামে তিনি যে দোষারোপ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। যে ব্রাহ্মণপত্নীর সতীত্ব নষ্ট করিয়াছিছেন বলিয়া তিনি অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই ব্রাহ্মণী ও তাহার স্বামীর দ্বারা তিনি পরে সাক্ষ্য দেওয়াইয়াছিলেন যে, নন্দকুমারের নিযুক্ত কয়েকটি লোকের প্রলোভনে ও উত্তেজনায় ব্রাহ্মণ এই মোকর্দমা উপস্থাপিত করে এবং তাহার স্ত্রীকে নবকৃষ্ণের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দিতে বলে। তখনও বঙ্গদেশের এরূপ দুরবস্থা ঘটে নাই যে, একজন ব্রাহ্মণ সামান্য অর্থলোভে স্বীয় ধর্মপত্নীকে অসতী প্রতিপন্ন করিয়া লোকসমাজে অনায়াসে কালযাপন করিতে পারিবে। যে দেশে তখনও পর্যন্ত সতীদাহ প্রবলরূপে প্রচলিত ছিল, সেই দেশের সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতির কোন ব্যক্তি যৎকিঞ্চিৎ অর্থলোভে যে আপনার স্ত্রীকে জগতের সমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিবে, ইহা আমাদের মনে স্থান পায় না। নবকৃষ্ণ সেই ব্রাহ্মণপত্নীর প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, উক্ত ব্রাহ্মণপত্নীর অপবাদ ঘোষিত হইলে, তাহার আত্মীয়গণ উক্ত অপবাদ দূরীকরণের জন্য নবকৃষ্ণপক্ষীয় লোকদিগের পরামর্শে শেষে যে উক্ত ব্যাপার নন্দকুমার ও তৎপক্ষীয়

১৭৬৯ খ্রীঃ অব্দে ভের্লেস্টসাহেব বিলাতযাত্রা করিলে, কার্টিয়ারসাহেব তাঁহার স্থানে কাউন্সিলের সভাপতি ও গবর্নর নিযুক্ত হন। কার্টিয়ারসাহেবের সময়েই বাঙ্গালা ১১৭৬ সালে ইংরেজী ১৭৭০ খ্রীঃ অব্দে বাঙ্গালায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ইহাকেই সাধারণতঃ 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' কহিয়া থাকে। এই ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের সময় বাঙ্গলার নায়েব-সুবা ও নায়েব-দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁর অত্যাচারে দেশের যাবতীয় লোক অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিল। সেইজন্য তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত হয়। তন্মধ্যে প্রধান দুইটির বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রথমটি, রেজা খাঁ দুর্ভিক্ষের সময় বাজারের সমস্ত চাউল ক্রয় করিয়া একচেটিয়া করিয়া রাখেন এবং অত্যন্ত উচ্চদরে সে সমস্ত বিক্রয় করেন। দ্বিতীয়টি, তিনি সাধারণ তহবিলের অনেক অর্থ অপব্যয় ও আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। ইহার পর কার্টিয়ারসাহেব পদত্যাগ করিলে, ১৭৭২ খ্রীঃ অব্দে ওয়ারেন্ হেস্টিংস তাঁহার স্থলে গবর্নর নিযুক্ত হন। ডিরেক্টরগণ তাঁহাকে মহম্মদ রেজা খাঁর বিচার করিতে বলেন। হেস্টিংস মুর্শিদাবাদের রেসিডেন্ট মিডল্‌টন সাহেবের প্রতি রেজা খাঁকে বন্দী করিয়া কলিকাতায় পাঠাইতে আদেশ দেন। তদনুসারে মিডল্‌টন রেজা খাঁকে তাঁহার বাসস্থান মুর্শিদাবাদের নেসাতবাগ হইতে বন্দী করিয়া কলিকাতায় পাঠান। এই সময়ে পাটনার দেওয়ান সেতাবরায়েরও বিচার উপস্থিত হয়।

হেস্টিংস মহম্মদ রেজা খাঁর বিচার করিতে আরম্ভ করিয়া, তাঁহার সমস্ত অপরাধের প্রমাণের জন্য উপযুক্ত লোকের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। নন্দকুমার ব্যতীত আর কে সেই সমস্ত দোষের কথা বিশেষ করিয়া জানিতে পারে? বাস্তবিক বঙ্গরাজ্যের ঘটনাসমূহ নন্দকুমার বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। তাঁহার ন্যায় বঙ্গদেশকে কেহ আপনার বলিয়া মনে করিত না। বঙ্গরাজ্যের কি শাসন, কি রাজস্ব, সমস্ত বিষয়েরই তিনি সংবাদ রাখিতেন এবং যেখানে অত্যাচার ঘটিত, লোকে সর্বাগ্রে তাঁহাকেই তাহার প্রতিকারের জন্য অনুরোধ করিত। হেস্টিংস নন্দকুমারের প্রতি পূর্ব হইতে বিরক্ত থাকিলেও, উপস্থিত কার্যোদ্ধারের জন্য মহম্মদ রেজা খাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণসংগ্রহের জন্য নন্দকুমারকে নিযুক্ত করিলেন। শুধু হেস্টিংস যে নিজেই

লোকদিগের পরামর্শে ঘটিয়াছিল বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছিল, এরূপ অনুমান অনায়াসে করা যাইতে পারে। বঙ্গসমাজের রীতি অনুসারে ব্রাহ্মণপত্নীর সতীত্বনাশের কলঙ্ক মিথ্যা ঘটনার আরোপ দ্বারা প্রক্ষালিত করিবার চেষ্টাই সত্য বলিয়া বোধ হয়। বিশেষতঃ নন্দকুমারের এরূপ অধঃপতন ঘটে নাই যে, তিনি আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীকে অপদস্থ করার জন্য ব্রাহ্মণ-দম্পতীকে সামান্য অর্থে সন্তুষ্ট করিয়া ব্রাহ্মণপত্নীর সতীত্বনাশের মিথ্যা অপবাদ প্রচার করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। যিনি কূটনীতিবিশারদ ছিলেন, তিনি ইহা অপেক্ষা অনেক সদুপায়ে নবকৃষ্ণকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতে পারিতেন। তাঁহার অন্যান্য দোষ থাকিলেও তিনি যেরূপ স্বধর্মভক্ত লোক ছিলেন, তাহাতে ব্রাহ্মণপত্নীর সতীত্বনাশের মিথ্যা অপবাদ সৃষ্টি করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবযোগ্য নহে। আমরা নন্দকুমারের প্রতি এরূপ দোষারোপ কোন মতেই বিশ্বাস করিতে পারি না।

নন্দকুমারের সাহায্য লইয়াছিলেন এমন নহে, ডিরেক্টরগণ তাঁহাকে আদেশ দিয়াছিলেন যে, যদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তিনি নন্দকুমারেরও সাহায্য লইতে পারেন। বলা বাহুল্য, এই ডিরেক্টরগণের নিকট নন্দকুমারের শত্রুপক্ষীয়েরা তাঁহার নামে নানাপ্রকার কুৎসা রটনা করিয়া, তাঁহাদিগকেও অনেক পরিমাণে নন্দকুমারের প্রতি অসন্তুষ্ট করিয়া তুলেন। কিন্তু তাঁহারাও অনেক দিন হইতে নন্দকুমারের কার্যদক্ষতা বিশেষরূপে অবগত ছিলেন ; কাজেই হেস্টিংসকে তাঁহার সাহায্যগ্রহণের জন্য আদেশ লিখিয়া পাঠাইলেন।

মহম্মদ রেজা খাঁর বিরুদ্ধে নন্দকুমারকে নিযুক্ত করিবার আর একটি কারণ ছিল বলিয়া হেস্টিংস প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, রেজা খাঁ মুসলমানসমাজের যেরূপ নেতা, নন্দকুমারও হিন্দুসমাজের সেইরূপ নেতা ছিলেন। উভয়েই ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠেন। হেস্টিংস উভয়কেই মনে মনে ভয় করিতেন। এইজন্য তিনি "কণ্টকেনৈব কণ্টকং" নীতি অনুসরণে নন্দকুমারের দ্বারা রেজা খাঁর অধঃপতন ঘটাইতে ইচ্ছা করেন। এ কথা তিনি নিজেই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।[২৮] অবশ্য ইহাতে হেস্টিংসের কূটবুদ্ধির প্রশংসা করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু তাঁহার প্রবৃত্তিও কিরূপ ছিল, ইহা হইতে তাহাও বুঝা যায়। নন্দকুমার রেজা খাঁর বিচারের জন্য যথেষ্ট যত্ন করিলেন। কিন্তু রেজা খাঁ এদিকে তলে তলে হেস্টিংসসাহেবকে বশীভূত করিয়া ফেলিলেন। যাহার নিকট হইতে হেস্টিংস অর্থের প্রলোভন পাইতেন, সে সহস্র দোষী হইলেও, তিনি অম্লানবদনে তাহাকে অব্যাহতি দিতেন। প্রায় দুই বৎসর বিচারের পর রেজা খাঁ নিষ্কৃতি লাভ করিলেন।

রেজা খাঁর বিচারের প্রথমে হেস্টিংস নন্দকুমারের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন ; এমন কি, তাঁহার সমস্ত অনুরোধ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এস্থলে দুই একটির উল্লেখ করা যাইতেছে। হেস্টিংস গবর্নর হইয়া আসিলে নবাব মোবারক উদ্দৌলার অভিভাবক ও দেওয়ান নিযুক্ত করিবার ভার তাঁহার প্রতি অর্পিত হয়। তিনি মণিবেগমের নিকট হইতে অনেক টাকা উৎকোচ গ্রহণ করিয়া, মোবারক উদ্দৌলার স্বীয় জননীর দাবী অগ্রাহ্য করিয়া, বিমাতা মণিবেগমকেই অভিভাবক ও নন্দকুমারের পুত্র গুরুদাসকে দেওয়ান নিযুক্ত করেন। কিন্তু সে নিয়োগ যে কেবল নন্দকুমারের অনুরোধেই হইয়াছিল, এমন নহে ; তজ্জন্য নন্দকুমারের নিকট হইতে তিনি যথেষ্ট নজরও আদায় করিয়াছিলেন। আমরা যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করিব। গুরুদাসের

---

২৮ "There is no doubt that Nund Kumar is capable of affording me great service by information and advice, and it is on his abilities and on the activity of his ambition and hatred to Reza Khan I depend for investing his conduct."

নিয়োগসম্বন্ধে গ্রেহাম, ডেকে, মরেল প্রভৃতি কাউন্সিলের সভ্যেরা আপত্তি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রধান আপত্তি এই ছিল যে, গুরুদাসের নিয়োগে নন্দকুমারেরই প্রভুত্ব থাকিবে। যে নন্দকুমার কোম্পানীর বিরুদ্ধে শাহজাদা ও ফরাসীদিগের সহিত চক্রান্ত করিয়াছেন, তাঁহার ক্ষমতাবৃদ্ধি হইতে দেওয়া কদাচ উচিত নহে। হেস্টিংস সে কথা না শুনিয়া গুরুদাসকেই নিযুক্ত করেন।

এই সময়ে তিনি নন্দকুমারের প্রকৃত চরিত্রসম্বন্ধে নিজের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা এ স্থলে তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম প্রদান করিতেছি। নন্দকুমারের পরম শত্রু হেস্টিংসের নিকট হইতে তাঁহার প্রকৃত চরিত্রের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যে অতীব বিস্ময়কর, তাহাতে সন্দেহ নাই। হেস্টিংস এই সময়ে নন্দকুমারের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন বলিয়া, তাঁহার প্রকৃত চরিত্রের কথা কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিয়াছিলেন। নন্দকুমার-চরিত্রের প্রতি যাঁহাদের ঘৃণা আছে, তাঁহারাও হেস্টিংসের মন্তব্যটি একটু মনোযোগ সহকারে পাঠ করিবেন। হেস্টিংস এই রূপ লিখিয়াছিলেন যে, "নন্দকুমার প্রকৃত কর্মচারী ও মন্ত্রীর ন্যায় স্বীয় প্রভুর কল্যাণের ও ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য বৈদেশিকগণের সাহায্যগ্রহণের ও কোম্পানীর ক্ষমতাহ্রাসের চেষ্টা করিয়াছিলেন। নবাব মীরজাফর তাঁহাকে যথেষ্ট বিশ্বাস করিতেন। মীরজাফর কখনও তাঁহাকে অবিশ্বাস্য বলিয়া তাঁহার প্রতি দোষারোপ করেন নাই। নন্দকুমার যে সমস্ত রাজনৈতিক ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন, তৎসমুদায় কেবল তাহার প্রভুর মঙ্গল ও ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই সংসাধিত হইত। মীরজাফরের মঙ্গলের সহিত তাঁহার নিজের স্বার্থের যে সংস্রব ছিল না, এমন নহে। তাহারও কিঞ্চিৎ মিশ্রণ ছিল। মীরজাফর তাঁহার প্রতি যে কিরূপ সন্তুষ্ট ছিলেন, তাঁহার রাজত্বের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁহাকে যেরূপ রাজসম্মানে সম্মানিত করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তাহা যথেষ্টরূপে সপ্রমাণ হয়। নন্দকুমারের দ্বারা যে সকল কার্য সংসাধিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ আমাদের বিরুদ্ধ হইলেও, সত্য কথা বলিতে গেলে, ইহা তাঁহার পক্ষে কোন মতে নিন্দনীয় নহে; বরং প্রশংসনীয়। তিনি স্বীয় প্রভুর স্বাধীনতাবিস্তারের জন্য বাদশাহের নিকট হইতে সনন্দ আনাইয়াছিলেন এবং পাছে তাঁহার ক্ষমতার হ্রাস হয়, তজ্জন্য মহম্মদ রেজা খাঁর নিয়োগসম্বন্ধে আপত্তি করিয়াছিলেন।"[২৯]

বাস্তবিক নন্দকুমারসম্বন্ধে বিবেচক ব্যক্তিমাত্রেরই এই মত। তাঁহার শত্রুপক্ষীয়গণ মনে মনে ইহাই বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু আপনাদিগের জেদ ও খাতির রক্ষার জন্য তাঁহার অযথা নিন্দা করিয়াছেন। নন্দকুমারেরর প্রতি হেস্টিংসের বিদ্বেষভাব সেই সময়ে প্রশমিত হওয়ায়, তিনি তাঁহার চরিত্রসম্বন্ধে প্রকৃত কথাই প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরম শত্রু হেস্টিংসের কথা তদীয় চরিত্রের মহত্ত্বপ্রতিপাদনের পক্ষে অল্প প্রামাণ্য

২৯ Minute of the Committee or Circuit of Kasimbazar, 28th July, 1772.

নহে। রেজা খাঁকে নিষ্কৃতি পাইতে দেখিয়া, জনসাধারণে আশ্চর্যান্বিত হইল। নন্দকুমারও হেস্টিংসচরিত্র বিশেষরূপে উপলব্ধি করিলেন।

ইহার পর হইতে দেশমধ্যে হেস্টিংসসাহেবের অত্যাচার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। উৎকোচপ্রদানে জমিদার ও প্রজাসাধারণে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। গঙ্গাগোবিন্দসিংহ, কান্তবাবু, দেবীসিংহ প্রভৃতি দেশীয় প্রাতঃস্মরণীয় (?) ব্যক্তিগণ হেস্টিংসের অনুচর হইয়া উঠিলেন। নবকৃষ্ণ, রেজা খাঁ প্রভৃতিও তাহাতে যোগ দিলেন। নন্দকুমার দেশের অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত মর্মাহত ও দুঃখিত হইলেন। কিন্তু এক্ষণে তিনি একরূপ ক্ষমতাহীন ; কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কি জমিদার কি প্রজা, সকলে আসিয়া তাঁহার নিকট আপনাদিগের প্রতি অত্যাচার এবং স্ব স্ব মনোবেদনার কথা জানাইতে আরম্ভ করিলেন। শুনিয়া সেই পরদুঃখ কাতর স্বদেশভক্তের প্রাণে আঘাত লাগিল। তিনি যথাসাধ্য তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া স্বীয় ক্ষমতাহীনতার কথা জানাইতে লাগিলেন ; কিন্তু কেহই তাঁহার আশ্রয় পরিত্যাগ করিতে চাহিল না। নাটোর, বর্ধমান প্রভৃতি বাঙ্গলার শীর্ষস্থানীয় জমিদারবৃন্দ হেস্টিংস ও তাঁহার অনুচরবর্গের ভীষণ অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া তাঁহার শরণাগত হইলেন। তিনি তাঁহাদিগের কি উপায় করিবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। নন্দকুমারের নিকট সাধারণের গমনাগমন এবং তাঁহার নিকট অত্যাচার-কাহিনীর প্রচারে, হেস্টিংস ও তাঁহার অনুচরবর্গ ক্রমে নন্দকুমারের প্রতি অসন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। এইরূপে উভয় পক্ষের মধ্যে ঘোরতর বিরক্তির সঞ্চার হইল। হেস্টিংস নন্দকুমারের প্রতি যেটুক সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা একেবারে ভুলিয়া গিয়া পুনর্বার নিজ মূর্তি ধারণ করিলেন। নন্দকুমারও তাঁহার অত্যাচারের প্রতিবিধানের জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার একটি সুযোগ উপস্থিত হইল। আমরা যথাক্রমে তাহার নির্দেশ করিতেছি।

পলাশী-যুদ্ধের পর হইতে যখন বঙ্গরাজ্যে ইংরেজদিগের ক্ষমতা বদ্ধমূল হইতে আরম্ভ হয়, তদবধি দেশমধ্যে কোম্পানীর কর্মচারিগণের অযথা প্রভুত্ব ও অত্যাচার দিন দিন বর্ধিত হইতে থাকে। এই সমস্ত অত্যাচারের কথা ইংলণ্ডে পৌঁছিলে, মহানুভব ব্রিটিশজাতির হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত লাগে। তাঁহারা নিরীহ ভারতবাসিগণের প্রতি অত্যাচার নিবারণের জন্য কৃতসঙ্কল্প হন। পার্লিয়ামেণ্ট সভা সেই সমস্ত বিষয়ের অনুসন্ধানের জন্য ১৭৭২ খ্রীঃ অব্দে গুপ্তসমিতি নামে এক সভার প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহাদের অনুসন্ধানে সমস্ত বিষয় প্রকাশিত হইলে, এই অত্যাচার নিবারণের জন্য, ইংলণ্ডের তৎকালীন মন্ত্রী লর্ড নর্থের মন্ত্রিত্বকালে রাজ্য-সংক্রান্ত নিয়ামক বিধি (Regulating Act) বিধিবদ্ধ হইয়া, বাঙ্গলার গবর্নরকে ভারতবর্ষের গবর্নর জেনারেল করা হয় ও তাঁহার সাহায্যের জন্য চারি জন সদস্য নিযুক্ত হয়। তাঁহাদের অত্যাচার নিবারণ ও দেশের সুবিচারের জন্য সুপ্রীমকোর্ট স্থাপিত হইয়া তাহাতে এক জন প্রধান বিচারপতি (Chief Justice) ও অপর তিন জন বিচারক নিযুক্ত হন। গবর্নর

জেনারেল ও চারিজন সভ্যের মধ্যে বারওয়েলসাহেব পূর্ব হইতেই এখানে ছিলেন। অন্য তিন জন—ক্লেভারিং, মন্সন ও ফ্রান্সিস এবং সুপ্রীমকোর্টের প্রধান জজ ইলাইজা ইম্পে এবং চেম্বার্স, হাইড ও লেমস্টেয়ার নামে অপর জজত্রয় ১৭৭৪ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল মাসে ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিয়া ১৯শে অক্টোবর কলিকাতার চাঁদপাল-ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হন। তোপধ্বনি প্রভৃতিতে তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হয়। এই নবাগতদিগের মধ্যে সদস্যগণের সহিত গবর্নরের বিরোধ ও বিচারকদিগের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। ইম্পেসাহেব হেস্টিংসসাহেবের সহপাঠী-বন্ধু ছিলেন; এইজন্য বিচারকদিগের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব সংস্থাপিত হইয়াছিল।

এইরূপ পক্ষাপক্ষে বাঙ্গলায় মহান্ অনর্থ উপস্থিত হয় এবং তাহা কোম্পানীর রাজত্বের গাঢ় কালিমা বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। নবাগত সদস্যত্রয় দেশের শাসনকার্যের অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিয়া, ক্রমাগত হেস্টিংসসাহেবের উৎকোচ-গ্রহণ ও অত্যাচারের প্রমাণ পাইতে লাগিলেন। এই সময়ে নন্দকুমারের সহিত তাঁহাদের পরিচয় হওয়ায়, তাঁহারা তাঁহাকে হেস্টিংসসাহেবের সমস্ত দোষের তালিকা প্রদান করিতে অনুরোধ করেন। তজ্জন্য তিনি হেস্টিংসের দোষ সপ্রমাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময়ে বর্ধমানের মৃত মহারাজ তিলকচাঁদের পত্নী হেস্টিংসের অত্যাচারের জন্য কাউন্সিলে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন। তাহার পর, নন্দকুমার প্রকাশ্যভাবে হেস্টিংসের বিরুদ্ধে এক আবেদন-পত্র প্রদান করেন। উক্ত আবেদন-পত্র ১৭৭৫ খ্রীঃ অব্দের ৮ই মার্চ তারিখে লিখিত হয়। ১১ই তারিখে কাউন্সিলে ফ্রান্সিস উক্ত পত্র উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। পত্রখানি অত্যন্ত দীর্ঘ; বর্তমান প্রবন্ধে তাহার আনুপূর্বিক উল্লেখ করা দুঃসাধ্য। আমরা সংক্ষেপে তাহার মর্ম প্রদান করিতেছি।

নন্দকুমার প্রথমতঃ মীর কাসেমের সহিত যুদ্ধের সময় ইংরেজদিগের কিরূপে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়া, মহম্মদ রেজা খাঁর কাহিনী জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করেন। পরে হেস্টিংসসাহেব মান্দ্রাজ হইতে গবর্নর হইয়া আসিলে, তাঁহার সহিত কিরূপে বন্ধুত্ব হয়, এবং কাউন্সিলের সভ্যেরা বিলাত হইতে কলিকাতায় আসিলে, হেস্টিংস যেরূপ অন্যান্য দেশীয় ব্যক্তিদিগকে তাঁহাদের সহিত পরিচিত করাইয়াছিলেন, নন্দকুমার তাঁহার নিকট সেইরূপ পরিচয়ের প্রার্থনা করিলে, হেস্টিংস নিজ শত্রুপক্ষের সহিত তাঁহার যোগ আছে বলিয়া, তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য করেন এবং অবশেষে এলিয়ট্ নামে কোন সাহেবকে তাঁহার পরিচয়ের জন্য আদেশ দেন। এই এলিয়ট্ নন্দকুমারের মোকর্দমায় দ্বিভাষীর কার্য করিয়াছিলেন।

এই সময়ে নন্দকুমারের পরম শত্রু বর্ধমানের রেসিডেণ্ট গ্রেহাম সাহেবের সহিত হেস্টিংসের পরামর্শ চলিতেছিল। নন্দকুমার উল্লেখ করেন যে, হেস্টিংস স্পষ্টাক্ষরে তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, এখন হইতে আমি তোমার শত্রু হইলাম এবং তোমার অনিষ্ট করিতে ক্ষান্ত হইব না। তাহার পর, মোহনপ্রসাদ নামে নন্দকুমারের একজন শত্রু

হেস্টিংসের বাটীতে গতায়াত করিত। এই মোহনপ্রসাদের সহিত তাঁহার জামাতা ও বর্তমান কুঞ্জঘাটা রাজবংশের আদি-পুরুষ জগৎচাঁদও যোগদান করিয়াছিলেন। নন্দকুমার দুঃখের সহিত বলিয়াছেন, যে জগৎচাঁদকে আমি পুত্রের ন্যায় বাটীতে প্রতিপালন করিয়াছি, আজ সেও আমার অনিষ্টসাধনে উদ্যত ![৩০]

হেস্টিংস মহম্মদ রেজা খাঁ ও সেতাবরায়ের বিরুদ্ধে নন্দকুমারকে নিযুক্ত করিলে, নন্দকুমার তাঁহাদের বিরুদ্ধে এক এক তালিকা প্রস্তুত করিয়া দেন। মহম্মদ রেজা খাঁ নিজামতের রত্নখচিত অলঙ্কার, হস্তী ও অশ্ব ব্যতীত প্রায় বিশ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেন। দুর্ভিক্ষের সময় চাউল একচেটিয়া করিয়া রাখিয়া, উচ্চদরে বিক্রয় করেন, ইত্যাদি অনেক কথার উল্লেখ করিয়াছিলেন। সেতাবরায়ের বিরুদ্ধেও ৯০ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করার এক তালিকা প্রস্তুত হয়। রেজা খাঁ ও সেতাবরায় উভয়েই এই বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য হেস্টিংস, নন্দকুমার ও অন্যান্য দুই একজনকে উৎকোচ দিতে প্রতিশ্রুত হন। নন্দকুমার সে কথা গবর্নরকে জানাইয়াছিলেন। রেজা খাঁ তাঁহাকে দুই লক্ষ ও হেস্টিংসকে দশ লক্ষ এবং সেতাবরায়ও তাঁহাকে এক লক্ষ, হেস্টিংসকে চারি লক্ষ ও রীড নামে কোম্পানীর আর একজন কর্মচারীকে ৫০ হাজার টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন। ইহার পর তাঁহাদিগকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

কাশীর রাজা বলবন্তসিংহ দুইটি পরগণা স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া লন। তাঁহার নিকট হইতে ২৪ লক্ষ টাকা কোম্পানীর পাওনা হইয়াছিল। হেস্টিংস প্রথমে নন্দকুমারের জামাতা রাধাচরণকে বলবন্তের পুত্র চেৎসিংহের নিকট হইতে সে টাকা আদায়ের জন্য আদেশ দেন ; পরে স্বয়ং কাশীতে উপস্থিত হইয়া চেৎসিংহের সহিত সাক্ষাতের পর কোম্পানীর পাওনা টাকা ছাড়িয়া দেন।

বাহারবন্দ পরগণা বলপূর্বক রানী ভবানীর নিকট হইতে লইয়া কৃষ্ণকান্ত নন্দীর পুত্র লোকনাথকে দেওয়া হয়।

দিল্লীর বাদশাহ নন্দকুমারকে রাজসম্মানের চিহ্নস্বরূপ একখানি ঝালরদার পাল্কী প্রদান করেন ; পাটনার শাসনকর্তা তাহা আটক করিয়া রাখেন। হেস্টিংস সেখানি কলিকাতায় পাঠাইতে লিখিলে, তাহা কলিকাতায় উপস্থিত হয়। কিন্তু তিনি সেখানি নন্দকুমারকে না দিয়া তাহা নিজ ব্যবহারের জন্য গ্রহণ করেন।

তাহার পর মণিবেগম ও গুরুদাস প্রভৃতির নিয়োগের জন্য নন্দকুমার যে সমস্ত টাকা আপনাদিগের কর্মচারী ও হেস্টিংসের কর্মচারী কান্তবাবুর ভ্রাতা নৃসিংহ প্রভৃতির দ্বারা প্রেরণ করেন, তাহারও একটি তালিকা দিয়াছিলেন। তাহাতে প্রথম দফায় ৭৪০০৪, দ্বিতীয় দফায় ২৫৯৯৮।।০, তৃতীয় দফায় ৩১০৩।।০, চতুর্থ দফায় ১০০০,

---

৩০ জগৎচাঁদের কথা গুরুদাসের প্রতি নন্দকুমারের লিখিত একখানি পত্র হইতেও জানা যায়, পরিশিষ্টে পত্রখানি প্রকাশিত হইল।

পঞ্চম দফায় ১ লক্ষ, ৬ষ্ঠ দফায় ১৸০ লক্ষ টাকা, মোট ৩৫৪১০৫ টাকা কোন্ কোন্ তারিখে কিভাবে দেওয়া হয়, সমস্তই উল্লিখিত হয়।[৩১]

নন্দকুমারের পত্র কাউন্সিলে পঠিত হইলে হেস্টিংসসাহেব ফ্রান্সিসকে বলেন যে, আমি কৌতূহলবশতঃ জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি নন্দকুমারের এই অভিযোগের কথা পূর্বে জানিতেন কি না ?

ফ্রান্সিস উত্তর দেন যে, আমি ব্যক্তিবিশেষের কৌতূহলনিবারণের জন্য উত্তর দিতে বাধ্য নহি। তবে গবর্নরকে বলিতে পারি, আমি তাহার বিষয় বাস্তবিক কিছুই জানিতাম না। সে দিবস অন্যান্য কার্যের পর সভা ভঙ্গ হয়। কিন্তু সেই দিন হইতে হেস্টিংস নন্দকুমারের অনিষ্টসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

১৩ই মার্চ পুনর্বার কাউন্সিলের অধিবেশন হয়। নন্দকুমার সে দিবসও পুনর্বার আর এক পত্র লেখেন। তাহাতে তিনি পূর্ব অভিযোগের কোন বিষয়ের পরিবর্তন করিতে ইচ্ছুক নহেন বলিয়া উল্লেখ করেন এবং স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সমস্ত প্রমাণ করিতে স্বীকৃত হন। তিনি এইরূপ লেখেন যে, তিনি পূর্ব গবর্নরদিগকে স্বার্থশূন্য হইয়া কোম্পানীর রাজস্ববৃদ্ধি ও দেশের শ্রীবৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। হেস্টিংস প্রথমে তাহাই করেন, কিন্তু অবশেষে আর সেকথা গ্রাহ্য করিতেন না। যাহাতে তাঁহার পত্রদ্বয়ের বিষয় আলোচনা করিয়া কোম্পানীর ও প্রজাবর্গের সুখবৃদ্ধি হয়, তাহারই জন্য তিনি প্রধানতঃ অনুরোধ করিয়াছিলেন।

নন্দকুমারকে সভাস্থলে উপস্থিত হইবার জন্য মন্সনসাহেব প্রস্তাব করিলে, গবর্নর ও বারওয়েল অত্যন্ত তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত করেন। তাঁহারা এইরূপ বলেন যে, কাউন্সিলের সভ্যত্রয় নন্দকুমারের নাম দিয়া নিজেরাই সমস্ত কার্য করিয়াছেন ; নন্দকুমারের উপস্থিতি গবর্নর প্রাণান্তেও সহ্য করিতে পারিবেন না। যখন সভ্যেরা তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া, নন্দকুমারকে আহ্বান করিবার জন্য বোর্ডের সেক্রেটারীকে আদেশ দিলেন, তখন হেস্টিংসসাহেব সভাভঙ্গের প্রস্তাব করিয়া ক্রোধভরে সভাগৃহ পরিত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বারওয়েলও প্রস্থান করিলেন। অপর সভ্যত্রয় হেস্টিংসসাহেবের প্রস্তাব গ্রাহ্য না করিয়া, সভার কার্য করিতে লাগিলেন। নন্দকুমার উপস্থিত হইলে, তাঁহারা নন্দকুমারকৃত অভিযোগের প্রমাণাদি চাহেন। নন্দকুমার কতকগুলি দলিল উপস্থিত করেন ; তাহাদের মধ্যে দুই একখানির মূল দলিল চাহিলে, তাহাও প্রদত্ত হয়। এই দলিলের সহিত কৃষ্ণকান্ত নন্দীর কোন সম্বন্ধ থাকায়, কাউন্সিল হইতে তাঁহাকে আহ্বান করা হয়। কিন্তু তিনি লিখিয়া পাঠান যে, আমি এক্ষণে গবর্নরসাহেবের নিকট থাকায় এবং তিনি আমাকে যাইতে নিষেধ করায়, আমি যাইতে পারিলাম না। ইহাতে তাঁহারা কান্তবাবুর প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন। সে দিবস অন্যান্য কার্যের পর সভা ভঙ্গ হয়।

৩১ Minutes of Evidence on W. H.'s Trial, pp. 1000-1003.

ইহার পর, কান্তবাবুকে আহ্বান করিয়া, তাঁহাকে বোর্ডের আদেশ অমান্য করার জন্য কিরূপ জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তাহা কান্তবাবু নামক প্রবন্ধে উল্লিখিত হইবে। কাউন্সিলে অপদস্থ হওয়ায়, নন্দকুমারের প্রতি হেস্টিংসের প্রতিহিংসানল এতদূর প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল যে, তিনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রাণনাশের পর্যন্ত বাসনা করিতে লাগিলেন। অচিরাৎ তিনি অনুচরবর্গের সহিত তাহার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

হেস্টিংস নন্দকুমারের প্রধান শত্রু গ্রেহামসাহেবের সহকারিতায় নন্দকুমারের অনিষ্টসাধনের পরামর্শে প্রবৃত্ত হইলেন। গঙ্গাগোবিন্দসিংহ, কান্তবাবু, নবকৃষ্ণ এবং গ্রেহামসাহেবের মুন্সী সদরউদ্দীন প্রভৃতি সকলেই সাধ্যমত হেস্টিংসের সাহায্য করিতে লাগিলেন। কমলউদ্দীন খাঁ নামে একজন শয়তান-প্রকৃতির লোক সেই সময়ে হিজলীর ইজারদারী করিত। নন্দকুমারের সহিত তাহার এবং তাহার পিতার পরিচয় ছিল। কিন্তু কমলের অসৎপ্রকৃতির জন্য নন্দকুমারের সহিত তাহার মনো-বিবাদ উপস্থিত হয়। যে সময়ে হেস্টিংসের সহিত নন্দকুমারের বিবাদ চলিতেছিল, সেই সময় কমলউদ্দীন নন্দকুমারের জামাতা রাধাচরণকে লইয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা করিতে উপস্থিত হয়। নন্দকুমার রাধাচরণের অনুরোধে কমলউদ্দীনের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পরিত্যাগ করেন। নন্দকুমারের নিকট কমলউদ্দীনের উপস্থিত হইবার কারণ এই ছিল যে, গঙ্গাগোবিন্দসিংহ ও আর্চডেকিন নামে কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে উৎকোচ লওয়ার অভিযোগ করিবার জন্য, সে ফাউক নামে কোন বিশিষ্ট ইংরেজের দ্বারা কাউন্সিলে আর্জি প্রেরণ করিতে উৎসুক হয় এবং তজ্জন্য ফাউককে অনুরোধ করিবার জন্য নন্দকুমারের প্রয়োজন হইয়া উঠে। নন্দকুমার রাধাচরণের সহিত কমলউদ্দীনকে ফাউকের নিকট পাঠাইয়া দেন। ফাউক কাউন্সিলে আর্জি দাখিল করিতে সম্মত হন। ইতিমধ্যে হেস্টিংস গ্রেহামের মুন্সী সদরউদ্দীনের দ্বারা কমলউদ্দীনকে বশীভূত করিয়া নন্দকুমার, ফাউক ও রাধাচরণের নামে এক অভিযোগের সূচনা করেন।

হেস্টিংস সুপ্রীমকোর্টে জজদিগের নিকট ১৭৭৫ খ্রীঃ অব্দের ১৯শে এপ্রিল এইরূপ লিখিয়া পাঠান যে, কমলউদ্দীন আসিয়া আমার নিকট এইরূপ প্রকাশ করে যে, নন্দকুমার ও ফাউক তাহার নিকট হইতে বলপূর্বক আমার ও বারওয়েল প্রভৃতির নামে উৎকোচ গ্রহণের এই মিথ্যা আর্জি লইয়াছে, ও গঙ্গাগোবিন্দ প্রভৃতির নামের আর্জি ফেরত চাহিলে প্রত্যর্পণ করিতেছে না। সুপ্রীমকোর্টের জজ মহোদয়েরা হেস্টিংসের পত্র পাইয়া ২৯শে এপ্রিল হইতে ইহাকে গবর্নর ও বারওয়েল প্রভৃতির নামে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ ধরিয়া, প্রাথমিক অনুসন্ধানে (Preliminary inquiry) প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রথমে কমলউদ্দীনের অভিযোগের দরখাস্ত গ্রহণ করা হইল। কমলউদ্দীন দরখাস্তে প্রকাশ করে যে, সে গঙ্গাগোবিন্দকে ভয় প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নন্দকুমার প্রভৃতির নিকট আর্জি প্রদান করিয়াছিল; বাস্তবিক তাহার তাহা পেশ করিবার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু নন্দকুমারের নিকট আর্জি ফেরত চাহিলে তিনি

বলেন যে, যদি কমল গবর্নরের বিরুদ্ধে কোন আর্জি লিখিয়া দেয়, তাহা হইলে তাহার পূর্ব আর্জি ফেরত দিবেন। কমল বাধ্য হইয়া তাহার মুন্সীর দ্বারা আর্জি লিখিয়া দেয়। পরে রাধাচরণের সহিত ফাউকের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি বলেন যে, গবর্নর প্রভৃতিকে তুমি কত টাকা দিয়াছ? কমল কিছু প্রদান করে নাই বলায়, ফাউক ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে এক কেতাবের দ্বারা প্রহার করেন। অবশেষে বলপূর্বক তাহাকে গবর্নরের বিরুদ্ধে আর্জিতে মোহর করাইয়া লন এবং আর একটি বিভিন্ন ফর্দ লিখাইয়া লন। সেই ফর্দে এইরূপ লিখিত হয় যে, কমলের নিকট হইতে বারওয়েল ৩ বৎসরের মধ্যে ৪৫ হাজার টাকা, গবর্নর ১৫ হাজার নজর, ভান্সিটার্ট ১২ হাজার, রাজবল্লভ ৭ হাজার ও কৃষ্ণকান্ত ৫ হাজার টাকা লইয়াছেন। কমল পরে সেই সকল আর্জি ফেরত পাঠাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ফেরত পায় নাই। নন্দকুমারের জবানবন্দীতে প্রকাশ হয় যে, কমলউদ্দীন গঙ্গাগোবিন্দ প্রভৃতির আর্জি ফেরত চাহে নাই; বরং তাহা কাউন্সিলে দিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছিল এবং নিজেই গবর্নরের বিরুদ্ধে আর্জি লিখিয়া লইয়া এক মুন্সীর সহিত নন্দকুমারের নিকট উপস্থিত হয়। তাহার বর্ণনা ভাল না হওয়ায়, নন্দকুমার তাহার স্থানে স্থানে পরিবর্তন করিয়া কমলউদ্দীনের মুন্সীর দ্বারা তাহা লিখাইয়াছিলেন।[৩২]

এই বিষয়ের অনুসন্ধানে বিশেষ কোন ফল হইতেছে না দেখিয়া, হেস্টিংস বুঝিলেন যে, ষড়যন্ত্রের মোকর্দমায় কিছুই হইবে না; তখন তিনি অন্য একটি উপায় উদ্ভাবন করিলেন। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, মোহনপ্রসাদ নামে নন্দকুমারের একজন শত্রু, সেই সময়ে হেস্টিংসের নিকট গতায়াত করিত। এই মোহনপ্রসাদ বুলাকীদাস শেঠ নামক একজন মহাজনের আমমোক্তার ছিল। বুলাকীদাস একজন আগরওয়ালা বেনিয়া; তিনি প্রায়ই মুর্শিদাবাদে বাস করিতেন। মীর কাসেমের সময় হইতে তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি হয়। বুলাকীদাসের নিকট মহারাজ নন্দকুমার একছড়া মুক্তার কণ্ঠী, একখানি কল্কা, একটি শিরপেঁচ ও ৪টি হীরকাঙ্গুরীয় বিক্রয়ার্থ প্রদান করেন; তাহাদের মূল্য ৪৮,০২১ টাকা স্থির হয়। মীর কাসেমের সহিত ইংরেজদিগের বিবাদ আরম্ভ হইলে, দেশের চারিদিকে ভয়ানক লুণ্ঠনব্যাপার আরম্ভ হয়; তাহাতে বুলাকীদাসের বাটীও লুণ্ঠিত হয়। সেইজন্য নন্দকুমারের সমস্ত জহরত অপহৃত হইয়া যায়। বুলাকীদাস নন্দকুমারকে সেই সমস্ত জহরতের মূল্যস্বরূপ একখানি অঙ্গীকার-পত্র লিখিয়া দেন। তাহাতে লিখিত হয় যে, বুলাকীদাস নন্দকুমারকে জহরতের মূল্যস্বরূপ ৪৮,০২১ টাকা ও প্রত্যেক টাকায় চারি আনা সুদ দিতে স্বীকৃত হইলেন, এবং কোম্পানীর নিকট তাঁহার যে দুই লক্ষেরও উপর টাকা পাওনা আছে, তাহা পাইলেই, সমস্ত পরিশোধ করিয়া দিবেন। এই অঙ্গীকার-পত্রে বুলাকীদাস মোহর করিয়া দিলে, মাতাব রায় ও মহম্মদ কমল আপন আপন মোহর এবং বুলাকীদাসের উকীল শীলাবৎ

৩২ Holwell's State Trials, Vol. XX.

নিজের স্বাক্ষর সাক্ষিরূপে সংযুক্ত করিয়া দেয়। বুলাকীদাসের মৃত্যু হইলে, কোম্পানীর নিকট পাওনা টাকা হইতে নন্দকুমার সেই অঙ্গীকারের বলে, বুলাকীদাসের সম্পত্তির একজিকিউটার পদ্মমোহন দাসের সম্মতিতে সেই টাকা পরিশোধ করিয়া লন। মোহনপ্রসাদ সমস্ত বিষয়ই জানিত। ক্রমে ক্রমে অঙ্গীকার-পত্রের সমস্ত সাক্ষীর ও পদ্মমোহনের মৃত্যু হইলে, গঙ্গাবিষ্ণু নামে বুলাকীদাসের একজন আত্মীয় ও বুলাকীদাসের বিধবা পত্নী তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। মোহনপ্রসাদ তাঁহাদেরও আমমোক্তাররূপে কার্য করিতে থাকে।

হেস্টিংস এই মোহনপ্রসাদের সহিত যোগ দিয়া নন্দকুমারের নামে এক জাল করা মোকর্দমা উপস্থাপিত করিলেন। নন্দকুমার বুলাকীদাসের নামে অঙ্গীকার-পত্র জাল করিয়াছেন এবং মিথ্যা করিয়া তাহার উত্তরাধিকারিগণের নিকট হইতে অর্থ লইয়াছেন বলিয়া, মোকর্দমা উপস্থাপিত করা হয়। জাল-করা মোকর্দমায় সরকারই বাদী, এবং তৎকালে তাহাতে প্রাণদণ্ড পর্যন্ত শাস্তি হইত। ষড়যন্ত্রের মোকর্দমায় ফল হইবে না বুঝিয়া, হেস্টিংস এই ভীষণ মিথ্যা মোকর্দমার সৃষ্টি করিলেন। নন্দকুমারের সহিত বুলাকীদাসের হিসাবপত্র লইয়া দেওয়ানী আদালতে গঙ্গাবিষ্ণু এক মোকর্দমা আনয়ন করে; মোহনপ্রসাদ তাহার তদ্বিরকারক ছিল। সেই মোকর্দমার নিষ্পত্তি হইতে না হইতে, হেস্টিংসের পরামর্শে ফৌজদারী মোকর্দমা উপস্থাপিত করা হইল।

নন্দকুমারের নামে সুপ্রীমকোর্টে অভিযোগ উপস্থিত হইলে, জজেরা ১৭৭৫ খ্রীঃ অব্দের ৬ই মে রাত্রি দশটার সময় তাঁহাকে জেলে পাঠাইলেন। নন্দকুমার একজন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। জেলে থাকিলে তাঁহার স্নানাহ্নিক ও আহারাদির অসুবিধা হইবে বলিয়া, তাঁহার পক্ষীয়েরা আবেদন করিলে, এমন কি কাউন্সিলের সভ্যেরাও তজ্জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলে, জজেরা সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অধিকন্তু তাঁহারা তৎকালীন কোন কোন পণ্ডিতের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া জানাইলেন যে, ইহাতে নন্দকুমারের জাতি নষ্ট হইবে না। কৃষ্ণজীবন শর্মা, বাণেশ্বর শর্মা, কৃষ্ণগোপাল শর্মা ও গৌরীকান্ত শর্মা ব্যবস্থা প্রদান করেন। তাঁহারা বলেন যে, এক কারাগারে এক ছাদের নীচে ব্রাহ্মণ ও মুসলমান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতি থাকিলেও, ব্রাহ্মণ যদি পৃথক গৃহে থাকেন, তাহাতে তাঁহার জাতি যায় না ; কিন্তু রাজাজ্ঞায় ব্রাহ্মণ কারাগারে থাকিয়া পানাহার করিলে, তাঁহার প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক হয়। তথাপি ভিন্ন ছাদের নীচে পৃথক গৃহে থাকিয়া, আহারাদি করিলে সামান্য প্রায়শ্চিত্তই যথেষ্ট। মুসলমান প্রভৃতি এক ছাদের নীচে অথচ ভিন্ন ঘরে থাকিলে, ব্রাহ্মণ স্নানাহ্নিক আহারাদি করিতে পারেন না ; যদি তিনি সন্ধ্যাহ্নিক বা আহারাদি করেন, তাহাতে তাঁহার জাতি যায় না ; কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। পণ্ডিতদিগকে মহারাজের কারাগৃহ দেখাইলে তাঁহারা বলেন যে, মহারাজ নন্দকুমার এরূপ স্থলে আহার করিতে পারেন না ; যদি

করেন, তাহাতে তাঁহার জাতি যাইবে না, কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।[৩৩] পণ্ডিত-দিগের এইরূপ অদ্ভুত ব্যবস্থায় নন্দকুমারকে কারাযন্ত্রণাই ভোগ করিতে হইল। তিনি জামিনে নিষ্কৃতি পাইলেন না। হায়! বঙ্গদেশে চিরকালই কি 'পলিটিকাল পণ্ডিত' পাওয়া যাইত? নন্দকুমারের কারাবাসে ও মিথ্যা মোকর্দমায় ক্লেভারিং, মন্সন ও ফ্রান্সিস অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। নন্দকুমার, ফাউক প্রভৃতির নামে মোকর্দমা উপস্থিত হইলে, তাঁহারা নন্দকুমারের বাটীতে গমন করিয়া তাঁহাকে একবার উৎসাহিত করিয়া আসেন। এদিকে জজদিগের সহিত যোগ দিয়া হেস্টিংস নন্দকুমারের সর্বনাশে প্রবৃত্ত হইলেন। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ষড়যন্ত্রের মোকর্দমার প্রাথমিক অনুসন্ধান হইতেছিল। জাল-করা অভিযোগ উপস্থিত হইলে, তাহার পরবর্তী দাওরায় ষড়যন্ত্রের মোকর্দমার পূর্বেই জাল-করা মোকর্দমার দিন পড়িল। ধন্য ন্যায়পর ব্রিটিশ বিচারকগণ! তোমরা হেস্টিংসের জন্য বিচারালয়ের নিয়ম পর্যন্তও লঙ্ঘন করিতে ত্রুটি কর নাই।

১৭৭৫ খ্রী অব্দের ৮ই জুন হইতে কলিকাতার সুপ্রীমকোর্টে মহারাজ নন্দকুমারের জাল-করা অভিযোগের বিচার আরম্ভ হয়। ৯ই জুন এডওয়ার্ড স্কট, রবার্ট ম্যাক-ফার্লিন, টমাস স্মিথ, এডওয়ার্ড এলারিংটন, যোসেফ বার্নার্ড স্মিথ, জন রবিন্সন, জন ফার্গুসন, আর্থার আডি, জন কলিস, সামুয়েল টাউচেট, এডওয়ার্ড সাটারথোয়েট এবং চার্লস ওয়েস্টন এই দ্বাদশ জন জুরী স্থির হন। তাঁহাদের মধ্যে জন রবিন্সনকে জুরীপতি নির্বাচিত করা হয়। সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি ইম্পেসাহেব চেম্বার্স, হাইড ও লেমস্টেয়ার জজত্রয়ের সহিত জুরীদিগকে লইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। পূর্বোল্লিখিত ইলিয়টসাহেব দ্বিভাষীর কার্যে নিযুক্ত হন। নন্দকুমারের পক্ষে জারেট আটর্নী ও ফ্যারার কৌন্সিলি নিযুক্ত হইয়া যথারীতি মোকর্দমা চালাইতে লাগিলেন। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, এ অভিযোগে স্বয়ং সরকার বা ইংলণ্ডাধিপ ফরিয়াদী। বিচার প্রথানুযায়ী অন্যান্য কার্যের পর ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হইল। প্রাসঙ্গিক (Formal) সাক্ষীদের কথা ছাড়িয়া দিলে, ফরিয়াদীর পক্ষ হইতে কমল-উদ্দীন, তাহার ভৃত্য হোসেন আলি, খাজা পিত্রুস, সদরউদ্দীন, মোহনপ্রসাদ, নবকৃষ্ণ, সহবৎ পাঠক এবং কৃষ্ণজীবন দাস এই আটজন প্রধান সাক্ষীকে উপস্থিত করা হয়। ফরিয়াদী পক্ষ হইতে এরূপ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা হয় যে, বুলাকীদাসের অঙ্গীকার-পত্রে যে তিনজন সাক্ষী ছিল, তাহাদের মধ্যে শীলাবতের মৃত্যু হইয়াছে, মাতাব রায় নামে কোন লোকই ছিল না ও মহম্মদ কমল, কমলউদ্দীন খাঁ ব্যতীত আর কেহই নহে। আসামী পক্ষ হইতে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা হয় যে, অঙ্গীকার-পত্রের তিনজন সাক্ষীরই মৃত্যু ঘটিয়াছে। আমরা এই সাক্ষীদিগের মধ্য হইতে দুই চারি-জনের সাক্ষ্যের সংক্ষিপ্ত মর্ম প্রদান করিতেছি।

৩৩ Selection from State Papers (Forest), Vol. II, pp. 376-77

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বুলাকীদাসের অঙ্গীকার-পত্রে মাতাব রায় ও মহম্মদ কমল মোহর করে ও শীলাবৎ নাম স্বাক্ষর করিয়া দেয়। কমলউদ্দীনের সাক্ষ্য হইতে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছিল যে, মহম্মদ কমলের মোহরই তাহার নিজের মোহর। এই কমলউদ্দীনই আমাদিগের পূর্বোল্লিখিত সেই শয়তান-প্রকৃতি হিজলীর ইজারদার।

কমলউদ্দীন বলিতে আরম্ভ করে যে, ১৭৬৩ খ্রীঃ অব্দে যখন নন্দকুমার নবাব মীরজাফরের সহিত মুঙ্গেরে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় সে মুঙ্গেরে মহারাজের নিকট তাহার মোহর পাঠাইয়া দেয়। মোহর পাঠাইবার এইরূপ কারণ উপস্থিত হয়। এক সময়ে কমলউদ্দীন কোন কারণে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল ; পরে কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিলে, সে নবাব মীরজাফরের নিকট এক আর্জি দাখিল করিবার ইচ্ছা করে। নন্দকুমারকে সে কথা জানাইলে, তিনি আর্জি লিখাইয়া কমলের মোহরসংযুক্ত করিবার জন্য তাহা চাহিয়া পাঠান। এইজন্য সে নবাবকে ১ স্বর্ণ মোহর ও ৪ টাকা নজর এবং নন্দকুমারকে সেইরূপ এক স্বর্ণ মোহর ও ৪ টাকা নজর পাঠাইয়া সেই সঙ্গে তাহার নামের মোহরও পাঠাইয়া দেয়। অঙ্গীকার-পত্রের মোহরে আবদুল মহম্মদ কমল লেখা থাকায় এবং তাহার নাম কমলউদ্দীন হওয়ায়, উভয়ের পার্থক্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, কমল উত্তর দেয় যে, পূর্বে তাহার নাম মহম্মদ কমল ছিল ; পরে নবাব নজমউদ্দৌলার সময় সে কমলউদ্দীন আলি খাঁ এই উপাধি পাইয়াছে এবং তদবধি সে সেই নামের একটি মোহর ব্যবহার করিয়া থাকে। কমল বলে যে, তাহার পূর্বের মোহর মহারাজের নিকট থাকায়, সে তাঁহার নিকট তাহা চাহিয়াছিল, কিন্তু তিনি ফেরত দেন নাই। তাহার পর মোহনপ্রসাদের নিকট সে শুনিয়াছে যে, মহারাজ তাহার মোহর জাল দলিলে ব্যবহার করিয়াছেন। মহারাজকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলেন যে, কমলের উপর বিশ্বাস করিয়াই তিনি এই কার্য করিয়াছেন। কমলকে তাঁহার পক্ষ হইয়া তিনি সাক্ষ্য দিতেও বলেন। কমল তাহাতে উত্তর দেয় যে, লোকে প্রভুর জন্য জীবন দিতে পারে, কিন্তু ধর্ম নষ্ট করিতে পারে না। কমল এই সকল কথা খাজা পিত্রুস ও মুন্সী সদরউদ্দীনের নিকট গল্প করিয়াছিল। কমলউদ্দীনের পর খাজা পিত্রুস ও সদরউদ্দীনকে আহ্বান করিয়া তাহা প্রমাণ করা হয়। শীলাবতের স্বাক্ষর প্রমাণ করিবার জন্য সহবৎ পাঠক ও রাজা নবকৃষ্ণকে উপস্থিত করা হয়।

সহবৎ পাঠক বলে যে, সে অনেক দিন শীলাবতের সহিত কার্য করিয়াছিল এবং তাহার অনেক হস্তাক্ষর দেখিয়াছে ; অঙ্গীকার-পত্রে শীলাবতের হস্তাক্ষর বলিয়া তাহার বিবেচনা হইতেছে না।

তাহার পর নবকৃষ্ণ সাক্ষ্য দিতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে শীলাবতের হস্তাক্ষর জানার কথা জিজ্ঞাসা করা হইলে, তিনি বলেন যে, আমি তাহার হস্তাক্ষর বিশেষরূপে জানি। অঙ্গীকার-পত্র দেখান হইলে, নবকৃষ্ণ বলিলেন যে, "বুলাকী

দাসের উকীল শীলাবৎ” এইটুকু শীলাবতের লেখা বলিয়া বোধ হইতেছে না। ইহা তাহার হস্তাক্ষর নয় ; তাহার নিকট তাহার অনেক লেখা আছে। অঙ্গীকার-পত্রের স্বাক্ষর শীলাবতের নয়, ইহা তিনি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন কি না, এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে, নবকৃষ্ণ উত্তর দেন যে, শীলাবৎ তাহাকে ও লর্ড ক্লাইবকে অনেক পত্র লিখিয়াছিল ; তবে ইহা তাহার লেখা কি না, তাহা ঈশ্বর জানেন। অঙ্গীকার-পত্রের স্বাক্ষর সম্বন্ধে তাঁহার মত কি জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলেন যে, আসামী একজন ব্রাহ্মণ এবং তিনি একজন কায়স্থ ; ইহাতে তাঁহার ধর্মের ক্ষতি হইতে পারে। ইহা একটি তুচ্ছ বিষয় নহে, ব্রাহ্মণের জীবন বিপদে পড়িয়াছে। অঙ্গীকার-পত্রের স্বাক্ষর শীলাবতের হস্তাক্ষর কি না পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলেন যে, সমস্ত সত্য কথা বলিতে তাঁহার মনে যাহা হইতেছে, তাহা তিনি প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। শীলাবৎ ইহা অপেক্ষা ভাল কি মন্দ লিখিত জিজ্ঞাসা করিলে নবকৃষ্ণ উত্তর দেন যে, অঙ্গীকার-পত্রের স্বাক্ষর ভাল লেখা, যদিও শীলাবতের লেখা মন্দ নহে, তথাপি এত ভাল ছিল না।[৩৪]

৩৪ নবকৃষ্ণ সাক্ষ্যপ্রদানে কিরূপ ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। তিনি যে স্পষ্ট মিথ্যা কথা বলিতে না পারিয়া কোন রূপে তাহা এড়াইবার জন্য কৌশলক্রমে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রদানের চেষ্টা করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার সাক্ষ্য হইতে সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু শ্রীযুক্ত এন্. এন্. ঘোষসাহেব নবকৃষ্ণের ঐরূপ ভাবকে কেমন সমর্থন করিযাছেন, একবার সকলে লক্ষ করিয়া দেখুন। ঘোষসাহেব বলিতেছেন ঃ—

"The reluctance is capable of being understood in two ways, either as an artful means of expressing the very thing which it appeared to suppress, or as a genuine unwillingness to say a thing which would endanger a Brahman's life. Rules of charity and common sense alike tell us to presume an honourable purpose in preference to a perverse one where both are equally possible. Apart from all principles of presumption, however, there are certain facts to be borne in mind in connection with Nubkissen's evidence. The truth of it is indisputable. His hesitation cannot therefore be regarded as the prevarication of a perverse witness who conceals his ignorance of a fact by answers that stimulate knowledge, who in spite of his ignorance is bent on ruining a prisoner by mere suggestion of guilt, but who does not make positive affirmation for fear of exposing his mendacity. Nubkissen showed that he really did know Sillabut's handwriting, and was satisfied in his own mind that the signature shown to him on the bond was not in Sillabut's handwriting. No cross examination could

ফরিয়াদীর সাক্ষীদিগের মধ্যে মোহনপ্রসাদ অভিযোগের প্রথমে নন্দকুমার জাল করিয়াছেন বলিয়া স্পষ্ট জবানবন্দী দেয়। সুতরাং তাহার সম্বন্ধে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই।

---

have discredited his evidence. If he still hesitated, it is clear that it was a bonafide hesitation. It can never be pretended that he knew nothing of the matter on which he was called upon to give evidence, or that he knew the reverse of what he chose to say, and that out of spite against the prisoner or to help the prosecution, he by his hesitation, hereby put on a knowing aspect. What he did know was against the prisoner, and there was nothing to prevent his saying it outright, saying it with eagerness, and saying it with emphasis, exaggeration and ornament, if his purpose was to help the prosecution and damage the defence. The hesitation was displayed in a Court of Law, and not in a drawing room. Nubkissen was giving evidence and not coquetting with a friend. Why then was he so modest so sweetly reluctant so importunate not to be pressed? Obviously he was indulging in no affection, but was sincerely unwilling to bear evidence against a Brahmin whom he always regarded with kindly feelings and whose life was now at stake." (Ghosh's Memoirs of Nubkissen, pp. 132-33).

এরূপ না হইলে কি জীবনীলেখক হওয়া যায়! অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত সকল লেখকই একবাক্যে বলিযা থাকেন যে, নন্দকুমার ও নবকৃষ্ণ উভয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন এবং উভয়েই উভয়ের প্রতি খরদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন। কিন্তু ঘোষমহাশয় বলিতেছেন যে, নবকৃষ্ণ নন্দকুমারের প্রতি অনুগ্রহদৃষ্টি করিতেন বলিয়া ব্রাহ্মণের জীবন বিপন্ন হওয়ায়, তিনি সাক্ষ্যপ্রদানে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। আধুনিক বাঙ্গালী লেখকগণ কিন্তু এতটুকু স্বীকার করিতে পারেন নাই যে, নন্দকুমার মহাপুরুষ হইলেও নবকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার উদার ভাব ছিল। কিন্তু যে ঘোষসাহেব আধুনিক বাঙ্গালী লেখকগণেব প্রতি আপনার লেখনীবাণ বর্ষণ করিয়াছেন, তিনি নিঃসঙ্কোচে ও অম্লানবদনে এই সারসত্যটি ঘোষণা করিলেন যে, নবকৃষ্ণ নন্দকুমারের প্রতি অনুগ্রহদৃষ্টি করিতেন। এই সম্বন্ধে তাঁহার প্রধান প্রমাণ সম্ভবতঃ নন্দকুমারের চট্টগ্রামনির্বাসন-ব্যাপার। আমরা পূর্বে সে বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি। যাহা হউক, যে ঘোষসাহেব নিজ নায়ককে মহাপুরুষরূপে অঙ্কিত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাপূর্বক অতিরঞ্জনের তুলিকা হস্তে ধারণ করিয়াছিলেন, আধুনিক বাঙ্গালী লেখকগণের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিবার সময় সে কথাটি কি তাঁহার স্মৃতিপথে নিমেষের জন্যও উদিত হয় নাই? অন্ততঃ তাঁহার নায়কের ন্যায় একটু ইতস্ততঃ ভাবপ্রকাশের ইচ্ছাও কি হয় নাই? যাহা হউক তাঁহার সাহসকে ধন্যবাদ প্রদান না করিয়া থাকা যায় না। কিন্তু একটি কথা বলিয়া রাখি যে, তাঁহার অসমসাহসিকতা থাকিলেও তাঁহার নবকৃষ্ণকে সাধারণের নিকট উপস্থাপিত করার পূর্বে তাঁহার স্বাভাবিকী বিবেচনা-শক্তির কিঞ্চিন্মাত্র প্রয়োগ করাও কি উচিত ছিল না? তিনি যাহাই বলুন না কেন, নবকৃষ্ণ নন্দকুমারের

কৃষ্ণজীবন আসামী পক্ষ হইতেও মানিত হওয়ায়, আমরা আসামীপক্ষীয় সাক্ষীদিগের সাক্ষ্যোল্লেখের সময় তাহার কথা বলিতে চেষ্টা করিব।

ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষ্য গৃহীত হইলে, আসামীপক্ষের সাক্ষীদিগকে আহ্বান করিবার পূর্বে মহারাজের কৌন্সিলি ফ্যারারসাহেব প্রথমতঃ প্রামাণ্য বিষয় নির্দেশ করিলেন। তিনি এইরূপ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, অঙ্গীকার-পত্রের সাক্ষিদ্বয় মাতাবরায় ও মহম্মদ কমল জীবিত থাকিতে থাকিতেই মোহনপ্রসাদ ইহার বিষয় অবগত হন। বুলাকীদাস নন্দকুমারকে অঙ্গীকার-পত্রের জন্য যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাও উপস্থাপিত করা হইবে। গঙ্গাবিষ্ণুর সাক্ষাতে মোহনপ্রসাদ ও পদ্মমোহন যে হিসাবে নাম স্বাক্ষর করিয়াছিল, সেই হিসাবপত্রেও যে অঙ্গীকার-পত্র ও জহরতাদির কথা আছে, তাহাও উপস্থাপিত করিতে চান ; বুলাকীদাসের যে খাতায় জহরতের হিসাব ছিল, তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে ; সুতরাং তাহা উপস্থাপিত করিবার উপায় নাই। এতদ্ভিন্ন, তিনি জহরত ও অঙ্গীকার-পত্র সম্বন্ধে নন্দকুমার ও বুলাকীদাসের মধ্যে আরও অনেক পত্রাদি উপস্থাপিত করিতে চান। বুলাকীদাসের হস্তলিখিত পত্রাদি উপস্থাপিত করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে তাঁহার নাম বা মোহরযুক্ত না থাকায় আদালত তাহা সাক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। যে সমস্ত প্রধান প্রধান দলিল উপস্থাপিত করা হয়, সে সম্বন্ধে আমরা পরে বলিব। আপাততঃ আসামী পক্ষের কয়েক জন প্রধান সাক্ষীর সাক্ষ্যের বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ আসামী পক্ষ হইতে তেজরায় নামে একজন সাক্ষীকে আহ্বান করা হয়। তেজরায় জাতিতে ক্ষত্রিয় ও চুঁচড়া তাহার জন্মস্থান ছিল। তেজরায় সাক্ষ্য দেয় যে, মাতাবরায় নামে তাহার এক জ্যেষ্ঠভ্রাতা ছিল, এক্ষণে সে মৃত। তাহার

বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রদানের জন্যই উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং পাছে স্পষ্টতঃ সাক্ষ্য প্রদান করিলে নন্দকুমারের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া তাঁহার সাক্ষ্যে অবিশ্বাস হয়, এবং শপথ গ্রহণ করিয়া ধর্মতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ায় অত্যন্ত নীচান্তঃকরণের পরিচয় দেওয়া হয়, সেইজন্য তিনি "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" প্রকারের সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি যাহা বলিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কৌশলক্রমে তাহাই যে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। নবকৃষ্ণ যেরূপ ভাবেই সাক্ষ্য প্রদান করুন না কেন, তাঁহার সাক্ষ্য জেরায় শিথিল করা কঠিন বলিয়া আসামীপক্ষীয় কৌন্সিলেরা বিশেষরূপেই জানিতেন, এবং তজ্জন্যই তাঁহারা জেরা করিতে চেষ্টা করেন নাই। জেরা সাক্ষিবিশেষে যে সময়ে সময়ে জেরাকারীর বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে, ইহা অবশ্যই ঘোষমহাশয় অবগত আছেন, এবং ফ্যারার প্রভৃতি যে তাহা অবগত ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং ঘোষমহাশয় নবকৃষ্ণের সাক্ষ্য জেরায় অটুট থাকাসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমরাও অস্বীকার করি না। যদি কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য কঠোর জেরাতেও অটুট থাকিতে পারে, তাহা যে নবকৃষ্ণের ন্যায় ব্যক্তির সাক্ষ্য, ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। ফলতঃ নবকৃষ্ণের সাক্ষ্যের সমর্থন জীবনীলেখকের বর্ণনা ব্যতীত নিরপেক্ষ ব্যক্তির যুক্তিযুক্ত কথা বলিয়া কেহই বিশ্বাস করিবেন না, এরূপ অনুমান আমরা অনায়াসেই করিতে পারি।

ভ্রাতার আদেশানুযায়ী যে একখানি পত্র তাহার ভ্রাতার মোহরসংযুক্ত করিয়া রূপনারায়ণ চৌধুরীকে লেখা হয়, সে পত্র আদালতে উপস্থিত হইলে, তেজরায় তাহা নিজের লিখিত ও ভ্রাতার মোহরযুক্ত স্বীকার করে। সে ও তাহার ভ্রাতা, সাহেবরায়ের পুত্র ও বঙ্গুলালের পৌত্র; তাহার ভ্রাতা বর্ধমান চাকলার ধনেখালির নিকট বড়াই আদমপুর নামক গ্রামে মাতামহালয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাহার পিতামহ হুগলীতে বাস করিতেন; কিন্তু বর্ধমানের মানকরে তাঁহার কারবার ছিল। মাতাবরায়ের সহিত হাজারীমল ও কাশীনাথের পরিচয় ছিল বলায়, তেজরায়ের সাক্ষ্য শেষ হইতে না হইতে, হাজারীমল ও কাশীনাথ বাবু নামে দুইজন সাক্ষীকে উপস্থিত করা হয়। এই সাক্ষিদ্বয়কে কোন্ পক্ষ হইতে আহ্বান করা হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু কেহ কেহ ইহাকে আদালতের মানিত সাক্ষী বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন।[৩৫] হাজারীমল হেস্টিংস-স্থাপিত কুঠীর একজন অংশীদার এবং কাশীনাথ হেস্টিংসের বন্ধু রসেল সাহেবের বেনিয়ান ছিল।

হাজারীমল প্রথমতঃ কোন মাতাবরায়কে দেখিয়াছে কিনা বলিতে চাহে না; পরে বলে যে, একজনকে দেখিয়াছে, কিন্তু তাহার সহিত তেজরায়ের সাক্ষ্যানুযায়ী তাহার ভ্রাতার বয়সের মিল হয় না; অনেক বৎসরের পার্থক্য হয়।

কাশীনাথ বলে যে, সে যে মাতাবরায়কে চিনিত, সে তেজরায়ের ভ্রাতা নহে, বঙ্গুলালের পুত্র। তেজরায়কে সম্মুখে উপস্থিত করিলেও সে তেজরায়কে সাহেবরায়ের পুত্র বলিয়া চিনিতে পারে নাই। পরে বলে যে, আমি আর একজন বঙ্গুলালকে চিনিতাম, তাহার হুগলীতে বাস ছিল এবং সে মানকরে কাজ করিত।

বর্ধমানের রানীর পেস্কার রূপনারায়ণ চৌধুরী সাক্ষ্য দেন যে, তিনি তেজরায় ও মাতাবরায় দুই ভ্রাতাকে চিনিতেন এবং তাহাদিগকে সাহেবরায়ের পুত্র বলিয়াই জানেন, মাতাবরায়ের মোহরযুক্ত এক পত্রেরও প্রাপ্তি স্বীকার করেন।

রূপনারায়ণের পর জয়দেব চোবেকে সাক্ষীর স্থলে উপস্থাপিত করা হয়। জয়দেব চোবে বলে যে, আমি জানি বুলাকীদাসের আদেশে তাহার মুহুরী মহারাজ নন্দকুমারকে অঙ্গীকার-পত্র লিখিয়া দেয়। মাতাবরায় নামে এক ক্ষত্রিয়, মহম্মদ কমল ও বুলাকীদাসের উকীল শীলাবৎ সাক্ষী হয়। অঙ্গীকার-পত্রে টাকার কথা ৪০ হাজার হইতে ৪৫ হাজারের মধ্যে লেখা হয় বলিয়া মনে হইতেছে। আর একবার বলে যে, ৪০ হইতে ৫০ হাজারের মধ্যে লিখিত হয়। কমলউদ্দীন খাঁ মহম্মদ কমল কিনা জিজ্ঞাসা করিলে, সে উত্তর দেয় যে, কমলউদ্দীন মহম্মদ কমল নহে; মহম্মদ কমল ৫।৬ বৎসর হইল প্রাণত্যাগ করিয়াছে। সে মহারাজের বাটীর এক পার্শ্বে থাকিত, তথায় তাহার মৃত্যু হয়। আমি তাহার মৃতদেহ বহন করিয়া কবর দিতে লইয়া যাইতে দেখিয়াছি। মাতাবরায় ক্ষত্রিয়কেও সে জানিত বলিয়া স্বীকার

৩৫ Beveridge.

করে। মহারাজের বাটীতে অঙ্গীকার-পত্রপ্রদানে স্বীকার করিয়া, বুলাকীদাস পাল্কী চড়িয়া, বড়বাজারে হাজারীমলের বাটীতে তাহার নিজ বাসায় গমন করে এবং মহম্মদ কমলকে তাহার নিকট পাঠাইতে বলিয়া যায়। বুলাকীদাস জয়দেবকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়, পরে তাহার বাসায় অঙ্গীকার-পত্র লিখিত ও স্বাক্ষরিত হয়। তথায় অঙ্গীকার-পত্রের লেখক, বুলাকীদাস ও জয়দেব ব্যতীত চৈতন্যনাথ, লালা ডোমন সিংহ এবং ইয়ার মহম্মদ এই কয়েক ব্যক্তি উপস্থিত ছিল।

জয়দেব চোবের সাক্ষ্যের মধ্যস্থলে মোহনদাস, কৃষ্ণজীবন, মোহনপ্রসাদ প্রভৃতিকে আহ্বান করিয়া কয়েকটি দলিলপত্রের কথা জিজ্ঞাসা করা হয়; আমরা পরে সে সমস্ত বিষয়ের কথা উল্লেখ করিতেছি।

লালা ডোমনসিংহ সাক্ষ্য দেয় যে, সে নিজ চক্ষে বুলাকীদাসকে মহারাজের নামে অঙ্গীকার-পত্র লিখিয়া দিতে দেখিয়াছে। ৪৬ হইতে ৪৮ হাজার টাকার কথা লেখা হয়। কমলউদ্দীন আলি খাঁ মহম্মদ কমল নহে; সে আর এক ব্যক্তি। লালা ডোমন সিংহ ফারসী জানায় কতকগুলি কাগজ দেখিয়া বুলাকীদাসের মোহর প্রমাণ করে।

চৈতন্যনাথ সাক্ষ্য দেয়, আমি বুলাকীদাসকে জানি; তাহাকে মহারাজের নামে অঙ্গীকার-পত্র লিখিয়া দিতে দেখিয়াছি। অঙ্গীকার-পত্রে মাতাবরায়, শীলাবৎ ও মহম্মদ কমল সাক্ষী হয়। তাহাতে ৪০ হইতে ৫০ হাজার টাকার কথা লিখিত হয়। মহম্মদ কমলের বাটী মুর্শিদাবাদে ছিল, এক্ষণে সে মৃত। কমলউদ্দীন মহম্মদ কমল নহে। তাহাকে M চিহ্নিত একখানি নাগরী দলিল দেখান হইলে, সে বলে যে, ইহার বিষয় আমি জানি; তাহা একখানি হিসাবের তালিকা। যখন এই হিসাবের স্থির হয়, তখন তথায় জয়দেব চোবে ও পুরুষোত্তম গুপ্ত উপস্থিত ছিল; পদ্মমোহন দাস ও মোহনপ্রসাদ, মহারাজ ও গঙ্গাবিষ্ণুর সাক্ষাতে ইহাই স্বাক্ষর করিয়া দেয়।

সেখ ইয়ার মহম্মদ সাক্ষ্য দেয় যে, সে মহম্মদ কমলকে জানে। কমলউদ্দীন ও মহম্মদ কমল এক নহে। মহম্মদ কমল ৫।৬ বৎসর হইল মহারাজের কলিকাতার বাটীতে মরিয়াছে এবং সে তাহাকে কবর দিয়াছে। মহম্মদ কমলকে সে বুলাকীদাসের অঙ্গীকার-পত্রে সাক্ষী হইতে দেখিয়াছে; সে পত্রে শীলাবৎ ও মাতাবরায়ও সাক্ষী হয়। তাহাতে ৪৮,০২১ টাকা লিখিত হয় বলিয়া মনে হইতেছে।

মীর আসদ উল্লা সাক্ষ্য দেয় যে, সে বুলাকীদাসকে চিনিত; নবাব মীর কাসেম রোটাস হইতে বুলাকীর নিকট কতকগুলি টাকাকড়ি পাঠাইয়াছিলেন। বুলাকী তৎকালে সাসেরামের নিকট দুর্গাবতী নামক স্থানে সেনাশিবিরে ছিল। সে টাকা তথায় তাহার নিকট দিলে, সে একখানি রসিদে মোহর করিয়া দেয়। সেই রসিদ আসদ উল্লা উপস্থিত করে। আসদ উল্লা যে যে স্থানের কথা উল্লেখ করে, সে সময় তথায় সৈন্যশিবির না থাকার প্রমাণ করিবার জন্য অনেক কাপ্তেন, কর্নেল প্রভৃতিকে আদালত হইতে উপস্থাপিত করা হয়। অন্যান্য সাক্ষীর সম্বন্ধে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই।

আমরা এক্ষণে উভয় পক্ষের মানিত সাক্ষী কৃষ্ণজীবনসম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিতে চাহি। কৃষ্ণজীবনের সাক্ষ্য প্রধানতঃ দুইটি দলিলের উপর নির্ভর করিয়াছিল। আমরা সেই দলিল দুইটির কথা সংক্ষেপে বলিয়া, সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণজীবনের সাক্ষ্যের কথারও উল্লেখ করিতেছি। কৃষ্ণজীবন সেই সময়ে মোহনপ্রসাদের অধীনতায় কার্য করিত। অনেক কথা তাহাকে যে ভয়ে ভয়ে বলিতে হইয়াছিল, এ কথা সে নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছে। এই মোকর্দমায় যে-সমস্ত দলিল উপস্থাপিত করা হয়, তন্মধ্যে দুইখানি প্রধান। একখানি একটি করারনামার নকল ও আর একখানি একটি হিসাবের তালিকা। এই হিসাবের তালিকা M চিহ্নিত করা হয়। এই করারনামাও বুলাকীদাস ও মহারাজ নন্দকুমারের মধ্যে লিখিত হয়। পদ্মমোহন দাস করারনামা লিখিয়া দেয় এবং বুলাকীদাস তাহাতে স্বাক্ষর করেন। তাহাতে জহরতের অঙ্গীকার-পত্র, দরবার-খরচ ও কতকগুলি হুণ্ডীর কথা লিখিত থাকে। মোহনদাস নামে এক ব্যক্তি এই করারনামার নকল করিয়াছিল। সে মূল করারনামা পদ্মমোহন দাসকে দেয় এবং নকলখানি মহারাজের নিকট রাখিয়া দেয়। কৃষ্ণজীবন মূল করারনামা দেখিয়াছে বলিয়া স্বীকার করে। কৃষ্ণজীবন করারনামা দেখিয়া খাতায় সে সম্বন্ধে কতকগুলি হিসাব লিখিয়া রাখে। এই করারনামার জন্য পদ্মমোহনের সমস্ত কাগজপত্র অনুসন্ধান করা হয়। পদ্মমোহনের পিতা শিবনাথ ও ভ্রাতা লছমন দাস আপন আপন সাক্ষ্যে প্রকাশ করে যে, পদ্মমোহনের সমস্ত কাগজপত্র আদালতে দাখিল আছে। তবুও আদালত হইতে তাহা বাহির করা হয় নাই। কৃষ্ণজীবনকে সমস্ত অনুসন্ধান করিতে বলা হয়; কিন্তু কৃষ্ণজীবন সমস্ত অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারে নাই। করারনামার মূল না পাওয়ায়, তাহার নকল সাক্ষ্য বলিয়া জজমহোদয়েরা গ্রাহ্য করিলেন না এবং মোহনদাস যে করারনামার নকল করিয়াছিল, সে সাক্ষ্যেও বিশ্বাস করা হয় নাই। M চিহ্নিত দলিলটি মহারাজ নন্দকুমার ও বুলাকীদাসের মধ্যে একটি হিসাবের তালিকা। তাহা নাগরী ও বাঙ্গলা উভয় অক্ষরে লিখিত হয়; পদ্মমোহন দাস নাগরীতে ও পুরুষোত্তম গুপ্ত বাঙ্গালায় লেখে। ইহাতেও অঙ্গীকার-পত্রের টাকা ও অন্যান্য হিসাবের উল্লেখ থাকে। কিন্তু অঙ্গীকার-পত্রানুযায়ী সমস্ত অর্থের সহিত কৃষ্ণজীবনের খাতায় লিখিত টাকার অনেক অমিল হয়। তৎকালে অনেক হিসাবপত্র আর্কট-মুদ্রায় লিখিত হইত এবং এতদ্দেশের প্রচলিত টাকার সহিত উক্ত মুদ্রার কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকায়, বাটানুযায়ী সময়ে সময়ে মূল্যেরও পার্থক্য হইত। সেইজন্য যে সময়ে হিসাব লিখিত হয়, খাতায় তাহার অনেক পরে সে হিসাব পুনর্লিখিত হওয়ায়, কিছু পার্থক্য হইবারই সম্ভাবনা। এই M চিহ্নিত হিসাবের তালিকায় মোহনপ্রসাদের স্বাক্ষর ছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই সমস্ত প্রমাণসত্ত্বেও মহারাজ নন্দকুমার নিষ্কৃতি পাইলেন না! তাঁহাকে দোষী স্থির করিয়া জজসাহেবেরা জুরীদিগকে চার্জ বুঝাইয়া দিলেন। আমরা পরে সে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি।

প্রধান বিচারপতি জুরীদিগকে চার্জ বুঝাইয়া দেওয়ার পূর্বে মহারাজের কৌন্সিলি

ফ্যারারসাহেব জুরীদিগকে লক্ষ্য করিয়া কিছু বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডীয় আইনে গুরুতর অপরাধীদিগের কৌন্সিলি আইনসংক্রান্ত কোন কথা ব্যতীত আর কিছু বলিতে পারেন না বলিয়া তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য করা হয়। কিন্তু জজসাহেবেরা ইচ্ছা করিলে, স্বয়ং মহারাজ নন্দকুমারকে কিছু বলিবার জন্য আদেশ দিতে পারিতেন; তাঁহাকে সে সুযোগ প্রদান করাও হয় নাই। তাহার পর ইম্পেসাহেব জুরীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি মোহনপ্রসাদ, কমলউদ্দীন, নবকৃষ্ণ প্রভৃতি ফরিয়াদীপক্ষের সাক্ষীদিগের কথাগুলি বিশ্বাস করিবার জন্য, সেগুলিকে বিশদরূপ ব্যাখ্যা করেন। যদিও বিচারপতির নিয়মানুসারে সাক্ষীদিগের কথায় বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করিবার জন্য তিনি সমস্তই জুরীদিগের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার বলিবার ভঙ্গিতে ফরিয়াদীপক্ষের সাক্ষীতে বিশ্বাস এবং আসামীপক্ষের সাক্ষীতে অবিশ্বাস করার কথা জুরীরা বুঝিয়া লইয়াছিলেন। অতঃপর জুরীরা প্রায় একঘণ্টা পরামর্শ করিয়া মহারাজ নন্দকুমারকে দোষী বলিয়াই প্রকাশ করিলেন। তজ্জন্য তৎকালের নিয়মানুসারে ১৬ই জুন মহারাজ নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করা হয়।

প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইলে, মহারাজ নন্দকুমারকে কারাগারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। কারাগারের একটি দ্বিতল গৃহ তাঁহার আবাসস্থানরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। সে গৃহে আর কেহ থাকিত না; তথায় মহারাজ বন্ধুবান্ধবগণের সহিত কথোপকথনে ও শাস্ত্রালাপে মৃত্যু-সময় পর্যন্ত অতিবাহিত করিয়াছিলেন। প্রাণদণ্ডাজ্ঞার পর দ্বাবিংশতি দিবস তিনি পাপময়ী পৃথিবীতে অবস্থান করিতে পারিয়াছিলেন। সেই কয় দিবস তাঁহার হৃদয়মধ্যে যে কিরূপ তরঙ্গ উত্থিত হইত, তাহা বুদ্ধিমানমাত্রেই বুঝিতে পারেন; কিন্তু তিনি সে ভাব কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না। ক্রমে ক্রমে তিনি হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হন এবং নির্ভীকচিত্তে সেই অন্তিম সময়ের অপেক্ষা করিতেছিলেন। এই সময়ে তিনি নিজ দোষহীনতার কথা উল্লেখ করিয়া ফ্রান্সিস ও ক্লেভারিংকে একখানি পত্র লেখেন। তাঁহারা মহারাজকে বাঁচাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। নবাব মোবারক উদ্দৌলাও কাউন্সিলে এইরূপ পত্র লিখিয়াছিলেন যে, যতদিন পর্যন্ত ইংলণ্ডাধিপের এ সম্বন্ধে মতামত না আইসে, ততদিন অবধি মহারাজের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রতিপালন না করা হয়; কিন্তু তাহাতেও কোন ফলোদয় হয় নাই।[৩৬]

৩৬ পূর্বে রাধাচরণ মিত্রের জালকরা মোকর্দমায় প্রাণদণ্ডের আদেশ হইলে কলিকাতার অধিবাসিগণের আবেদনে তাহার দণ্ডাজ্ঞা রহিত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে নবাব নাজিমের অনুরোধেও নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা কিছু দিনের জন্য স্থগিত রাখাও ঘটিয়া উঠে নাই। ইম্পেসাহেবের পুত্র স্বীয় পিতার জীবনীতে লিখিয়াছেন যে, নন্দকুমারের জন্য কেহ অনুরোধ করে নাই। কিন্তু নবাব নাজিমের অনুরোধ অপেক্ষা আর কাহারও অনুরোধ গুরুতর হইতে পারে কি না, তাহা আমরা জানি না। রাধাচরণ মিত্রের দণ্ডাজ্ঞা রহিত করার জন্য যেমন

আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, হেস্টিংস প্রভৃতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের যে অভিযোগ উপস্থিত হয়, তাহার দিন জাল-করা মোকর্দমার পরে ধার্য হইয়াছিল। হেস্টিংসের বিরুদ্ধে কাহারও দোষের প্রমাণ হয় নাই। কিন্তু বারওয়েলের বিরুদ্ধে ফাউক ও নন্দকুমার দোষী ও রাধাচরণ নির্দোষ হন বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। সে অভিযোগে নন্দকুমার প্রকৃত দোষী হইয়াছিলেন কি না, এ বিষয়েও অনেকে সন্দিহান হইয়া থাকেন।

ক্রমে মহারাজের মৃত্যুদিন অগ্রসর হইয়া আসিল। তাঁহার জীবনের শেষ দুই দিনের চিত্র অতীব শোকাবহ ; কিন্তু তাহা হইতে মহারাজ নন্দকুমারের স্থিরচিত্ততারও প্রমাণ পাওয়া যায়। কলিকাতার তদানীন্তন সেরিফ ম্যাক্রেবী সাহেব এই দুই দিনের ঘটনা লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি একজন সাধুপ্রকৃতি ইংরেজ ছিলেন। আমরা তাঁহার লিখিত বর্ণনাই উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন,—"৪ঠা আগস্ট শুক্রবার সন্ধ্যাকালে আমি মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। তিনি আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া এরূপভাবে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন যে, আমি আশ্চর্যান্বিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, কল্য এ জগৎ হইতে যে তাঁহাকে চিরবিদায় লইতে হইবে, তাহা কি তিনি অবগত নহেন ? আমি অবশেষে দ্বিভাষীর দ্বারা তাঁহাকে অবগত করাই যে, আমি অদ্য তাঁহাকে শেষ অভিবাদন করিতে আসিয়াছি। কল্য সেই শোচনীয় ব্যাপারে মহারাজের যেরূপ সুবিধা হয়, তজ্জন্য আমার কর্তব্যানুরোধে আমাকে সমস্তই প্রতিপালন করিতে হইবে। আপনার যে-সমস্ত অন্তিম বাসনা আছে, তাহা পূর্ণ করিতে আমি চেষ্টা পাইব। আপনার শিবিকা ও বাহকগণ নিয়মিত সময়ে আপনার গৃহ-সম্মুখে অপেক্ষা করিবে এবং আপনার যে সমস্ত বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন, তাঁহাদিগকেও রক্ষা করিতে যত্ন পাইব। মহারাজ উত্তর দিলেন—আমার সাক্ষাতের জন্য তিনি আপ্যায়িত হইয়াছেন এবং তজ্জন্য আমাকে ধন্যবাদ দিতেছেন। পরে তিনি কপালে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, বিধাতার ইচ্ছা অবশ্যই সম্পন্ন হইবে। তিনি ক্লেভারিং, মন্সন ও ফ্রান্সিসকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া, রাজা গুরুদাসের তত্ত্বাবধানের জন্য ও তাঁহাকে ব্রাহ্মণসমাজের নেতা বলিয়া মনে করিবার জন্য অনুরোধ করেন। সেই সময়ে তাঁহার শান্তভাব অতিব বিস্ময়জনক। তিনি একটিও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করেন নাই ; তাঁহার কথায় কোনরূপ পরিবর্তন বা চাপল্যভাব ছিল না। আমি জ্ঞাত হইয়াছিলাম যে, কিছু পূর্বে তিনি তাঁহার জামাতা রায় রাধাচরণের নিকট হইতে চিরবিদায় লইয়াছিলেন। তাঁহার অদ্বিতীয় দৃঢ়তার নিকট আমরা কিছুই নহি মনে করিয়া, আমি তথা হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। নীচে আসিলে জেলরক্ষক আমাকে বলিল যে, তাঁহার

তৎকালে কাউন্সিলে আবেদন করা হইয়াছিল, নন্দকুমারের সম্বন্ধে নবাব নাজিমও সেইরূপই কাউন্সিলে অনুরোধ-পত্র লিখিয়াছিলেন।

আত্মীয়-স্বজন বিদায় গ্রহণ করিলে, তিনি নিজ হিসাব পরিদর্শন ও মন্তব্যাদি লিখিয়াছিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে জেলে উপস্থিত হইয়া দেখি, অনাথ-দরিদ্রগণের কাতর রোদনধ্বনিতে চতুর্দিক্ প্রতিধ্বনিত হইতেছে ; তাহারা মহারাজকে শেষদর্শন করিতে আসিয়াছে। মহারাজ জেলরক্ষকের আবাসস্থানের একটি গৃহে আসিয়া উপবেশন করিলে, আমিও তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলাম। মহারাজ প্রসন্নচিত্তে তিনজন ব্রাহ্মণকে তাঁহার মৃতদেহ-বহনের জন্য ইঙ্গিত করিলে, তাহারা দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িল। আমি আমার ঘড়ি দেখিয়া মহারাজকে বলিলাম যে, এখনও সময় হয় নাই। তিনি আবার আমাকে গুরুদাসের, ক্লেভারিং, মন্সন ও ফ্রান্সিসের কথা বলিয়া, একমনে ঈশ্বরধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। অবশেষে তিনি উঠিয়া আমাকে ইঙ্গিত করিয়া, তাঁহার পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি রাজা গুরুদাসকেই লইয়া যাইবার জন্য জেলখানার ভৃত্যদিগকে আদেশ দিয়া, পাল্কীতে আরোহণপূর্বক বধ্যভূমি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আমরা গিয়া দেখিলাম, সেই প্রশস্ত ময়দান [৩৭] লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। মহারাজ তাঁহার সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণ তিনটির জন্য আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। তাহারা উপস্থিত হইলে, তাহাদের সহিত কোন গুপ্ত কথা থাকিতে পারে মনে করিয়া, আমি লোকজন সরাইয়া দিতে চাহিলাম। মহারাজ আমাকে নিষেধ করিয়া তাহাদিগকে গুরুদাস ও তাঁহার পরিবারবর্গের কথা মনে করিয়া দিলেন। মহারাজ বারংবার আমাকে সেই তিন জন ব্রাহ্মণের দ্বারা মৃতদেহ বহন করিবার জন্য অনুরোধ করেন এবং আর কাহাকেও স্পর্শ করিতে নিষেধ করিয়া যান। তিনি জনতার জন্য কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত সাক্ষাতের কথা বলিলে, তিনি বলেন যে, আমার অনেক বন্ধু আছেন, এ স্থানে সকলের সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন নাই। পরে তিনি একজনের নাম করিয়াছিলেন ; অবশেষে তাহাকেও উপস্থিত হইতে নিষেধ করেন। আমাকে পুনর্বার প্রশান্তচিত্তে ক্লেভারিং, মন্সন ও ফ্রান্সিসের কথা স্মরণ করিতে বলেন। তাহার পর তিনি পাল্কীতে ঠেস দিয়া জপ করিতে থাকেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, গোলমালে আমি তাঁহার কথা বুঝিতে পারিব না ; অতএব সময় হইলে, তিনি যেন কোনরূপ ইঙ্গিত করেন। তিনি বলিলেন যে, আমি হস্তদ্বারাই সঙ্কেত করিব। পরে তাঁহার হস্ত বদ্ধ থাকার কথা বলিলে, তিনি পা নাড়িয়া সঙ্কেত করিতে স্বীকৃত হন।

সময় উপস্থিত হইলে, আমি বধমঞ্চের নিকট তাঁহার পাল্কী লইয়া যাইতে বলিলাম ;

৩৭ যে স্থান মহারাজের বধ্যভূমি বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন যে, খিদিরপুরের নিকট কুলীবাজার ও হেস্টিংস সেতুর মধ্যবর্তী নদীর নিকটস্থ শূন্য ময়দানে নন্দকুমারের বধমঞ্চ নির্মিত হইয়াছিল।

তিনি নিষেধ করিয়া পদব্রজেই অগ্রসর হইলেন। মঞ্চের সোপানের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলে, তাঁহার হস্তদ্বয় একখানি রুমাল দিয়া আবদ্ধ করা হইল। পরে তাঁহার মুখ আচ্ছাদন করার আবশ্যক হইলে, তিনি আমাদিগকে তাহা করিতে নিষেধ করিলেন। আমি একজন ব্রাহ্মণ সিপাহীকে আদেশ করিলে, মহারাজ তাঁহার একটি ভৃত্যকে আদেশ দিলেন। ভৃত্যটি তখন তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতেছিল। মহারাজ ঋজুভাবে দণ্ডায়মান হইয়া মঞ্চোপরি উঠিলেন। আমি তাঁহার প্রশান্ত বদনে কোনরূপ ভাব-বিকৃতি দেখিলাম না। পরে আমি নিজে স্থির থাকিতে না পারিয়া, স্বীয় শিবিকামধ্যে পলায়ন করিলাম। শিবিকায় বসিতে বসিতে মঞ্চাপসারণের শব্দ শুনিলাম। কিছুক্ষণ পরে শান্ত হইলে, দেখিলাম, মহারাজের হস্তদ্বয় যেরূপভাবে প্রথমে বদ্ধ ছিল, সেইরূপ ভাবেই অবস্থিত আছে এবং তাঁহার বদনমণ্ডলে কোনরূপ বিকৃতির চিহ্ন নাই। ফলতঃ এই শোচনীয় ব্যাপারে মহারাজ নন্দকুমার যেরূপ শান্তভাব ও দৃঢ়তা দেখাইয়াছিলেন, এরূপ স্থিরচিত্ততার উদাহরণ আমি কখনও শুনি নাই বা পাঠ করি নাই।[৩৮] অবশেষে সেই ব্রাহ্মণত্রয় তাঁহার মৃতদেহ ভস্মীভূত করিবার জন্য বহন করিয়া লইয়া যায়।"

এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্যে সমস্ত দর্শকমণ্ডলীর মধ্য হইতে এক মর্মস্পর্শী কাতরধ্বনি উঠিয়া আকাশ বিদীর্ণ করিবার উপক্রম করিল। অনেকে সেই দৃশ্য দেখিতে অশক্ত হইয়া পলায়ন করিল, কেহ কেহ বসন দ্বারা বদন আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল এবং কেহ কেহ এই পাপদৃশ্য দেখিবার জন্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ পবিত্র-সলিলা ভাগীরথীজলে পতিত হইল।[৩৯] সমস্ত কলিকাতায় মহান্দোলন পড়িয়া গেল. অনেকে কলিকাতা

৩৮ "In a word, his steadiness, composure, and resolution throughout the whole of this melancholy transaction were equal to any examples of fortitude, I have ever read or heard of." (Echoes from Old Calcutta).

৩৯ "While this tragedy was acting, the surrounding multitude were agitated with grief, fear, and suspense. With a kind of superstitious incredulity, they could not believe that it was really intended to put the Rajah to death ; but when they saw him tied up, and the scaffold drop from under him, they set up an universal yell, and with the most piercing cries of horror and dismay betook themselves to flight, running many of them as far as the Ganges, and plunging into the water, as if to hide themselves from such tyranny as they had witnessed, or to wash away the pollution contracted from viewing such a spectacle." (Sir Elliot Gilbert's Speech)

"All the natives present amounting to many thousands, dispersed as by common signal, the moment he was turned off, with unusual

পরিত্যাগ করিয়া বালি প্রভৃতি স্থানে আবাসস্থান স্থাপন করিল।[৪০] সমস্ত বঙ্গরাজ্যের লোকেরা মহারাজের অন্যায় প্রাণদণ্ডে মর্মাহত হইল, সর্বাপেক্ষা ঢাকার লোকেরা বিশেষরূপে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল।[৪১] যে দৃশ্যে একজন ইংরেজসন্তানও অভিভূত হইয়া, শিবিকামধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন, সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিয়া ও তাহার মর্মস্পর্শিনী কাহিনী শুনিয়া, সমস্ত বঙ্গবাসী যে বিচলিত হইবে, তাহাতে আর বিস্ময় কি ? হায় মাতঃ বঙ্গভূমি, সে সময়ে তুমি রসাতলগামিনী হইলে না কেন ? হায় মাতঃ ভাগীরথি, সে সময়ে সমস্ত বঙ্গভূমি তোমার জলপ্লাবনে আচ্ছাদিত হইল না কেন ? এইরূপে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের দেহপাতে কোম্পানীর রাজ্য বঙ্গদেশে সুদৃঢ় হইল। বৈষ্ণবচূড়ামণি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ নিজ জীবন বলি দিয়া, কোম্পানীর শাসনকর্তার

precipitation, countenances distorted by despair, and their mouths filled with exclamations of the most extreme agony and horror ! They departed so instantly and entirely from this fatal spot that the Rajah had not got expired when no body was seen about the gallows, but the sheriff and his attendants, and a few European spectators !" (Transaction in India, pp. 245-46).

"The next morning, before the sun was in his power, an immense concourse assembled round the place where the gallows had been set up. Grief and horror were on every face : yet to the last the multitude could hardly believe that the English really purposed to take the life of the Great Brahmin. * * * The moment that the drop fell, a howl of sorrow and despair rose from the innumerable spectators. Hundreds turned away their faces from the polluting sight, fled with loud wailings towards the Hoogly, and plunged into its holy waters, as if to purify themselves from the guilt of having looked on such crime." (Macaulay.)

৪০ শ্রীযুক্ত এ. লায়াল সাহেব এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া একখানি পত্র হইতে এইরূপ জ্ঞাত হইয়াছিলেন। পত্রলেখক হাইকোর্টের কোন জজকে এইরূপ লিখিতেছেন ঃ—

"I am told on inquiry that Calcutta was looked upon with horror for several years after the event, but the feeling died out long ago. The statement, however, that a number of families left Calcutta, and settled in Bally in consequence of the execution is quite correct. There are dozens of families in Bally whose ancestors lived in Calcutta."

৪১ "These feelings were not confined to Calcutta. The whole province was greatly excited ; and the population of Ducca, in particular, gave strong signs of grief and dismay." (Macaulay).

প্রতিহিংসার নিবৃত্তি করিলেন ! আর কতকগুলি কুলাঙ্গার বঙ্গবাসী তাহাতে যোগ দিয়া, আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির পথ পরিষ্কার করিল ! হা ধর্ম ! তুমি যে অনেক দিন বঙ্গভূমি হইতে বিদায় লইয়াছ, তাহা কেমন করিয়া জানিব !

দেশের মঙ্গল করিতে গিয়া মহারাজ নন্দকুমার, কিরূপে জীবন বলি দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, আমরা সংক্ষেপে তাহার মর্ম প্রদান করিলাম। হেস্টিংসের কূটচক্রে ইম্পের অন্যায্য ও পক্ষপাতপরিপূর্ণ বিচারে তাঁহাকে যে জীবন বিসর্জন দিতে হইয়াছিল, ইহাও সাধারণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। যদিও ইংলণ্ডীয় আইনে জালিয়াত আসামীর প্রাণদণ্ডের আদেশ তৎকালে প্রচলিত হইয়াছিল এবং কলিকাতার অধিবাসিগণ সেই আইনের দ্বারা দণ্ডার্হ হইতে পারিত, তথাপি কলিকাতার অধিবাসীরা সে বিষয়ে যে অনেক পরিমাণে অনভিজ্ঞ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুপ্রীমকোর্টের স্থাপনা অবধি কলিকাতায় ইংলণ্ডীয় আইনের প্রচলন বিশেষরূপে আরম্ভ হয়। তৎকালে ভারতবর্ষীয় আইনে জালিয়াতের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল না। ইহার পূর্বে কলিকাতার দুই জন জালিয়াত অপরাধীর প্রাণদণ্ড রহিতও হইয়াছিল। জজেরা ইচ্ছা করিলে, নন্দকুমারের অপরাধ যথার্থ হইলেও তাঁহাকে প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি দিতেও পারিতেন। কলিকাতায় ইংলণ্ডীয় আইন প্রচলিত হইলেও কলিকাতার অবস্থা যে তাৎকালিক ইংলণ্ডের ন্যায় ছিল না, ইহাও তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত ছিল এবং নন্দকুমারকে ব্রাহ্মণ বলিয়া তাঁহারা অব্যাহতি দিতে পারিতেন। কিন্তু হেস্টিংসের অনুরোধ অব্যর্থ।[৪২] যিনি প্রভুভক্তি ও স্বদেশের হিতসাধনের জন্য

৪২ নন্দকুমারের বিচার আইনানুযায়ী হইয়াছিল কি না, এ বিষয় লইয়া অনেক তর্কবিতর্ক আছে। আমরা এস্থলে সে বিষয়ের আলোচনা করিতে চাহি না। তবে আমরা এইটুকুমাত্র বলিতে পারি যে, যদিও কলিকাতায় পূর্ব হইতে ইংলণ্ডীয় আইন প্রচলিত হইয়াছিল এবং তদনুসারে নন্দকুমারের বিচার হইয়াছিল স্বীকার করা যায়, তথাপি জজেরা ইচ্ছা করিলে প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা ব্যতীত তাঁহার অন্যবিধ দণ্ডের বিষয় বিবেচনা করিতে পারিতেন, এবং এ বিষয়ে দেশের শাসনকর্তা কাউন্সিলের সভ্যগণের সহিত পরামর্শও করিতে পারিতেন। বিশেষতঃ যখন ভারতবর্ষে ইংরেজী আইনের বিচারদ্বারা তাঁহারা একজন ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ডাজ্ঞার আদেশ দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন এ বিষয়ে তাঁহাদের একবার ইংলণ্ডাধিপের মত জিজ্ঞাসা করাও অত্যন্ত উচিত ছিল। ইতিপূর্বে ভারতবর্ষে কখনও সাধারণ অপরাধের জন্য ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড বিহিত হয় নাই। এ বিষয়ে মেকলে প্রভৃতি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত। কিন্তু ম্যালেসনসাহেব তাহা স্বীকার করিতে চাহেন না। তিনি বলেন যে, আকবর বা তাঁহার পরবর্তী সম্রাট্‌গণ ব্রাহ্মণ অপরাধীকে অন্যান্য জাতীয় অপরাধী হইতে পৃথক্ করেন নাই। ম্যালেসনসাহেবের এই মন্তব্য প্রকৃত নহে। যদিও আমরা মুসলমান আইনে ইহার কোনরূপ বিশেষ ব্যবস্থা দেখিতে পাই না, তথাপি আমরা কার্যদ্বারা অনেক স্থলে তাহার প্রমাণ পাইয়া থাকি। ম্যালেসনসাহেব কি এমন কোন দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন যে, কোন ব্রাহ্মণ মুসলমান ধর্মবিরুদ্ধ কোন অপরাধ ব্যতীত সাধারণ অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন ? এরূপ একটিমাত্রও দৃষ্টান্ত তিনি দেখাইতে পারিবেন না। মুসলমান রাজত্বে ব্রাহ্মণগণের কিরূপ

আপনার জীবনকে উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন, তাঁহার পুরস্কার জীবনদণ্ড ব্যতীত আর কি হইতে পারে! যে দেশের জন্য তিনি শত বিপদ মাথায় লইয়াছিলেন, সে দেশের লোকের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার প্রাণদণ্ডে সন্তোষলাভ পর্যন্তও করিয়াছিল।

অধিকার ছিল, তাহা বোধ হয়, ম্যালেসন ভাল করিয়া অনুসন্ধান করেন নাই। তিনি কি জানিতেন না যে, মুসলমানরাজত্বে ব্রাহ্মণেরা সরকারের আদেশে বিনা করে ও কোন কোন স্থলে অল্প করে, ভূমি উপভোগ করিতে পারিতেন। কেবল আরঙ্গজেব এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। যে মুসলমানরাজত্বে ব্রাহ্মণের এরূপ অধিকার ছিল, সেই ব্রাহ্মণ যে সাধারণ আইনের বহির্ভূত ছিলেন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। বিশেষতঃ আকবর ও তদ্বংশীয়গণ হিন্দুরাজগণের ও হিন্দুসাধারণের অনুরোধে সাম্রাজ্যমধ্যে অনেক স্থলে গোহত্যা নিবারণের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ম্যালেসনসাহেব সম্ভবতঃ অবগত ছিলেন না যে, হিন্দুরা গোহত্যাকে একটি উপপাতক ও ব্রহ্মহত্যাকে একটি মহাপাতক বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, এবং রাজাজ্ঞায় ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইলেও তাহা রহিত করার ব্যবস্থা হিন্দুশাস্ত্রে আছে। সুতরাং হিন্দুসাধারণের গো-ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি দেখিয়া আকবর ও তদ্বংশীয়গণ যে কেবল গোবধের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, এবং ব্রহ্মবধের প্রতি যে কিছুমাত্র মনোযোগ দেন নাই, এরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত হইতে পাবে না, এবং আমরা যখন মুসলমানরাজত্বে অন্যান্য-জাতীয় প্রজাগণের অপেক্ষা ব্রাহ্মণের বিশিষ্টরূপ অধিকার দেখিতে পাইতেছি, তখন যে গোবধনিবারণের ন্যায় ব্রহ্মবধনিবারণেরও বিশেষরূপ ব্যবস্থা ছিল, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। বিশেষতঃ ম্যালেসনসাহেব এমন কোন দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন নাই যে, সাধারণ অপরাধে মুসলমানরাজত্বে ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে। যদি পূর্বে ঐরূপ প্রথা প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে. নন্দকুমারের হত্যায় কলিকাতার ব্রাহ্মণেরা ভাগীরথীজলে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেন না এবং কেহ কেহ কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া বালিগ্রামে গিয়া বাস করিতেন না। নন্দকুমারের মৃত্যুতে হিন্দুসাধারণের প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে যে কার্য হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। সেইজন্য ইম্পেসাহেবের বিচারকালে ইম্পেকে লক্ষ্য করিয়া সার ইলিয়ট জিলবার্ট সত্য সত্যই বলিয়াছিলেন যে,

"You should have granted a respite because Nuncomar was a Brahmin, 'a rank considered as sacred in India, where the natives think it impious to take the life of a Brahmin." The execution of Nuncomar must have made the poor of India shudder, as they must have thought if neither wealth nor rank could save a man's life what would become of the poor and the mean? ....It was not for Elijah Impey, it was not for a handful of strangers, to decide that this was an absurd distinction. What appeared absurd according to our ideas of society might for anything we knew, be perfectly proper and well-founded according to theirs, and we were not with a vain presumption, to trample an established law with reasons of which we were not acquainted." আর একজন ইংরাজও ঐরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন, "The privileges of Brahmins are deemed, in every part of India inviolable.

এ যে বঙ্গভূমি, এখানে সমস্তই শোভা পায়! অন্য কোন দেশ হইলে, এরূপ পরোপকারী লোকের মৃত্যুতে দেশমধ্যে যে মহা-আন্দোলন উপস্থিত হইত, তাহাতে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। যদিও মহারাজ নন্দকুমারের মৃত্যুতে সমস্ত বঙ্গভূমি শোকাভিভূত হইয়াছিল সত্য,[৪৩] তথাপি তাহা বাঙ্গালীর উপযোগী

They commute capital punishment, and are exempted, by what may be called the common law of the country from every species of personal outrage. Nuncomar was at the head of this sacred caste, whom the Hindoos regard everywhere with an idolatrous veneration. His ignominious death was consequently much more shocking in India, than if a nobleman of the highest distinction, a prince of the blood, or even a crowned head, were in any European state sentenced to suffer by the hands of the common hangman······The feelings of the natives were wantonly and incurably wounded, by the sufferings of Nuncomar. It was an insult to the customs, the laws, the religion of all the Genttoo nations." (Transactions in India.)

৪৩ মহারাজ নন্দকুমারের মৃত্যুতে বঙ্গবাসীমাত্রেই যে বিচলিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর ইম্পেসাহেব প্রভৃতির নিকট ভিন্ন ভিন্ন জাতির পক্ষ হইতে কয়েকখানি আবেদনপত্র প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাতে সুপ্রীমকোর্ট সুবিচার করিয়াছেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল। নবকৃষ্ণপ্রমুখ কলিকাতার বাঙ্গালীগণের পক্ষ হইতেও ঐরূপ এক আবেদনপত্র প্রেরিত হয়। সেইজন্য শ্রীযুক্ত ঘোষসাহেব লিখিয়াছেন ঃ—"It would thus appear that public opinion, European as well as native, was expressed in an unmistakable way in the nature of a vote of confidence in the court. It is very likely that the masses of the Hindu population were especially shocked by the hanging of a conspicuous Brahmin, but it seems to be clear that all citizens, in whom the sense of legal justice prevailed over other sentiments and who had intelligently followed the course of the trial, loyally accepted a result which, if lamentable, the law rendered inevitable." (Memoirs of Nubkissen, pp. 135-136) ঘোষসাহেবের এইরূপ বলিবার কারণ, নবকৃষ্ণপ্রমুখ কয়েকজন সুপ্রীমকোর্টের বিচার ভাল হইয়াছে বলিয়া আবেদন-পত্র পাঠাইয়াছিলেন। কাজেই ইহাতে নবকৃষ্ণ জড়িত ছিলেন, তাহার একটি যে উচ্চতর উদ্দেশ্য ছিল, ইহা প্রতিপন্ন না করিলে যে জীবনী লেখকের কার্য হয় না। ঘোষসাহেব অনায়াসে এইরূপ মনে করিতে পারেন যে, যে ভীষণ হত্যাকাণ্ডে সমগ্র বঙ্গভূমি বিচলিত হইয়াছিল, তাঁহার নায়কপ্রমুখ কয়েকজন মুষ্টিমেয় লোকের আবেদনে তাহা উচিত হইয়াছিল বলিয়া উক্ত হওয়ায়, অবশ্য তাহার উদ্দেশ্য উচ্চতর ছিল। কিন্তু কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি তাহা স্বীকার করিবেন না। নবকৃষ্ণপ্রমুখ কয়েকজন লোক ব্যতীত তৎকালে সমগ্র বঙ্গভূমিতে কি একজনও বিবেচক লোক ছিল না? বাঙ্গালীজাতিমাত্রেই ভাববিহ্বল ছিল, আর নবকৃষ্ণ ও তাঁহার পক্ষের কয়েকজন মুষ্টিমেয় লোক বুদ্ধিমান, বিবেচক, ইহা ঘোষসাহেবের

শোকপ্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। বাঙ্গালী কাঁদিয়াই আকুল হয়; কিন্তু রোদনের কারণ দূর করিতে কোন কালে তাহাদিগকে তৎপর দেখিতে পাওয়া যায় না। মহারাজের হত্যাকাণ্ড লইয়া পরে ইংলণ্ডেও গুরুতর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল এবং হেস্টিংস ও ইম্পের জন্য বিচারও ঘটিয়াছিল।[৪৪]

আমরা মহারাজ নন্দকুমারের রাজনৈতিক চরিত্রসম্বন্ধে আর অধিক বলিতে ইচ্ছা

ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তি কিরূপে যুক্তিযুক্ত বলিয়া উল্লেখ করিলেন, বুঝিতে পারিলাম না। অথবা জীবনীলেখক হইলে সমস্তই সম্ভবপর হইতে পারে। ফলতঃ নবকৃষ্ণ প্রভৃতি এরূপ বিচারকে ন্যায়সঙ্গত বলিলেও, অদ্যাপি নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণের নিকট তাহা অন্যরূপই প্রতীত হইয়া থাকে, এবং নবকৃষ্ণ ও তৎপক্ষের লোকেরাই যে কলিকাতার citizen ছিলেন, আর সকলে mass-এর অন্তর্ভুক্ত, ঘোষসাহেবের এরূপ উক্তিও যে স্পর্দ্ধাসূচক, ইহাও সকলে স্বীকার করিবেন। মহা-রাজের মৃত্যুতে দেশমধ্যে যে এক মহান্দোলন উপস্থিত হইযাছিল, আমরা তাহার প্রমাণস্বরূপ একটি গ্রাম্যগীতের উল্লেখ করিতেছি :—

"মহারাজ নন্দকুমার রে,
তোর রাজপাট জমিদারী কারে দিলি রে,
নন্দকুমার রায় ছিল বাঙ্গলার অধিকারী।
হেস্টিং সাহেব এলো জান্ করিবারে বারি ॥
নন্দকুমারের মা কাঁদে ঐ গঙ্গার পানে চেয়ে।
আর না আসিবে বাছা যোড়া ডিঙ্গি বেয়ে ॥
খোপেতে কৌতর কাঁদে ফোঁহারাতে হাঁস।
যোড় বাঙ্গলায় কাঁদে সোনার গুলতি বাঁশ ॥
ছোট রানী উঠে বলে বড় রানী গো দিদি।
সিঁতে ছিল কড়া সিঁদূর বঞ্চিত করিলেন বিধি ॥"

এই গীতে দুই রানীর কথা আছে। কিন্তু তাঁহার রানী ক্ষেমঙ্করী ব্যতীত অন্য রানীর প্রমাণ পাওয়া যায় না।

৪৪ হেস্টিংস নানা বিষয়ে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে নন্দকুমারের হত্যাকাণ্ড অন্যতম। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া তাঁহার বিচার চলিয়াছিল; তন্মধ্যে ইংলণ্ডে এ বিষয়ের অনেক আলোচনা ও আন্দোলন হইযাছিল, এবং হেস্টিংস ও ইম্পে প্রভৃতির সম্বন্ধে অনেক রহস্যময় চিত্রাদিও প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৭৮৮ খ্রীঃ অব্দের ১৮ই মার্চ একখানি চিত্র প্রকাশিত হইয়া-ছিল; তাহার নাম লিখিত হইযাছিল "The struggle of a Bengal Butcher and his Imp-pie." তাহাতে প্রাচ্যপরিচ্ছদধারী হেস্টিংস দক্ষিণে থর্লো ও শয়তান-কর্তৃক এবং বামে বার্ক, ফক্স ও শেরিডান প্রভৃতি-কর্তৃক আকৃষ্ট হইতেছিলেন, এবং তাঁহার সম্মুখে একখানি পাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিশাচ (imps) নাচিতেছিল। বার্ক বলিতেছেন ঃ—"For the sake of injured millions I and my worthy friends and colleagues demand these wretches as victims to public justice." থর্লো উত্তর দিতেছেন :—"And for the sake of consigned millions I, with the assistance of my old friend and colleagues here, am resolved to protect these worthy gentlemen," ১৭৮৯ খ্রীঃ অব্দের ৮ই মে "Cooling the brain, or the little

করি না। কারণ আমাদের প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে। অতঃপর তাঁহার সামাজিক চরিত্রসম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

আমরা বরাবরই বলিয়া আসিতেছি যে, মহারাজ একজন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন এবং প্রকৃত ব্রাহ্মণের ন্যায় তিনি আপনার ধর্মকার্য প্রতিপালন করিতে চেষ্টা পাইতেন। তিনি একজন পরমবৈষ্ণব ছিলেন ; কিন্তু সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবগণের ন্যায় অনুদার ছিলেন না। সকল দেবতা ও সকল সম্প্রদায়কে তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন। বৈষ্ণব হইয়া গুহ্যকালী, গৌরীশঙ্কর প্রভৃতি প্রতিমার স্থাপন, তাঁহার উদার ধর্মের নিদর্শন। মালিহাটির সুপ্রসিদ্ধ রাধামোহন ঠাকুরের নিকট তিনি দীক্ষিত হন। রাধামোহন অত্যন্ত তেজস্বী পণ্ডিত ছিলেন। নন্দকুমার তাঁহার প্রতি অভিমান প্রকাশ করায়, তিনি অনেকদিন পর্যন্ত নন্দকুমারকে সাক্ষাৎ প্রদান করেন নাই। রাধামোহন নন্দকুমারকে বরাবরই স্নেহদৃষ্টিতে অবলোকন করিতেন ; সেইজন্য তিনি তাঁহাদের পূর্বপুরুষ শ্রীনিবাসাচার্য-কর্তৃক পূজিত সপার্ষদ মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের একখানি সুন্দর চিত্র নন্দকুমারকে প্রদান করিয়াছিলেন। অদ্যাপি সেই চিত্র নন্দকুমারের দৌহিত্রবংশীয় কুঞ্জঘাটা রাজবংশীয়গণের নিকট বর্তমান আছে। তাঁহারা প্রত্যহ তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন।[৪৫] বঙ্গের যাবতীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ তাঁহার নিকট হইতে বহু সাহায্য লাভ করিতেন। নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের প্রধান পণ্ডিতগণকে তিনি রীতিমত প্রতিপালন করিতেন। বৈষ্ণব ও দরিদ্রের পক্ষেও তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ সামাজিক মর্যাদায় কিঞ্চিৎ ন্যূন হওয়ায়, তিনি একবার লক্ষ ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া, এক মহাসমারোহময় ক্রিয়া করেন। বঙ্গের অনেক স্থান হইতে ব্রাহ্মণগণ সমবেত হইয়া মহারাজের বাসভবন ভদ্রপুরকে পবিত্রীকৃত করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা ও ভোজনাদি করান হয়। কথিত আছে, কৃষ্ণনগরাধিপ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র উপস্থিত থাকিয়া সেই ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং নাটোরের দেওয়ান দয়ারাম ভাণ্ডারীর কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।[৪৬]

Major shaving the shaver" নামে আর একখানি চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে বার্ক একটি উন্মত্ত লোকের ন্যায় শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিলেন। হেস্টিংসের পার্লিয়ামেণ্ট এজেণ্ট মেজর স্কট তাঁহার মস্তকমুণ্ডন করিতেছিলেন, হেস্টিংস উপরিভাগে "৫০ লক্ষ পাউণ্ড" লিখিত একটি ছালা স্কন্ধে করিয়া সেণ্ট জেম্স প্রাসাদে গমন করিতেছিলেন ও তথায় অভ্যর্থিত হইতেছিলেন। নিকটে ফাঁসিকাষ্ঠে নন্দকুমারের কঙ্কাল রজ্জুবদ্ধ হইয়া প্রলম্বিত ছিল। বার্ক বলিতেছেন :— "Ha ! miscreant, plunderer, murderer of Nund-comar, where wilt thou hide thy head now ?" (Lawson's Warren Hastings).

৪৫ উক্ত চিত্রের প্রতিকৃতি মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে প্রদত্ত হইয়াছে।

৪৬ দয়ারাম সম্বন্ধে এইরূপ গ্রাম্যকবিতা প্রচলিত আছে, —

"বায়ান্নলাখী দয়ারাম,
সে হবে ভাণ্ডারকাম।"

রাজনৈতিক জগতের ন্যায় সামাজিক জগতেও মহারাজের শত্রুর অভাব ছিল না। কেহ কেহ তাহার ঈর্ষা প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্মণগণের আদর অনাদর সম্বন্ধে গ্রাম্য কবিতাও রচনা করিয়া গিয়াছে।[৪৭] কিন্তু মহারাজ যে ব্রাহ্মণগণের প্রতি যথেষ্ট সমাদর করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পদধূলিসংগ্রহ করা তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। মহারাজ নন্দকুমার সেই লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ করিয়া, অতীব যত্নপূর্বক রক্ষা করিয়াছিলেন। অদ্যাপি সে ধূলির কতক অংশ কুঞ্জঘাটা রাজবাটীতে অবস্থিতি করিতেছে। যিনি ব্রাহ্মণের পদধূলির জন্য লালায়িত, তাঁহার কর্তৃক নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের অনাদর যে সম্পূর্ণ অসম্ভব, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে এক স্থানে লক্ষ ব্রাহ্মণের সমাবেশ হইলে, সকলের প্রতি সমান যত্ন সম্ভব হইয়া উঠা অতি কঠিন। কিন্তু মহারাজ সেই লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি লইবার জন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ সমাদরই করিয়াছিলেন। লক্ষ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবার জন্য যে-সমস্ত কাষ্ঠাসন বা পিঁড়া নির্মিত হইয়াছিল, তাহারও ২।৪ খানি কুঞ্জঘাটা রাজবাটীতে অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। কুঞ্জঘাটা-রাজবংশীয়েরা সেই পদধূলি ও পিঁড়া কয়খানিকে যৎপরোনাস্তি মান্য করিয়া থাকেন। লক্ষ ব্রাহ্মণ যে তোরণদ্বার দিয়া মহারাজের বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা আজও বিদ্যমান রহিয়াছে।

মহারাজের দেবভক্তিও অতুলনীয় ছিল। তিনি ভদ্রপুরে নবরত্নের এক মন্দির স্থাপন করিয়া, তাহাতে লক্ষ্মীনারায়ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনচন্দ্র নামে আর এক বিগ্রহও প্রতিষ্ঠিত হন। নবরত্নের মন্দিরে অনেক শিল্পকার্য করা হইয়াছিল। এক্ষণে তাহার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন শিব, আকালীপুর নামক স্থানে গুহ্যকালী, গৌরীশঙ্কর প্রতিমাদ্বয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি আপনার সাম্প্রদায়িকতাবিহীন প্রকৃত সনাতন ধর্মনিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। গুহ্যকালীর মন্দির অদ্যাপি বর্তমান আছে।[৪৮] লক্ষ্মীনারায়ণ, বৃন্দাবনচন্দ্র রাজা

৪৭ সেই কবিতার কয়েক চরণ উদ্ধৃত হইতেছে ঃ—

> "ভাদুরের নন্দকুমার,
> লক্ষ বামন কল্লে সুমার,
> কেউ খেলে মাছের মুড়ো,
> কেউ খেলে বন্দুকের হুড়ো ;—ইত্যাদি।

ভদ্রপুরকে সাধারণ লোকে ভাদুর বলিয়া থাকে।

৪৮ আকালীপুরের মন্দিরে প্রতিমাস্থাপনের জন্য মহারাজ গুরুদাসকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহা কুঞ্জঘাটার রাজবাটীতে বিদ্যমান আছে। আমরা পরিশিষ্টে উক্ত পত্র প্রদান করিলাম। তাহা হইতে অনেক রাজনৈতিক তথ্যও অবগত হওয়া যায়। রটন্তী তিথিতে উক্ত প্রতিমাদ্বয় প্রতিষ্ঠিত হন। সেইজন্য আজিও রটন্তী তিথিতে ধূমধামের সহিত প্রতিমাদ্বয়ের পূজা হইয়া থাকে। আকালীপুরের মন্দির অসম্পূর্ণ অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। মন্দির মধ্যে গুহ্যকালী ও গৌরীশঙ্কর মূর্তি অবস্থিত। গুহ্যকালীর এমন সুন্দর মূর্তি আর কুত্রাপি দৃষ্ট

মহানন্দ-কর্তৃক ভদ্রপুর হইতে কুঞ্জঘাটার বাটীতে আনীত হইয়াছেন। নন্দকুমার ভদ্রপুরে তাঁহার রানী ক্ষেমঙ্করীর পুণ্যার্থে রানীসায়র নামে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। তাহারই নিকটে রাজা গুরুদাসের নিখাত সুবৃহৎ গুরুসায়র পুষ্করিণী। সেই পুষ্করিণী দুইটি কুঞ্জঘাটার বর্তমান কুমার-কর্তৃক সংস্কৃত হইয়া, অদ্যাপি বিরাজ করিতেছে। নন্দকুমারের বাসবাটীর চিহ্ন এখনও ভদ্রপুরে দেখিতে পাওয়া যায়। জন্মভবনের চিহ্ন ও তাঁহার নির্মিত দেওয়ানখানা অদ্যাপি বিরাজিত আছে। ১১৮১ সালের ২৯শে ভাদ্র তাঁহার দেওয়ানখানার তীর দেওয়ালের উপরে সন্নিবেশিত হইয়াছিল।[৪৯]

মহারাজ নিজের চেষ্টায় যথেষ্ট ধনোপার্জন করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহার সমস্তই সৎকার্যে ব্যয় করিতেন। শেষ জীবনে যদিও তিনি আর কিছু উপার্জন করিতে পারেন নাই, তথাপি মৃত্যুকালে ৫২ লক্ষ টাকা সঞ্চিত রাখিয়া যান।[৫০] তাঁহার পুত্র রাজা গুরুদাস সেই সমস্তের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। মহারাজ নন্দকুমারের এক পুত্র ও তিন কন্যা ছিল। পুত্রের নাম রাজা গুরুদাস। তিনি গৌড়াধিপতি উপাধি প্রাপ্ত হন। কন্যা তিনটির নাম সম্মানী, আনন্দময়ী ও কিনুমণি। রতনমণি নামে তাঁহার কোন কন্যার নাম শুনা যায় ; উক্ত তিন কন্যার মধ্যে কাহারও নাম রতনমণি ছিল, অথবা রতনমণি তাঁহার অন্য এক কন্যা ছিলেন, তাহা আমরা অবগত নহি। তাঁহার কন্যা সম্মানীর সহিত কুঞ্জঘাটা রাজবংশের আদিপুরুষ জগচ্চন্দ্রের বিবাহ হয়। নন্দকুমারের কোন্ কন্যার সহিত তাঁহার প্রিয় জামাতা রায় রাধাচরণের বিবাহ হইয়াছিল, তাহাও বলিতে পারা যায় না। রাধাচরণের বাটী হুগলীর নিকটে ছিল। তাঁহার আর এক জামাতা ভদ্রপুরেই বাস করিতেন। জগচ্চন্দ্রের প্রতি মহারাজ তাদৃশ সন্তুষ্ট ছিলেন না। গুরুদাসের প্রতি জগচ্চন্দ্র হিংসা প্রকাশ করায়, মহারাজ জগচ্চন্দ্রের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং তাঁহার প্রধান শত্রু মোহনপ্রসাদের সহিত জগচ্চন্দ্রের মিত্রতা থাকায়, মহারাজ অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।[৫১] কিন্তু কোম্পানীর কর্মচারিগণ জগচ্চন্দ্রের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। রাজা গুরুদাসের পর তদীয় পত্নী রানী জগদম্বা নন্দকুমারের সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হন। তাঁহার

হয় না। মহারাজ নন্দকুমার মন্দির সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। মন্দিরনির্মাণের কয়েক বৎসর পর তাঁহার শোচনীয় পরিণাম ঘটায়, তদ্বংশীয়েরা আর মন্দির সম্পূর্ণ করেন নাই। এই মন্দির ও তন্মধ্যস্থ দেবতাসম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত ঘটনার প্রবাদ প্রচলিত আছে।

৪৯ তীরে এইরূপ লিখিত আছে :—"শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মীনারায়ণজী জয়তি সন ১১৮১ সালে তারিখ ২৯ ভাদ্র মারফত দেবেরাম শর্মা।" ১১৮১ সালের ২৯-এ ভাদ্র ইংরাজী ১৭৭৪ খ্রীঃ অব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর। সুতরাং মহারাজের মৃত্যুর প্রায় এক বৎসর পূর্বে দেওয়ানখানার তীর উঠিয়াছিল।

৫০ Mutaqherin Trans., Vol. II, p. 406.

৫১ পরিশিষ্টে মুদ্রিত পত্রেও এ কথার উল্লেখ আছে।

জীবিতাবস্থায় নন্দকুমারের একমাত্র বংশধর তাঁহার দৌহিত্র জগচ্চন্দ্রের পুত্র রাজা মহানন্দ সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করেন। মহানন্দ নিজামতে দেওয়ানী করিতেন। তিনি রাজোপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। নবাব কুঞ্জঘাটার বাটীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে খেলাৎ প্রদান করেন।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, জগচ্চন্দ্রের প্রতি কোম্পানীর কর্মচারিগণ সন্তুষ্ট ছিলেন। এজন্য তদ্বংশীয়গণ কোম্পানীর কর্মচারিদের সহিত সৌহার্দসূত্রে আবদ্ধ হন। তাহার একটি প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে। যৎকালে ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ ওয়েস্টমিনিস্টার-হলে সমস্ত ব্রিটিশজাতির প্রতিনিধির নিকট ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচার চলিতেছিল, সেই সময়ে হেস্টিংস নিজ দোষহীনতার প্রমাণের জন্য তাঁহার শাসনকে ন্যায়ানুমোদিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার ইচ্ছায় কতকগুলি দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকের নামস্বাক্ষর সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে রাজা মহানন্দের নামও দৃষ্ট হইয়া থাকে। মহানন্দও একজন পরমবৈষ্ণব ছিলেন; তাঁহার স্থাপিত রাধামোহন ও মহাপ্রভু গৌরাঙ্গমূর্তি প্রভৃতি তাহার প্রমাণ। রাজা মহানন্দের পর তাঁহার পুত্র বিজয়কৃষ্ণ রাজোপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; বিজয়কৃষ্ণের পর আর কেহই সে উপাধি লাভ করেন নাই। কুঞ্জঘাটা রাজবাটীতে নন্দকুমারের ভ্রাতা কেবলকৃষ্ণের রাও উপাধি, জগচ্চন্দ্রের রায় উপাধি ও গুরুদাসের রায়বাহাদুর উপাধির ও রাজা গুরুদাসের জমিদারীর সনন্দ আছে। বর্তমান সময়ের ন্যায় তৎকালে রায় ও রায়বাহাদুর উপাধি পথেঘাটে গড়াগড়ি যাইত না। সে সময়ে রায়দিগকে সহস্র সৈন্যের (তন্মধ্যে পঞ্চশত অশ্বারোহী) অধিপতির ও রায়বাহাদুরকে তিন সহস্র সৈন্যের (তন্মধ্যে দুই সহস্র অশ্বারোহী) অধিপতির পদমর্যাদা দেওয়া হইত। বিজয়কৃষ্ণের পর কৃষ্ণচন্দ্র, এবং তৎপরে কুমার দুর্গানাথ কুঞ্জঘাটা রাজবংশের বংশধর হন। এক্ষণে দুর্গানাথের পুত্র কুমার দেবেন্দ্রনাথ মহারাজ নন্দকুমারের একমাত্র বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছেন। দেবেন্দ্রনাথ তরুণবয়স্ক; কিন্তু তাঁহার স্থিরবুদ্ধি, অমায়িক ব্যবহার, সাধুপ্রকৃতি মহারাজ নন্দকুমারের বংশধরের ন্যায়ই প্রতীয়মান হয়। ভগবানের আশীর্বাদে তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া, তাঁহার বংশের আদিপুরুষ সেই দেশবিখ্যাত প্রকাণ্ডপুরুষ মহারাজ নন্দকুমারের স্বধর্ম, স্বদেশ ও স্বজাতিভক্তির অনুকরণপূর্বক বঙ্গভূমির মুখোজ্জ্বল করুন।

কান্তবাবু

খ্রীস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রবল ঝটিকা বঙ্গে শান্তভাব আনয়ন করিয়া, ভারতের অন্যান্য স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। যে ঝটিকার প্রারম্ভে, হতভাগ্য সিরাজ, মুর্শিদাবাদের সুখময় সিংহাসন হইতে বিচ্যুত হইয়া, অনাথের ন্যায় স্ত্রীকন্যাসহ উত্তাল-তরঙ্গময়ী পদ্মার ক্রোড়স্থিত ভগবানগোলায় আশ্রয় লইয়াছিলেন, পরে মহম্মদী বেগের তরবারিমুখে আপনার লাবণ্যনিকেতন দেহকে বলি দিয়া, খোসবাগের বৃক্ষচ্ছায়ায় চিরদিনের জন্য সমাহিত হন, তাহারই পরিণামে কার্যদক্ষ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মীর কাসেম স্বকীয় নবগঠিতা অক্ষৌহিণী গিরিয়া ও উধুয়ানালার সমরে বলি দিয়া, ইংরেজ কোম্পানীর হস্তে, বঙ্গরাজ্য সমর্পণপূর্বক নিরাশায় ও মনস্তাপে ফকিরী গ্রহণ করিয়া, বঙ্গরাজ্য হইতে বিদায় লইতে বাধ্য হন। মুর্শিদাবাদের ভাগ্যলক্ষ্মী, সেই দারুণ ঝটিকাঘাতে অনন্তকালের জন্য মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়াছেন। নবাব মীরজাফর ইংরেজের ক্রীড়াপুত্তলীর ন্যায় বৃদ্ধ বয়সে কিছুদিন মুর্শিদাবাদের মসনদে উপবেশন-পূর্বক অন্তিম সময়ে কিরীটেশ্বরীর চরণামৃতপানে বিষয়তৃষ্ণাশুষ্ক কণ্ঠকে কথঞ্চিৎ সিক্ত করিয়া, চিরকালের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছেন। নবাব নজমউদ্দৌলা ও সৈফ-উদ্দৌলা অল্পবয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। অল্পবয়স্ক নবাব মোবারক উদ্দৌলা বিমাতা মণিবেগম ও রাজা গুরুদাসের তত্ত্বাবধানে এক্ষণে মুর্শিদাবাদ-নিজামতের পরিচয়মাত্র প্রদান করিতেছেন। নজমউদ্দৌলার সময় হইতেই ইংরেজ বাঙ্গলার রাজা, দেওয়ানী তাঁহাদের হস্তে, নবাব নামে নাজিম (শাসক) মাত্র।

রাজনৈতিক জগতের এইরূপ পরিবর্তন সংশোধন করিয়া, সেই ভীষণ ঝটিকা বঙ্গে আর এক ভয়াবহ কাণ্ডের অবতারণা করিল। বাঙ্গলা ১১৭৬ সালের কৃতান্তদূত-স্বরূপ প্রবল-দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া, "সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা" বঙ্গভূমিকে সাহারার দিগন্তপ্রসারিণী মরুভূমি অপেক্ষাও ভয়াবহ করিয়া তুলিল। অন্নাভাবে বঙ্গবাসিগণ কঙ্কালমাত্রে পর্যবসিত হইয়া, প্রেতভূমির চিত্র স্মরণ করাইতেছিল। প্রজা ও জমিদার উভয়েরই সর্বনাশ সংঘটিত ছিল। এই প্রকারে অশেষবিধ কষ্ট ভোগ করিয়া, বঙ্গমাতা এক্ষণে শান্তিদেবীর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ইংরেজ কোম্পানী স্বহস্তে রাজ্যভার লইয়া, নবাবকে আপনাদের বৃত্তিভোগী করিয়া রাখিয়াছেন। দেওয়ানী-গ্রহণের পর লর্ড ক্লাইব নায়েব-দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া, যেরূপ দ্বিবিধশাসনের (Double government) অবতারণা করেন, সে প্রথাও রহিত হইয়াছে। এক্ষণে কলিকাতায় কোম্পানীর অধ্যক্ষ গবর্নর জেনারেল নামে অভিহিত হইয়া, কতিপয় সদস্যসহ ভারতের সমগ্র ব্রিটিশ অধিকারের অধিশ্বর হইয়াছেন। ব্রিটিশকেতন-লাঞ্ছিত কলিকাতা নগরী, নব নব সৌধমালায় বিভূষিতা হইয়া, ভাগীরথীনীরে স্বীয় কান্তিচ্ছবি প্রতিবিম্বিত করিতেছে। ফোর্ট উইলিয়মের বিজয়বাদ্য স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিতেছে। এইরূপে ইংরেজ কোম্পানী বঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর হইয়া,

ভারতের অন্যান্য স্থানের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কোম্পানীর স্বহস্তগঠিত বিজয়-মুকুটে বিভূষিতা হইয়া, ভাগ্যলক্ষ্মী কতিপয় দেশীয় লোকের প্রতিও অনুগ্রহদৃষ্টি করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে আমাদের আলোচ্য কান্তবাবুও একজন। কান্তবাবুর সংক্ষিপ্ত পরিচয়প্রদানের সহিত তিনি কিরূপে ভাগ্যলক্ষ্মীর অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই দেখাইবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা। আমরা ক্রমশঃ তাহাই বিবৃত করিতেছি! বলা বাহুল্য যে, কান্তবাবুই কাশীমবাজারের বর্তমান রাজ-বংশের আদিপুরুষ। তাঁহারই সুকৃতিবলে আজ কাশীমবাজার রাজবংশ বঙ্গদেশে, কেবল বঙ্গদেশে কেন, সমগ্র ভারতবর্ষে পরিচিত। বাঙ্গলায় এমন স্থান নাই, যেখানে দানশীলা মহারানী স্বর্ণময়ী-মহোদয়ার নাম বিঘোষিত না হয়। কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত সকল প্রকার লোকই মহারানী-মহোদয়ার ও তাঁহার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্রের নাম জ্ঞাত আছে। মহারানী-মহোদয়ার ও মহারাজ-মহোদয়ের এই সুনামের কারণ, কান্তবাবুর সৌভাগ্য। সেই কান্তবাবুর পরিচয় প্রদান করিতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি।

খ্রীস্টীয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাশীমবাজার বাঙ্গলার মধ্যে একটি বাণিজ্য-প্রধান স্থান বলিয়া বিখ্যাত হয়। তৎকালে ইহাতে ও ইহার নিকটবর্তী স্থানসমূহে, ভিন্ন ভিন্ন ইউরোপীয় জাতির কুঠী সংস্থাপিত ছিল। ইউরোপীয়দিগের সহিত বাণিজ্যকার্য চালাইবার জন্য, অনেক দেশীয় লোক কাশীমবাজারে অবস্থিতি করিতেন। বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে অনেক লোক কাশীমবাজারে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে। কান্তবাবুর পূর্বপুরুষেরাও সেই উদ্দেশ্যে কাশীমবাজারে আপনাদিগের আবাসস্থান স্থাপন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের পূর্বনিবাস বর্ধমান জেলার অন্তর্গত মন্ত্রেশ্বরের অধীন রিপীগ্রাম বা সিজনা। তথা হইতে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ইঁহারা কাশীমবাজারের নিকট শ্রীপুর নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। বর্তমান কাশীম-বাজার রাজবাটী সেই শ্রীপুরেই অবস্থিত। কান্তবাবুর দুই তিন পুরুষ পূর্ব হইতে, ইহারা রেশমের ও সুপারির ব্যবসায় চালাইতেছিলেন। ধনশালী ব্যবসায়ী না হইলেও ইহারা একঘর মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছিলেন; কখন অন্নবস্ত্রের কষ্ট ভোগ করেন নাই। রাধাকৃষ্ণ নন্দী সুপ্রসিদ্ধ কান্তবাবুর পিতা। কোন কোন মতে রাধাকৃষ্ণের পিতা সীতারাম এবং কাহারও কাহারও মতে তাঁহার পিতামহ অর্থাৎ সীতারামের পিতা কালীনন্দী, প্রথমে কাশীমবাজারে আগমন করেন।[১] রাধাকৃষ্ণ বর্ধমান জেলার কুড়ুম্ব-

১ কাশীমবাজার রাজবংশের বংশপত্রিকানুসারে প্রথমে সীতারাম নন্দীর কাশীমবাজার আগমনের কথা উল্লিখিত হয়। সীতারামের মাথায় টাক ছিল বলিয়া, তিনি "নেড়া" নামে অভিহিত হইতেন। কিন্তু কিশোরচাঁদ মিত্রের কাশীমবাজার রাজবংশে (Calcutta Review, 1873) কালীনন্দীরই কাশীমবাজার আগমনের কথা লিখিত আছে। কিশোরীচাঁদের মতে রাধাকৃষ্ণের পিতা কালীনন্দীর জ্যেষ্ঠপুত্র। সুতরাং তাঁহারই নাম সীতারাম হইতেছে।

গ্রামে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহারা জাতিতে তৈলিক বা তিলি। অনেকে তাঁহাদিগকে তেলি বলিয়া ভ্রমে পতিত হন এবং সেইজন্য সাহেবদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাদিগকে Oilman বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।[২] বর্তমান সময়ে যাহাদিগকে তেলি বলে, তাহারা ইঁহাদের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ইঁহারা সাধারণতঃ তিলি নামেই অভিহিত হন।[৩] তৈলিক বা তিলিগণ নবশাখ শূদ্রের মধ্যে এক শাখা; সুতরাং জাত্যংশে শূদ্রদের মধ্যে তাঁহারা নিতান্ত হীন নহেন। রাধাকৃষ্ণের পাঁচ পুত্র ছিল; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণকান্ত; এই কৃষ্ণকান্তই কান্তবাবু বলিয়া সুপরিচিত। রাধাকৃষ্ণ পূর্বপুরুষগণের আরব্ধ রেশম ও সুপারির ব্যবসায় পরিচালন করিতেন। রাধাকৃষ্ণ নিজে ভাল ঘুঁড়ী উড়াইতে পারিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে খলিফা বলিযা অভিহিত করিত। কাশীমবাজারে ইংরেজ কুঠী ও রেসিডেন্সির নিকটই তাঁহাদের দোকান ছিল; এজন্য কুঠীর লোকদিগের সহিত তাঁহাদের বিশেষ পরিচয় হয়। কৃষ্ণকান্ত বাল্যকালে বাঙ্গলা, ফারসী ও সামান্য-রূপ ইংরেজী শিক্ষা করেন। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, কান্তবাবু দুই হাজার ইংরেজী শব্দ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন, এতদ্ভিন্ন বাঙ্গলা হিসাবপত্রেও তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল। কান্তবাবুর বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল; এজন্য তিনি কাশীমবাজারস্থ ইংরেজদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ইংরেজ বণিকদিগের সহিত ব্যবসায়বিষয়ে সম্পর্ক হওয়ায়, কান্তবাবু ক্রমে ক্রমে কাশীমবাজারেই ইংরেজ কুঠীতে মুহুরীর পদে নিযুক্ত হন। তিনি বাল্যকাল হইতে আপনাদের রেশমের ব্যবসায় দেখিয়া আসিতেছিলেন; তজ্জন্যে উক্ত বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা জন্মে। ইংরেজ কুঠীতে রেশমের ব্যবসায়ই প্রধান হওয়ায় এবং সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান থাকায়, শীঘ্রই তাঁহার পদোন্নতি ঘটে। এই সময়ে বঙ্গের প্রথম গবর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ১৭৫৩ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর মাসে নবাব আলিবর্দী খাঁ মহবৎ জঙ্গের রাজত্বকালে, ওয়ারেন হেস্টিংস কলিকাতা হইতে কাশীমবাজার কুঠীতে আগমন করেন। ক্রমে ক্রমে কান্তবাবুর সহিত তাঁহার পরিচয় জন্মিলে, কান্তবাবুর কার্যদক্ষতায় তিনি তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হন। ওয়ারেন হেস্টিংস এই সময়ে একজন নিম্নতন কর্মচারিমাত্র ছিলেন। এই সময়ে হেস্টিংসেরও কর্তব্যনিষ্ঠার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়।

১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে নবাব আলিবর্দী খাঁ ইহলোক হইতে বিদায়

২ Beveridge's Nundakumar, p. 554.

৩ কেহ কেহ বলেন যে, তিলি তৌলিক শব্দের অপভ্রংশ; তৌলিক অর্থে যাহারা তুলাদণ্ড ধরিয়া জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে। কিন্তু তিলি শব্দ তৈলিক বা তৈলী শব্দেরই অপভ্রংশ। তৈলিকগণ নবশায়ক বা নবশাখগণের অন্যতম। কোনও সময়ে ইহারাও তেলি নামে অভিহিত হইলেও, বর্তমান তেলিগণ তৈলকার বলিয়া পরিচিত। তৈলকারগণ অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জাতি; সুতরাং বর্তমান সময়ের তেলি হইতে তিলিগণ যে সম্পূর্ণ পৃথক্‌, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

গ্রহণ করিলে, তাঁহার প্রিয়তম দৌহিত্র সিরাজ বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন। আলিবর্দী মৃত্যুকালে বলিয়া যান যে, ইংরেজেরা যেরূপ ক্ষমতাশালী হইতেছে, তাহাতে যেরূপে পার, ইহাদিগকে দমন করিতে চেষ্টা করিবে।[8] সেই পরামর্শের বশবর্তী হইয়া, সিরাজ ইংরেজদিগের উচ্ছেদসাধনে কৃতসংকল্প হইলেন এবং অবিলম্বে কাশীমবাজার কুঠী আক্রমণ করিলেন। নবাবসৈন্যের নিকট ইংরেজ-বণিগ্‌গণ আত্মসমর্পণ করিল। এই সময়ে ওয়াট্‌সসাহেব কাশীমবাজারের অধ্যক্ষ ছিলেন। কলেট ও ব্যাট্‌সন সাহেবদ্বয় তাঁহার সদস্যরূপে অবস্থিতি করিতেন। ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁহাদের নিম্নপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। ইংরেজেরা আত্মসমর্পণ করিলে, নবাবের কর্মচারিগণ তাঁহাদিগকে সুচতুর প্রহরীর দ্বারা বেষ্টিত করিয়া, মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করিল। এই বন্দীদিগের মধ্যে কান্তবাবুর সুপরিচিত হেস্টিংসসাহেবও কষ্ট ভোগ করিতে বাধ্য যন। তথায় কিছুদিন অবস্থানের পর, তাঁহারা মুক্তি লাভ করেন। এই মুক্তিলাভের সহিত কান্তবাবুর এক বিশেষ সম্বন্ধ থাকায়, তাঁহার ভবিষ্যৎ ভাগ্যোদয়ের সূচনা হয়।

এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, ওয়ারেন হেস্টিংস মুর্শিদাবাদে বন্দী অবস্থায় থাকিতে থাকিতে, তথা হইতে পলায়ন করিয়া, কাশীমবাজারে উপস্থিত হন। কিন্তু তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। তিনি কালিকাপুরের ওলন্দাজ কুঠীর অধ্যক্ষ ভিনেট্‌সাহেবের জামিনে নবাবের নিকট হইতে মুক্তি লাভ করেন,[৫] এবং মুর্শিদাবাদে অবস্থান করিতে থাকেন। এই সময়ে কলিকাতার অধ্যক্ষ ড্রেক ও অন্যান্য ইংরেজগণ কলিকাতা আক্রমণের পর ফল্‌তায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংস, এই সময়ে নবাব সরকারের যাবতীয় সংবাদ তাঁহাদিগকে গোপনে প্রেরণ করিতেন। ক্রমে ক্রমে এই সংবাদ নবাবের কর্ণগোচর হইলে, হেস্টিংস ভীত হইয়া মুর্শিদাবাদ হইতে পলায়ন করেন। সম্ভবতঃ এই পলায়নসময়েই তিনি কাশীমবাজারে স্বীয় পরিচিত বন্ধু কান্তবাবুর আশ্রয়ে থাকিতে বাধ্য হন। পরে তথা হইতে চুনারে, অবশেষে ফল্‌তায় গিয়া ইংরেজদিগের সহিত মিলিত হন।

কথিত আছে যে, যৎকালে হেস্টিংস নবাব-ভয়ে ভীত হইয়া, কাশীমবাজারে উপস্থিত হন, সে সময়ে তথায় প্রসকাশ্যভাবে কোন কুঠীতে বা গদিতে থাকিতে সাহসী হন নাই। তাঁহার পরিচিত বন্ধু কান্তবাবু আপনার ভীষণ বিপদ সম্মুখীন দেখিয়াও, নবাবের কঠোর-শাসনে ভীত না হইয়া, হেস্টিংসকে আশ্রয় দান করেন। ইহাও শুনিতে পাওয়া যায় যে, কান্তবাবু তাঁহার জন্য কোনরূপ খাদ্যদ্রব্যের আয়োজন করিতে পারেন নাই; গৃহে পান্তাভাত ও চিংড়ি মৎস্য মাত্র ছিল; ক্ষুৎপীড়িত হেস্টিংস তাহাই পরিতোষ-সহকারে আহার করিয়াছিলেন। নবাবের প্রহরিগণ তাঁহার

৪ Holwell's India Tracts, p. 193.

৫ Glieg's Memoir of Warren Hastings.

অনুসন্ধানে কাশীমবাজারের চতুর্দিকে বিচরণ করিতেছিল ; কিন্তু কান্তবাবু তাহাতেও বিচলিত হন নাই। তাহারা যখন অকৃতকার্য হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল, তখন কান্তবাবু হেস্টিংসের পলায়নের আয়োজন করিয়া দিলেন ; হেস্টিংস কান্তবাবুর চেষ্টায় কাশীমবাজার পরিত্যাগ করিলেন। কাশীমবাজার পরিত্যাগসময়ে, তিনি অশ্রুপূর্ণলোচনে, কান্তবাবুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে এক নিদর্শনপত্র দিয়া বলিলেন যে, ঈশ্বর যদি কখন দিন দেন, তাহা হইলে, তিনি যথাসাধ্য তাঁহার প্রত্যুপকার করিবেন। হেস্টিংস এই অঙ্গীকার সর্বতোভাবে পালন করিয়াছিলেন। চতুর্দিকে বিভীষিকার মধ্য হইতে যে উপকারী বন্ধু আপনার প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, বিপদস্তূপ মস্তকে লইতে অগ্রসর হয়, যাহার হৃদয়ে কণামাত্র মনুষ্যরক্ত আছে, সে তাহার প্রত্যুপকার না করিয়াই থাকিতে পারে না। কান্তবাবু আশ্রয় না দিলে, হয়ত, হেস্টিংস ধৃত হইয়া, অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে বাধ্য হইতেন ; এমন কি, তাঁহার জীবননাশেরও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। এজন্য তিনি কান্তবাবুর উপকার জীবনেও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। ক্রমে ক্রমে তাঁহার যেরূপ পদোন্নতি ঘটিয়াছে, তিনিও তদনুযায়ী কান্তবাবুর উপকার করিয়াছেন। কান্তবাবুর জন্য তিনি মস্তক পাতিয়া অম্লানবদনে কর্তৃপক্ষের তিরস্কারপর্যন্তও গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা যথাস্থানে তাহাও দেখাইব।

পলাশীযুদ্ধের পর যখন মীরজাফর ক্লাইবের সাহায্যে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন, সেই সময় হইতে বাঙ্গলায় ইংরেজদিগের প্রাধান্য স্থাপিত হয়। মীরজাফর ও অন্যান্য নবাবগণ ইংরেজদিগের বিনা পরামর্শে কোন কার্য করিতে সমর্থ হইতেন না। এই সময়ে নবাব-দরবারের অবস্থা সম্যগ্‌রূপে অবগত হইবার জন্য একজন করিয়া ইংরেজ রেসিডেন্টের মুর্শিদাবাদে থাকা আবশ্যক হয়। পূর্বে কাশীমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ নবাব-দরবারে ইংরেজদের আর্জি পেশ করিতেন ও হুকুম আদি লইতেন। এক্ষণে তদ্বিপরীত অর্থাৎ নবাবকে কোন পরামর্শ ও তাঁহাকে কোন বিষয় হইতে নিরস্ত করিবার জন্য, মুর্শিদাবাদে সর্বদা একজন রেসিডেন্ট থাকিতেন। মোরাদবাগ তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়। প্রথমে স্কাফ্‌টনসাহেব এই পদে নিযুক্ত হন। হেস্টিংসের বিচক্ষণতায় সন্তুষ্ট হইয়া, পরে ক্লাইব ১৭৫৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহাকে উক্ত পদ প্রদান করেন। হেস্টিংস পূর্ব হইতে কান্তবাবুর উপকারের জন্য সচেষ্ট ছিলেন কিন্তু সেরূপ উচ্চপদ না পাওয়ায়, সম্যগ্‌রূপে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই ; এক্ষণে অপেক্ষাকৃত উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়া তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহার পর ১৭৬১ খ্রীঃ অব্দে তিনি কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হন। এই সময় হইতে কোম্পানীর কর্মচারিগণ, নিজ নিজ ব্যবসায়ের পরিচালনা করিতেন। মীরজাফরের রাজত্ব হইতে তাহার সূচনা হয়। ১৭৬০ খ্রীঃ অব্দে মীর কাসেমের রাজ্যাভিষেক হইলে, ইহার আরও বিস্তার ঘটে। গবর্নর হইতে কোম্পানীর সামান্য কর্মচারী পর্যন্ত আপন আপন ব্যবসায় চালাইতে প্রবৃত্ত হন। এতদ্ভিন্ন বে-সরকারী ইংরেজগণও

যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবসায়-বাণিজ্যে সুবিধা করিয়া লন। গবর্নর ভান্সিটার্ট ও হেস্টিংস প্রভৃতিও সুযোগ পরিত্যাগ করেন নাই। হেস্টিংস এই সময় কান্তবাবুকে আপনার মুৎসুদ্দী বা বেনিয়ান্ নিযুক্ত করেন; কান্তবাবু ও তাঁহার ভ্রাতা নৃসিংহ হেস্টিংসের ব্যবসায়ের পরিচালন করিতেন।

কথিত আছে, হেস্টিংস ও ভান্সিটার্ট এই সমস্ত ব্যবসায়নির্বাহের অর্থ নবাব মীর কাসেমের নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন। যখন মীর কাসেমের নিকট তাঁহারা মুর্শিদাবাদের সিংহাসন বিক্রয় করেন, তখন তাঁহার নিকট উৎকোচস্বরূপ প্রচুর অর্থ প্রাপ্ত হন। যেরূপেই হউক, তাঁহারা বাণিজ্য আরম্ভ করিয়া লাভবান্ হইতে থাকেন। ১৭৬৪ খ্রীঃ অব্দে হেস্টিংস ইংলণ্ড যাত্রা করেন; তথায় তিনি স্বীয় আত্মীয়দিগের সাহায্যার্থে ভারতবর্ষ হইতে সঞ্চিত সমস্ত অর্থ ব্যয় করিয়া ফেলেন; এমন কি তাঁহার নিজ ব্যবসায়ের অর্থ পর্যন্ত নিঃশেষ হইয়া যায়। তিনি অত্যন্ত বিপদে পতিত হইলেন। অবশেষে কান্তবাবুকে ১২,০০০ টাকার জন্য লিখিয়া পাঠাইতে বাধ্য হন।[৬] কান্তবাবু যদিও তাঁহার মুৎসুদ্দী ছিলেন, তথাপি তাঁহার দ্বারা সে সময়ে প্রচুর অর্থাগম হইতে পারে নাই; কাজেই তিনি স্বীয় প্রভুকে ১২০০০ টাকা দিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্যোপায় হইয়া, অবশেষে হেস্টিংসকে খাজা পিদ্রুসের[৭] নিকট হইতে সেই টাকা লইতে হয় এবং যখন তিনি দ্বিতীয়বার মাদ্রাজে আগমন করেন, সেই সময়ে উক্ত অর্থ পরিশোধ করিয়াছিলেন। হেস্টিংস জানিতেন যে, কান্তবাবু এরূপ ধনী ছিলেন না যে, তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারেন, তজ্জন্য নিজের বিপদের সময় কান্তবাবুর সাহায্য না পাইয়াও, তিনি তাঁহার উপর বিরক্ত হন নাই; তাহার পরও তাঁহাকে চিরদিনই স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, এবং তাঁহার উন্নতির জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই।

১৭৭২ খ্রীঃ অব্দে কার্টিয়ারসাহেব অবসরগ্রহণ করিলে, হেস্টিংস মাদ্রাজ হইতে তাঁহার পদে গবর্নর নিযুক্ত হইয়া আসেন। তিনি এদেশে আসিয়াই পুনর্বার কান্তবাবুকে আপনার মুৎসুদ্দী নিযুক্ত করেন। কান্তবাবু তৎপূর্বে সাইক্সসাহেবের বেনিয়ানী করিতেন। এই সময়ে কোম্পানীর কর্মচারিগণ আর আপন আপন ব্যবসায় পরিচালন করিতে পারিতেন না। ব্যক্তিগত বাণিজ্যে কোম্পানীর নিতান্ত ক্ষতি হইতেছে দেখিয়া, কোম্পানীর অধ্যক্ষগণ এইরূপ নিয়ম বিধিবদ্ধ করিতে বাধ্য হন। কাজেই কোম্পানীর কর্মচারিগণ, আপনাদিগের মুৎসুদ্দীদের স্বনামে বা বেনামে ব্যবসায় পরিচালন, এবং জমিদারী ও আবাদী জমি প্রভৃতির ইজারা লইতে আরম্ভ করেন। মুৎসুদ্দীগণ ইহাতে যথেষ্ট অর্থাগমের উপায় করেন। তাঁহারাই দেশমধ্যে সর্বেসর্বা ছিলেন; যাহা ইচ্ছা করিতেন, তাহাই সম্পন্ন করিতে পারিতেন।

৬ Seir Mutaqherin, Vol. I, p. 773. (Translator's note.)

৭ ইনি সুপ্রসিদ্ধ গর্গিন খাঁর ভ্রাতা ও একজন বিখ্যাত বণিক্।

সাহেবদের সহিত দেখা বা কোন কথা বলিতে হইলে, প্রথমে তাঁহাদিগকে জানাইতে হইত। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে, হয়ত সে কথা সাহেবদিগকে জানাইতেন, নতুবা গোপন করিয়া রাখিতেন। এই সকল বেনিয়ান বা মুৎসুদ্দীগণ, যাবতীয় শস্যশালিনী ভূমির জমিদারী ও প্রধান প্রধান লবণের মহালগুলি আপনাদের অধিকারে রাখিতেন এবং দেশমধ্যে অনেক দ্রব্যের একচেটিয়া ব্যবসায়ের পরিচালনা করিতেন। তাঁহারা সাহেবদিগের দেওয়ান বা বেনিয়ান বলিয়া অভিহিত হইতেন।

১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে লর্ড নর্থের রাজ্যসংক্রান্ত নিয়ামক বিধি (Regulating Act) বিধিবদ্ধ হইলে, হেস্টিংস গবর্নর জেনারেল হন। তাঁহার সাহায্যের জন্য চারিজন সদস্যের মধ্যে তিনজন, এবং রাজ্যের বিচারের জন্য সুপ্রীমকোর্টের বিচারকগণ যথাসময়ে কলিকাতায় আগমন করেন। এই সমস্ত নবাগতদিগের মধ্যে সদস্যগণের সহিত হেস্টিংসের বিরোধ ও বিচারকদিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, হেস্টিংস বাঙ্গলার গবর্নরী পাইয়া, সেই সময় হইতে ও গবর্নর জেনারেল হওয়া পর্যন্ত কান্তবাবুর যথেষ্ট উন্নতি করিয়া দেন। কান্তবাবুকে কতকগুলি জমিদারী পরিদর্শনের ও তাহাদের সুশৃঙ্খলাসাধনের ভার প্রদান করেন। কান্তবাবু প্রথম প্রথম জমিদারী কার্য ভাল বুঝিতেন না ; কিন্তু অবশেষে গঙ্গাগোবিন্দসিংহের সাহায্যে তাহাতে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। হেস্টিংস যৎকালে দ্বিবিধশাসন (Double Government) উঠাইয়া নানাবিধ নূতন বন্দোবস্ত প্রচলন করিতেছিলেন, সেই সময়ে দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত নন্দী তাঁহাকে অনেক সাহায্য করেন এবং হেস্টিংসও সেই সময় তাঁহাকে অনেকগুলি লাভকর জমিদারী ও নিমক্ মহাল ইজারা করিয়া দেন। সেই সময়ে কান্তবাবু কাশীমবাজার হইতে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। প্রথমে তিনি বড়বাজারে একটি ক্ষুদ্র বাটীতে বাস করিতেন ; পরে তথা হইতে জোড়াসাঁকোর বৃহৎ বাটীতে আসিয়া বাস করেন। জোড়াসাঁকোর সে বাটী অদ্যাপি বিদ্যমান আছে ; ঐ সকল মহাল ও জমিদারী হইতে তাঁহার প্রচুর ধনাগম হয়।

কান্তবাবুকে জমিদারী প্রভৃতি প্রদান করিবার জন্য হেস্টিংস অনেক অসদুপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হন। তিনি প্রথমতঃ কর্তৃপক্ষগণের আদেশ অবহেলা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এদেশের অনেক জমিদারের উপর ভীষণ অত্যাচার করিতে ত্রুটি করেন নাই। গঙ্গাগোবিন্দসিংহ ও দেবীসিংহ প্রভৃতি কতকগুলি ভীষণ-প্রকৃতি লোকের সাহায্যে তিনি বাঙ্গলার জমিদার ও প্রজাবর্গের উপর নানা প্রকার অত্যাচার করিয়াছিলেন। এই দুই ব্যক্তির সাহায্যে হেস্টিংস যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকেই অনেক লাভকর জমিদারী প্রদান করিতেন। সর্বাপেক্ষা তাঁহার প্রিয় কান্তবাবুই অধিক সুবিধা প্রাপ্ত হন। ১৭৭২ খ্রীঃ অব্দে রাজ্যসংক্রান্ত নিয়ম বিধিবদ্ধ হইলে, তাহার মধ্যে এইরূপ একটি বিধি থাকে যে, কোম্পানীর কর্মচারিগণের কোন পেস্কার বেনিয়ান বা

বা অন্য লোক, কিংবা তাহাদের কোন আত্মীয় কোন জমিদারী বা ফারম ইজারা লইতে পারিবে না ; এইরূপ করিলে সেই কর্মচারীকে পদচ্যুত হইতে হইবে।[৮]

এই নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষগণ এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, কোম্পানীর কর্মচারিগণ যদি ইজারাদারদিগকে সাহায্য করেন, তাহা হইলে, কেহ তাঁহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হইবে না। কোম্পানী ইচ্ছা করেন না যে, তাঁহাদের স্বীয় কর্মচারিগণের সহিত কোনরূপ বন্দোবস্ত হয়। কোম্পানীর কর্মচারীরা এইরূপ ইজারদার হইলে, প্রজাগণ আপনাদিগের রক্ষার জন্য কাহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিবে ? সুতরাং তাঁহারা কোম্পানীর কর্মচারীদিগকে ভূয়োভূয়ঃ এই বিধি-অনুসারে কার্য করিতে আদেশ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গবর্নর জেনারেলই তাহা লঙ্ঘন করিয়া, আপনার বেনিয়ানের অত্যন্ত সুবিধা করিয়া দেন এবং তজ্জন্য জমিদার ও প্রজাদিগের উপর যদিও অত্যাচার করিতে হইত, তাহাতেও তিনি পশ্চাৎপদ হইতেন না। নিয়মে স্পষ্টতঃ কলেক্টরগণ ও তাঁহাদের কর্মচারীরা নিষিদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া, হেস্টিংস চতুরতাপূর্বক স্বীয় বেনিয়ানের সুবিধার উপায় করিয়া দেন। এক সময়ে কান্তবাবু তাঁহার বিশেষ উপকার করেন, এমন কি প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন বলিতে হইবে—সেইজন্য, তিনি তাঁহার প্রত্যুপকার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু দস্যুদিগের মত পরস্বাপহরণ করিয়া প্রত্যুপকারের এই উপায়, কদাচ ন্যায়মতে সমর্থন করিতে পারা যায় না। সদুপায়ে সেই প্রত্যুপকার করিলে উপকর্তা ও উপকৃত উভয়েরই পুণ্যলাভ হয়, অন্যথা ইহাতে উভয়েরই প্রত্যবায় আছে।

হেস্টিংস বলপূর্বক কান্তবাবুকে যে সমস্ত জমিদারী প্রদান করেন, তন্মধ্যে বাহারবন্দ পরগণাই সর্বপ্রধান। বাহারবন্দ রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত, একটি বিস্তৃত ও আয়কর জমিদারী।[৯] বাহারবন্দ আজিও কাশীমবাজার রাজবংশের অধীন আছে এবং ইহা তাঁহাদের সর্বাপেক্ষা প্রধান ও লাভকর জমিদারী। বাহারবন্দ পরগণা পূর্বে রানী সত্যবতীর জমিদারীর অন্তর্গত ছিল ; তিনি ধর্মোপার্জন মানসে সংসার পরিত্যাগ

---

৮ "That no *peshcar, banyan*, or other servant, of whatever denomination, of the Collector, or relation, or dependant of any such servant. be allowed to farm lands, nor directly or indirectly to hold a concern in any farm, nor to be security for any farmer ; and if it shall appear that the Collector shall have countenanced, approved, or connived at a breach of this regulation, he shall stand *ipso facto* dismissed from his collectorship." (Mill's History of India, Vol. III, p. 646. Also Beveridge's History of India, Vol. II) এই নিয়মে যদিও কলেক্টর ও তাহার কর্মচারিগণের প্রতি নিষেধাজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছিল, তথাপি তাহার Commentary বা ব্যাখ্যায় কলেক্টরের স্থলাভিষিক্ত কোম্পানীর সকল কর্মচারীকেই বুঝাইবে বলিয়া লিখিত হয়।

৯ বাহারবন্দের বিস্তৃত বিবরণ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

করিয়া যৎকালে পুণ্যভূমি তীর্থরানী কাশীতে গমন করেন, সেই সময়ে স্বীয় আত্মীয়া হিন্দুবিধবার উচ্চ আদর্শ, বঙ্গভূমির জ্বলন্ত গৌরব, মূর্তিমতী পবিত্রতা সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণারূপিণী রানী ভবানীকে বাহারবন্দ পরগণা প্রদান করিয়া যান এবং সরকার-কর্তৃক তাহা গ্রাহ্যও হইয়াছিল। রানী সত্যবতীর সুকীর্তি আজিও বাহারবন্দ অলঙ্কৃত করিতেছে। তাঁহার স্থাপিত দেবমন্দির আজিও তাঁহার ধর্মানুরাগের পরিচয় প্রদান করিতেছে। ধর্মপালন যাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, সেই ধর্মপালন আরও সুচারুরূপে নির্বাহিত হইবে বলিয়া, তিনি রানী ভবানীকে স্বীয় জমিদারী প্রদান করিয়াছিলেন। রানী ভবানীর ধর্মনিষ্ঠা বঙ্গদেশে প্রবাদবাক্যের ন্যায় প্রচলিত। শুধু বঙ্গদেশে কেন ভারতের অনেকস্থানে তাঁহার গৌরব বিঘোষিত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের ইতিহাসে তাঁহার দেবভক্তি, ব্রাহ্মণপ্রতিপালন, দীনদুঃখীর প্রতি কৃপার তুলনা আর দ্বিতীয় নাই। তাঁহার স্বধর্মানুরাগ কতদূর প্রবল, তাহা সহজে অনুমিত হইতে পারে। যাঁহাকে বাঙ্গালীরা ছদ্মবেশধারিণী ভবানী বলিয়া জানে, তাঁহাকে ব্যতীত অন্য কাহাকে রানী সত্যবতী স্বীয় উদ্দেশ্যপালনের জন্য নিজ সম্পত্তি প্রদান করিতে পারেন? রানী ভবানী স্বীয় আত্মীয়ার নিকট হইতে বাহারবন্দ পাইয়া সত্যবতীর উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যথেষ্ট যত্ন করিয়াছিলেন।

বাহারবন্দ পরগণা অত্যন্ত লাভকর দেখিয়া, হেস্টিংসের মন বিচলিত হইল। তিনি স্বীয় প্রতিপাল্য কান্তবাবুকে কিরূপে তাহা প্রদান করিবেন, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অবশেষে স্থির হইল যে, রানী ভবানী স্ত্রীলোক; তিনি এরূপ জমিদারী শাসন করিতে অসমর্থা; অতএব তাঁহার হস্তে বাহারবন্দ থাকা যুক্তি-যুক্ত নহে। যে রানী ভবানী ৩২ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়া দেড়কোটি টাকা রাজস্বের[১০] জমিদারী অবাধে এতদিন শাসন করিয়া আসিতেছিলেন, এক্ষণে তিনি সামান্য ২।৩ লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারী পরিচালনে অসমর্থা হইলেন! যিনি নবাবশ্রেষ্ঠ আলিবর্দীর সময়ে মহারাষ্ট্রীয়গণের ঘোর অত্যাচারের মধ্যেও অবিচলিত ভাবে আপনার রাজস্বসংগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন; এক্ষণে তিনি অকর্মণ্য বলিয়া বিবেচিত হইলেন। হেস্টিংসের ন্যায় শত শত কেরাণী-গবর্নর যাঁহার পদতলের নিকট বসিবার উপযুক্ত নহে, সেই কার্যদক্ষ বিচক্ষণ নবাবশ্রেষ্ঠ আলিবর্দীর সময় যাঁহার হস্তে সর্বাপেক্ষা অধিক রাজস্বসংগ্রহের ভার ছিল, আজ কি না তাঁহার প্রতি একটা অযথা দোষ অর্পণ করিয়া, তাঁহার হস্ত হইতে তাঁহার জমিদারী বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া হইল। অনুগত লোককে প্রতিপালন করিতে হয় বলিয়া, ন্যায় ও ধর্মের মস্তকে পদাঘাত করিতে হয়, ইহা কোন্ নীতির পরিচায়ক? দেশের শাসনকর্তা হইয়া, যিনি একের শুভোদ্দেশে অপরের সর্বনাশ করিতে পারেন, তিনি শাসনকর্তা নামের কিরূপ উপযুক্ত, সকলে তাহা অনুমান করিতে পারেন। আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িলেও কখন ন্যায়ের মর্যাদা

১০ Holwell's Interesting Historical Events, p. 102.

লঙ্ঘন করা উচিত নহে। হেস্টিংস যে দোষ দেখাইয়া রানী ভবানীর হস্ত হইতে বাহারবন্দ কাড়িয়া লন, মণিবেগমের সময় সে বিচার যে কোথায় ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। নাবালক নবাব মোবারক উদ্দৌলার অভিভাবক যদি মণিবেগম হইতে পারেন তাহা হইলে রানী ভবানী যে একটি জমিদারীর রাজস্বসংগ্রহে অসমর্থা, এ কথা কে স্বীকার করিতে পারে? মণিবেগমের সময় যে আপত্তি উঠে নাই, এক্ষণে সেই আপত্তি করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সমর্থন করা হইল। কাউন্সিলের সদস্য ফ্রান্সস্ সাহেব রানী ভবানীর পক্ষ হইয়া হেস্টিংসকে এইরূপ জানাইয়াছিলেন যে, মণিবেগম যখন স্ত্রীলোক হইয়াও নবাবের অভিভাবক নিযুক্ত হইয়াছেন, তখন রানী ভবানী কি জন্য কর সংগ্রহ করিতে পাইবেন না? কিন্তু হেস্টিংস তাঁহার কথায় কর্ণপাত করেন নাই। হেস্টিংস যাহা জেদ করিতেন, তাহা কার্যে পরিণত না করিয়া বিরত হইতেন না। কিন্তু তাঁহার এই যুক্তি পরে পরিবর্তিত ও বাহারবন্দ প্রদানের জন্য অন্য কৈফিয়ৎ সৃষ্ট হইয়াছিল। আমরা পরে তাহার উল্লেখ করিব।

যাহা হউক, তিনি রানী ভবানীর নিকট হইতে বলপূর্বক বাহারবন্দ লইয়া প্রথমে ১১৮১ সাল ১৭৭৫ খ্রীঃ অব্দে কান্তবাবুর পুত্র লোকনাথকে ইজারা দিলেন। পরে ১১৮৩ সালের (১১৭৯ খ্রীঃ অঃ) ৩রা ভাদ্র ৮২,৬৩৯ টাকায় ঐ ইজারা চিরস্থায়ী করা হয়। যে সময়ে লোকনাথকে প্রথমে ইজারা দেওয়া হয়, তৎকালে তিনি দশ বা একাদশ বৎসর-বয়স্ক বালকমাত্র।[১১] স্ত্রীলোকের হস্ত হইতে জমিদারী কাড়িয়া লইয়া বালকের হস্তে প্রদান করা হইল। এরূপ ন্যায়-বিচার কেহ দেখিয়াছেন কি? যদিও কান্তবাবুর বেনামীতে লোকনাথকে জমিদারী দেওয়া হয়, তথাপি প্রকাশ্যভাবে একটি বালকের হস্তে জমিদারী প্রদান করিতে তিনি কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করেন নাই। ইহা লইয়া পীড়াপীড়ি করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন যে, কান্তবাবুর বেনামীতে লোকনাথকে দেওয়া হইয়াছে এবং বেনামীতে জমিদারী দেওয়া এ দেশে প্রচলিত আছে। হেস্টিংস এইরূপে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে ত্রুটি করেন নাই। ইহা অপেক্ষা অধিকতর নির্লজ্জতার বিষয় আর আছে কি না, জানি না। স্ত্রীলোক বলিয়া রানী ভবানীর হস্ত হইতে বাহারবন্দ বিচ্যুত হইল। স্ত্রীলোক হইলে যদি দোষ হয়, তাহা হইলে, বোধ হয়, মহারানী স্বর্ণময়ীর নাম আজ কেহ শুনিতে পাইতেন না।

হেস্টিংস বাহারবন্দ কান্তবাবুকে প্রদান করিলেন বটে, কিন্তু প্রজারা প্রথমতঃ তাঁহাকে কর প্রদান করিতে স্বীকৃত হইল না। যাহারা রানী ভবানীর অধিকারে বাস করিত, তাহারা সহজে অন্য লোকের নিগ্রহ ভোগ করিতে যাইবে কেন? দয়া যাঁহার নিত্যসহচরী, পরোপকার যাঁহার জীবনের মুখ্য ব্রত, যাঁহার নামে দারিদ্র্য দরিদ্রের কুটীর ছাড়িয়া দূর-দূরান্তরে পলায়ন করে, তাঁহার প্রজাবর্গ যে, তাঁহার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হৃদয়ে যথার্থ বেদনা পাইবে, ইহা বিচিত্র নহে। যাহারা তাঁহাকে

১১ Calcutta Review (1878) Warren Hastings in Lower Bengal.

প্রকৃত মাতা বলিয়া জানিত, যাঁহার অজস্র করুণাধারা স্তন্যদুগ্ধের ন্যায় ক্ষরিত হইয়া এতদিন তাহাদিগকে স্নিগ্ধ করিয়াছে, আজ কোন্ প্রাণে তাহারা তাহা হইতে বিচ্যুত হইতে ইচ্ছা করিবে? কিন্তু দুঃখের বিষয় এবং তাহাদের দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, দেশের শাসনকর্তাই বলপূর্বক তাহাদিগকে সে সুখভোগ হইতে বঞ্চিত করিতেছেন। সমস্ত প্রজাবর্গ যখন জানিতে পারিল যে, বাস্তবিকই তাহারা রানী ভবানীর হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তখন তাহারা দলবদ্ধ হইয়া, কর-প্রদানে অসম্মতি জানাইতে লাগিল। কান্তবাবু অত্যন্ত বিপদে পতিত হইলেন। তাঁহার পক্ষে সরকারের রাজস্ব দেওয়া ভার হইয়া উঠিল। যদিও অন্যান্য লোকের সহিত তুলনায় তাঁহার রাজস্ব অতি সামান্যমাত্র ছিল, তথাপি কর আদায় না হওয়ায়, তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। প্রজারা মধ্যে মধ্যে যাহা কিছু প্রদান করিত, তাহাতে কোন প্রকারে রাজস্বের সংকুলান হইত। কিন্তু ইহাতে বিশেষ কোন লাভ হইত না। তাঁহাকে অনেক দিন পর্যন্ত এই কষ্ট ভোগ করিতে হয়। অবশেষে তিনি হেস্টিংসসাহেবকে সমস্ত জানাইলে, হেস্টিংস তাঁহার সুবিধা করিয়া দেন। ১৭৮৩ খ্রীঃ অব্দে যখন কান্তবাবু বাহারবন্দ-পরিদর্শনে নিজে গমন করেন, সেই সময়ে (১৭৮৩ খ্রীঃ অব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি) হেস্টিংস রঙ্গপুরের কালেক্টর গুডল্যাডসাহেবকে এই মর্মে লিখিয়া পাঠান, "আমার দেওয়ান কান্তবাবু আমার অনুমতিক্রমে তাঁহার জমিদারী বাহারবন্দ দেখিতে যাইতেছেন। সেখানকার বিদ্রোহী প্রজাদিগকে দমন করিবার জন্য কান্তবাবুকে সাহায্য করিবে এবং এখন, যখন খাজনা আদায়ের সময়, তখন লাগাদ বৈশাখ প্রজাদিগের কোন অভিযোগ আপত্তি শুনিবে না। তাহাতে কান্তের ক্ষতি হইতে পারে, বৈশাখ মাসে শুনিলে তাহার বিশেষ ক্ষতি হইবে না।"[১২]

গুডল্যাডসাহেব হেস্টিংসের আজ্ঞাপ্রতিপালনে ত্রুটি করেন নাই। আজিও তাঁহার নাম রঙ্গপুর অঞ্চলে প্রবাদবাক্যের ন্যায় প্রচলিত রহিয়াছে। দেবীসিংহ এই

১২ "Kanto Babu my *Dewan*, having obtained my permission to visit the pargona of *Baharbund* which is his *zemindari*, the *ryots* of which have proved very refractory in paying their rents, I request that you will afford him your protection and support in collecting the same, enforcing his authority and that of his agent or agents whom he may leave in the management. In the meantime as this is the season of the heavy collections, and as he expects, as the natural consequence of his endeavours, to realise them and reduce the *ryots* to their duty, that they will appeal and complain to you, he requests, and it is reasonable, that you will suspend any inquiry therein until the month *Baisak*, at which time his business will suffer little from it." (Calcutta Review, 1878. W. H. in Lower Bengal.)

গুডল্যাডসাহেবের সহায়ক হইয়া রঙ্গপুর অঞ্চলের হতভাগ্য প্রজাদিগের উপর লাঠিবাজী করিয়াছিলেন। হেস্টিংসের আদেশে ও গুডল্যাডসাহেবের যত্নে, কান্তবাবু বাহারবন্দ হইতে রীতিমত রাজস্ব আদায় করিতে লাগিলেন। রানী ভবানীর নিকট হইতে বাহারবন্দ বিচ্যুত হওয়ায়, দেশের যাবতীয় লোক দুঃখিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ একজন ব্রাহ্মণ-বিধবার সম্পত্তি বলপূর্বক অন্য এক ব্যক্তিকে প্রদান করায়, সকলে মর্মাহত হইয়াছিল। তৎকালে রানী ভবানীর আয় যেরূপ সৎকার্যে ব্যয়িত হইত, সেরূপ আর কখনও হয় নাই বলিয়া লোকের বিশ্বাস। লোকে তাঁহার সম্পত্তিকে সাধারণের সম্পত্তি মনে করিত; কারণ সকলে কোন না কোন প্রকারে তাহা হইতে উপকার প্রাপ্ত হইত। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণকে তিনি যেরূপ প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ব্রহ্মোত্তরপ্রদান ও অন্যান্য অনেক প্রকারে যেরূপ সাহায্য করিয়াছেন, বাঙ্গলাদেশে সেরূপ আর কেহ কখন করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। সেইজন্য হিন্দুমাত্রেই দুঃখিত হইয়াছিলেন। কান্তবাবুর হস্তে উক্ত সম্পত্তি পতিত হওয়ায়, তাঁহারা সেরূপ আশা করেন নাই; বরং বিপরীতই মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে বলিতে হইতেছে যে, মহারানী স্বর্ণময়ী মহোদয়ার ও তাঁহার উপযুক্ত বংশধর মহারাজ মনীন্দ্রচন্দ্রের সময়ে সাধারণে সেই উপকার কিয়ৎ পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বাস্তবিক বাহারবন্দ পরগণা বলপূর্বক কান্তবাবুকে প্রদান করা হেস্টিংস-চরিত্রের একটি প্রধান কলঙ্ক। মহারাজ নন্দকুমার ১৭৭৫ খ্রীঃ অব্দের ৮ই মার্চ হেস্টিংসের নামে যে অভিযোগ-পত্র লিখিয়া কাউন্সিলে উপস্থাপিত করেন, তাহার একস্থলে, তিনি ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। একথা পূর্বেও লিখিত হইয়াছে। তিনি বলেন যে, হেস্টিংস রানী ভবানীর জমিদারীর অন্তর্গত বাহারবন্দ পরগণা প্রভৃতি তাঁহার দেওয়ান কান্তকে প্রদান করিয়াছেন। রানী কোনও দোষ করেন নাই এবং কান্তের সহিত রানীর এমন কোন সম্বন্ধ নাই যে, তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে বাহারবন্দ পাইতে পারেন। গবর্নর এ বিষয়ে কারণ নির্দেশ করিবেন।[১৩] হেস্টিংস এই অভিযোগের স্বকীয় নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য বলিয়াছিলেন যে, বাহারবন্দ রানী ভবানীর জমিদারীর অন্তর্গত ছিল না এবং কোন কালে তাঁহার দখলে ছিল না। বরং তাহা সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত হওয়ায় সরকারের খাসে ছিল। পরিশিষ্টে আমরা

১৩ "The Governor Mr. Hastings has given the pargona Baharband and others in the Zamindari of Rani Bhawani to Canto his own Dewan. The Rani has committed no fault and Canto has no right by inheritance or any other title to these pargonas. The reasons of this gift remain with the Governor to explain." (Selections from State Papers, Vol, II. also Minutes of the Evidence taken at Hastings Trial, p. 1002,)

বাহারবন্দের এক বিবরণ দিয়াছি। তাহাতে সকলে দেখিতে পাইবেন যে, বাহারবন্দ অনেক সময়ে জায়গীর বলিয়া অভিহিত হইলেও, তাহা রানী ভবানীরই জমিদারী ছিল। এ কথা গুডল্যাডসাহেবের লিখিত বাহারবন্দের বিবরণ হইতে অবগত হওয়া যায়। বাহারবন্দ রানী ভবানীর জমিদারীর অন্তর্গত বা তাঁহার দখলে না থাকিলেও, যখন সেরেস্তায় তিনি জমিদার বলিয়া বরাবর উল্লিখিত হইয়া আসিতেছেন, তখন তাঁহার সহিত বন্দোবস্ত না করিয়া কান্তবাবুর পুত্র লোকনাথের সহিত বন্দোবস্ত করা কেন হইল, হেস্টিংসসাহেব ইহার উত্তর দিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন যে, ইহাতে কান্তের প্রতি আমি কোন অনুগ্রহ দেখাই নাই।[১৪] ইহাও যদি অনুগ্রহ না হয়, তবে অনুগ্রহ যে কিরূপ, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

আমরা বাহারবন্দপ্রদানবিষয়ে হেস্টিংসকে বারংবার দোষ প্রদান করিয়াছি; কিন্তু কান্তবাবুও এ বিষয়ে দোষী কিনা, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখি নাই। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, হেস্টিংস যখন তাঁহাকে উক্ত সম্পত্তি প্রদান করিয়াছেন, তখন সে দোষ হেস্টিংসেরই হইবে; কান্তবাবু তজ্জন্য দোষী হইবেন কেন? কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, কান্তবাবুরও কি কোন দোষ দেখা যায় না? কেহ যদি বলপূর্বক একজনের সম্পত্তি অপহরণ করিয়া, আর এক জনকে প্রদান করে এবং সে ব্যক্তি যদি অম্লানবদনে তাহা গ্রহণ করে, তাহাতে কি তাহার কিছুমাত্র প্রত্যবায় নাই? কান্তবাবু জানিয়া শুনিয়া বাহারবন্দ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং সে বিষয়ে যে, তাঁহার কিছু দোষ হয় নাই, ইহা কেমন করিয়া স্বীকার করিব? বিশেষতঃ বাহারবন্দ ব্রাহ্মণ-বিধবার সম্পত্তি। যে ব্রাহ্মণের একটি কাণাকড়ি অপহরণ করিলে, ধর্মশাস্ত্রানুসারে অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হয়, সেই ব্রাহ্মণের বিধবা-পত্নীর সম্পত্তি অপহরণে যে বিশেষ প্রত্যবায় আছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? বিশেষতঃ যাঁহার অর্থ ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রপ্রতিপালনে ব্যয়িত হইত, তাঁহার সম্পত্তি নিজ সুখভোগের জন্য গ্রহণ করায় যে পাপ আছে, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেই হইবে। কান্তবাবু ব্রাহ্মণ-বিধবার সম্পত্তি না লইয়া, যদি অন্য কোন জাতির সম্পত্তি লইতেন, তাহা হইলে হিন্দুশাস্ত্রানুসারে তিনি তত প্রত্যবায়ের ভাগী হইতেন না। ইচ্ছা করিলে তিনি যে-কোন জমিদারী লইতে পারিতেন। কারণ সে সময়ে সমস্তই

১৪ "The reasons which prevailed on the late Board to grant the pergunnah of Baharband to Cantoo Baboo, my servant, will appear in the consultations of the 12th and 19th of July, 1774, in the Revenue Department. To those I refer, you will find that this is not a part of the zamindary of Ranny Bowanny, for ever in her possession, but a mahal or district depending immediately of Government and lying on the frontier of the province; that no kind of indulgence shewn to my servant in this grant." (State Papers, Vol. II.)

তাঁহার পক্ষে অবাধ ছিল। ব্রাহ্মণ-বিধবার অপহৃত সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া, তিনি যে হিন্দুধর্মানুসারে গর্হিত কার্য করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কান্তবাবুর স্বধর্মের প্রতি যথেষ্ট আস্থা ছিল; সেইজন্য আমরা এত কথা বলিলাম। স্বধর্মপরায়ণ শূদ্রকে ব্রাহ্মণের সম্পত্তি গ্রহণ করা ভাল দেখায় না বলিয়া, আমরা তাঁহাকে দোষ দিতেছি। ব্রাহ্মণের সম্পত্তি না লইয়া, অন্য অনেক উপায়ে তিনি অর্থ লাভ করিতে পারিতেন। যাহা হউক, এবিষয়ে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। কাউন্সিলের অন্যান্য সভ্যেরা লোকনাথ নন্দীর হস্ত হইতে বাহারবন্দ বিচ্যুত করার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা কার্যে পরিণত হয় নাই।

বাহারবন্দ ব্যতীত হেস্টিংস কান্তবাবুকে আরও অনেক জমিদারী ও কোন কোন লবণের মহাল ইজারা করিয়া দেন। এই সমস্ত জমিদারীর মধ্যে বিষ্ণুপুর ও পাঁচেট বা পঞ্চকূটের ইজারার উল্লেখ দেখা যায়। ১৭৭২ ও ৭৩ সালের জন্য কান্তবাবু ইজারা লন। কিন্তু উক্ত সময়ে কোম্পানির ২,১৯,৮০৬ টাকা রাজস্ব বাকী পড়ে।[১৫] পরে তিনি পঞ্চকূটের মধ্যে ২৭টি মৌজা ক্রয় করেন এবং তাঁহার পুত্র লোকনাথ নন্দী আরও ২৭টি মৌজা নীলামে ক্রয় করিয়া লন। উক্ত জমিদারী সাতাইশ-সতর বা চটি-বালিয়াপুর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। লবণের মহালের মধ্যে তৎকালে হিজলীর মহাল লাভকর ছিল। এইরূপ শুনা যায় যে, কান্তবাবু বেনামীতে সেই মহালের ইজারা লইয়াছিলেন। কমলউদ্দীন হিজলীর ইজারদার ছিল; সে কান্তবাবুর বেনামীতেই হিজলীর ইজারা গ্রহণ করে। মহারাজ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে যে-ষড়যন্ত্র হয়, তন্মধ্যে কান্তবাবু, গ্রেহামসাহেবের মুন্সী সদরুদ্দীন ও কমলউদ্দীন এই তিন জনই প্রধান।[১৬] ইহা কান্তবাবুর চরিত্রের একটি ভয়াবহ দোষ বলিতে হইবে। যে অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং যাহাতে একটি ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড ঘটিয়াছিল, এরূপ ষড়যন্ত্রে যদি কান্তবাবু স্বতঃ বা পরতঃ কোন প্রকারে বাস্তবিক লিপ্ত থাকেন, তাহা হইলে তিনি যে ভয়ানক পাপ করিয়াছেন, ইহা বলিতেই হইবে। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, যে ব্রহ্মহত্যা করে, সে যেরূপ মহাপাপী, যে তাহার সংসর্গে থাকে, সেও তদ্রূপ মহাপাপী। সুতরাং কান্তবাবু যে মহাপাতকের অংশভাগী হইয়াছিলেন, ইহা অবশ্য স্বীকার্য। ইচ্ছাপূর্বকই হউক, অথবা স্বীয় প্রভু হেস্টিংসসাহেবের অনুরোধেই হউক, যদি তিনি মহারাজ নন্দকুমারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের একজন নায়ক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে যে, ধর্ম ও দেশের চক্ষে তিনি নিন্দনীয় হইয়াছেন, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

১৫ Selections from State Papers, Vol. II, p. 503

১৬ ক্রেভারিং সাহেব ঐ বিষয়ে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন :—

"I am informed that this same Banyan is the secret mover of the whole conspiracy against Nundcomar jointly with Mr. Graham's *moonshy* and that infamous creature Camaul-ud-deen Cawn." (Selections from State Papers, Vol. II, p. 368.)

হিজলী মহালের বেনামী লইয়া নানারূপ তর্কবিতর্ক আছে। কাউন্সিলের সভ্যেরা কমলউদ্দীনকে কান্তবাবুর বেনামদার মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু হেস্টিংস তাহা স্বীকার করিতেন না।[১৭] পরবর্তী ইংরেজ লেখকগণও এ বিষয়ের বর্ণন করিয়াছেন। মুর্শিদাবাদের ভূতপূর্ব জজ বেভারিজসাহেব প্রথমতঃ কলিকাতা রিভিউ নামক পত্রিকায় "নিম্নবঙ্গে হেস্টিংস" এই প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে, প্রকাশ্যভাবে কমলউদ্দীন হিজলীর নিমক মহলের ইজারদার ছিল বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কান্তবাবু ইহার মালিক ছিলেন।[১৮] বিলাতের জজ সার জেমস স্টিফেনসাহেব স্ব-প্রণীত "নন্দকুমারের আখ্যায়িকা" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, বেভারিজসাহেব হিজলী মহালের বেনামীসম্বন্ধে যাহা কহেন, তাহা যদি বাস্তবিক সত্য হয়, তাহা হইলে যে, ইহা একটি গুরুতর বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বেভারিজসাহেব এ বিষয়ের কোন প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই এবং নন্দকুমারের বিচারে কমলউদ্দীনের সাক্ষ্যে ইহার কোনও প্রকার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না।[১৯] বেভারিজসাহেব স্বীয় "নন্দকুমারের বিচার" গ্রন্থে এ বিষয়ে উত্তর প্রদান করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি এ বিষয়ে যে সমস্ত প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহার যথাযথ মর্ম প্রদান করিতেছি, সাধারণে তাহা হইতে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বেভারিজসাহেব স্বীয় গ্রন্থের পরিশিষ্টে এই বিষয় প্রমাণ করিবার জন্য একখানি পত্র ও তাহার উত্তর প্রদান করিয়াছেন।

১৭ 'I have produced clear proofs on the consultation that my *banyan* had no connection with Camul-o-deen Cawn but regarded him as the instrument of injuries sustained by him, in the order passed by the Board for dispossessing him of his teeka collaries (or salt works manufactured by hired workmen) and giving them to Camul-o-deen, and in his subsequent disputes between them, concerning the separation of their propetry in those works." (8th March, 1775.)

অন্যত্র—

"If further proofs are wanting, many instances of my impartiality and some even of rigour shewn him by the Board, with my concurrence, particularly in depriving of his Teeka salt-works, in favour of his competitor Comaul-ud-deen an act rather of necessity than strict justice." (22nd April, 75) State Papers, Vol. II.

কিন্তু হিজলী মহাল ও কমলউদ্দীনের সহিত কান্তবাবুর কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহা বেভারিজসাহেব সুন্দররূপে প্রমাণ করিয়াছেন। উপরে সকলে তাঁহার প্রমাণগুলি দেখিতে পাইবেন।

১৮ Calcutta Review (78-79), Hastings in Lower Bengal.

১৯ Story of Nuncomar, Vol. I, p. 79.

কমলউদ্দীন গঙ্গাগোবিন্দসিংহ প্রভৃতি কয়েকজনের নামে কাউন্সিলে অভিযোগ করিবার জন্য মহারাজ নন্দকুমারকে যে কয়েকখানি দরখাস্ত পেশ করিতে দেয়, বেভারিজসাহেব বলেন যে, তাহার একখানিতে এইরূপ লেখা আছে—"বিলায়তি ১১৮১ সালের বৈশাখ মাসে রামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, লোকনাথনন্দীর জন্য আমার নিকট হইতে হিজলীর দরইজারা লয় এবং আর্চডেকিনসাহেব তাহার জামিন হন।" ইহা হইতে স্পষ্ট অনুমান করা যাইতে পারে যে, কান্তবাবুর সহিত হিজলীর মহালের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। কান্তবাবু সমস্ত জমিদারী ও নিমক-মহাল স্বীয় পুত্র লোকনাথের নামে লইতেন; বাহারবন্দ তাহার প্রমাণ। লোকনাথ সে সময়ে ১১।১২ বৎসরের বালক হইলেও, হেস্টিংস-কর্তৃক অর্থশালী ও বিশ্বস্ত বলিয়া কথিত হইতেন। রাজস্বসংক্রান্ত কাগজপত্রে লোকনাথনন্দীর লবণের কারবারসম্বন্ধে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। হেস্টিংস কাউন্সিলে বলিয়াছিলেন যে, কমলউদ্দীনের পূর্বে এই সমস্ত লবণের মহাল কান্তেরই ইজারা ছিল। যদিও তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, কমল ইজারা লওয়ায় কান্তের কোনও লাভ হয় নাই, কিন্তু কমলের দরখাস্ত হইতে জানা যায় যে, কান্তবাবু রামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে হিজলীর দরইজারা লন এবং বারওয়েল প্রভৃতির পত্রে প্রকাশ যে, কমলের দরইজারদারগণই মহাল হইতে প্রকৃত লাভ করিতেন। ক্লেভারিংসাহেবও বলেন যে, কমল ও কান্ত দুই জনেই হিজলীর অংশীদার ছিলেন।[২০] বেভারিজসাহেব এ বিষয়ের অনেক প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, বাহুল্যভয়ে আমরা তাহার উল্লেখ করিলাম না। এ সম্বন্ধে তিনি একখানি পত্র ও তাহার উত্তর তাঁহার গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রদান করিয়াছেন। নিম্নে তাহার মর্ম প্রদত্ত হইল।

কলিকাতার রাজস্ব-সমিতির সভ্যেরা ১৭৭৪ খ্রীঃ অব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি গবর্নর জেনারেল ও কাউন্সিলের সভ্যদিগকে এইরূপ লিখিয়া পাঠান যে, আপনাদিগের ইচ্ছানুসারে কান্তবাবু ও অন্যান্য ব্যবসায়ীদিগকে, যাহাদের হিজলী প্রভৃতি স্থানে লবণের ঠিকা বন্দোবস্ত আছে, জানান হয় যে, কোম্পানীর নামে ১০০ মণে ৮৬ সিক্কা টাকা লইয়া কলিকাতায় লবণ পঁহুছিয়া দিতে হইবে। তাহাতে তাহারা এইরূপ আপত্তি করে যে, ইহাতে তাহাদের খরচ উঠিবে না এবং কান্তবাবুর এইরূপ অনুরোধ যে, কোম্পানীকে লবণ দেওয়ার পরিবর্তে ১০০ মণে ২০ টাকা লাভ দিতে ইচ্ছা করেন। ইজারদারের ইচ্ছা যে, সমস্ত ঠিকা বন্দোবস্ত তাহার অধীন হইলে, সে কোম্পানীর যথেষ্ট সুবিধা করিতে পারে। কান্তবাবুর গত বৎসরের লবণের প্রস্তাবানুসারে আমরা বিশেষ অনুসন্ধানে অবগত হইয়াছি যে, কোম্পানীর ৫০ টাকা সমেত তাঁহার ১৫০ টাকা ব্যয় পড়িবে। তাঁহার অগ্রিম টাকা দেওয়ার পর হইতে অনেক সময় অতিবাহিত হইয়াছে। এক্ষণে সমগ্র ঠিকা বন্দোবস্ত ইজারদারের অধীন হইলে, তাঁহাকে ঋণগ্রস্ত হইতে হইবে ইত্যাদি। গবর্নর জেনারেল ৮ই তাহার এইরূপ উত্তর

২০ Trial of Maharaja Nandkumar, pp. 234-38.

পাঠান যে, আমরা কান্তবাবুর গত বৎসরের প্রস্তাবে সম্মত আছি। আপনারা তাঁহার সহিত ১০০ মণে ৫০ টাকা দিবার বন্দোবস্ত করিবেন; ও শুল্ক দিবারও বন্দোবস্ত করিবেন ইত্যাদি।[২১]

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, কান্তবাবুর সহিত হিজলীর নিমক মহালের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল এবং কান্তবাবু ও অন্যান্য ব্যবসায়ীর অসুবিধা বিবেচনায় রাজস্বকমিটির সভ্যেরা কাউন্সিলের নিকট আবেদন করিতেছেন; এরূপ আবেদন আমরা কিন্তু অন্য কোন স্থানে দেখিতে পাই না। হেস্টিংসসাহেবের প্রিয়পাত্র কান্তবাবুর সহিত ইহার বিশেষ সম্বন্ধ না থাকিলে, কদাচ তাঁহারা এরূপ আবেদন করিতেন না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। অন্যান্য ব্যবসায়ীর কথা যে নামমাত্র তাহা সকলে সহজে উপলব্ধি করিতে পারেন। কাউন্সিল হইতেও তাঁহার সুবিধার জন্য হুকুম প্রদত্ত হইল। কান্তবাবুর প্রায় জমিদারী ও মহাল লোকনাথের নামে লওয়া হইত, কিন্তু কাউন্সিলে ও রাজস্বকমিটি প্রভৃতি স্থানে কর্ত্তৃপক্ষগণ এরূপ সাহস অবলম্বন করিতেন যে, কান্তবাবুর নিজ নামে সমস্ত কথাবার্তা চালাইতে তাঁহারা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। উপরোক্ত পত্র হইতে ইহা বেশ বুঝা যায়। যদিও কোম্পানীর নিয়মানুসারে কোন সরকারী কর্মচারীর বেনিয়ান বা পেস্কারাদি কোন জমিদারী বা ফারম ইজারা লইতে পারিত না, তথাপি লোকনাথের নামে কান্তবাবুকে জমিদারী মহালাদি প্রদান করিয়া, তাঁহারা অনেক সময়ে প্রকাশ্যভাবে কান্তবাবুর নাম করিয়া তর্কবিতর্ক করিয়াছেন। তাঁহারা যে অনেক সময়ে ডিরেক্টর প্রভৃতির আদেশ অবহেলা করিতেন, ইহা হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়। উপরোক্ত পত্র ও তাহার উত্তর ১৭৭৪ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে লিখিত হয়। কমলউদ্দীন ১৭৭২ খ্রীঃ অব্দে হিজলীর ইজারাদার নিযুক্ত হয়। পূর্বে একস্থানে লিখিত হইয়াছে যে, হেস্টিংস দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, কমলউদ্দীন হিজলীর ইজারা লওয়ায় কান্তের লোকসান হইতেছে। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, কমলউদ্দীন ইজারাদার হইবার পূর্বে ও পরে কান্তের সহিত হিজলীর লবণমহালের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল, এবং তাঁহার লাভের যাহাতে ক্ষতি না হয়, তদ্বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষগণের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। কমলউদ্দীনও প্রকাশ করিয়াছে, লোকনাথ রামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে হিজলীর দরইজারা লইয়াছেন। ইত্যাদি কারণে কমলউদ্দীন স্পষ্টতঃ কান্তবাবুর বেনামদার না হইলেও, কমলের সহিত তাঁহার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং স্টিফেনসাহেব বেভারিজসাহেবকে প্রমাণাভাবে যে দোষ দিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, তৎকালে এ দেশে যে-কোন লাভকর জমিদারী বা মহাল ছিল, কান্তবাবুর সহিত তাহাদের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল। হেস্টিংসের যত্নে চঞ্চলা লক্ষ্মী অনেক লোককে পরিত্যাগ করিয়া, কান্তবাবুকে আশ্রয় করিতে বাধ্য হন।

২১ Trial of Maharaja Nondkumar, Appendix, pp. 402-403.

পরিবর্তনশীলা স্রোতস্বিনীর ন্যায় ভাগ্যলক্ষ্মীও বৈচিত্র্যময়ী। নদীর যে তট এক্ষণে নানাবিধ শস্যরাশিতে পরিপূর্ণ হইয়া, শ্যামলতার পবিত্র রাজ্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে, পরক্ষণে হয়ত মহাপ্লাবনে বিধৌত হইয়া, তাহা নিরবচ্ছিন্ন সিকতাস্তূপে পরিণত হইবে। যে স্থান গগনস্পর্শী সৌধমালায় বিভূষিত হইয়া, প্রতিবিম্বচ্ছটায় নদীগর্ভে আপনাকে পুনঃ সৃষ্টি করিতেছে, দুই দিন পরে, হয়ত বাস্তবিকই নদীগর্ভে তাহার স্থান হইবে। আবার যে স্থান এক্ষণে সলিলমধ্যে অবস্থিতি করিয়া, তাহার প্রত্যেক পরমাণুর সহিত নিজের পরমাণুগুলিকে পলে পলে মিশাইয়া দিতেছে, কিছুকাল পরে, হয়ত, সে মস্তক উত্তোলন করিয়া, ক্রমে ক্রমে শ্যামল বৃক্ষরাজিতে অথবা নবীন সৌধমালায় পরিশোভিত হইয়া, হাস্য করিতে থাকিবে। সেইরূপ যে ভাগ্যশীল ব্যক্তি বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া, সুবাসিত কক্ষে অর্ধনিমীলিত অবস্থায় কত সুখস্বপ্ন দেখিতেছেন, দুই দিন পরে, হয়ত, তিনিও পথের ভিখারী হইয়া দাঁড়াইবেন। আর যে দরিদ্র পর্ণকুটীরে বসিয়া, নিরাশার বিভীষিকাময় চিত্রে শিহরিয়া উঠিতেছে ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপায় কিছুকাল পরে দেখিবে, সে লক্ষাধিপতি হইয়া আনন্দহিল্লোলে ভাসিয়া চলিয়াছে। লীলাময়ী কমলার কৃপায় কান্তবাবু সামান্য অবস্থা হইতে লক্ষপতি হইতে লাগিলেন। যে জমিদারী অথবা মহাল লইতে তাঁহার ইচ্ছা হইতে লাগিল, তৎক্ষণাৎ তাহাই তাঁহার করায়ত্ত হইতে লাগিল। তাঁহার লালসা ব্রহ্মাণ্ডগ্রাসিনী না হইলেও, উত্তরোত্তর যে প্রসারিত হইতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। যেরূপে তিনি স্বীয় বাসনা পূর্ণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা শেষ করিয়া উঠিতে পারিলে, বহু লক্ষাধীশ্বর হইতে পারিতেন। বঙ্গের অনেক লাভকর জমিদারী যে ভিন্ন ভিন্ন হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়া, তাঁহার করতলগত হইত, সেই সময়ে তাঁহার জমিদারীগ্রহণের কথা শুনিলে ইহা বেশ বুঝা যায়।

১৭৭৩ খ্রীঃ অব্দে কান্তবাবু প্রকাশ্য নীলামে ১৯টি পরগণার জমিদারী ৫ বৎসর মেয়াদে বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। ১৭৭৩ খ্রীঃ অব্দের জন্য ১৩,৩৩,৬৬৪; ১৭৭৪ খ্রীঃ অব্দে ১৩,৪৬,১৫২; ১৭৭৫ খ্রীঃ অব্দে ১৩,৬৭,৭৯৬; ১৭৭৬ খ্রীঃ অব্দে ১৩,৮৮,৩৪৬ এবং ১৭৭৭ খ্রীঃ অব্দে ১৪,১১,৮৮৫ টাকায় তাঁহার সহিত পরগণাগুলির বন্দোবস্ত হয়। উক্ত ১৯ পরগণার মধ্যে দ্বিতীয় বর্ষের শেষে তিনি তিনটি পরগণা ইস্তাফা দিয়াছিলেন।[২২] এতদ্ভিন্ন তিনি কোন কোন জমিদারী ক্রয়ও করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে পঞ্চকূট রাজ্যের সাতাইশ-সতর বা চটিবালিয়াপুর জমিদারী সর্বপ্রধান। কয়লার খনিতে পরিপূর্ণ থাকায়, তাহা এক্ষণে অত্যন্ত লাভকর হইয়া উঠিয়াছে। হেস্টিংসসাহেবের প্রিয় বেনিয়ান কান্তবাবুর রাজস্ববন্দোবস্ত তৎকালে যে, অতি সুবিধাজনক ছিল, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। হেস্টিংসের প্রিয়পাত্রগণকে যেরূপ

---

২২ Mill's History of India, Voll. III, p. 647. Also Beveridge's History of India, Vol. II.

রাজস্ব প্রদান করিতে হইত, তাঁহারা তদপেক্ষা অনেক অধিক গুণ লাভ করিতেন ; সুতরাং ঊনবিংশ পরগণা হইতে কান্তবাবুর কিরূপ আয় হইত, তাহা সকলে অনুমান করিতে পারেন। যদি বাস্তবিক এই সমস্ত জমিদারী কান্তবাবুর কেবল নিজেরই হইতে এবং তিনি স্বীয় লালসাকে ক্রমে ক্রমে প্রসারিত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে যে, কালে অর্ধবঙ্গের একাধিপত্য লাভ করিতে সমর্থ হইতেন, তাহা কিয়ৎপরিমাণে বিশ্বাস করা যাইতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত জমিদারীগ্রহণের মধ্যে কিছু গুপ্ত রহস্য ছিল বলিয়া বোধ হয় এবং বাধ্য হইয়া পরিণামে তাঁহার এ লালসা দিন দিন সঙ্কুচিত করিতেও হইয়াছিল।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কাউন্সিলের তিন জন সদস্য হেস্টিংসসাহেবের বিপক্ষ ছিলেন। তাঁহারা প্রথমতঃ এ বিষয়ে যথাসাধ্য বাধা প্রদান করিতে লাগিলেন। যখন হেস্টিংস সমস্ত বিধিব্যবস্থা পদদলিত করিয়া, যথেচ্ছাচারিতা অবলম্বনপূর্বক নিজের প্রিয়পাত্রগণের উদরপূরণের জন্য অনেকের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতে আরম্ভ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর যথেষ্ট ক্ষতি করিতে লাগিলেন, তখন সদস্যগণ ডিরেক্টারদিগকে এ বিষয়ের আনুপূর্বিক বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলেন। অল্পদিনের মধ্যে হেস্টিংসের অত্যাচার, অবিচার ও কোম্পানীর ক্ষতিকর কার্যের কথা ইংলণ্ডে আন্দোলিত হইতে লাগিল। সকলে অবগত হইলেন যে, হেস্টিংস আপনার কতিপয় প্রিয়পাত্রের জন্য সমস্ত বিধিব্যবস্থা লঙ্ঘন করিয়াছেন এবং স্বয়ং সর্বেসর্বা হইয়া, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দেশের শাসনকর্তার এরূপ যথেচ্ছাচারিতা সর্বতোভাবে দমন করা আবশ্যক ; তজ্জন্য তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা হইতে লাগিল।

হেস্টিংসের এই সমস্ত অপকার্যের কথা ডিরেক্টারগণের কর্ণগোচর হইলে, তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, হেস্টিংসের যথেচ্ছচারিতায় বাস্তবিকই কোম্পানীর যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে। তখন তাঁহারা হেস্টিংসসাহেবের কৈফিয়ৎ চাহিয়া পাঠান। হেস্টিংস ১৭৭৫ খ্রীঃ অব্দের মার্চ মাসে তাঁহাদিগকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, কান্তবাবু অনেক জমিদারী তাঁহার অজ্ঞাতসারে এবং প্রায় সমস্তই তাঁহার উপদেশের বিরুদ্ধে লইয়াছেন ; ইহাতে কোন প্রকার জুলুম বা কর্তৃত্ব প্রকাশ করা, তাঁহার অধিকারবিরুদ্ধ। এ দেশের অন্যান্য লোকেরা যে স্বাধীনতাটুকু ভোগ করিতেছে, কান্তবাবু তাঁহার কর্মচারী বলিয়া হেস্টিংস তাঁহাকে তাহা হইতে বিরত করিতে পারেন না। কান্তবাবু যে সকল জমিদারী ইস্তাফা দিয়াছেন, তাহা হেস্টিংসের অনুমতিক্রমেই। কারণ সে সকলের পরিচালনা করিতে হয়ত, কান্তবাবুকে ক্ষমতার অতিরিক্ত কার্য করিতে হইবে এবং ভবিষ্যতে তজ্জন্য যে সকল গোলযোগ হইবে, তৎসমুদায়ের বিচার তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়া তিনি ভালবাসেন না।[২৩] হেস্টিংসসাহেবের এই সকল কথা যে

২৩ "Many of his Fans were taken without my knowledge, and almost all against my advice. I had no right to use compulsion or

সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য, তাহা সকলে অনুমান করিতে পারেন। তাঁহার উপরোক্ত কথার মধ্যে অনেকগুলি পরস্পরের বিরোধী। তাঁহার অজ্ঞাতে ও উপদেশের বিরুদ্ধে কান্তবাবু যে, এই সকল জমিদারী লইয়াছিলেন, ইহা কে বিশ্বাস করিতে পারে? অথচ তজ্জন্য তিনি কান্তবাবুকে কোন কথাই বলেন নাই।

ডিরেক্টারেরা ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া এই মর্মে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট রাজস্বসংক্রান্ত বিধির বিরুদ্ধে কান্তবাবু প্রভৃতিকে জমিদারী বা জমিদারীর জামীন হইতে অনুমতিদানে এবং পরে তাঁহাদিগকে জামীনতি হইতে নিষ্কৃতি দিয়া, কোম্পানীর যে সকল ক্ষতি করিয়াছেন, তাহা অতীব গর্হিত। সেই সমস্ত ক্ষতির বিবরণ প্রস্তুত ও যাহাতে আবার সেই সকল জামীনতির উদ্ধার হয়, তাহার চেষ্টা করা হউক।[২৪]

authority, nor could I with justice exclude him, because he was my servant, from a liberty allowed to all persons in the country—The Farms, which he quitted, he quitted by my advice, because I thought, that he might engage himself beyond his abilities and be involved in disputes, which I did not choose to have come before me as judge of them." (Selections from State Papers, Forrest, Vol. II, p. 352.)

২৪ Extract of Company's General Letter to Bengal , dated the 5th April, 1776.

For suffering his Banyan Canto Baboo to hold Farms contrary to Regulation.

Para 27. Having investigated the charges exhibited against some of the members of our late administration, we have come to the following resolutions—

"Resolved that it appears that the conduct of late president and council of Fort William, in Bengal, in suffering Canto Baboo the present Governor-General's banyan to hold Farms in different parganas to a large amount, or to be security for such Farms, contrary to the tenor and spirit, of the 17th regulation of the committee of Revenue at Fort William, of the 14th May, 1772, and afterwards relinquishing that security, without satisfaction made to the Company that the Governor-General and Council be directed to prepare an exact statement of such losses or damages as the Company have sustained by their servants permitting Canto Baboo and other persons, to withdraw the security they have given, and take the most effectual measure of the recovery of the same. * * * (An Authentic copy of the Correspondence in India between the Country Powers and Hon. E. I. Co.'s servants, pp. 3-4.)

কাউন্সিলের সদস্যগণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পূর্ব শাসন-বিবরণী অনুসন্ধান করিয়া, ডিরেক্টারদিগকে সমস্ত অবগত করাইয়াছিলেন। তাঁহারা আপনাদিগের মন্তব্যের একস্থলে এইরূপ প্রকাশ করেন যে, গত রাজস্বসংক্রান্ত বন্দোবস্তে এমন কোন প্রকার চুরি, ডাকাইতি দেখা যায় না, যাহা হইতে মাননীয় গবর্নর জেনারেল বাহাদুর বিরত থাকা সঙ্গত বিবেচনা করিয়াছিলেন।[২৫] হেস্টিংসসাহেবের প্রতি এইরূপ তিরস্কার-বর্ষণ হওয়ায়, তিনি স্বীয় প্রিয়পাত্রদিগের আর সেরূপ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। সুতরাং কান্তবাবুর আশা দিগন্তপ্রসারিণী হইতে পারিল না। লোকনাথের নামে যে সকল বেনামী জমিদারী ও মহলাদি ছিল, তাহাতেই তাঁহার আয় আবদ্ধ হইয়া থাকিল, উত্তরোত্তর আর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারিল না। ক্লেভারিং, মন্‌সন ও ফ্রান্সিস সদস্যত্রয় হেস্টিংসের ঘোরতর শত্রুতাসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া, তাঁহাকে যে পরিমাণে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কান্তবাবু প্রভৃতিরও সেই পরিমাণে ক্ষতি হইয়াছে। যদিও হেস্টিংস অনেক সময়ে তাঁহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া, নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেন, কিন্তু পরিণামে কর্তৃপক্ষগণের নিকট তিরস্কৃত হওয়ায়, তাঁহাকে অনেক পরিমাণে শান্তভাব অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। সুতরাং কান্তবাবুরও লাভের ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল ; নতুবা তিনি বহুলক্ষাধীশ্বর হইয়া বঙ্গদেশে সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী বলিয়া পরিচিত হইতে পারিতেন।

অবিচারপূর্বক কান্তবাবুকে জমিদারী দেওয়ায়, হেস্টিংসসাহেব কেবল যে, ডিরেক্টারদিগের নিকট হইতে তিরস্কার লাভ করিয়া নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন, এমন নহে। ভারতবর্ষপরিত্যাগের পর যখন ওয়েস্টমিনিস্টার-গৃহে ব্রিটিশরাজ্যের প্রতিনিধিগণের সমক্ষে তাঁহার সপ্তবর্ষব্যাপী বিচার হয়, তখনও তাঁহাকে ইহার জন্য অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। মহামতি বার্ক, শেরিডান প্রভৃতির অনলবর্ষিণী বক্তৃতায়, যখন তাঁহার অত্যাচারকাহিনী শ্রোতৃবর্গকে স্তম্ভিত করিয়াছিল, সেই সময়ে এই অবিচারের কথাও ইংলণ্ডের জাতীয় দরবারে উত্থিত হয়। তাঁহারা অযোধ্যার বেগম ও চেৎসিংহের প্রতি পাশব অত্যাচারের বিবরণের সহিত বঙ্গদেশের হতভাগ্য জমিদারদিগের প্রতি অবিচারের কথাও উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই এবং তৎসঙ্গে হেস্টিংসসাহেবের প্রিয় কান্তের উদরপূরণের কথাটিও উল্লিখিত হইয়াছিল। হেস্টিংসসাহেবের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে পঞ্চদশ অভিযোগে কান্তবাবুকে অন্যায়রূপে জমিদারী দেওয়ার কথা দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত অভিযোগের মর্ম এই ;—পূর্বকথিত গবর্নর জেনেরাল তাঁহার নিজ বেনিয়ান

২৫ "In the late proceedings of the Revenue Board there is no species of speculation from which the honourable Governor-General has thought it right to abstain." (Beveridge's History of India, Vol. II, p. 385.)

বা প্রধান কালা কর্মচারী কান্তবাবুকে বৎসরে ১৩ লক্ষ টাকায় ভিন্ন ভিন্ন পরগণার জমিদারী বা জমিদারীর জামীন হইতে দিয়াছেন এবং দুই বৎসর পরে তাহাদের মধ্যে দুইটি পরগণা অলাভকর বলিয়া পরিত্যাগ করিতে অনুমতি দিয়াছেন।[২৬] উক্ত অভিযোগের একস্থলে এইরূপ লিখিত আছে যে, ওয়ারেন হেস্টিংস ডিরেক্টারদিগের আদেশের বিরুদ্ধে নিজের ইচ্ছানুযায়ী কোন কোন জমিদারকে চিরস্থায়ীরূপে জমিদারীর বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন এবং বিশেষতঃ কান্তবাবুকে অতি অল্প বন্দোবস্তে বাহারবন্দ প্রদান করিয়াছেন।[২৭]

সর্বাপেক্ষা মহামতি বার্ক এই বিষয় লইয়া অধিক আন্দোলন করিয়াছিলেন। বিচার-সমিতির পঞ্চম অধিবেশনে ১৭৮৮ খ্রীঃ অব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারি তিনি বঙ্গদেশের জমিদারদিগের উপর হেস্টিংসসাহেবের অবৈধ অত্যাচারের কথা উল্লেখ করেন এবং তাহাতে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, হেস্টিংসসাহেব প্রকাশ্যভাবে জমিদারদিগের জমিদারী নীলাম করিয়া, কলিকাতার বেনিয়ানদিগকে তাহা প্রদান করিতেন। সর্বাপেক্ষা কান্তবাবুই অধিক পরিমাণে এই সুবিধা ভোগ করেন। যদিও কোম্পানীর কর্মচারিগণের বেনিয়ান প্রভৃতি কোনরূপ জমিদারী বা মহালের ইজারা লইতে পাইত না এবং কাহাকেও বার্ষিক ১ লক্ষ টাকার অধিক রাজস্বে বন্দোবস্ত করার নিয়ম ছিল

২৬ "The said Governor-General did permit and suffer his own Banyan or principal black steward, named *Kato Babu* to hold farms in different Pargonas, or to be security for farms to the amount of thirteen *lacs* of Rupees per annum ; and that after enjoying the whole of those farms, for two years, he was permitted by said Warren Hastings to relinquish two of them which were unproductive." (Charge XV, Pt. I, Articles of charge against Warren Hastings, formed by the Impeachment Committee)", Burke's Works (Bohn), Vol. IV, p. 415.

২৭ "The said Warren Hastings did not hold himself bound or restrained by the orders of the Court of Directors, but acted upon his discretion ; and that he has for partial and interested purposes, exercised that discretion in particular instances, against his own general settlement for one year by granting perpetual leases of farms and zemindaries to persons specially favoured by him ; and particularly by granting a perpetual lease of zemindary of Baharband to his servent Canto Baboo on very low terms." Charge XV, Pt. I, Burks (Bohn), Vol. IV, p. 423.

না, তথাপি, তিনি সেই সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া নিজ বেনিয়ানকে বার্ষিক ১৩ লক্ষ টাকার রাজস্ব বন্দোবস্তে নানাস্থানের জমিদারী প্রদান করিয়াছেন।[২৮]

বিচার-সমিতির ষষ্ঠ দিবসের অধিবেশনে ১৭৮৮ খ্রীঃ অব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারি মহামনস্বী বার্ক, বাহারবন্দের কথা উল্লেখ করিয়া, বলিয়াছিলেন যে, হেস্টিংসসাহেব অন্যায়পূর্বক বাঙ্গলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ বংশের মাননীয়া প্রবীণা রানী ভবানীর নিকট হইতে বাহারবন্দ লইয়া কান্তবাবুর পুত্র লোকনাথকে প্রদান করেন। হেস্টিংস ইহার এইরূপ কারণ নির্দেশ করেন যে, রানী উক্ত জমিদারী পরিচালনে অসমর্থা। মহামতি বার্ক কোন সাক্ষীর প্রমুখাৎ অবগত হন যে, হেস্টিংসসাহেব ৮২,০০০ বা ৮৩,০০০ টাকার রাজস্ব বন্দোবস্তে বাহারবন্দ লোকনাথকে প্রদান করেন ; কিন্তু উক্ত পরগণাতে প্রকৃত যে টাকা আদায় হইত, তাহা অনেক অধিক। কত টাকায় বাহারবন্দের বন্দোবস্ত হয়, আমরা পূর্বেই সে কথার উল্লেখ করিয়াছি। লোকনাথের দর-ইজারাদারগণের সহিত বাহারবন্দ হইতে এক বৎসরে ৩,৫৩,০০০ টাকারও অধিক আদায় করিবার বন্দোবস্ত হয়, প্রজারা ইহাতে আপত্তি করিয়াছিল। প্রায় ৫ সহস্র প্রজা দলবদ্ধ হইয়া কলিকাতার রাজস্ব-সমিতির নিকট আবেদনের জন্য গমন করে ; তাহারা কাশীমবাজারে উপস্থিত হইলে, কান্তবাবুর ভ্রাতা নৃসিংহবাবু তাহাদিগকে ক্ষান্ত করিয়া, আপোষে নিষ্পত্তি করিয়া লন।[২৯] হেস্টিংস অন্যায়পূর্বক রানী ভবানীর নিকট হইতে যে বাহারবন্দ লইয়া কান্তবাবুকে দিয়াছিলেন, বার্ক ভূয়োভূয়ঃ তাহার উল্লেখ করেন। তিনি হেস্টিংসের ভীষণ চরিত্রের কথা ব্রিটিশ জাতির হৃদয়ে বদ্ধমূল করিবার জন্য অশেষ প্রকারে চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশতম দিবসের অধিবেশনে ১৭৯০ খ্রীঃ অব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি মহামতি আনস্ট্রুথার হেস্টিংসের উৎকোচাদিগ্রহণের আলোচনাপ্রসঙ্গে কোম্পানীর কর্মচারিগণের বেনিয়ানদিগের সহিত জমিদারী বন্দোবস্তের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, জমিদারদিগকে বিদূরিত করিয়া হেস্টিংস বেনিয়ানদিগকে সেই সমস্ত জমিদারী দিয়া, রাজস্ব-সংক্রান্ত বিধির লঙ্ঘন ও কর্তৃপক্ষগণের অবমাননা করিয়াছেন।[৩০] কান্তবাবুকে এইরূপ জমিদারীপ্রদান করার জন্য হেস্টিংসকে সেই ব্রিটিশ জাতির প্রতিনিধিগণের সমক্ষে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। হেস্টিংস কান্তবাবুর জন্য এত লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন কেন ? তিনি বাস্তবিক কি কান্তবাবুর প্রত্যুপকারের জন্যই এইরূপ অবমাননার ডালি স্বীয় মস্তকে লইতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন ? অবশ্য

২৮ Burke's Speeches on the Impeachment of Warren Hastings (Bohn's series), Vol. I, p. 139.

২৯ Burke's Speeches, Vol. I, pp. 220-21.

৩০ History of the Trial of Warren Hastings (Deberett), Pt. III, p. 4.

তাহা যে কিয়ৎপরিমাণে সত্য, ইহা নিঃসন্দেহই বলা যাইতে পারে। কিন্তু হেস্টিংসসাহেব কেবলই যে কান্তবাবুর প্রত্যুপকার স্মরণ করিয়া, এরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বাস করিতে পারি না। প্রত্যুপকারের সহিত স্বার্থপরতারও মিশ্রণ ছিল। তাঁহার হৃদয় তত উচ্চ হইলে, আজ তাঁহার অত্যাচারাবলী বিভীষিকাময়ী মূর্তি ধারণ করিয়া বঙ্গদেশ, কাশীধাম বা অযোধ্যার জনগণের মানস-নেত্রের সমক্ষে নৃত্য করিয়া বেড়াইত না।

আমাদের বিবেচনায় কান্তবাবুর সহিত যে সমস্ত জমিদারীর বন্দোবস্ত ছিল, তাহার অধিকাংশই হেস্টিংসসাহেবের নিজের বলিয়া বোধ হয়। কান্তবাবুর জমিদারীর সহিত হেস্টিংসসাহেবের যে বিশেষরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহা মহামতি বার্ক স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ইউরোপীয় কর্মচারিগণ অনেক সময়ে এই জমিদারী পর পর ৩।৪ জনের বেনামীতে লইতেন। হেস্টিংস কান্তবাবুর বেনামীতে অনেক জমিদারী লইয়াছিলেন ; নতুবা কান্তবাবুর প্রতি তাঁহার এত অনুগ্রহ হইবে কেন ? হেস্টিংসের সহিত কান্তবাবুর এক বৎসরের পরিচয়ে এরূপ বন্ধুতা হইতে পারে না যে, তিনি তাঁহার এরূপ সুবিধা করিয়া দেন। পূর্বে কান্তবাবু সাইক্সসাহেবের কর্মচারী ছিলেন। তিনিই হেস্টিংসসাহেবের নিকট কান্তবাবুর জন্য অনুরোধ করেন ; সুতরাং ইহা হইতে সকলে প্রকৃত বিষয়ের অনুমান করিতে পারেন।[৩১]

হেস্টিংসসাহেবের সহিত কান্তবাবুর যে পূর্বে পরিচয় ছিল না, বার্কের এ কথা প্রকৃত নহে। আমরা পূর্বে সে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি এবং তিনি এক সময়ে বিলাত হইতে কান্তবাবুর নিকট কিছু টাকা চাহিয়া পাঠান, তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। কর্নেল মন্সনও একস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন যে, হেস্টিংস প্রথমে এদেশে আসিলে, কান্তবাবু তাঁহার অধীনে ১৫।২০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। হেস্টিংসের পদোন্নতির সহিত কান্তবাবুরও উন্নতি হইতে থাকে। পরে তিনি সাইক্সসাহেবের বেনিয়ান নিযুক্ত হন। হেস্টিংস পুনর্বার গবর্নর হইয়া আসিলে, আবার কান্তবাবুকে নিজ বেনিয়ান নিযুক্ত করেন।[৩২] মন্সনের এই কথা হইতে বার্কের উক্তির খণ্ডন হইতেছে। হেস্টিংসের সহিত কান্তবাবুর পূর্বপরিচয় থাকিলেও এই সমস্ত জমিদারীর সহিত যে, তাঁহার বিশেষরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কান্তবাবুর সমস্ত জমিদারী থাকিলে, কাশীমবাজার রাজবংশের আয় আরও অধিক হইত। কান্তবাবুর জমিদারী বন্দোবস্ত ১৩ লক্ষ টাকা হইতে পরে ৫ লক্ষ হয়।[৩৩] তাহার পর তিনি আরও কিছু বৃদ্ধি করিয়া লইয়াছিলেন। হেস্টিংসসাহেবের সহিত তাঁহার জমিদারীর সম্বন্ধ থাকায়, ডিরেক্টারগণের ভয়ে, তাঁহাকে অনেক জমিদারী পরিত্যাগ

৩১ Burke's Speeches, Vol. I, pp. 139-40.
৩২ Selections from State Papers, Vol. II, p. 367.
৩৩ Selections from State Papers, Vol. II, pp. 362-63.

করিতে হইয়াছিল এবং হেস্টিংস মানে মানে লাঞ্ছনার হস্ত হইতে কিয়ৎপরিমাণে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন।

হেস্টিংস অন্যায়পূর্বক কান্তবাবুকে যে সমস্ত জমিদারী ও মহলাদি প্রদান করেন, আমরা যথাসাধ্য তাহার আলোচনা করিয়াছি এবং ইহার মধ্যে হেস্টিংস নিজেও যে জড়িত ছিলেন, তাহারও উল্লেখ করিতে ত্রুটি করি নাই। হেস্টিংসের সহিত কান্তবাবুর জমিদারীর বিশেষ সম্বন্ধ থাকিলেও, দুই একটি প্রধান জমিদারী যে কান্তবাবুর নিজস্ব ছিল, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই ; সে সকলের মধ্যে বাহারবন্দই প্রধান। হেস্টিংস লোকনাথের বেনামীতে কান্তবাবুকে বাহারবন্দ প্রদান করিয়া কান্তবাবুর যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুগ্রহ-বলে বাহারবন্দ হইতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় কান্তবাবুকে আর অধিক রাজস্ব দিতে হয় নাই। হেস্টিংসের আদেশে গঙ্গাগোবিন্দসিংহ যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় তাহাই বাহাল থাকে। অদ্যাপি কাশীমবাজার রাজবংশ সেই অনুগ্রহ লাভ করিতেছেন। আমরা কান্তবাবুর জমিদারীর সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। এক্ষণে হেস্টিংসের সহিত তাঁহার অন্যান্য বিষয়ের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহাই দেখাইতে চেষ্টা পাইব।

হেস্টিংসের সহিত কান্তবাবুর সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ ছিল। যেখানে হেস্টিংস, সেইখানে কান্তবাবু। যে কার্যে হেস্টিংস হস্ত প্রদান করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে কান্তবাবুও তাহাতে অগ্রসর। কি জমিদারী-সংক্রান্ত বন্দোবস্ত, কি কর্মচারীনিয়োগ, সমস্ত কার্যেই হেস্টিংসের সঙ্গে কান্তবাবুকে দেখিতে পাওয়া যায়। মহামতি বার্ক বলিয়াছেন যে, ভারতসংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে হেস্টিংসের নাম শুনা যায়, তৎসঙ্গে তাঁহার বেনিয়ান কান্তবাবুর নামও শ্রুত হওয়া যায়।[৩৪]

কোনরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইলে, তৎকালে কোম্পানীর কর্মচারীরা আপনাদিগের উদর পূর্ণ না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসনচ্যুতি হইতে আরম্ভ করিয়া, এই সময় পর্যন্ত তাঁহারা এই প্রথা অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন। বাঙ্গলার রাজকোষ শূন্য করিয়া তাঁহারা মীরজাফরকে মসনদে উপবেশন করাইয়াছিলেন। রিক্তকোষে রিক্তহস্তে মীরজাফরের রাজত্বের আরম্ভ! অবশেষে কোষ পূর্ণ করিতে হতভাগ্য প্রজাগণের উপর অত্যাচার! মীর কাসেমকে নবাব করিবার সময়ও, কোম্পানীর সহিত বন্দোবস্ত ব্যতীত তাঁহাদের কর্মচারিগণের সহিত বন্দোবস্ত পৃথক হয় এবং সেই গুপ্ত বন্দোবস্ত প্রতিপালনে অসমর্থ হওয়ায়, মীর কাসেমকে বিদ্রোহী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে, ন্যায়বান্ ইংরেজ কর্মচারিগণ ত্রুটি করেন নাই। মীরজাফরের পুনরভিষেকের সময় এবং মীরণের অল্পবয়স্ক পুত্রকে উপেক্ষা করিয়া, নজমউদ্দৌলাকে

৩৪ "Whoever has heard of Mr. Hasting's name with any knowledge of Indian connections, has heard of his banyan Canto Baboo." (Burke's Impeachment of W. H., Vol. I, p. 138.)

নবাবীপ্রদানের সময়ও, সেই গুপ্ত বন্দোবস্তপ্রথা প্রবর্তিত হইয়াছিল। এমন কি সম্রাট্ শাহ আলম বারংবার কোম্পানীকে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা প্রদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু পাছে আপনাদের উদরপূরণের ব্যাঘাত ঘটে, এই আশঙ্কায় কোম্পানীর হিতৈষী কর্মচারিগণ ঐরূপ ঝঞ্ঝাট স্কন্ধে লইতে সাহসী হন নাই। দেওয়ানী লইয়া তাঁহাদের একটি বিশেষ লাভের মূলে কুঠারাঘাত পতিত হয়। তাঁহারা নবাব-দিগের নিকট হইতে আর সেরূপ অর্থোপার্জন করিতে পারিতেন না; পরন্তু নবাবকে বৃত্তিস্বরূপ কোম্পানীর কোষ হইতে অর্থ প্রদান করিতে হইত। সেইজন্য তাঁহারা অন্যান্য লোকের সহিত বন্দোবস্তে আপনাদের লাভের সামঞ্জস্য করিয়া লইতেন। কোম্পানীর কর্মচারিগণ এইরূপ যেখানে বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তথায় অগ্রে হস্তপ্রসারণ করিয়াছেন, পরে বন্দোবস্তের অনুমতি দিয়াছেন। প্রধান কর্মচারিগণের ন্যায় তাঁহাদের দেওয়ান বা বেনিয়ানগণও এইরূপ লাভ হইতে বঞ্চিত হন নাই। সিরাজ-উদ্দৌলার ধনাগার লুণ্ঠনের সময় ক্লাইবের দেওয়ান রামচাঁদ ও নবকৃষ্ণ যথেষ্ট লাভ করিয়াছিলেন। কোম্পানীর প্রত্যেক কর্মচারী আপনাদের উদরপূরণের সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের মুৎসুদ্দীদিগের সুবিধা করিয়া দিতেন।

হেস্টিংসসাহেবও পূর্বপ্রথা অবলম্বন করিয়া, নিজের সঙ্গে সঙ্গে প্রিয় কান্তেরও অর্থাগমের যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দেন। কি ভারতবর্ষে, কি ইংলণ্ডে, হেস্টিংসের উৎকোচগ্রহণব্যাপার জনসাধারণে বিশেষরূপে অবগত আছে। প্রত্যেক কার্যে এরূপ ভীষণ উৎকোচগ্রহণ, অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহার উৎকোচগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে, কান্তও জড়িত ছিলেন। দুই একটির উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। হেস্টিংসের নামে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত হয়, তন্মধ্যে অষ্টম অভিযোগের একস্থলে লিখিত আছে যে, হেস্টিংস, খাঁ জাহান খাঁ নামক এক ব্যক্তিকে বার্ষিক ৭২,০০০ টাকায় হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে বৎসরে নিজে ৩৬,০০০ টাকা ও তাঁহার বেনিয়ান কান্ত, বৎসরে ৪,০০০ টাকা উৎকোচস্বরূপ লইতেন।[৩৫]

৩৫ "That on the 30th of March, 1775, a member of the Council produced, and laid before the Board a petition from Mr. Zein Abul Dheen, (formerly farmer of a district, and who had been in creditable stations) setting forth, that Khan Jehan Khan, then phousdar of Hooghly, had obtained that office from the said Warren Hastings with a salary of seventytwo thousand sicca rupees a year; and that the said phousdar had given a receipt of bribe to the patron of the city, meaning Warren Hastings, to pay him annually thirtysix thousand rupees, and also to his banyan Canto Babu, four thousand rupees a year, out of the salary above mentioned." (Burke's Works, Vol. IV, p. 374.)

ইহা অপেক্ষা ভয়ানক উৎকোচগ্রহণ আর আছে কি না জানি না ; একজন ৭২,০০০ টাকা বার্ষিক বেতন পাইয়া তাহা হইতে যদি ৪০,০০০ টাকা উৎকোচ প্রদান করে, তাহা হইলে, তাহার আয়ের কত লাঘব হয়, ইহা সহজে বুঝা যাইতে পারে। সুতরাং সে ব্যক্তি স্বীয় আয় ঠিক রাখিবার জন্য অবশেষে যে অত্যাচারের সাহায্য লইয়া, হতভাগ্য প্রজাবর্গকে উৎপীড়িত করিবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি ? সেইরূপ ঘটনার জন্য অনেক সময়ে হতভাগ্য প্রজাগণ অশেষ কষ্টভোগ করিয়াছে। হেস্টিংসের উৎকোচের বিবরণ দুই জনে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। বাঙ্গলাদেশের প্রায় সমস্ত বিবরণ কান্তবাবু বাঙ্গলাতে লিখিতেন এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সমস্ত বিবরণ ফার্সী মুন্সী লিখিয়া রাখিতেন। কোম্পানীর আয়-ব্যয়াধ্যক্ষ (Accountant General) লার্কিন্সসাহেব পরিশেষে তাহা সংশোধন করিয়া রাখিতেন।[৩৬] হেস্টিংস অনেক লোককে উৎকোচগ্রহণে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার এমনই কৌশল ছিল যে, কেহ কাহারও বিষয় বলিতে পারিত না। বাঙ্গলাদেশের অনেক বন্দোবস্ত কান্তবাবুর জ্ঞাতসারে হইয়াছিল, সে সমস্ত বিষয় হেস্টিংসের অন্যান্য অনুচরেরা অজ্ঞাত ছিলেন। হেস্টিংসের বাঙ্গলাসংক্রান্ত প্রায় সমস্ত বিষয়ের হিসাব কান্তবাবুকে রাখিতে হইত। সুতরাং বাংলার উৎকোচগ্রহণসম্বন্ধে, অনেক বিষয় তিনি জ্ঞাত ছিলেন এবং তাহা হইতে তাঁহার নিজেরও অনেক লাভ হইত। বাঙ্গলার নবাব মোবারক উদ্দৌলার অভিভাবক ও দেওয়ান নিযুক্ত করিবার সময়, মণিবেগমের এবং রাজা গুরুদাসের নিকট হইতে হেস্টিংস যে সমস্ত উৎকোচগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই সমস্ত ব্যাপারে কান্তবাবু ও তদীয় ভ্রাতা নৃসিংহবাবু বিশেষরূপে জড়িত ছিলেন। এই উৎকোচ লইয়া সর্বাপেক্ষা হেস্টিংসকে অধিক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়।

মহারাজ নন্দকুমার ১৭৭৫ খ্রীঃ অব্দের ৮ই মার্চ তারিখে কলিকাতা কাউন্সিলের নিকট হেস্টিংসসাহেবের নামে যে অভিযোগ উপস্থিত করেন, তাহাতে তিনি স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে, নৃসিংহের দ্বারা অনেকবার মণিবেগম প্রভৃতি হেস্টিংস-সাহেবকে উৎকোচ প্রদান করিয়াছেন। একবার হেস্টিংস মুর্শিদাবাদে গমন করেন। তিনি কাশীমবাজারে অবস্থান করিয়া, মধ্যে মধ্যে নবাব-প্রাসাদে গমন করিতেন। কিছুদিন পরে তিনি কলিকাতায় গমন করিলে, মণিবেগম রাজা গুরুদাসকে বলেন, গবর্নরকে কিছু নজর দেওয়া উচিত এবং মহারাজ নন্দকুমারকে লিখিয়া পাঠান হউক যে, মণিবেগম গবর্নরকে ১,৫০,০০০ টাকা দিতে চাহেন। তিনি নগদ টাকা, কি হুণ্ডী দিবেন, তাহাই জানিতে ইচ্ছা করেন। নন্দকুমার হেস্টিংসকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিলে, হেস্টিংস বলেন যে, কান্তবাবুর ভ্রাতা নৃসিংহ কাশীমবাজারে আমার ব্যবসায়ের

৩৬ Impeachment of W. H., Vol. I, p. 423.

পরিচালনা করিয়া থাকেন ; তাঁহার নিকট উক্ত টাকা দিলেই হইবে। তদনুসারে নৃসিংহকে ১,৫০,০০০ টাকা দেওয়া হয়।[৩৭]

কান্তবাবু এই সময়ে প্রায়ই কলিকাতায় বাস করিতেন। নৃসিংহবাবু কাশীমবাজারে থাকিতেন। তিনি কান্তবাবুর পরামর্শানুসারে হেস্টিংসের এতদঞ্চলের যাবতীয় কার্য নির্বাহ করিতেন। কি উৎকোচগ্রহণ, কি ব্যবসায়সম্বন্ধে বন্দোবস্ত, সকল কার্যই নৃসিংহবাবুর দ্বারা সংসাধিত হইত। বলা বাহুল্য এ সমস্তই কান্তবাবুর পরামর্শানুসারেই হইত। এই সকল কার্য একরূপে কান্তবাবুর নিজেরই কার্য। তিনি কাশীমবাজারে সে সময় থাকিতেন না বলিয়া, স্বীয় ভ্রাতা নৃসিংহকে সমস্ত কার্যনির্বাহের পরামর্শ দিতেন। দুই ভ্রাতায় হেস্টিংসসাহেবের সকল কার্য সম্পন্ন করিতেন। সুতরাং কান্তবাবুর ন্যায় নৃসিংহবাবুও হেস্টিংস-সংক্রান্ত ব্যাপারের একজন অভিনেতা ছিলেন। মহারাজ নন্দকুমার নৃসিংহের দ্বারা অনেক বার হেস্টিংসসাহেবের উৎকোচগ্রহণের কথা তাঁহার অভিযোগপত্রে নির্দেশ করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে সমস্তের উল্লেখ করা গেল না।

আমরা বারংবার বলিয়াছি যে, মণিবেগমের নিকট হইতে উৎকোচ লওয়া সম্বন্ধে কান্তবাবু বিশেষরূপে জড়িত ছিলেন। মহারাজ নন্দকুমার ইহা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। কলিকাতা কাউন্সিলের নিকট তিনি সাক্ষ্য দিতে উপস্থিত হইয়া মণিবেগমের এক পত্র উপস্থাপিত করেন। তাহাতে মণিবেগমের পদোন্নতির জন্য হেস্টিংসসাহেবকে এক লক্ষ টাকা মুর্শিদাবাদে ও আর এক লক্ষ টাকা কলিকাতায় দেওয়ার কথা উল্লিখিত থাকে। পূর্বে যে দেড়লক্ষ টাকার কথা বলা হইয়াছে, এ দুই লক্ষ তাহা হইতে বিভিন্ন। মণিবেগমের সেই মূল পত্র নন্দকুমারের নিকট হইতে

৩৭ "After Mr. Hastings returned from Murshidabad to Calcutta Muny Begum said to Raja Goordas "Write word to Maha Rajah Nundkumar, that it is proper and requisitie to give one lakh and 50,000 rupees to Governor, and beg of Maha Rajah to ask the Governor whether it shall be sent in ready money or by a bill of exchange." I (Nundkumar) accordingly asked Mr. Hastings who answered, "I have connection of trade in that part of the country, let this money be paid to Nursing, Contoo's brother, who is at Cossimbazar. In consequence of which I write to Rajah Goordas and Muny Begum, that they should deliver the money to Nursing, Cantoo's brother. Muny Begum with Rajah Goordas' knowledge in the month Aughun, 1179 paid the money to the Governer Mr. Hastings by the means of Nursing aforesaid'. (State Papers. Also Minutes of the Evidence of Hastings' Trial, p. 1003)

হেস্টিংস কিংবা তাঁহার কোনও লোক লইয়াছিলেন কি না, এই কথা কাউন্সিল হইতে জিজ্ঞাসা করা হইলে নন্দকুমার উত্তর দেন যে, বেগম কান্তবাবুর দ্বারা তাহা পেশ করিতে বলেন, কান্তবাবুকে মূল পত্র না দেওয়ায়, তিনি ইহার নকল লইতে চান। নন্দকুমার তাঁহার সমক্ষে নকল করিতে বলেন ; সে দিন সন্ধ্যা হওয়ায়, তৎপর দিন লইবার কথা হয়।[৩৮] কাউন্সিল হইতে এই সমস্ত বিষয়ের প্রমাণের জন্য কান্তবাবুকে সমন দেওয়া হয়, কিন্তু হেস্টিংসের নিষেধক্রমে তিনি প্রথমে উপস্থিত হন নাই। সুতরাং কাউন্সিলের সভ্যেরা নন্দকুমারের উপস্থাপিত অভিযোগ-সম্বন্ধে আপনাদের বিবেচনানুযায়ী বিচার নিষ্পন্ন করেন।

অনন্তর কাউন্সিলের অবমাননার হেতুপ্রদর্শনের জন্য পুনরায় কান্তবাবুর নামে সমন-প্রেরণের জন্য কাউন্সিলে তর্কবিতর্ক উপস্থিত হয়। বারওয়েলসাহেব প্রথমে আপত্তি করেন। গবর্নর জেনারেল হেস্টিংসসাহেব তাঁহাকে কলিকাতার সর্বপ্রধান দেশীয় অধিবাসী বলিয়া, উল্লেখ করিয়া বলেন যে, সাধারণ বেনিয়ানদিগের ন্যায় তিনি গণ্য হইতে পারেন না। এই সময়ে তিনি কান্তবাবুর বংশমর্যাদার কথাও উল্লেখ করিয়াছিলেন। ক্লেভারিংসাহেব তাঁহাকে সাধারণ বেনিয়ানগণ হইতে বিভিন্ন মনে করেন নাই এবং প্রকাশ করেন যে, কান্তবাবু যখন কোম্পানীর ইজারদার, তখন তিনি কাউন্সিলের আদেশ মানিতে বাধ্য।[৩৯] বারওয়েলও তখন ইহাতে মত দেন।

৩৮ "Q. Has any application been made to you by the Governor-General, or any other person on the part of the Governor-General to obtain from you the original letter which you have produced ?—

A. The Begum applied to me for it through Canto Baboo, the Governor's Banyan. I gave it into Canto Baboo's hand, who read it and on being refused the original he desired he might take a copy of it to read to the Begum. I told him he might copy it in my presence, but it being then late in the evening he said he would deter copying it till another day." (Selections from State Papers, Forrest, Vol. II, p. 310.)

৩৯ The Governor-General.—

Cantoo Baboo, as the servant of the Governor, is considered universally as the first native inhabitant of Calcutta. I observe the stress which has been laid upon the approbious term Banyan applied to him, which is not applicable to him if used in the same sense by which the Common brokers in this place are distinguished under that application. He is a man of a very creditable family, not a native of Calcutta, and has been publicly known many years in this country in which his character is to this day irreproachable , as my

বারওয়েল প্রথমে আপত্তি করিলেও পরে ক্লেভারিং-এর প্রস্তাবে সম্মত হন। পরে কান্তবাবুর নামে সমন প্রেরিত হইলে, তিনি তাঁহাদের সমক্ষে উপস্থিত হন। তাঁহাকে পূর্ব সমনে উপস্থিত না হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন যে, গবর্নরসাহেবের নিষেধক্রমে তিনি উপস্থিত হন নাই। এতদ্দেশীয় লোকেরা গবর্নরের আদেশের পরে কাউন্সিলের আদেশ মান্য করিয়া থাকে। গবর্নর যদি উপস্থিত হইতে বলিতেন, তাহা হইলে তিনি কাউন্সিলের আদেশ মান্য করিতে ত্রুটি করিতেন না ইত্যাদি।[৪০]

servant he is ammenable to the jurisdirtion of the Supreme Court, Judicature. By the express words upon Act of Parliament, he was not subject to the Mayors Court in which the exercise of the English law was vested before the constitution of the Superior Court. Any conclusions therefore drawn from the practice of former Governments, in which different rights and powers were supposed to be inherent, but have been since, expressly abrogated are fallacious and unwarranted. I repeat that I am against the question.

General Clavering—I understand that Cantoo Baboo is the Governor-General's Banyan in the strict sense in which that term is understood in Calcutta ; that he exercises all the functions of that office, whatever it may be. I am not acquainted with his origin, but I have always understood that he was Mr. Sykes's Banyan before he entered in the Governor-General's service, but he is a farmer, as I have said before in the proceedings of the Revenue Board, to a considerable amount, and in that quality alone I call upon the Governor-General to declare whether he is not ammenable to this Board." (Selections from State Papers, Vol. II.)

৪০ "Q. Did you receive a summons from this Board on Monday the 13th instant, to attend them ?—A. I did. Q. Why did you not come ?—A. I was with the Governor, who heard of the summons and said what occasion is there for your going ? Don't go. Q. Are you not sensible that the authority of his Government is placed in the Council ?—A. We Bengallies, the people of this country, know that the Governor's orders are in force upon us, and that next to these the orders of the Council, are over us. Q. Would you not have obeyed the orders of the Council, if the Governor had not told you to disobey them ?—A. I cetrainly should have obeyed the orders. Q. Did you receive summons on Tuesday the 14th instant to attend the Board of Revenue ;—A. I did receive it. Q. Why did you not

কাউন্সিলের অবমাননার জন্য ক্লেভারিংসাহেব প্রস্তাব করেন যে, কান্তবাবুকে কোন প্রকার গুরুতর শাস্তি দেওয়া হউক। গবর্নর জেনারেল বলেন যে, কান্তবাবু উচ্চপদস্থ বলিয়া সকলে তাঁহার সম্মান করিয়া থাকে। তাঁহার প্রতি কোন প্রকার শাস্তিবিধান হইতে পারে না। বিশেষতঃ তিনি গবর্নর জেনারেলের কর্মচারী বলিয়া, সুপ্রীমকোর্টের সীমানিবিষ্ট ও কাউন্সিলের সীমাবহিভূর্ত। হেস্টিংস আরও বলেন যে, তিনি তাঁহার নিজের জীবন দিয়াও কান্তবাবুকে রক্ষা করিতে প্রস্তুত। অনেক তর্ক-বিতর্কের পর ক্লেভারিংসাহেব পুনর্বার প্রস্তাব করিলেন যে, গবর্নর অতি সামান্য অপরাধের জন্য প্রত্যহ দুর্ভাগ্য হিন্দুদিগকে যে তুড়ুম পরাইয়া থাকেন, আমি কান্তবাবুকেও সেই শাস্তি প্রদান করিতে ইচ্ছা করি।[৪১] হেস্টিংস ইহাতে ঘোর আপত্তি করেন। যাহা হউক সে দিবস এ-বিষয়ের কোনই মীমাংসা হয় নাই এবং কান্তবাবুও অবমাননার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন।

আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি, যে স্থানে হেস্টিংসাহেব উৎকোচ গ্রহণ করিতেন, সেই স্থানেই কান্তবাবু উপস্থিত থাকিতেন। এ সম্বন্ধে আরও দুই একটি দৃষ্টান্ত দেখান যাইতেছে। হিজলীর ইজারদার পূর্বোল্লিখিত কমলউদ্দীন, মহারাজ নন্দকুমার ও ফাউকসাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া, নিম্নলিখিত মর্মে কাউন্সিলে এক আর্জি পেশ করিয়া বলে যে, তিন বৎসরের মধ্যে তাহার নিকট হইতে বারওয়েলসাহেব

obey it ?—A. For the same reasons as those I before mentioned. Q. Did you not receive another order to attend the Board of Revenue on Friday the 17th instant ?—A. I did not receive any on Friday, I got one on Saturday, to attend at the First Council and I returned for answer to Mr. Summer, that I would attend at the First Council. I went to Mr. Summer's that morning, and I learnt that there was no Board there, but he directed me to be present on the First Council day. Q. Did you receive an order of this Board to attend here today ?—A. I received no written order today. A person left word at my gate, and on receiving the notice I came. Q. Do you know from whom that person came ?—A. I did not see the peon. My people told me that a peon had come with an order of Council, and had left word, that it was the Council's order for me immediately to attend." (State Papers, also Minutes of the Evidence of Hastings' Trial, p. 1016.)

৪১ "He should be put in the stocks to have that same punishment inflicted upon him which the Governor inflicts every day upon many miserable Hindoos barely for easing themselves upon the Esplanade two miles distant from the town." (Minutes of the Evidence of Hasting's Trial, p. 1016.)

৪৫,০০০ টাকা উৎকোচ লইয়াছেন এবং গবর্নর হেস্টিংস নজর বলিয়া ১৫,০০০, ভান্সিটার্টসাহেব ১২,০০০, রাজা রাজবল্লভ ৭,০০০ ও কৃষ্ণকান্ত ৫,০০০ লইয়াছেন। কিন্তু কিছুকাল পরে হেস্টিংসসাহেবের প্ররোচনায় উক্ত কমলউদ্দীন সুপ্রীমকোর্টে এই অভিযোগ উপস্থিত করে যে, নন্দকুমার ও ফাউকসাহেব তাহার নিকট হইতে বলপূর্বক উক্ত আর্জি লিখাইয়া লইয়াছেন। হেস্টিংস ও বারওয়েল এই ছল ধরিয়া নন্দকুমার প্রভৃতির নামে এক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উপস্থাপিত করেন। কিন্তু ভান্সিটার্ট, রাজবল্লভ ও কান্তবাবু প্রথমে অভিযোগের ইচ্ছা করিলেও পরে মোকর্দমা উঠাইয়া লন। এই সমস্ত কথা নন্দকুমার প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে।[৪২] হেস্টিংসের বিচারের সময়ও উৎকোচগ্রহণ লইয়া অত্যন্ত আন্দোলন হইয়াছিল এবং তাহাতে গঙ্গাগোবিন্দসিংহ ও কান্তবাবু যে বিশেষরূপে লিপ্ত ছিলেন, মহামতি বার্ক তাহা পুনঃপুনঃ প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন যে, বঙ্গদেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে এই দুই জনের দ্বারা উৎকোচ আদায় করা হইত। এক সময়ে এই দুই জনে নয় লক্ষ টাকা উৎকোচ আদায় করেন; তন্মধ্যে ৫,৫০,০০০ কেবল কোম্পানীর কোষাগারে জমা দেওয়া হয়; অবশিষ্ট টাকা হয় হেস্টিংস, নতুবা তাঁহার প্রতিনিধিদ্বয় আত্মসাৎ করিয়াছেন।[৪৩]

কি রাজা, কি জমিদার, কি ইজারদার, সকলের নিকট হইতে অন্যায় ও বলপূর্বক উৎকোচ গ্রহণ করিয়া হেস্টিংসসাহেব কিরূপ দুর্নাম অর্জন করিয়াছেন, তাহা ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে কাহারও অবিদিত নাই। এই উৎকোচগ্রহণের জন্য যে তাঁহার নাম প্রকাশ করিয়াছে, তিনি তাহার সর্বনাশ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা পাইয়াছেন। এইজন্যই মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসী। হেস্টিংসসাহেবের সহিত জড়িত বলিয়া যে কান্তবাবুকেও আমরা সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ভীষণ হত্যায় লিপ্ত দেখিতে পাই, পূর্বে আমরা ইহার উল্লেখ করিয়াছি। নন্দকুমারের বিচারের পর, রাজা নবকৃষ্ণপ্রমুখ কতিপয় দেশীয় লোক সুপ্রীমকোর্টে বিচারের প্রশংসা করিয়া ইম্পেসাহেবকে যে অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন, তাহাদের মধ্যে কান্তবাবুরও নাম দেখা যায়।[৪৪] হিন্দুর হিন্দুত্ব অনেক দিন ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া গিয়াছে; নতুবা যাহারা দেশের উচ্চপদস্থ, তাহারা হিন্দু হইয়া কেমন করিয়া ব্রাহ্মণহত্যার সমর্থন করে, বুঝিতে পারি না। প্রথম ইংরেজরাজত্বে ব্রাহ্মণহত্যার ভিত্তিতে বাঙ্গালী জাতির উন্নতি আরম্ভ বলিয়া, দেবশাপের অগ্নিশিখায় তাহারা প্রতিনিয়ত দগ্ধ হইতেছে। এতদ্ভিন্ন বর্ধমানের ও রাজশাহীর রানীর নিকট হইতে অনেক টাকা গ্রহণেরও উল্লেখ দেখা যায়।[৪৫]

৪২ Holwell's State Trials, Vol. XX.
৪৩ History of the Trial of Warren Hastings (Debrett Pt. II. p. 37.)
৪৪ Stephen's Nuncomar, Vol. I, p. 229.
৪৫ "The Governor's Banian stands foremost and distinguished

কঠোরপ্রকৃতি ওয়ারেন হেস্টিংস হইতে পুণ্যভূমি বারাণসী-ক্ষেত্রে যে ভীষণ অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। চেৎসিংহের নিকট হইতে বারংবার অর্থ শোষণ করিয়াও হেস্টিংসের ব্রহ্মাণ্ডগ্রাসিনী লালসার নিবৃত্তি হয় হয় নাই। ক্রমেই হতভাগ্য কাশীরাজকে কপর্দকবিহীন করিয়া, তাঁহার হস্ত হইতে বারাণসীরাজ্য বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া হয়। চেৎসিংহ এই ভয়ঙ্কর অত্যাচারে অবশেষে কাশী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। কৃতান্তদূতের ভীষণ কবল হইতে নিস্তার পাইবার জন্য, রাজকুমারকে কাপুরুষতা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল! এই সময়ে হেস্টিংসের আদেশে চেৎসিংহের মাতা স্ত্রী ও অন্যান্য পরিবারগণ পশুপ্রকৃতি সৈনিকগণের হস্তে যে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিতে গেলে, শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। রাজমাতা, রাজরানী, পশুগণ-কর্তৃক লাঞ্ছিত, অবমানিত হইয়া ভিখারিনীবেশে দুর্গ হইতে বহিষ্কৃত হইতে বাধ্য হন। হেস্টিংস চেৎসিংহকে রাজ্যচ্যুত করিয়া, তাঁহাকে বারাণসীরাজ্য হইতে বিদূরিত করিয়া দেন। এই ব্যাপারে সকলে যেরূপ লাভ করিয়াছিলেন, কান্তবাবুও সেইরূপ নিজ লভ্যাংশ হইতে একেবারে বঞ্চিত হন নাই। আমরা যথাস্থানে তাহার নির্দেশ করিতেছি।

কান্তবাবু বারাণসীর অত্যাচার হইতে আপনার স্বার্থসাধন করিলেও, সাক্ষাৎসম্বন্ধে তিনি এ বিষয়ে লিপ্ত ছিলেন না। তবে, হেস্টিংসের সহিত তাঁহার একরূপ 'সমবায় সম্বন্ধ' থাকায়, তিনি সে সময়ে কাশীরাজ্যে উপস্থিত ছিলেন বলিয়া, লভ্যাংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, উৎকোচগ্রহণের জন্য হেস্টিংস অনেকগুলি লোক নিযুক্ত করেন; তাহারা পরস্পর পরস্পরের বিষয় বিদিত ছিল না। চেৎসিংহ-সংক্রান্ত কোন উৎকোচ কান্তবাবু অবগত ছিলেন না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। সম্ভবতঃ হেস্টিংসের ফারসী সেরেস্তার মুন্সী তাহা জানিতেন এবং তাঁহারই হিসাবপুস্তকে সে সমস্ত বিষয় লিখিত থাকার সম্ভাবনা। চেৎসিংহের উৎকোচ কেন, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশস্থ কোন উৎকোচের বিষয় কান্তবাবু জানিতেন না। তিনি ফারসী ভাষায় বিশেষরূপ অভিজ্ঞ না হওয়ায়, হেস্টিংসের মুন্সী তৎসমুদায় লিখিয়া রাখিতেন। কান্তবাবু বাঙ্গালী বলিয়া, বাঙ্গলার যাবতীয় হিসাবপত্র বাঙ্গলাতেই

by the enormous amount of his farms and contracts to say nothing of the large sums standing in his name in the accounts of money received from the Rannies of Rajshahy and Burdwan. Which have either been proved by the production of the original papers at the Board or by witness upon oath ; our opinion of Mr. Hastings will not suffer as to think that a participation of profits with his servant would have been *repugnant to his principles* to assert as he does that *it would have been opposite to his interest* seems too extravagant to deserve an answer." (Selections from State Papers, Vol. II.)

লিখিয়া রাখিতেন। যদিও তিনি সর্বত্রই ছায়ার ন্যায় হেস্টিংসের অনুবর্তন করিতেন, কি বাঙ্গলা, কি উত্তর-পশ্চিম, কোথাও তাঁহার গতির বিরাম ছিল না, তথাপি বাঙ্গলা ভিন্ন অন্য স্থানের বিষয় তাঁহার সম্পূর্ণই অজ্ঞাত ছিল। মহামতি বার্ক ইহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন।[৪৬]

হেস্টিংসের প্রিয়পাত্র বলিয়া, কান্তবাবু সর্বত্র তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। হেস্টিংসের ভীষণ অত্যাচারের সময় তিনিও বারাণসীতে উপস্থিত ছিলেন, এবং প্রভুর কঠোর-প্রকৃতির কার্যাবলী প্রতিনিয়ত অবলোকন করিতেন। তিনি চেৎসিংহের অনুনয়ক্রমে একবার স্বীয় প্রভুকে ক্ষমা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু কৃতকার্য হন নাই। এই অনুরোধের মূলে চেৎসিংহ প্রদত্ত কোন চাকচিক্যশালী পদার্থ ছিল, অথবা তিনি হিন্দুর প্রধান তীর্থক্ষেত্রে হিন্দুরাজার প্রতি অবৈধ অত্যাচার অবলোকন করিয়া স্বীয় প্রভুকে শান্তভাব অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা সবিশেষ অবগত নহি। কেহ কেহ প্রথমোক্ত কারণের নির্দেশ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু আমরা যখন সে বিষয়ের কোন বিশেষ প্রমাণ পাই নাই, তখন সাহস করিয়া সে কথা বলিতে পারি না। সাক্ষাৎসম্বন্ধে তিনি অত্যাচারে লিপ্ত ছিলেন না বলিয়া হয়ত হিন্দুজনোচিত কোমলতাপ্রবণ হইয়া, হেস্টিংসসাহেবকে অনুরোধ করিতে পারেন। কিন্তু উক্ত বিষয়ের কোন বিশেষ প্রমাণ না থাকায়, আমরা সে প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিলাম।

প্রতিবৎসর হেস্টিংস চেৎসিংহের নিকট যাহা দাবী করিতেন, চেৎসিংহ তাহাই প্রদান করিতেন, ক্রমে তিনি সর্বস্বান্ত হইয়া, প্রবল ক্লেশতরঙ্গমধ্যে নিপতিত হইলেন। অবশেষে তিনি আর হেস্টিংসসাহেবের লালসার তৃপ্তি করিতে পারিলেন না। হেস্টিংস ইহাতে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, চেৎসিংহকে রাজ্যচ্যুত করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। ১৭৮১ খ্রীঃ অব্দের ১৪ই আগস্ট তিনি কাশীতে উপস্থিত হন। সঙ্গে অনেক লোক গমন করিয়াছিল। কিন্তু সৈন্যসংখ্যা তাদৃশ অধিক ছিল না। ১৫ই হেস্টিংসসাহেব রাজা চেৎসিংহকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, রাজা ইংরেজরাজের অধীন হইয়াও, বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, এবং কাশীরাজপথে প্রকাশ্য ভাবে অত্যাচার করিয়াছেন। রাজা গবর্নরের পত্র পাইয়া স্তম্ভিত হইলেন, এবং বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার অদৃষ্টচক্র পরিবর্তিত হইয়াছে ; নতুবা তাঁহার নামে এরূপ মিথ্যা অপরাধের সৃষ্টি হইবে কেন ? তিনি পত্র প্রাপ্ত হইয়া লিখিয়া পাঠাইলেন যে,

৪৬ "He (Cantoo Babu) was not worth a farthing as to any transaction that happened when Mr. Hastings was in the upper provinces ; where though he was his faithful and constant attendant through the whole, yet he could give no account of it." (Impeachment of Warren Hastings, Vol. I, p. 423.)

হেস্টিংসসাহেবের যাবতীয় দাবী তিনি পূরণ করিয়াছেন এবং হেস্টিংসসাহেব তাঁহার নামে যে সমস্ত অপরাধ আনয়ন করিয়াছেন, তাহা তিনি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন।

হেস্টিংস এই পত্র পাইয়া, আপনাকে অবমানিত মনে করিলেন এবং রেসিডেণ্টকে রাজার প্রাসাদ আক্রমণ করিয়া, তাঁহাকে বন্দী করিতে আদেশ দিলেন। রেসিডেণ্ট কতিপয় সিপাহী লইয়া রাজাকে বন্দী করিতে গেলে, রাজা বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু ইহাতেও হেস্টিংসের মনস্তুষ্টি ঘটিল না। রাজাকে বন্দী করিবার কথা শুনিয়া নগরের যাবতীয় লোক অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠে। বিশেষতঃ কাশীক্ষেত্রে হিন্দুমাত্রে এরূপ অবমাননা কখনও সহ্য করিতে পারে না। যাহারা রাজাকে "মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি" বলিয়া জানে, তাহারা পুণ্যভূমির পবিত্র হৃদয়ে বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণার সেবক, হিন্দুরাজাকে অবমানিত দেখিয়া কেমন করিয়া সহ্য করিবে! কাজেই তাহারা সকলে দলবদ্ধ হইতে লাগিল। এই সময়ে ইংরেজদিগের জনৈক চোপদার রাজার অবমাননা করায় তাহারা ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিল। রাজার সৈন্যগণ এই সংবাদ অবগত হইয়া, রামনগর দুর্গ হইতে নদী পার হইয়া নগরবাসীদিগের সঙ্গে যোগ দিল। তাহাদের তরবারির আঘাতে ইংরেজ সিপাহীগণের ছিন্ন দেহ ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। ইত্যবসরে চেৎসিংহ কাশীপ্রাসাদ হইতে পলায়ন করিয়া, নদী পার হইয়া রামনগর দুর্গে আশ্রয় লন এবং হেস্টিংসসাহেবকে পুনর্বার বশ্যতা স্বীকার করিয়া লিখিয়া পাঠান। রাজা কান্তবাবুকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, হেস্টিংসসাহেব যাহাই আদেশ করিবেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাই অবনত মস্তকে প্রতিপালন করিতে বাধ্য থাকিবেন।[৪৭]

কান্তবাবু চেৎসিংহের প্রার্থনাক্রমে হেস্টিংসকে অনেকরূপে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই সময় বাস্তবিকই তিনি অশেষপ্রকার চেষ্টা করেন; কিন্তু হেস্টিংসের মন কিছুতেই বিচলিত করিতে পারিলেন না। চেৎসিংহের প্রলোভনে হউক, অথবা তীর্থক্ষেত্রে হিন্দুরাজের প্রতি অত্যাচারে কষ্ট বোধ করিয়াই হউক, কান্তবাবু যে এজন্য হেস্টিংসকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য হিন্দুমাত্রেরই প্রশংসার পাত্র। যদি তিনি ইহাতে কৃতকার্য হইতে পারিতেন, তাহা হইলে তীর্থক্ষেত্রে প্রকৃত পুণ্যের সঞ্চয় করিয়া, চিরদিনই হিন্দুর নিকট আদরণীয় হইতেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার প্রভু তাঁহারও অনুরোধ উপেক্ষা করিলেন। হেস্টিংস যেরূপে হউক, চেৎসিংহকে নির্যাতন করিতে আদেশ দিলেন।

এই সময়ে রাজার পক্ষীয় লোকেরা সমস্ত নগরে ভীষণ কোলাহল উপস্থিত করিল। হেস্টিংস আপনার জীবনকে নিরাপদ বিবেচনা করিলেন না। যদি তাহারা

৪৭ Burke's Works, Vol. IV, p. 264.

তাঁহার আশ্রয়স্থান আক্রমণ করিত, তাহা হইলে তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গী আরও ত্রিশ জন ইংরেজের রক্তে তরবারি রঞ্জিত করিতে পারিত। হেস্টিংস নিজ মুখে ইহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।[৪৮] তাহারা নায়কবিহীন হইয়া, ইতস্ততঃ কোলাহল করিয়া বেড়াইতে লাগিল। হেস্টিংস কাশীতে অবস্থান করা নিরাপদ নহে মনে করিয়া, রজনীযোগে চুনার দুর্গে পলায়ন করিলেন। তাঁহার পলায়ন উপলক্ষ্য করিয়া চেৎসিংহের লোকেরা এইরূপে বিদ্রূপ করিয়াছিল :—

"হাতীপর হাওদা ঘোড়াপর জীন্।
জল্‌দী যাও জল্‌দী যাও ওয়ারেন্ হস্টিন্।"

কান্তবাবু প্রভৃতিও হেস্টিংসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পলায়ন করিতে বাধ্য হন।

এই সময়ে হেস্টিংস চতুর্দিকে সংবাদ প্রেরণ করিলে, দলে দলে ইংরেজ সেনা আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা রামনগর প্রভৃতি স্থান আক্রমণের পর চেৎসিংহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ শোণনদ হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে বিজয়গড় নামক দুর্গে উপস্থিত হইল। এই দুর্গে চেৎসিংহের মাতা, স্ত্রী ও অন্যান্য পরিবারবর্গ বাস করিতেছিলেন। চেৎসিংহ তথায় উপস্থিত হইয়া কিছুকাল অতিবাহিত করেন। কিন্তু মেজর পপহামের অধীন একদল ইংরেজসৈন্য বিজয়গড় আক্রমণ করিতে গমন করায়, চেৎসিংহ আপনার যাবতীয় ধনসম্পত্তিসহ বিজয়গড় হইতে বুন্দেলখণ্ডে পলায়ন করেন। তাঁহার মাতা, স্ত্রী ও পরিবার সকলে অরক্ষিতভাবে উক্ত দুর্গে অবস্থান করিতে থাকেন। চেৎসিংহ এইরূপ কাপুরুষতা অবলম্বন করিয়া কিজন্য আপনার পরিবারবর্গকে শত্রুর হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, বুঝা যায় না; অথবা তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, সুসভ্য ইংরেজ কখনও স্ত্রীলোকদিগকে আক্রমণ করিবে না। মেজর পপহাম বিজয়গড়ে উপস্থিত হইয়া অবগত হইলেন যে, চেৎসিংহ পলায়ন করিয়াছেন, কেবল তাঁহার পরিবারবর্গ অবস্থিতি করিতেছেন। মেজর পপহাম এই কথা হেস্টিংসকে লিখিয়া পাঠাইলে, তিনি আদেশ দিলেন যে, অবিলম্বে স্ত্রীলোকদিগকে দুর্গ পরিত্যাগ করিতে হইবে; যদি তাহারা স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে আক্রমণ করা যাইবে। পপহাম পুনর্বার লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তাহারা গুপ্তভাবে দ্রব্যাদি লইয়া গেলে তৎসমুদায়ের উদ্ধারের কোনই উপায় নাই। তাহাতে সুসভ্য ইংরেজ জাতির সুসভ্য গবর্নর লিখিয়া পাঠান যে, রাজমাতা হয়ত সৈন্যদিগকে বঞ্চনা করিবার জন্য বিজয়গড় হইতে অনেক ধনসম্পত্তি, মণিমুক্তা লইয়া পলায়ন করিবেন। তাঁহাদিগকে বিনা পরীক্ষায় যাইতে দেওয়া সঙ্গত নহে। এ বিষয়ে তুমি যাহা হয় বিবেচনা করিও।[৪৯]

৪৮ Beveridge's History of India, Vol. II, p. 357.

৪৯ "I apprehend that she (The Ranee) will contrive to defraud the captors of a considerable part of the booty, by being suffered

ইহা অপেক্ষা আর স্পষ্ট আদেশ কি হইতে পারে ? এই সময়ে হেস্টিংস, কান্তবাবুকেও বিজয়গড়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাজমাতা কান্তবাবুকে বিশেষ অনুনয়বিনয় করিয়া ও তাঁহাকে কয়েকখানি বহুমূল্য অলঙ্কার প্রদানপূর্বক এই অনুরোধ করেন যে, যদি তাঁহার ও তাঁহার সহচরীবর্গের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার বা অবমাননা করা না হয়, তাহা হইলে তিনি বিজয়গড় দুর্গ ও যাবতীয় ধনসম্পত্তি ইংরেজহস্তে সমর্পণ করিতে ইচ্ছুক আছেন। হেস্টিংস রাজমাতার এ কথা নিজমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। হেস্টিংস কান্তবাবুর নিকট হইতে এ সংবাদ পাইয়া বলিয়া পাঠান যে, রাজমাতা যদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আপনাদিগের প্রয়োজনীয় দ্রব্য ব্যতীত অন্যান্য মূল্যবান্ সমস্ত দ্রব্য সমর্পণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রার্থনাসম্বন্ধে বিবেচনা করা যাইতে পারে।

সময়াভাবেই হউক, অথবা যে কারণেই হউক, রাজমাতা গবর্নর জেনারেলের আদেশ পালন করিয়া উঠিতে পারেন নাই ; কাজেই পরিণামে তাঁহাকে অত্যাচার ও অবমাননা ভোগ করিতে হইল। সৈনিকগণ সেনাপতির নিষেধসত্ত্বেও রাজমাতা ও তাঁহার সহচরীবর্গকে আক্রমণ করিয়া লাঞ্ছনার একশেষ করিল। তাহারা তাঁহাদিগকে অঙ্গস্পর্শ করিয়া আপনাদিগের লুণ্ঠনযোগ্য মণিমুক্তার অনুসন্ধান করিতে লাগিল।[৫০] রাজমাতা রাজরানী আজ সহায়হীনা। যবনের অত্যাচারে সংজ্ঞাহীনা হইলেন। নিকটে কেহ নাই যে, তাঁহাদিগকে সাহায্য করে। কান্তবাবু অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। পপহাম সাহেবের অনেক চেষ্টায় পরিশেষে তাঁহারা নিষ্কৃতি লাভ করেন। সৈন্যদিগের এই অত্যাচারকাহিনী পপহামসাহেব নিজে হেস্টিংসকে লিখিয়া পাঠান। কেবলই গবর্নরের কঠোরতার জন্য যে, এই লোমহর্ষণ ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহা বোধ হয় কাহারও বুঝিতে বিলম্ব ঘটিবে না। অনেক দিন হইতে হিন্দুর অস্তিত্ব রসাতলে নিমগ্ন হইয়াছে, নতুবা সতীশিরোমণি তাহাদের জননীভগিনীর প্রতি কে সাহস করিয়া এরূপ অত্যাচার করিতে সমর্থ হয় ? চেৎসিংহের পরিবারবর্গ অনাথার ন্যায় একদিক্ দিয়া চলিয়া গেলেন। গবর্নর হেস্টিংস এই সমস্ত লুণ্ঠন-দ্রব্যের অংশ চাহিলে, সৈনিকগণ তাঁহাকে এক কপর্দকও প্রদান করে নাই। তথাপি এই ভীষণ কাণ্ডে একেবারে হেস্টিংসসাহেব যে কিছু লাভ করিতে পারেন নাই, তাহা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না।

এতদঞ্চলে এক গল্প প্রচলিত আছে যে, হেস্টিংসসাহেব কাশীক্ষেত্রে রাজা চেৎসিংহের প্রাসাদ আক্রমণ করিলে, সৈন্যগণ যৎকালে রাজরানীকে আক্রমণ করিতে ধাবিত হয়, সেই সময়ে কান্তবাবু মহত্ত্বের পরিচয়প্রদানে সৈনিকগণকে নিবৃত্ত করিয়া

to retire without examination. But this is your consideration and not mine &c." (Beveridge's History of India, Vol. II, p. 538.)

৫০ Burke's Works, Vol. II. Speech on Fox's India Bill, p. 212.

তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। আমরা ইহার যথাসাধ্য আলোচনা করিতেছি। হেস্টিংসসাহেব বারাণসীতে আসিয়া, যখন রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিতে আদেশ দেন, তখন স্ত্রীলোকদের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করা হয় নাই এবং অত্যাচার হইবার সম্ভাবনাও ছিল না। কারণ, নগরবাসী সকলে ও চেৎসিংহের সৈন্যগণ সেই সময় ইংরেজ সিপাহীদিগকে তরবারির আঘাতে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলে। আমরা পূর্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং সে সময়ে তাঁহাদের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার হয় নাই। একমাত্র বিজয়গড়ে তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার হইয়াছিল এবং সেই অত্যাচারের কথাই সর্বত্র আলোচিত হইয়া থাকে। বিজয়গড় কাশী হইতে ২৫ ক্রোশ দক্ষিণ এবং শোণনদ হইতে ৪৷৷০ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত।[৫১] সেই স্থানে রাজমাতা অবস্থান করিতেছিলেন এবং বিজয়গড়েই তাঁহাদের উপর পাশবিক অত্যাচার হয়। এই বিজয়গড়ের অত্যাচার বারাণসীর অত্যাচার বলিয়া এতদঞ্চলে কথিত হইয়া থাকে। কান্তবাবু এ অত্যাচার হইতে সৈনিকদিগকে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হন নাই, আমরা পূর্বেই এ কথার উল্লেখ করিয়াছি। সমর্থ না হইলেও তিনি এ বিষয়ে যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য অবশ্যই ধন্যবাদের পাত্র। সমর্থ হইলে, তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইত। এই সময় কান্তবাবু রাজমাতার নিকট হইতে যে সমস্ত বহুমূল্য অলঙ্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎসমুদায় অদ্যাপি কাশীমবাজার রাজভবনে বিদ্যমান আছে এবং কাশীরাজমাতার প্রদত্ত অলঙ্কার বলিয়া তাঁহারা সেগুলিকে নির্দেশ করিয়া থাকেন।

হেস্টিংস চেৎসিংহকে রাজ্যচ্যুত করিয়া, তাঁহার ভাগিনেয়কে বারাণসী-রাজ্য প্রদান করেন। এই সময়ে সকলেই আপন আপন উদর পূরণ করিয়াছিলেন। কেবল সৈন্যগণ যে লুণ্ঠন করিয়া আপনাদের ক্ষোভ মিটাইয়াছিল এমন নহে, হেস্টিংস ও তাঁহার অনুচরগণও আপনাদের পেটিকা পূর্ণ করেন। রাজমাতার প্রদত্ত অলঙ্কার ব্যতীত কান্তবাবু লুণ্ঠনেরও যথোচিত অংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সকলেই যখন নিজ নিজ অংশ প্রাপ্ত হইল, তখন তিনি স্বীয় অংশ ছাড়িবেনই বা কেন? লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির সঙ্গে কান্তবাবু কাশীরাজভবন হইতে লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা, রামচন্দ্রী মোহর, একমুখ রুদ্রাক্ষ ও দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ, লুণ্ঠনের অংশ স্বরূপ আনয়ন করেন। সে সমস্ত অদ্যাপি কাশীমবাজার রাজবাটীতে অবস্থান করিতেছে। লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁহাদিগের রক্ষক হইয়া সর্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছেন। এই লুণ্ঠনের সময় কান্তবাবু আর একটি দ্রব্য আনয়ন করেন, সেটি একটি পাথরের দালান। চেৎসিংহের বাটী হইতে উত্তোলন করিয়া দালানটি কাশীমবাজারে তাঁহার স্ববাটীতে আনয়নপূর্বক স্থাপন করা হয়। তাহা আজিও অক্ষত অবস্থায় কান্তবাবু ও চেৎসিংহ উভয়ের নামই স্মরণ করাইয়া দিতেছে। অনেক দ্রব্য লুণ্ঠনের কথা শুনিয়াছি; কিন্তু দালানলুঠের কথা

৫১ Imperial Gazetter (Hunter), Vol. II, p. 116.

আমরা জানিতাম না। চিরকাল পুকুরচুরির কথা শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু কান্তবাবুর নিকট হইতে দালানলুঠের কথাও জানিতে পারি। এই সমস্ত ব্যতীত কান্তবাবুর আরও একটি লাভ হয়। চিরকালই কান্তবাবুর জমিদারীলাভের পিপাসাটা অত্যন্ত প্রবল ছিল। সে পিপাসা প্রবল হওয়ায় প্রভু হেস্টিংস তাহাও মিটাইয়াছিলেন। তিনি বারাণসীরাজ্য হইতে স্বীয় প্রিয়পাত্র কান্তকে বালিয়া নামক একটি জমিদারী জায়গীরস্বরূপ প্রদান করেন। বালিয়া এক্ষণে গাজীপুর জেলার অন্তর্ভূত; অদ্যাপি তাহা কাশীমবাজার রাজবংশের অধীন রহিয়াছে। সুতরাং আমরা দেখাইলাম যে, সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে বারাণসীসংক্রান্ত ব্যাপারে লিপ্ত না থাকিলেও কান্তবাবুর লভ্যাংশ বড় কম হয় নাই। হেস্টিংসের সহিত যেখানে যে কোন ব্যাপারে গমন করিতেন, সেই স্থান হইতে নিজের সুবিধা করিয়া লইতে পারিতেন। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইলে, মনুষ্যের সুবিধা আপনা হইতেই উপস্থিত হয়।

কান্তবাবু হেস্টিংসের কিরূপ প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং তাহার দ্বারা কিরূপে ভাগ্যলক্ষ্মীর অনুগ্রহভাজন হইয়াছিলেন, তাহা আমরা যথাসাধ্য প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। নিজের বেনিয়ানী ব্যতীত হেস্টিংসসাহেব কান্তবাবুকে আর একটি সরকারী কার্য প্রদান করেন, তাহা অবৈতনিক কি না জানা যায় না। সম্ভবতঃ বেতন থাকিতে পারে। কোম্পানীর বিচারালয়সমূহে জাতিঘটিত কোন তর্ক উপস্থিত হইলে, কান্তবাবুর উপর তাহার বিচারভার অর্পিত হইত। কিন্তু এই বিচারালয়ে উচ্চতর জাতিসমূহের বিচার হইত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, স্বয়ং হেস্টিংসসাহেব একস্থানে সে কথার উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা এই বিচারালয়সম্বন্ধে যাহা কিছু অবগত হইয়াছি, তাহা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। জাল-করা অভিযোগে মহারাজ নন্দকুমার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলে, কান্তবাবু জাতিঘটিত বিচারালয়ের প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, নন্দকুমার কারাগারে সন্ধ্যা, তর্পণ ও আহারাদি করিতে পারেন কি না, এ বিষয়ে কান্তবাবুকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য কাউন্সিলের অধিবেশনে ক্লেভারিংসাহেব প্রস্তাব করেন। গবর্নর জেনারেল তাহাতে অমত করিয়া বলেন যে, কান্তবাবু কেবলই ছোট লোকদিগের জাতিঘটিত গোলযোগের বিষয় মীমাংসা করিয়া থাকেন এবং জাতিঘটিত কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত তাঁহার উপর নির্ভর করা যাইতে পারে না। কারণ তিনি স্বীয় ধর্মশাস্ত্রে অভ্যস্ত নহেন। গবর্নর বলেন যে, তিনি সেই বিচারালয়ের সর্বপ্রধান কর্তা এবং নিজেই স্বীকার করিতেছেন যে, হিন্দুধর্মসম্বন্ধে তিনি স্বয়ং কিছুই অবগত নহেন।[৫২]

হেস্টিংসসাহেবের উক্ত কথা হইতে দুইটি বিষয়ের বিবেচনা করা যাইতে পারে। একটি বাস্তবিকই কান্তবাবু হিন্দুশাস্ত্রের কিছুই অবগত না থাকায়, হেস্টিংস সত্য কথাই বলিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ পাছে কান্তবাবু কারাগারে নন্দকুমারের আহারাদিসম্বন্ধে কোনরূপ অমত প্রদান করেন এই ভাবিয়া কান্তবাবুর অনুপস্থিতি ইচ্ছা করিয়া

৫২ Selections from State Papers, Vol. II, p. 367.

সদস্যদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু হেস্টিংসের সেরূপ আশঙ্কার কোন কারণ ছিল না। কারণ কান্তবাবু নন্দকুমারকে বিপদগ্রস্ত করিবার জন্য একেবারে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। কান্তবাবু যে হিন্দুশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ছিলেন তাহাও যথার্থ, কারণ, তিনি উচ্চজাতিসম্ভূত ছিলেন না। সেইজন্য বোধ হয় যে, বাস্তবিকই তিনি নীচ লোকদিগের জাতিঘটিত বিবাদবিসংবাদের মীমাংসা করিতেন। তাঁহার নিজের উক্তি হইতেও তাহার সমর্থন হয়। আমরা এস্থানে তাহারও উল্লেখ করিতেছি।

ফ্রান্সিস ও মন্সন কান্তবাবুর উপস্থিতির পক্ষেই মত প্রদান করেন, কাজেই কান্ত-বাবুকে উপস্থিত হইতে হয়। কান্তবাবুকে তাঁহার বিচারালয়ের ও কোন্ কোন্ বিষয়ের বিচার কিরূপভাবে করিতে হয়, তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি নিম্নলিখিত উত্তর প্রদান করেন। কাউন্সিল গৃহের সম্মুখেই তাঁহার জাতিঘটিত বিষয়ের বিচারালয় অবস্থিত। জাতিনাশ ও বিবাহ প্রভৃতির বিষয়ে তিনি বিচার করিয়া থাকেন। তাঁহার সাহায্যের জন্য একজন দারোগা ও দুইজন মোহরের নিযুক্ত আছে। মুসলমান-দিগের বিষয়, ভিন্ন বিচারালয়ে মৌলবীদিগের দ্বারা সম্পাদিত হয়। তাঁহার মীমাংসাই একেবারে শেষ নহে, যাহারা তাঁহার বিচারে সন্তুষ্ট না হয়, তাহারা গবর্নরের নিকট আপীল করিয়া থাকে। তাঁহাকে কোনও বিষয়ে আদেশ দিতে হইলে, গবর্নরের স্বাক্ষরের প্রয়োজন হয়। যাহারা উক্ত বিচারালয়ে দোষী স্থির হয়, তাহাদিগের স্বজাতিদিগকে ভোজ প্রদান করিবার জন্য অর্থদণ্ড দিতে হয়। বিচারালয়ে জরিমানার কোন নিয়ম নাই, অপরাধীরা তাঁহার আদেশ অমান্য করিলে, তাহাদিগের দুই এক দিন কারাবাসে থাকিবারও বিধি আছে। হেস্টিংসসাহেব গবর্নর হইবার পর হইতেই কান্তবাবু উক্ত বিচারালয়ে নিযুক্ত হন ; ইতিপূর্বে অন্যান্য গবর্নরের বেনিয়ানগণও উক্ত কার্য করিতেন।

জেনারেল ক্লেভারিং কান্তবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন যে, স্নান করা হিন্দুধর্মের একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ কিনা ? কান্তবাবু উত্তর দেন যে, লোকে সুস্থ থাকিলে ইহা করা সঙ্গত বটে, কিন্তু সেরূপ অবস্থা না হইলে সে করিয়া উঠিতে পারে না। এই সময়ে গবর্নর জেনারেল জিজ্ঞাসা করেন, কেহ সুস্থ শরীরে থাকিয়া স্নান না করিলে কোন অপরাধ হয় কিনা ? কান্তবাবু উত্তর দেন যে, তাহাতে অপরাধ হয় কি না, তাহা ধর্মশাস্ত্রে লিখিত আছে, আমি শাস্ত্র জানি না। পরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তুমি ব্রাহ্মণ কিনা ? উত্তর—আমি ব্রাহ্মণ নহি। সাধারণতঃ ব্রাহ্মণেরাই ধর্মানুষ্ঠান প্রতিপালন করিয়া থাকে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে, কান্তবাবু উত্তর দেন যে, শাস্ত্রের আদেশ সকল জাতির প্রতিই সমান। তবে ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ আদেশ তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থে লিখিত আছে, সে সকলের বিষয় আমি কিছুই অবগত নহি। আহারের পূর্বে স্নান করা আবশ্যক কিনা এই কথার উত্তরে কান্তবাবু বলেন যে, আহারের পূর্বে স্নানাহ্নিক করা নিয়ম বটে। কিন্তু যে স্থলে লোক স্নান করিতে পারে না, সে স্থলে আহারের পূর্বে আহ্নিক করিতে হয়। ছোট জাতিরা স্নান না করিয়াও আহার করিয়া থাকে। উহার

পর কান্তবাবুকে শেষ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় যে, যদি দুর্ভাগ্যক্রমে তোমাকে কারাবাস করিতে হয়, তাহা হইলে তোমার জাতিনাশ হওয়ার বিপদ ঘটিতে পারে কি না? তাহাতে তিনি উত্তর দেন যে, শুধু কারাবাস করিলে জাতিনাশের ভয় নাই, তবে খুন ডাকাতি প্রভৃতি করিয়া কারাবাস করিলে জাতি যাইবার সম্ভাবনা আছে।[৫৩]

কান্তবাবুর এই সকল উক্তি হইতে বেশ বুঝা যায় যে, তিনি বাস্তবিকই নীচলোক-দিগের বিচার করিতেন, কারণ শাস্ত্রজ্ঞান না থাকিলে কখন ব্রাহ্মণাদি জাতির বিচার করা সম্ভবপর হয় না। যাহা হউক, জাতিঘটিত বিচারালয়ের একটি প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, তাঁহার গৌরবের যে একটি নিদর্শন, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

হেস্টিংসের যে কয়েকটি প্রিয়পাত্র ছিলেন, তন্মধ্যে কান্তবাবু শান্তপ্রকৃতি ও অপেক্ষাকৃত ধর্মভীরু বলিয়া বোধ হয়। যদিও অর্থের প্রলোভনে তাঁহার জীবনে পদে পদে তাঁহাকে সৎপথ হইতে বিচলিত হইতে দেখা যায়, তথাপি দেবীসিংহ ও গঙ্গাগোবিন্দসিংহের ন্যায় তিনি অত্যাচারী বা পূর্ণমাত্রায় প্রবঞ্চক ছিলেন না। দেশের যাবতীয় লোকের সর্বনাশ সংঘটন করিতে হইবে বলিয়া, তিনি কোম্পানীর দেওয়ানী লইতে স্বীকৃত হন নাই; তাঁহার অপারগতা তাহার প্রধান কারণ হইলেও উপরোক্ত কারণটি অন্যতম। পরে উক্ত দেওয়ানী সুবিখ্যাত গঙ্গাগোবিন্দের প্রতি অর্পিত হওয়ায়, তিনি বঙ্গদেশে আপনার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। অর্থলালসা প্রবল থাকায়, কান্তবাবুকে অনেকগুলি অসৎকর্ম করিতে হইয়াছিল; প্রবল অর্থলালসাবশে তিনি স্বীয় প্রভু হেস্টিংসের মনস্তুষ্টি-সম্পাদনার্থ প্রায়শঃ কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনা করিতেন না। যদিও অর্থলালসার জন্য কান্তবাবু সাধুসমাজে নিন্দিত হইয়াছেন, তথাপি সে সময়ের কথা ভাবিতে গেলে, তাঁহাদিগের দোষের মাত্রা অত্যধিক মনে না করাই যুক্তিসঙ্গত। যে সময়ে সাধারণ লোকসমাজে উৎকোচগ্রহণ, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি বিশেষ দোষ বলিয়া গণ্য হইত না; সে সময়ের লোকেরা ঐরূপ কোন অপরাধ করিলে তাঁহাদিগকে ক্ষমা করাই উচিত। তবে দোষ চিরকালই নিন্দনীয়। তৎসম্বন্ধে সময়াসময় বিবেচনা করা যাইতে পারে না; সত্যের অনুরোধে কান্তবাবুর সম্বন্ধে আমাদিগকে দুই একটি অপ্রিয় সত্য কথা বলিতে হইয়াছে।

হেস্টিংস কান্তবাবুর কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে রাজোপাধি প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু কান্তবাবু নিজের পরিবর্তে তাহা স্বীয় পুত্র লোকনাথকে প্রদান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। লোকনাথ পরে নবাব নাজিমের নিকট হইতে মহারাজ উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৭৮৫ খ্রীঃ অব্দের প্রথমে হেস্টিংসসাহেব ইংলণ্ডে গমন করিলে, কান্তবাবু কাশীমবাজারে আসিয়া বাস করেন। তিনি কলিকাতায় থাকিতে ভাল বাসিতেন না; হেস্টিংসসাহেবের সময়েই তিনি মধ্যে

৫৩ Selections from State Papers, Vol. II, p. 371-72.

মধ্যে কাশীমবাজারে আসিতেন। কলিকাতায় তাঁহার বাসভবন থাকিলেও কাশীমবাজার হইতে তাঁহার ভাগ্যোন্নতির সূচনা হওয়ায়, তিনি ঐ স্থানটিকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। কিন্তু এই সময় হইতে কাশীমবাজারেরও শ্রীবৃদ্ধির হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। ১৭৮৮ খ্রীঃ অব্দে লালবাগ ও সৈয়দাবাদের মধ্যে একটি খাল কাটা হইয়া ভাগীরথীর উভয় মুখ সংযুক্ত হওয়ায়, কাশীমবাজারের নিম্নস্থ ভাগীরথী ক্রমে বদ্ধ বিলে পরিণত হইতে আরম্ভ হয়। সেইজন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে এখানে মহামারী উপস্থিত করিয়া ইহাকে অরণ্যতুল্য করিয়া তুলে।[৫৪] তথাপি কান্তবাবু জন্মভূমি বলিয়া তথায় বাস করিতে ভাল বাসিতেন। হেস্টিংসসাহেব ভারত পরিত্যাগ করার পর কান্তবাবু অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। স্বয়ং রাজোপাধি গ্রহণ না করায়, সাধারণ লোকে হেস্টিংসের দেওয়ান বলিয়া তাঁহাকে দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত নামে অভিহিত করিত।

দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত নামে আর এক জন কৃতী পুরুষও মুর্শিদাবাদে ভাগ্যলক্ষীর কৃপা লাভ করেন। ইনি বহরমপুরের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার সেনবংশীয়গণের আদিপুরুষ। কলিকাতার দুর্গাচরণ মিত্র-স্ট্রীটস্থ তাঁহার বাসভবন অদ্যাপি দেওয়ানবাটী বলিয়া প্রসিদ্ধ।[৫৫] সেন কৃষ্ণকান্ত কোম্পানীর নিমকমহালের দেওয়ান ছিলেন। উভয়েই দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত নামে অভিহিত হওয়ায়, তাঁহাদের প্রসঙ্গ লইয়া পূর্বকালে এতদ্দেশীয় প্রাচীনেরা অনেক সময় গোলযোগ করিতেন।

কান্তবাবু অনেকবার দার পরিগ্রহ করেন; শেষ পত্নীর গর্ভেই লোকনাথের জন্ম হয়। লোকনাথের মাতার নাম ক্ষুদুমণি। বর্ধমান জেলার কুড়ুম্ব নামক গ্রাম লোকনাথের মাতুলালয়। কাশীমবাজার রাজবংশের আদিপুরুষ ও হেস্টিংসের প্রিয়পাত্র কান্তবাবু আপনার একমাত্র পুত্র লোকনাথকে রাখিয়া বাঙ্গলা ১২০০ সালের পৌষ মাসে জাহ্নবীতীরে জীবন বিসর্জন করেন। তাঁহার অর্জিত বিশাল সম্পত্তি আজিও তাঁহার পরিচয় দিতেছে। কান্তনগর নামে একটি পরগণা তাঁহার নামানুসারে হইয়াছে বলিয়া কথিত আছে। বহরমপুরের পূর্বভাগে ঐ নামের একটি ক্ষুদ্র গ্রামও রহিয়াছে।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, অর্থলোভে কান্তবাবু কোন কোন অসৎকর্মের অনুষ্ঠান করিলেও, তাঁহার হৃদয় হইতে একেবারে হিন্দুজনোচিত ধর্মভাবের লোপ হয় নাই। তিনি অনেক স্থলে তাহার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক গল্প

৫৪ টমাস লায়ান সাহেব উক্ত খাল খনন করেন। সেই সময়ে পলাশীর বাঁকও কাটা হয়।

৫৫ উক্ত বাটী পূর্বে দুর্গাচরণ মিত্রেরই ছিল। ঐ বাটিতে রামপ্রসাদ "দে মা আমায় তবিলদারী" গান রচনা করিয়া প্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। পরে উক্ত বাটী দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত ক্রয় করেন।

সেণ্ট্রাল এভিনিউ রাস্তা তৈয়ারী করিবার সময় কলিকাতা ইনপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট উক্ত বাটী ভাঙ্গিয়া তাহার উপর দিয়া রাস্তা তৈয়ারী করিয়াছে।

প্রচলিত আছে, আমরা দুই একটির উল্লেখ করিতেছি। কান্তবাবু যখন কাশীমবাজার ইংরেজ কুঠীতে মুহুরীর পদে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় হইতে একজন কলু তাঁহার বাটীর নিকট বাস করিত। কান্তবাবুকে প্রাতিদিনই তাহার মুখ দর্শন করিয়া কার্যস্থানে যাইতে হইত। কিন্তু প্রচলিত প্রবাদানুসারে তাঁহার কার্যে কোনরূপ বিঘ্ন না ঘটিয়া বরং উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ হয়। যৎকালে তিনি বিশাল সম্পত্তির অধিপতি হইয়া কাশীমবাজারে স্বীয় বাসভবন নূতনরূপে নির্মাণ করাইয়া চতুর্দিক হইতে সম্মান ও গৌরব লাভ করিতেছিলেন, সে সময়েও উক্ত কলু তাঁহার বাটীর নিকটেই বাস করিবার অধিকার পায়। কান্তবাবু তাহাকে নির্ভয়ে বাস করিতে অনুমতি প্রদান করেন। একদিন তাঁহার কোনও আত্মীয় তাঁহাকে বলেন যে, আপনার প্রাসাদের নিকট একজন ইতরজাতি বাস করিবে, ইহা কদাচ সঙ্গত নহে। অতএব যাহাতে উক্ত কলু স্থানান্তরিত হয়, তজ্জন্য আপনার যত্ন করা উচিত। কান্তবাবু উত্তর করিলেন যে, তিনি প্রতিদিন উহার মুখ দেখিয়া কার্যস্থানে গমন করিতেন, তাহাতে তাঁহার উন্নতি ব্যতীত কদাচ অবনতি ঘটে নাই। এখন তাঁহার এক প্রকার উন্নতির চরমসীমা হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি যদি এক্ষণে ঐ দরিদ্রকে তাহার বাসস্থান হইতে বিদূরিত করিয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পাপের ভাগী হইতে হইবে। তিনি যতদিন জীবিত থাকিবেন, ততদিন উহাকে রক্ষা করিবেন। কান্তবাবু উক্ত কলুকে বিশেষরূপ সাহায্য করিতেন। এইরূপ অনেক গল্প তাঁহার জীবনের সহিত জড়িত রহিয়াছে।

কান্তবাবু একবার তীর্থপর্যটনে বহির্গত হন। ক্রমে ক্রমে জগন্নাথক্ষেত্র পুরীধামে উপস্থিত হইয়া অন্নসত্র খুলিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু একটি বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়। পাণ্ডারা প্রথমে বঙ্গদেশ হইতে একজন ধনী আসিয়াছেন জানিয়া, কান্তবাবুকে দোহন করিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিনি অন্নসত্র খুলিবার প্রস্তাব করিলে, তাঁহারা কোনরূপে অবগত হইলেন যে, কান্তবাবু জাতিতে তেলি। তৈলকারের নিকট হইতে দানগ্রহণে পাণ্ডারা স্বীকৃত হইলেন না। কান্তবাবু অত্যন্ত বিপদে পড়িলেন। তিনি বাস্তবিক তৈলকার নহেন। অথচ পাণ্ডাগণের এ ভ্রম দূর করাও সহজ নহে। তীর্থক্ষেত্রে আসিয়া যদি কেহ দান গ্রহণ না করে, অথবা নিজ সঙ্কল্প সংসাধিত না হয়, তাহা হইলে হিন্দুহৃদয়ে যে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়া থাকে, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। তিনি স্বীয় জাতিত্বের প্রমাণের জন্য নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে ব্যবস্থা আনয়নের বন্দোবস্ত করিলেন। পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা দিলেন যে, তাহারা বাস্তবিক তৈলকার নহেন, তৈলিক, অর্থাৎ তেলি নহেন, তিলি। তিলিগণ নবশাখশূদ্রের অন্যতম; তাঁহারা সচ্ছূদ্র; তাঁহাদের দানগ্রহণে সেরূপ প্রত্যবায় নাই। তখন তাঁহারা স্বীকৃত হইয়া কান্তবাবুর দান গ্রহণ করেন এবং তাঁহার অন্নসত্রেরও সুবন্দোবস্ত করিয়া দেন। তীর্থস্থানে অপদস্থ হওয়ায় কান্তবাবু যে বিচলিত হইয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই সমস্ত গল্প ও প্রবাদ বিচার করিলে,

কান্তবাবুর যে কিছু কিছু ধর্মভীরুতা ছিল, তাহাও বেশ বুঝা যায়। কিন্তু অর্থলালসার জন্য তিনি যে সমস্ত অসৎকার্য করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার জীবনে দুরপনেয় কলঙ্ক প্রদান করিয়াছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নন্দকুমারের হত্যায় তাঁহার যোগের কথা এবং রানী ভবানীর নিকট হইতে বাহারবন্দগ্রহণের কথা যখন মনে হয়, তখন তাঁহার অহিন্দুজনোচিত ব্যবহার স্মরণ করিয়া বাঙ্গালী জাতির প্রতি ঘৃণার উদয় হইয়া থাকে। যাহা হউক, কান্তবাবু একেবারে ধর্মহীন ছিলেন না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

কান্তবাবু সম্বন্ধে আমরা যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তৎসমুদায় সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম। এক্ষণে তদ্বংশীয়গণেব সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া, আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কান্তবাবুর মৃত্যুর পর মহারাজ লোকনাথ বাহাদুর অতীব দক্ষতাসহকারে পিতৃগৌরব ও নিজ কীর্তিবিস্তারের চেষ্টা করেন। কিন্তু বিষয়লাভের অব্যবহিত পরেই কালব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায়, তিনি স্বীয় জীবনকে ক্লেশকর বিবেচনা করিয়াছিলেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন রোগের আক্রমণে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য হন। বাঙ্গলা ১২১১ সালে তাঁহার জীবনবায়ুর অবসান হয়।

মহারাজ লোকনাথের মহিষীর নাম রাজ্ঞী সুসারমোহিনী। মহারাজের মৃত্যুর পর তাঁহার একবর্ষবয়স্ক শিশুপুত্র কুমার হরিনাথ কাশীমবাজার রাজসম্পত্তির অধিকারী হন। তিনি অত্যন্ত শিশু বলিয়া সম্পত্তি কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের অধীন হয়। হরিনাথ প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া অনেক সৎকার্যে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। হিন্দু-কলেজের স্থাপনের জন্য তিনি ১৫,০০০ হাজার টাকা প্রদান করেন। তিনি অত্যন্ত প্রজাবৎসল ছিলেন। স্বীয় জমিদারীর মধ্যে প্রজাদিগের জলকষ্ট হইলে, তিনি পুষ্করিণী খনন করাইয়া তাহার নিবারণ এবং অন্যান্য অনেক প্রকার উপায়ে প্রজাদের উপকার করিতেন। কাশীমবাজার-রাজবংশের ন্যায় প্রজাবৎসল জমিদার অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। হরিনাথ পণ্ডিত, সঙ্গীতজ্ঞ ও ব্যায়ামকারীদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিতেন। তাঁহার সময়ে কাশীমবাজারের বিখ্যাত নৈয়ায়িক কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন বঙ্গদেশমধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। লর্ড আমহার্স্ট কুমার হরিনাথ বাহাদুরকে রাজোপাধি প্রদান করেন।

১২৩৯ সালে ১৪ই অগ্রহায়ণ হরিনাথ একমাত্র পুত্র কৃষ্ণনাথ, বিধবা রাজ্ঞী হরসুন্দরী ও কন্যা গোবিন্দসুন্দরীকে রাখিয়া পরলোকগত হন। কুমার কৃষ্ণনাথ অপ্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া বিষয় কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের অধীন হয়। কুমার কৃষ্ণনাথ বাল্যকালে ইংরেজী ও পারস্য ভাষায় উত্তমরূপে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। সে সময়ে ইংরেজী শিখিয়া বাঙ্গলার কৃতী সন্তানগণ যে দোষ অর্জন করিতেন, কৃষ্ণনাথেরও তাহাই ঘটে। যৌবনারম্ভে তিনি ইংরেজী সভ্যতানুযায়ী অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠেন, কিন্তু তিনি পিতার সমস্ত সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়

অত্যন্ত উচ্চ ছিল ; মুক্তহস্ততায় তাঁহার ন্যায় লোক তৎকালে দৃষ্ট হইত না। তিনি শিক্ষাকার্যে অত্যন্ত উৎসাহ প্রদান করিতেন। হেয়ারসাহেবের স্মরণচিহ্নস্থাপন-সভায় তিনি সভাপতির কার্য করিয়াছিলেন, এবং সর্বাপেক্ষা অধিক অর্থ প্রদান করেন। তাঁহার প্রিয় উদ্যানবাটী বানজেটিয়ায় নিজ নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় করিবার জন্য প্রায় সমস্ত সম্পত্তি উইল করিয়া যান। বিদ্যাশিক্ষার এরূপ জ্বলন্ত উৎসাহ কয়টি দেখিতে পাওয়া যায় ? কৃষ্ণনাথ লর্ড অকল্যাণ্ড-কর্তৃক রাজোপাধিতে ভূষিত হন। একটি মোকর্দমায় তাঁহার বিচারালয়ে উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনায়, কৃষ্ণনাথ সম্মানহানির আশঙ্কায় আত্মহত্যা সম্পাদন করেন। ১৮৪৪ খ্রীঃ অব্দের ৩০শে অক্টোবর এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। তাঁহার ন্যায় মুক্তহস্ত ও উচ্চ-হৃদয় পুরুষ এতদ্দেশে বিরল।

রাজা কৃষ্ণনাথের মৃত্যুর পর তদীয় সহধর্মিণী কীর্তিমতী মহারানী স্বর্ণময়ী মহোদয়া কাশীমবাজার রাজসম্পত্তির অধিকারিণী হন। মহারানী মহোদয়ার নূতন পরিচয় দেওয়া বাতুলের কার্য। যাঁহার নাম বঙ্গের প্রত্যেক দরিদ্রের গৃহ হইতে প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইতেছে, যাঁহার দানস্রোত বিশাল ভারতভূমি অতিক্রম করিয়া সুদূর ইউরোপ পর্যন্ত গমন করিয়াছে, তাঁহার আবার নূতন পরিচয় কি ? যিনি মূর্তিমতী দয়া ; পরোপকার যাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত, তাঁহার নাম কোন্ বাঙ্গালী অবগত নহে ? তিনি বঙ্গদেশে একমাত্র ব্রাহ্মণসেবা ও দরিদ্র-পালনের ভার লইয়াছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শত শত ব্রাহ্মণ, শত শত দরিদ্র তাঁহার দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছে। স্বর্ণময়ীর স্বর্ণময় নাম চিরদিনই বাঙ্গলার ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত থাকিবে। মহারানী মহোদয়ার সুকীর্তির বিবরণ লিখিতে হইলে, একখানি বৃহদায়তন পুস্তক হইয়া উঠে ; সুতরাং এখানে সে বিষয়ে অধিক লেখা সম্ভব নহে।

মহারানী মহোদয়ার অশেষবিধ কীর্তি থাকিলেও হিন্দুভাবের কোনও বিশেষ স্থায়িকীর্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। চিরদিন হইতে মহারানী মহোদয়ার সুনাম দিগ্‌দিগন্তে বিঘোষিত হইতেছে ; কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে যে, শেষকালে তাঁহার সুনামের চতুর্দিকে একটু একটু করিয়া যেন কালিমা পড়িয়াছিল। স্বজনবর্জন, প্রজাপীড়ন, দান-সঙ্কোচের কলঙ্কচ্ছায়া যেন ধীরে ধীরে তাঁহার যশোভাতির নিকট ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। আমাদের বিশ্বাস, মহারানী মহোদয়ার অজ্ঞাতসারে ইহাদের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। নতুবা যিনি মূর্তিমতী দয়া, তাঁহার যশঃকিরণের নিকট কখনও কলঙ্কচ্ছায়া কি অগ্রসর হইতে পারে ? মুক্তহস্ততার জন্য তিনি মহারানী, ও এম. আই. এবং সি. আই. উপাধি লাভ করেন, এবং দুর্ভিক্ষের সময় অর্থসাহায্য করায়, তাঁহার উত্তরাধিকারী মহারাজ উপাধিতে ভূষিত হইবেন বলিয়া গভর্নমেণ্ট অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

১৩০৪ সালের ভাদ্রমাসে স্বর্ণময়ী স্বর্গধামে গমন করেন। রাজা কৃষ্ণনাথের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহারানী মহোদয়ার পর কাশীমবাজারের সম্পত্তির

অধীশ্বর হইয়াছেন। মণীন্দ্রচন্দ্র বঙ্গদেশের একটি উজ্জ্বল রত্ন। এমন স্বজন-প্রতিপালক, উদারহৃদয়, মহত্ত্বের জ্বলন্ত আদর্শ অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহার গার্হস্থ্যজীবন প্রত্যেক বাঙ্গালীর শিক্ষণীয়। দেশহিতব্রতে ও বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র সর্বদাই অগ্রসর। বাঙ্গলার জমিদারগণের প্রতিনিধি-স্বরূপ তিনি বঙ্গীয় ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদে আসীন হইয়াছিলেন। গবর্নমেণ্ট-কর্তৃক তিনি মহারাজ ও কে. সি. আই. ই. উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। তাঁহার উত্তরাধিকারীও মহারাজ উপাধি পাইবেন। ভগবানের আশীর্বাদে তিনি ও মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্র দীর্ঘজীবনলাভপূর্বক কাশীমবাজার রাজাসন অলঙ্কৃত করুন।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ

কত দিন, কত মাস, কত বৎসর অতীত হইল, আজিও বঙ্গদেশে গঙ্গাগোবিন্দের নাম সমান ভাবেই চলিয়া আসিতেছে! ইংরেজরাজত্বের ভিত্তিস্থাপনের সময়ে যাঁহার কূটমন্ত্রে সমগ্র বঙ্গরাজ্যের শাসননীতি পরিচালিত হইয়াছিল, তাঁহার নাম যে চিরদিনই অক্ষুণ্নভাবে বিরাজ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? মানুষ দুই ভাবে অক্ষয় হয়। কেহবা কুনামে, কেহবা সুনামে। রাবণ, দুর্যোধন, নিরো, চতুর্দশ লুই, ইঁহাদের নাম আজিও ধরণীপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যায় নাই, এবং রাম, যুধিষ্ঠির ও আকবরের নামও অদ্যাপি উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। ওয়ারেন্ হেস্টিংস ও ডালহৌসির নাম ভারতের অস্থিমজ্জায় বিঁধিয়া আছে, আবার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং স্বায়ত্ত-শাসনের সঙ্গে কেহ কখনও লর্ড কর্নওয়ালিস্ ও লর্ড রিপনকে বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। যতদিন পর্যন্ত বাঙ্গলায় জমিদারী প্রথা প্রচলিত রহিবে, ততদিন গঙ্গাগোবিন্দের নামও অক্ষয় হইয়া থাকিবে। শত বৎসর পূর্বে যাঁহারা বাঙ্গলার জমিদারী উপভোগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরদিগের এক্ষণে নিতান্ত অভাব নাই। তাঁহাদের অণুপরমাণুতে গঙ্গাগোবিন্দের নাম মিশিয়া আছে।

সুভাবেই হউক বা কুভাবেই হউক, গঙ্গাগোবিন্দের নিকট তৎকালীন জমিদার-দিগের সকলকেই মস্তক অবনত করিতে হইত। বাঙ্গলার শীর্ষস্থানীয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র চতুর্দিক অন্ধকারময় দেখিয়া, "ভরসা কেবল গঙ্গাগোবিন্দ" বলিয়া আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হন। এইরূপ সেই সময়ের প্রত্যেক জমিদার ও ভূস্বামী গঙ্গাগোবিন্দের মনস্তুষ্টির জন্য সর্বদা সচেষ্ট হইতেন। যাঁহার একটু সামান্য ভূমিমাত্র ছিল, তাঁহাকেও 'দেওয়ানজীকে' সন্তুষ্ট রাখিতে হইয়াছিল। লোকে দেশের শাসনকর্তা গবর্নর জেনারেল বাহাদুরকে যেরূপ সম্মান না দেখাইত, দেওয়ানজীকে তদপেক্ষা অধিক দেখাইতে হইত। তাহারা জানিত যে, গঙ্গাগোবিন্দের প্রসাদের উপর তাহাদের জীবনমরণ নির্ভর করিতেছে; অথবা সমস্ত ইংরেজরাজত্ব পরিচালিত হইতেছে। এ কথার মধ্যে যে অধিকাংশই সত্য, তাহা অস্বীকার করা যায় না। গঙ্গাগোবিন্দের সহিত গবর্নর হেস্টিংসের এরূপ একাত্মতা ছিল যে, লোকে তাঁহাদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করিয়া উঠিতে পারিত না। হেস্টিংস নিজমুখে গঙ্গা-গোবিন্দকে আপনার বিশ্বাসী 'বন্ধু' বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মহামতি বার্ক গঙ্গাগোবিন্দকে দেবীসিংহের ন্যায় নিষ্ঠুর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি ইংলণ্ডের মহাসভায় এইরূপ বলিয়াছিলেন যে, গঙ্গাগোবিন্দের নামে সমস্ত ভারতবাসী বিবর্ণ হইয়া উঠে এবং ভারতের ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের মধ্যে ইঁহার ন্যায় দুর্বৃত্ত, দুর্দান্ত, নির্ভীক ও শঠ কখন দেখা যায় নাই।[১] আমরা কিন্তু তাঁহাকে সেরূপ শয়তানপদ-

১ "A name at the sound of which all India turns pale—the most

বাচ্য করিতে ইচ্ছুক নহি। তবে স্বার্থসিদ্ধি ও উচ্চাশার বেদীতলে তিনি যে ন্যায়, ধর্ম, স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রীতি বলি দিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। ভগবান্ তাঁহাকে অপরিমিত বুদ্ধি ও ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে দেশের যথেষ্ট মহোপকার সংসাধিত করিতে পারিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার বুদ্ধি ও ক্ষমতা কুপথেই পরিচালিত হইয়াছিল।

বঙ্গের তৎকালীন রাজস্ববন্দোবস্ত গঙ্গাগোবিন্দ ব্যতীত সম্পন্ন হয় নাই, ইহা একটি জ্বলন্ত সত্য; এমন কি লর্ড কর্নওয়ালিসের অক্ষয় কীর্তি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সহিতও গঙ্গাগোবিন্দের সম্বন্ধ বিজড়িত রহিয়াছে। আজ যদি সেই গঙ্গাগোবিন্দকে আমরা ন্যায়পথে চলিতে দেখিতাম, যাঁহার উপর বাঙ্গলার ইংরেজ রাজত্বের সম্পূর্ণ ভার ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না, গবর্নর জেনারেল যাঁহার করতলগত, আজ যদি ন্যায় ও ও ধর্মের বিশাল প্রবাহে তাঁহাকে ভাসমান দেখিতাম, তাহা হইলে জগতে বাঙ্গলার গৌরব ও সুনাম চিরবিঘোষিত হইত। দুঃখের বিষয়, সে সময়ে যে কয়জন বাঙ্গালীর সহিত ইংরেজ-রাজ্যের সম্বন্ধ ছিল, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই স্বার্থপর ও স্বদেশদ্রোহী। হেস্টিংসের অপূরণীয় অর্থলালসা মিটাইবার জন্য গঙ্গাগোবিন্দ যে সমস্ত কুকীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে জগৎসমক্ষে চিরকাল বাঙ্গালীকে হেয় বলিয়া পরিচয় দিতেছে। আমাদের দুরদৃষ্টবশতঃ তাই বৈদেশিকগণের মধুর বিশেষণে আমরা প্রতিনিয়ত অভিহিত হইয়া থাকি!

আমরা প্রথমতঃ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পূর্বপুরুষগণের কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান করিতে ইচ্ছা করিতেছি। গঙ্গাগোবিন্দের পূর্বপুরুষগণ অনেক দিন হইতে মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত কান্দীতে বাস করিতেছিলেন। তাঁহারা জাতিতে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণ বহুদিন হইতে মুর্শিদাবাদের ফতেসিংহ প্রভৃতি স্থানে আবাসস্থান স্থাপন করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ কান্দীনিবাসী হরকৃষ্ণ সিংহ হইতে গঙ্গাগোবিন্দের ধারা গৃহীত হইয়া থাকে। হরকৃষ্ণ প্রথমতঃ কুসীদজীবীর ব্যবসায় করিতেন। পরে ক্রমে ক্রমে রেশমের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া, প্রচুর লাভ করিতে আরম্ভ করেন। মুর্শিদাবাদ চিরদিনই রেশমের ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত; সুতরাং সুবিধাক্রমে রেশমের ব্যবসায় আরম্ভ করিলে তাহাতে যে বিশেষ উন্নতি হইবে, ইহা বড় আশ্চর্যের কথা নহে। মহারাষ্ট্রীয়দিগের আক্রমণের সময় হরকৃষ্ণ কান্দী হইতে পলায়ন করিয়া, বোয়ালিয়া নামক স্থানে বাসস্থান নির্দেশ করিতে বাধ্য হন। বোয়ালিয়া ভাগীরথীর পূর্বতীরে অবস্থিত ছিল। মহারাষ্ট্রীয়গণ ভাগীরথীর পশ্চিম তীর অধিকার করিয়া অনেক দিন আপনাদের শাসনে রাখিয়াছিল এবং তাহাদের অত্যাচারে বাঙ্গলায়

wicked, the most atrocious, the boldest, the most dexterous villain that ever the rank servitude of that country has produced." (Burke's Impeachment of W. H., Vol. I, p. 164.)

প্রজাগণের দুর্দশার একশেষ হইত। কান্দী ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে হওয়ায়, হরকৃষ্ণ তাহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। হরকৃষ্ণ অনেক টাকা নজরানা দিয়া মুর্শিদাবাদের নবাবের নিকট হইতে বোয়ালিয়া গ্রাম নিজস্ব করিয়া লন; তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও কতিপয় গ্রাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বোয়ালিয়া তদবধি কান্দী রাজবংশীয়দের সম্পত্তিমধ্যে পরিগণিত হয়। বোয়ালিয়া হইতে পুনর্বার তাঁহারা কান্দীতে আসিয়া বাস করেন।

হরকৃষ্ণের পুত্র মুরলীধর হইতে নারায়ণসিংহ, গৌরাঙ্গসিংহ ও বিহারীসিংহ ভ্রাতৃত্রয়ের উৎপত্তি হয়। ইঁহাদের মধ্যে গৌরাঙ্গসিংহ নিজ ক্ষমতাগুণে নবাবসরকারে কার্য প্রাপ্ত হন। তাঁহার নাম হইতে কান্দীবংশীয়দের যশ প্রথমতঃ বাঙ্গলার সর্বত্র রাষ্ট্র হয়। গৌরাঙ্গসিংহ কাননগো বঙ্গাধিকারী মহাশয়দিগের অধীনতায় কার্য করেন। তৎকালে কাননগোমহাশয়দিগকে যাবতীয় জমাজমির নির্দেশসম্বন্ধীয় কাগজপত্র রাখিতে হইত। গৌরাঙ্গসিংহের ভূমি-সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যুৎপত্তি থাকায়, তিনি তাঁহাদের অধীন কর্মচারী হইয়া নিজের প্রভূত ক্ষমতাবলে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করেন এবং মজুমদার উপাধি প্রাপ্ত হন। গৌরাঙ্গসিংহ অত্যন্ত ভাগ্যবান্ পুরুষ ছিলেন। তিনি বহুল পরিমাণে অর্থ উপার্জনদ্বারা অনেক মহাল, তালুক ও লাখরাজভূমি ক্রয় করিয়া প্রচুর সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়া উঠেন। দেবসেবা প্রভৃতিতে তাঁহার যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, তিনি এক সময়ে কান্দীতে একটি সুন্দর অট্টালিকা নির্মাণ করিবার ইচ্ছা করিয়া, নবাব সিরাজউদ্দৌলার হীরাঝিলের উপরিস্থিত এম্‌তাজমহাল প্রাসাদের কার্ণিসের অনুকরণে স্বীয় অট্টালিকা প্রস্তুত করেন। সিরাজ এই সংবাদ শুনিয়া সেই অট্টালিকা ভগ্নস্তূপে পরিণত করিতে আদেশ দিয়া গৌরাঙ্গসিংহকে বন্দী করিয়া আনিতে বলেন।[২] তৎকালে সাধারণ্ লোকে নবাববাদশাহদিগের অনুকরণ করিতে পারিত না; করিলে, তাহাদিগকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত, এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক শুনিতে পাওয়া যায়।

গৌরাঙ্গসিংহের কোনও পুত্রাদি ছিল না। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিহারীসিংহের দীনদয়াল, রাধাকান্ত, রাধাচরণ ও গঙ্গাগোবিন্দ নামে চারি পুত্র হয়। গৌরাঙ্গ রাধাকান্তকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন; রাধাকান্ত অনেক স্থলে রাধাগোবিন্দ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। গৌরাঙ্গসিংহের পর রাধাকান্ত তাঁহার পদে নিযুক্ত হন এবং নিজ উদ্যমবলে অনেক সম্পত্তি উপার্জন করিয়াছিলেন। নবাব আলিবর্দী ও সিরাজউদ্দৌলার সময়ে রাধাকান্ত রাজস্ববিষয়ে অনেক উন্নতি দেখাইয়াছিলেন। কোম্পানীর দেওয়ানীগ্রহণের পরও তিনি ভূমিসম্বন্ধীয় অনেক বন্দোবস্ত করিয়া পুরস্কারস্বরূপ হুগলীতে রাজস্ব আদায়ের ভার ও একখানি সায়ার মহাল প্রাপ্ত হন। নবাব

২ Calcutta Review (1874), The Territorial Aristocracy of Bengal. (The Kandi Family.)

সিরাজউদ্দৌলার সর্বনাশের জন্য যে ভীষণ ষড়যন্ত্রের অভিনয় হইয়াছিল, ইতিহাসে উল্লিখিত থাকুক বা নাই থাকুক, যাহাতে প্রবাদানুসারে বাঙ্গলার প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান লোক লিপ্ত ছিলেন কি জমিদার কি উচ্চপদস্থ কর্মচারী কেহই বিরত ছিলেন না, রাধাকান্তও তাহার একজন নায়ক বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। তাঁহার সম্বন্ধে যেরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

ইংরেজদের সহিত গোপনে পরামর্শ করিতেছেন সন্দেহ করিয়া, সিরাজ রাধাকান্তের সর্বনাশসাধনে উদ্যত হন। রাজা দুর্লভরাম তাঁহাকে গোপনে এই সংবাদ দিলে, তিনি মুর্শিদাবাদ হইতে পলায়ন করিয়া নদীয়ায় উপস্থিত হইলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ভবনে ষড়যন্ত্রকারিগণের পূর্ণ অধিবেশন হয়।[৩] তথায় ক্লাইবের দূতও উপস্থিত ছিলেন। রাধাকান্ত সেই সভামধ্যে দরবারের যাবতীয় কর্মচারীর মনোভাব সুস্পষ্টরূপে চিত্রিত করেন। তিনি এইরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, সকলেই সিরাজের সিংহাসনচ্যুতির ইচ্ছা করিতেছেন। মীরজাফর তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী এবং আবশ্যক হইলে, মোহনলালকেও অর্থ দ্বারা বশীভূত করা যাইতে পারে।[৪] হায় প্রবাদ! তুমি মোহনলালের নামেও দোষারোপ করিতে বিরত হও নাই। রাধাকান্তের এই সংবাদে নাকি ক্লাইবসাহেবের পলাশীর যুদ্ধের অনেক উপকার হইয়াছিল। তিনি রাধাকান্তের নিকট হইতে নাকি প্রথমে দরবারের কর্মচারিগণের মনোভাব অবগত হন। পলাশীর যুদ্ধের পর, ক্লাইব রাধাকান্তকে রাজস্ববিভাগের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করেন। তাহার পর দেওয়ানীর সময় হইতেও তাঁহার নিকট রাজস্বসম্বন্ধে কোম্পানী বিশেষরূপ উপকৃত হইয়াছিলেন। রাধাকান্ত নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন; তিনি কান্দীতে রাধাবল্লভ নামে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাঁহার সেবার সুবন্দোবস্ত করিয়া যান, এবং অনেকগুলি গ্রাম তাঁহার নামে উৎসর্গীকৃত হয়। রাধাকান্তের স্মরণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল, এবং তাঁহার ন্যায় রাজস্ববিষয়ে ব্যুৎপন্ন লোক সচরাচর দৃষ্ট হইত না। মুসলমান ও কোম্পানী উভয় রাজত্বসময়ে তিনি জমাজমির কাগজ ও হিসাবপত্র এরূপ পরিষ্কাররূপে রক্ষা করিয়াছিলেন যে, বঙ্গাধিকারী মহাশয়েরা তাঁহাকে না পাইলে, বিষম গোলযোগে পতিত হইতেন। রাধাকান্তের পর গঙ্গাগোবিন্দ সেই পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। আমরা পরে তাহা দেখাইতেছি।

মুসলমান রাজত্বকালে খালসার দেওয়ান রায়রায়ান্ ও বঙ্গাধিকারী কাননগোদের হস্তে রাজস্ব-সংক্রান্ত সমস্ত বন্দোবস্তের ভার থাকিত। রায়রায়ান্ নবাবের প্রকৃত রাজস্ব-মন্ত্রী ছিলেন, রাজস্বসম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য তাঁহাকে করিতে হইত। কাননগো মহাশয়েরা জমিসম্বন্ধীয় সমস্ত কাগজপত্র প্রস্তুত করিতেন; ও তাঁহাদের নিকট উক্ত সমস্ত

---

৩ এই ষড়যন্ত্রের স্থান লইয়া নানারূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। নদীয়া তাহার মধ্যে একটি।

৪ Calcutta Review (Kandi Family.)

কাগজপত্র রক্ষিত হইত। সুতরাং তাঁহাদের নিকট সমস্ত রাজস্বের মূলসূত্র ছিল। তৎকালে কাননগোদিগের বিভাগে অনেক লোক নিযুক্ত হইত। সমস্ত বাঙ্গলারাজ্যের প্রত্যেক ভূমির বিবরণ যাঁহাদিগকে সংগ্রহ করিতে হইত, তাঁহাদের সাহায্যের জন্য কত লোকের আবশ্যক, তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। খালসার দেওয়ান বা রায়রায়ান্ প্রকৃত প্রস্তাবে সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন; কারণ রাজস্ব-সংক্রান্ত সমস্ত বন্দোবস্তের ভার তাঁহারই হস্তে ন্যস্ত ছিল।[৫] নবাবেরা যুদ্ধবিগ্রহ দেশশাসন, কেহ বা আপনাদের আমোদপ্রমোদ লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন; সুতরাং রায়রায়ান্ রাজস্ব-মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, তাঁহার দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুতরই ছিল। রায়রায়ান্ ও কাননগোব্যতীত রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয়ে জগৎশেঠদিগকেও একটি পদ লইতে হইয়াছিল। তাঁহারা বাদশাহের পেস্কারস্বরূপ দিল্লীতে বাঙ্গলার রাজস্ব পৌঁছাইয়া দিতেন।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানীগ্রহণের পর এই সমস্ত বিষয়ের কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু অনেকগুলি নিয়ম রক্ষিতও হইয়াছিল। ক্লাইব মহম্মদ রেজা খাঁ ও সেতাবরায়কে যথাক্রমে মুর্শিদাবাদ ও পাটনার নায়েব-দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করিয়া রাজস্ব-সংক্রান্ত যাবতীয় ভার তাঁহাদের উপর প্রদান করেন। কাননগো প্রভৃতি কর্মচারী তাঁহাদের অধীন হন। এই সময়ে বঙ্গাধিকারী লক্ষ্মীনারায়ণ ও মহেন্দ্রনারায়ণ দুই জনে মুর্শিদাবাদে কাননগোর কার্য করিতেছিলেন। পুরুষানুক্রমে তাঁহারা উক্ত কার্য করিয়া আসিয়াছেন। মুসলমান রাজত্বকালে তাঁহাদের কাননগোগিরিতে সবিশেষ দক্ষতা থাকায়, কোম্পানীও তাঁহাদিগকে আপনাদিগের কার্যে নিযুক্ত করেন। বিশেষতঃ পুরুষানুক্রমে জমি-সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র তাঁহাদের হস্তে অবস্থিত; সুতরাং তাঁহারা দেশের জমাজমির বিষয় যেরূপ অবগত থাকিবেন, এবং তাঁহাদের দ্বারা যেরূপ সুচারুরূপে কার্য সম্পন্ন হইবে, নূতন লোকের দ্বারা তাহা সম্ভবপর নহে; কাজেই কোম্পানী তাঁহাদিগকে রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহারা সমস্ত কাগজপত্র দেখিয়া নায়েব-দেওয়ানকে রাজস্ব-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের পরামর্শ দিতেন বলিয়া, নূতন বন্দোবস্তের সময় কোম্পানীকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় নাই।

গঙ্গাগোবিন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাধাকান্ত বরাবরই বঙ্গাধিকারাদিগের সেরেস্তায় কার্য কীরিতেন। কোম্পানীর রাজত্বেও তিনি উক্ত কার্য দক্ষতার সহিত নির্বাহ করিয়াছিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ছিলেন বলিয়া, অনেক কার্যে রাধাকান্তের সাহায্য করিতেন এবং অনেক সময়ে রাজস্বসম্বন্ধে তাঁহাকে সৎপরামর্শ দিতেন। রাধাকান্ত উক্ত কার্য পরিত্যাগ করিলে, গঙ্গাগোবিন্দ সেই পদে নিযুক্ত হন এবং নিজ দক্ষতা প্রকাশ করিয়া মহম্মদ রেজা খাঁর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন।

এই সময় হইতে তাঁহার রাজস্ব-সংক্রান্ত প্রতিভা দেশমধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

৫ রায়রায়ান্ ও কাননগোপ্রসঙ্গ 'বঙ্গাধিকারী' প্রবন্ধে বিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়াছে

কোম্পানীর ইংরজকর্মচারিগণ সকলেই গঙ্গাগোবিন্দের পরিচয় পাইয়াছিলেন। হেস্টিংসসাহেবেরও তাঁহার সহিত অনেক দিন হইতে বিশেষ পরিচয় ছিল। হেস্টিংস যৎকালে কাশীমবাজার কুঠীতে সামান্য কর্মচারীর কার্য করিতেন এবং পলাশীযুদ্ধের পর যখন মুর্শিদাবাদের রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন, সেই সময় হইতে রাধাকান্তকে তিনি বিশেষরূপে জ্ঞাত ছিলেন এবং তদুপলক্ষে গঙ্গাগোবিন্দের সহিতও তাঁহার পরিচয় হয়। সেই সময় হইতে গঙ্গাগোবিন্দ ও কান্তবাবু উভয়ে তাঁহার সুদৃষ্টিতে পতিত হওয়ায়, ভবিষ্যতে এই দুই জন তাঁহার দুই হস্তস্বরূপ হইয়া উঠেন। কান্তবাবু হেস্টিংসের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া, হেস্টিংস তাঁহার উন্নতিসাধনে চেষ্টা করেন; কিন্তু গঙ্গাগোবিন্দের অপরিসীম বুদ্ধি ও চতুরতা তাঁহাকে অনেক দিন হইতে মুগ্ধ করে। ভবিষ্যতে যখন তিনি বঙ্গদেশের বা সমস্ত ভারতবর্ষের গবর্নর জেনারেল হইয়া ধনতৃষ্ণায় ধর্মাধর্মবিবেকবিধুর হইয়াছিলেন, তখন সেই পূর্বপরিচিত গঙ্গাগোবিন্দের বিশেষ সাহায্যের আবশ্যক হইয়া উঠে।

কান্তবাবুকে তিনি প্রথমতঃ প্রধান দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু কান্তবাবু সে সমস্ত বিষয়ে তাদৃশ পারদর্শী নহেন বলিয়া, উক্ত পদগ্রহণে অস্বীকৃত হইলে, হেস্টিংস গঙ্গাগোবিন্দকে রাজস্ব-সমিতির দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিয়া, আপনার সুবিধা করিয়া লন। একে গঙ্গাগোবিন্দের অসীম বুদ্ধি ও চতুরতা, তাহাতে অনেক দিন হইতে রাজস্ব-সংক্রান্ত বিষয়ে নিযুক্ত থাকায়, উক্ত বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি জন্মে। তদ্ব্যতীত তিনি ফারসী ভাষায় বিশিষ্টরূপ দক্ষ ছিলেন। যদিও সে সময়ে মুসলমানরাজত্বের অবসান হইয়াছিল, তথাপি কোম্পানীর কর্মচারিগণ প্রচলিত ভাষায় কার্য করিতে ও কাগজপত্র রাখিতে বাধ্য হন; নতুবা তাঁহাদিগকে বিষম গোলযোগে পড়িতে হইত। নূতন ভাষায় নূতন ভাবে কার্য করিতে গেলে যে, অনেক সময়ে নানারূপ বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহা বোধ হয় অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। মুসলমানরাজত্বকালে ফারসী ভাষায় কার্য সম্পন্ন হইত বলিয়া, সে কালের কোম্পানীর কর্মচারিগণ প্রায়ই ফারসীভাষাভিজ্ঞ লোককে নিযুক্ত করিতেন এবং প্রত্যেককেই একজন ফারসী মুন্সী রাখিতে হইত। হেস্টিংসেরও একজন ফারসী মুন্সী ছিলেন। যাহা হউক, এই সমস্ত কারণে, গঙ্গাগোবিন্দ কান্তবাবু অপেক্ষা উপযুক্ত হওয়ায় এবং কান্তবাবু কার্য করিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, হেস্টিংস গঙ্গাগোবিন্দকে প্রকাশ্য দেওয়ান এবং কান্তবাবুকে স্বকীয় কার্যসমূহের দেওয়ান বা বেনিয়ান নিযুক্ত করেন।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কোম্পানী দেওয়ানী গ্রহণ করিয়া মহম্মদ রেজা খাঁ ও সেতাবরায়ের উপর রাজস্ব আদায়ের ভার অর্পণ করেন। ইঁহারা যে কেবল রাজস্ব-বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন, এমন নহে; অধিকন্তু পুলিশ ও বিচার প্রভৃতির ভারও ইঁহাদের হস্তে ন্যস্ত ছিল এবং রেজা খাঁকে নবাবের পারিবারিক কার্যসমূহেরও পরিদর্শন করিতে হইত। দেওয়ানীগ্রহণের সময় এরূপ নির্ধারিত হয় যে, কোম্পানী

কেবল দেওয়ানীপদে নিযুক্ত হইয়া রাজস্ববিষয়ে নিযুক্ত থাকিবেন ; কিন্তু নাজিমী বা ফৌজদারী ও বিচার-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের নবাবই কর্তা থাকিবেন্। মহম্মদ রেজা খাঁ উভয় দিকের ভার প্রাপ্ত হইয়া, নায়েব-দেওয়ান ও নায়েব-নাজিম নিযুক্ত হইলেন ; প্রকৃত প্রস্তাবে তিনিই দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হইয়া উঠিলেন। তাঁহারই হস্তে রাজস্ব, তাঁহারই হস্তে বিচার, তাঁহারই হস্তে শাসন। তিনি সকল বিষয়েই আপনার প্রভুত্ব দেখাইতে লাগিলেন। সেতাবরায়ের হস্তেও যে সকল ক্ষমতা প্রদত্ত হয়, তিনিও তাহার অপব্যবহার আরম্ভ করেন। এইরূপে তাঁহাদের নামে দেশের চারিদিকে ভীষণ কোলাহল উপস্থিত হইল। ক্রমশঃ প্রকাশ পাইল যে, তাঁহারা কোম্পানীর রাজস্ব-বিভাগের অনেক টাকা নষ্ট করিয়াছেন। তখন তাঁহাদিগকে বন্দী করিয়া কলিকাতায় আনিবার আদেশ দেওয়া হইল। উভয় স্থানের সর্বোচ্চ কর্মচারীদিগকে বন্দী করিয়া আনায় দেশমধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

১৭৭২ খ্রীঃ অব্দে কার্টিয়ারসাহেব পদত্যাগ করিয়া গেলে, হেস্টিংস মান্দ্রাজ হইতে তাঁহার পদে গবর্নর নিযুক্ত হইয়া আসেন। তিনি আসিয়াই ডিরেক্টারদিগের আদেশে, রেজা খাঁকে ধৃত করিয়া কলিকাতা পাঠাইবার জন্য মুর্শিদাবাদের তৎকালীন রেসিডেণ্ট মিডল্‌টনকে আদেশ দিলেন। রেজা খাঁ তাঁহার বাসস্থান নেসাতবাগ হইতে ধৃত হইয়া, কলিকাতায় আসিলে, মিডল্‌টনের হস্তে রাজস্ববিভাগের সমস্ত ভার অর্পিত হয়। গঙ্গাগোবিন্দ ১৭৬৯ খ্রীঃ অব্দ হইতে স্বীয় ভ্রাতা রাধাকান্তের স্থলে রাজস্ববিভাগে কার্য করিতেছিলেন। মহম্মদ রেজা খাঁর পদচ্যুতির পর মিডল্‌টনের অধীনতায়, তিনি আরও দক্ষতা প্রকাশ করিতে থাকেন। মহম্মদ রেজা খাঁ ও সেতাবরায়কে বন্দী করিয়া আনায়, কোম্পানীর রাজস্বসম্বন্ধে অনেক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। দেওয়ানী-গ্রহণের পর হইতে হেস্টিংসের আগমন পর্যন্ত, যেরূপ ভাবে দেশের রাজস্বসংগ্রহ ও শাসনকার্য চলিয়া আসিতেছিল, হেস্টিংস সে সমস্তের পরিবর্তন করিয়া নূতন বন্দো-বস্ত করিতে উৎসুক হইলেন। ডিরেক্টারদিগের অনুমতি গ্রহণ করিয়া, তাঁহার নূতন ভাবের বন্দোবস্ত আরম্ভ হইল। কোম্পানী রাজস্ব ও শাসন উভয়ই নিজ হস্তে লইতে ইচ্ছা করিয়া, প্রচলিত দ্বৈত শাসন (Double Government) রহিত করিয়া দিলেন এবং রাজস্ব ও শাসন সমস্ত বিষয়ের ভার গবর্নরের হস্তে ন্যস্ত হইল।

এই সময়ে হেস্টিংস রাজস্ব ও শাসনসম্বন্ধে যে সমস্ত বন্দোবস্ত করেন, আমরা সংক্ষেপে তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি। ইহা বিশদরূপে বুঝিতে না পারিলে, গঙ্গাগোবিন্দের সহিত শাসনকার্যের কিরূপ সম্বন্ধ হইয়াছিল, তাহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে না। হেস্টিংস প্রথমতঃ নায়েব-দেওয়ানী পদ রহিত করিয়া, স্বহস্তে রাজস্ব-সংক্রান্ত যাবতীয় ভার গ্রহণ করিলেন। পরে স্বয়ং ও কাউন্সিলের চারিজন সভ্য লইয়া, এক পর্যাটক সমিতি (Committee of circuit) গঠন করিয়া, বাঙ্গলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উপস্থিত হইয়া, ভূমি-সংক্রান্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন, এবং নূতন ইজারা বন্দোবস্তের ইচ্ছা করেন। তাঁহারা প্রথমতঃ কৃষ্ণনগরে

উপস্থিত হন। এইরূপ পরিদর্শন করিয়া, তাঁহারা দেশের অবস্থা অনেক পরিমাণে জ্ঞাত হইলেন। তখন এইরূপ সিদ্ধান্ত হইল যে, জমিদারদিগকে প্রকাশ্য নীলামে উচ্চদরে পাঁচ বৎসরের জন্য জমির ইজারা দিলে, রাজস্ব আদায়ের সুবন্দোবস্ত হইতে পারে। তাঁহাদের সেই সিদ্ধান্তানুসারে পাঁচসনা বন্দোবস্তের নিয়ম হয়। তাঁহারা জমিদারের হস্ত হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করিতেও ইচ্ছা করেন। যদিও হেস্টিংসসাহেব, প্রকাশ্যভাবে সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, প্রজাদিগের মঙ্গলের জন্য পাঁচসনা বন্দোবস্তের সৃষ্টি হইল, কিন্তু জমিদারের নিকট হইতে তিনি যেরূপ ভাবে উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রজাদিগের উপর পূর্বাপেক্ষা কত অধিক অত্যাচার হইয়াছিল, তাহা বুদ্ধিমানমাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারেন। জমিদারগণ পূর্বে আপনাদের ক্ষুদ্র উদরপরিপূরণের জন্য প্রজাদিগের উপর যাহা কিছু অত্যাচার করিতেন, এক্ষণে গবর্নর ও তাঁহার অনুচরবর্গের বিশ্বগ্রাসী উদরপরিপূরণার্থ কিরূপ মাত্রায় অত্যাচার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়! যাহা হউক হেস্টিংস প্রকাশ্যভাবে পাঁচসনা বন্দোবস্তের সদুদ্দেশ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই পাঁচসনা বন্দোবস্তের কয়েক বৎসর পরে দশসালা, অবশেষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত স্থিরীকৃত হয়। জমিদারগণ কিস্তি কিস্তি রাজস্ব প্রদান করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হন।

হেস্টিংসসাহেব এই সময়ে গ্রামের মহাজনদিগের প্রতিও সুদের হার কম করিবার নিয়ম জারি করিয়া, হতভাগ্য কৃষকদিগকে তাহাদের কঠোর হস্ত হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করেন। কুসীদজীবী মহাজনদিগের প্রকৃতি যে কসাইদিগের অপেক্ষাও ভীষণ, তাহা বোধ হয় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। পূর্বে দেশীয় আমীন-দিগের দ্বারা রাজস্বসংগ্রহ হইত ; এক্ষণে তাহাদের স্থলে অধিকাংশ জেলায় ইংরেজ কালেক্টর নিযুক্ত হইলেন এবং কতকগুলি জেলা লইয়া এক একটি বিভাগের সৃষ্টি হইল ; একজন কমিশনারের উপর তাহাদের তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত হইল। অদ্যাপি ঐরূপ নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে। পাটনা ও মুর্শিদাবাদ হইতে রাজস্ব-সমিতি কলিকাতায় আনীত হইল এবং উভয়ে এক হইয়া একটি মাত্র রাজস্ব-সমিতি গঠিত হইল। ঐ রাজস্ব-সমিতির সহিতই গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বিশেষ সম্বন্ধ ; আমরা ক্রমে তাহা দেখাইতেছি।

এইরূপে রাজস্বসম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিয়া, হেস্টিংস বিচারকার্যের বন্দোবস্তেও মনোনিবেশ করিলেন। প্রত্যেক জেলায় এক একটি দেওয়ানী আদালত স্থাপন করিয়া তাহার বিচারভার কালেক্টরদিগের হস্তে দেওয়া হইল ; সুতরাং ইহাতে রাজস্ব ও বিচারের ভার একজনের হস্তেই পড়ে। কলিকাতায় সদর দেওয়ানী আদালত স্থাপিত হইল এবং কাউন্সিলের সভ্য ও সভাপতি দ্বারা তাহার কার্য সম্পন্ন হইতে লাগিল। কতকগুলি দেশীয় কর্মচারী উক্ত বিষয়ে তাঁহাদিগের সাহায্যার্থ নিযুক্ত হইলেন। সদর-দেওয়ানী আদালতে, মফঃস্বল-দেওয়ানী আদালতের ৫০০ টাকার অধিক দাবীর আপীলের মীমাংসা হইত।

এইরূপে দেওয়ানী বিচারের বন্দোবস্ত হইলে, ফৌজদারী বিচারের বন্দোবস্ত আরম্ভ হইল। প্রত্যেক জেলায় এক একটি ফৌজদারী আদালত স্থাপিত হইয়া, একজন কাজীকে তাহার প্রধানপদে নিযুক্ত করা হয়। একজন মুফ্‌তি ও দুই জন মৌলবী কাজীর সাহায্যের জন্য নিযুক্ত হন এবং ইংরেজ কালেক্টরগণ তাহার তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন। মুর্শিদাবাদে একটি সদর-নিজামত আদালত প্রতিষ্ঠিত হইল; তাহার প্রধানপদে একজন দারোগা নিযুক্ত হইলেন এবং একজন কাজী, একজন মুফ্‌তি ও তিন জন মৌলবী তাঁহার সাহায্যার্থ নিযুক্ত হইলেন। ইঁহাদের নিয়োগ ও তত্ত্বাবধানের ভার নাজিমের উপরই ন্যস্ত হইল। যদিও কোম্পানী রাজস্ব ও শাসন উভয়ের ভার গ্রহণ করিলেন বটে, তথাপি একেবারে নাজিমকে সমস্ত বিষয় হইতে বিদূরিত করিতে ইচ্ছা না করিয়া, তাঁহাকে ফৌজদারী বিচারবিভাগের কর্তা করিয়া রাখিলেন। কিন্তু এই সকল বন্দোবস্তের ভার কোম্পানী নিজেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে নাজিমের হস্ত হইতে তাহাও বিচ্যুত হইয়া রাজস্ব ও বিচার উভয়েই কোম্পানীর সম্পূর্ণ অধীনে আইসে।

হেস্টিংসের এই নিয়ম যে দেশের কিয়ৎ-পরিমাণে উপকার করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ তিনি প্রত্যেক বিচারালয়ে হিন্দু ও মুসলমান আইন প্রচলিত রাখায়, মফঃস্বলের লোকদিগের বিশেষরূপে উপকার হয়। ইহার পর কলিকাতায় সুপ্রীমকোর্ট স্থাপিত হইয়া, ইংরেজী আইনে কলিকাতার অধিবাসীদিগকে যেরূপ জ্বালাতন করিয়াছিল, তাহাতে হেস্টিংসের দেশীয় আইন প্রচলন করা সম্বন্ধে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, রাজস্ববন্দোবস্তে তিনি নিজের লালসা মিটাইবার জন্য দেশের সর্বনাশ করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে হেস্টিংস নূতন বন্দোবস্ত করিয়া দেশশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, পাটনা ও মুর্শিদাবাদ হইতে রাজস্ব-সমিতি উঠিয়া আসিয়া কলিকাতায় স্থাপিত হইল। এই সময়ে কিছু দিনের জন্য কাননগো বিভাগটি উঠাইয়া দেওয়া হয়।[৬] গঙ্গাগোবিন্দ পূর্ব হইতে কাননগো-বিভাগে কার্য করিতেন; কাজেই তাঁহার আর কোন কার্য না থাকায়, তিনি কলিকাতায় রাজস্ব-সমিতির অধীন হইয়া কার্য করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, হেস্টিংসসাহেবের সহিত তাঁহার পূর্ব হইতে বিলক্ষণ পরিচয় ছিল; হেস্টিংস সেইজন্য এক্ষণে তাঁহার আশা পূর্ণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

গঙ্গাগোবিন্দ হেস্টিংসের শরণাপন্ন হইলে, তিনি তাঁহাকে খালসার রায়রায়ান্ এবং রাজস্ব-কমিটীর দেওয়ান রাজবল্লভের সহকারীরূপে ৭০০ টাকা বেতনে নিযুক্ত করিলেন। এই সময় হইতে গঙ্গাগোবিন্দ দিন দিন ভাগ্যলক্ষ্মীর অনুগ্রহভাজন হইতে থাকেন।

৬ Minutes of Evidence in H's Trial, David Anderson's Evidence. p. 1226.

১৭৪৪ খ্রীঃ অব্দে গঙ্গাগোবিন্দ কলিকাতা রাজস্ব-সমিতির দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইয়া আপনার চরিত্রের পরিচয় দিতে লাগিলেন। যাহাদের উপর তাঁহার তত্ত্বাবধানের ভার ছিল, উৎকোচভারে তাহারা প্রপীড়িত হইয়া উঠিল। এই সমস্ত উৎকোচ যে গঙ্গাগোবিন্দ একাই গ্রহণ করিতেন এমন নহে, ইহার অধিকাংশই হেস্টিংসসাহেবকে প্রদান করিতে হইত।

১৭৭২ খ্রীঃ অব্দে রাজ্যশাসননিয়ামক-বিধি (Regulating Act) বিধিবদ্ধ হইলে, ক্লেভারিং, মন্সন ও ফ্রান্সিস্ বিলাত হইতে সদস্য নিযুক্ত হইয়া আসেন; কেবল বারওয়েলসাহেব ভারতবর্ষ হইতে মনোনীত হন। গঙ্গাগোবিন্দের উৎকোচগ্রহণের কথা ক্রমে ক্রমে কাউন্সিলের সভ্যগণের কর্ণগোচর হইল এবং তিনি সরকারের ন্যস্ত অর্থেরও অপহরণ করিয়াছেন বলিয়া দোষী হইলেন। কাউন্সিলের সভ্যেরা ১৭৭৫ খ্রীঃ অব্দের ১২ই মে'র সভায় গঙ্গাগোবিন্দের পদচ্যুতিসম্বন্ধে তর্কবিতর্ক করেন। ইজারদার কমলউদ্দীন খাঁ গঙ্গাগোবিন্দের নামে ২২ হাজার টাকা উৎকোচগ্রহণের অভিযোগ করে।[৭] ফ্রান্সিস কমলউদ্দীনের কথায় বিশ্বাস স্থাপন না করিয়াও বলেন যে, আমি ক্রমাগত শুনিয়া আসিতেছি যে, গঙ্গাগোবিন্দের চরিত্র অতীব নিন্দনীয় এবং গঙ্গাগোবিন্দ স্বকৃত কার্যের কথা যাহা প্রকাশ করিয়াছে, তাহা হইতে তাহার চরিত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ হইতেছে। এরূপ লোককে বিশ্বাস করিয়া কোম্পানীর কার্যে রাখা কদাচ যুক্তিযুক্ত নহে। মন্সন গঙ্গাগোবিন্দের ধনলালসা ও অত্যাচারের কথা উল্লেখ করিয়া, তাঁহার পদচ্যুতির ইচ্ছা করেন, ক্লেভারিংও তাহাতে মত দেন। কেবল বারওয়েল ও গবর্নর জেনারেল হেস্টিংস গঙ্গাগোবিন্দের পক্ষ হইয়া, তাঁহার পদচ্যুতির বিরুদ্ধে তর্কবিতর্ক করিতে থাকেন। তাঁহারা উভয়ে অনেক দিন ভারতবর্ষে থাকায়, গঙ্গাগোবিন্দের সহিত বিশেষরূপ পরিচিত ছিলেন এবং গঙ্গাগোবিন্দের পদচ্যুতি ঘটিলে, আপনাদের যথেষ্ট ক্ষতি হইবে বিবেচনায়, তাহাকে স্বপদে রাখিতে অনেক চেষ্টা করেন। বারওয়েল বলিয়া উঠিলেন যে, গঙ্গাগোবিন্দের অসচ্চরিত্রের কথা আমি এই প্রথম শুনিলাম, আমি কখনও তাঁহার দুর্নাম শুনি নাই; আমি তাঁহার পদ-চ্যুতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। স্বয়ং গবর্নর জেনারেল বাহাদুর বারওয়েলের পক্ষ সমর্থন করিয়া বলিলেন যে, আমিও কখন গঙ্গাগোবিন্দের কোন দোষ দেখি নাই; তাহার অনেক শত্রু আছে; বোধ হয়, তাহারা এরূপ রটাইয়া থাকিবে। গঙ্গাগোবিন্দ যেরূপ দক্ষতাসহকারে রাজস্ববিভাগে কার্য করিতেছে, তাহাতে তাহাকে পদচ্যুত করিলে, রাজস্ববিভাগে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা ঘটিবে; অতএব এরূপ দক্ষ লোকের পদচ্যুতি কদাচ ঘটিতে পারে না। কিন্তু প্রথমোক্ত তিন জনের একবাক্যতায় অবশেষে কাউন্সিলের সভ্যেরা গঙ্গাগোবিন্দকে অবসর প্রদান করিতে বাধ্য হন। ক্লেভারিং, মন্সন ও ফ্রান্সিস্ তিন জনেই হেস্টিংসের বিপক্ষ ছিলেন। ১৭৭৬ খ্রীঃ অব্দে মন্সনের মৃত্যুর

৭ Evidence taken in H's Trial., p. 1189.

পর হেস্টিংসের বিপক্ষদলের ক্ষমতা হ্রাস হওয়ায়, তিনি পুনর্বার গঙ্গাগোবিন্দকে রাজস্ববিষয়ের কার্যে নিযুক্ত করিতে উৎসুক হইলেন। ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দের ৮ই নবেম্বরের সভায় গবর্নর জেনারেল তাঁহার দক্ষতা ও রাজস্ববিষয়ক জ্ঞানের উল্লেখ করিয়া, পুনর্বার গঙ্গাগোবিন্দকে কলিকাতার রাজস্ব-সমিতির দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিলেন।

হেস্টিংস পাঁচসনা বন্দোবস্তের সময় অধিকাংশ জেলার রাজস্ব আদায়ের জন্য কালেক্টর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। গবর্নর জেনারেলের উৎকোচগ্রহণ দেখিয়া, সেই সমস্ত কালেক্টরগণও নিজ নিজ উদরপূরণে সচেষ্ট হন। ক্রমে কোম্পানীর রাজস্ব বাকী পড়িতে লাগিল। হেস্টিংস কালেক্টরদিগকে শাসন করিতে গেলে, তাঁহারা তাঁহার দোষও প্রকাশ করিতে পারেন, এই আশঙ্কায় হেস্টিংস কালেক্টরী পদ রহিত করিয়া, পুনর্বার দেশীয় লোকদিগের হস্তে রাজস্ব আদায়ের ভার দিলেন। এই সকল দেশীয় কর্মচারিগণের কার্যকলাপপরিদর্শনের জন্য পাটনা, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, দিনাজপুর, ঢাকা ও কলিকাতা এই ছয় স্থানে ছয়টি প্রবিন্সিয়াল কাউন্সিল বা প্রাদেশিক সমিতি স্থাপিত হইল। গঙ্গাগোবিন্দ কলিকাতার ও দেবীসিংহ মুর্শিদাবাদ প্রবিন্সিয়াল কাউন্সিলের দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন। প্রবিন্সিয়াল কাউন্সিলের সভ্যদিগের হস্তে রাজস্ব-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের ভার ন্যস্ত হওয়ায়, হেস্টিংসের নিজের কোন সুবিধা নাই দেখিয়া, তিনি পুনর্বার প্রাদেশিক সমিতি ভঙ্গ করিবার জন্য বারংবার ডিরেক্টরদিগকে লিখিতে লাগিলেন। অবশেষে প্রাদেশিক সমিতিভঙ্গের পর কলিকাতায় একটি সাধারণ রাজস্ব-সমিতি স্থাপিত হয়। হেস্টিংস গঙ্গাগোবিন্দকে তাহার দেওয়ান এবং তৎপুত্র প্রাণকৃষ্ণকে নায়েব-দেওয়ান নিযুক্ত করেন। পিতাপুত্রে রাজস্ব-বিভাগের ভার হস্তে লইয়া স্ব স্ব ক্ষমতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে প্রধান দেওয়ান নিযুক্ত করিবার পর রায়রায়ানের ক্ষমতা হ্রাস করা হয়।

এইরূপে গঙ্গাগোবিন্দকে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়ায়, ডিরেক্টরগণ সন্তুষ্ট হন নাই। তাঁহারা ১৭৭৪ সালের ৪ঠা জুলাই-এর পত্রে গভর্নর জেনারেলকে এইরূপ লিখিয়া পাঠান যে, কোন দেশীয় মধ্যস্থের দ্বারা রাজস্ব-বিষয়ের কথাবার্তার চালনা করিতে হইলে, রায়রায়ানই তাহার উপযুক্ত পাত্র ; গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ নহে। কারণ তাহার পদচ্যুতি তাহাকে কোম্পানীর কার্যে অনুপযুক্ত করিয়া তুলিয়াছে।[৮] কিন্তু হেস্টিংস-সাহেব কাহারও কথা শুনিবার পাত্র নহেন। তিনি গঙ্গাগোবিন্দকে সাধারণ রাজস্ব-সমিতির দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া, যে সমস্ত ভার প্রদান করিলেন, তাহাতে রায়রায়ানের আর কোনই ক্ষমতা থাকিল না। সমিতির দেওয়ানের প্রতি এইরূপ ভাবে ক্ষমতা প্রদত্ত হয় যে, সমিতি হইতে যে সমস্ত কাগজপত্র স্বাক্ষরিত হইবে, দেওয়ান তাহাতে আবার নিজ নাম স্বাক্ষর করিবেন। দেওয়ান সমিতির প্রত্যেক অধিবেশনে উপস্থিত

৮ Evidence taken in H's Trial, p. 1169.

থাকিয়া, সভ্যদিগের সহিত উপবেশন করিয়া, নিজের সমস্ত কার্য সম্পন্ন করিবেন। তিনি সভাপতির নিকট গমন করিয়া, সমস্ত কার্যের আদেশ গ্রহণ করিবেন এবং তাহার কতদূর সম্পন্ন হইল, তাঁহাকে অবগত করাইবেন। সমিতির দেওয়ান যে সমস্ত কার্য করিবেন, রায়রায়ান তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না; তিনি হস্তক্ষেপ করিলে, অনেক সময়ে বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে। রায়রায়ান-কর্তৃক এক্ষণে প্রাদেশিক দেওয়ানদিগের তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন নাই। সমিতি প্রাদেশিক-দেওয়ান ও নায়েবদিগের প্রতি আদেশ প্রদান করিবেন। তাহাতে দেওয়ানেরও স্বাক্ষর থাকিবে। কালেক্টরগণ দেওয়ানের নিকট হিসাবপত্র পাঠাইবেন। হাজরী মহাল প্রভৃতির রাজস্বের বিষয় সমিতির আদেশমতে সভাপতি ও দেওয়ান তত্ত্বাবধান করিবেন।[৯] এইরূপে দেওয়ানের উপর রাজস্ব-বিষয়ের সমস্ত ভার দিয়া, রায়রায়ানের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া, বহুদিনের প্রচলিত একটি পদ প্রায় রহিত করা হইল। প্রকৃত প্রস্তাবে সমিতির দেওয়ানই রাজস্ববিভাগের সর্বেসর্বা হইয়া দাঁড়াইলেন।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মহম্মদ রেজা খাঁর পদচ্যুতির পর মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় রাজস্ববিভাগ উঠিয়া আসিলে, কিছুদিনের জন্য কাননগো-বিভাগটি উঠাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু যখন রাজস্ববিভাগে গোলযোগ উপস্থিত হয়, তখন কাননগো-বিভাগের পুনঃপ্রবর্তন করিতে হইয়াছিল। লক্ষ্মীনারায়ণ ও মহেন্দ্রনারায়ণ দুইজন প্রধান কাননগোর অধীন গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ও শ্রীনারায়ণ মুস্তফী নায়েব-কাননগো নিযুক্ত হইয়াছিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ লক্ষ্মীনারায়ণের সহকারী নিযুক্ত হন। নায়েব-কাননগো কাননগোবিভাগের সমস্ত প্রধান প্রধান কার্য করিতেন। মুসলমান-রাজত্বকালে নায়েব-কাননগো একটি প্রধান পদরূপে স্থাপিত হয়।[১০] প্রধান কাননগোর নিকট রাজস্ববিষয়ের যে সমস্ত ভার ও কাগজপত্র থাকিত, নায়েব-কাননগোকে তাহার নিম্নলিখিত কার্যগুলি সম্পন্ন করিতে হইত। সরকার-কর্তৃক যে সমস্ত কর নির্ধারিত হইত, তাহাদের সমস্ত রসিদাদি নায়েব-কাননগোর নিকট থাকিত; এমন কি সামান্য ভূমিখণ্ডের রসিদও রাখিতে তিনি বাধ্য হইতেন। সমস্ত জমির সীমাসম্বন্ধীয় কাগজপত্র রাখিবার ভার তাঁহাদের হস্ত ন্যস্ত ছিল। যদি কোন জমির সীমা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইত, তবে নায়েব-কাননগো কাগজ দেখিয়া কাহার জমি তাহা বলিয়া দিতেন। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক স্থানের সদর কাছারী হইতে সামান্য ইজারদারের রাজস্বের হিসাবপত্রও তাঁহাদিগকে রাখিতে হইত, এবং অন্যান্য অনেক হিসাবপত্রও তাঁহাদের নিকট থাকিত।[১১] সুতরাং কাননগোবিভাগের প্রধান প্রধান সমস্ত কার্যই নায়েব-কাননগো দ্বারা নির্বাহ হইত। নায়েব-কাননগোগণ

৯ Evidence taken in H's Trial, p. 1181.
১০ Evidence taken in H's Trial, p. 1217.
১১ Ibid, p. 1217. বঙ্গাধিকারী প্রবন্ধ দেখ।

প্রধান কাননগোদিগের সহকারী থাকিয়া সেরেস্তার কার্য অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতেন। গঙ্গাগোবিন্দ নায়েব-কাননগো ও রাজস্ব-সমিতির দেওয়ান উভয় পদ প্রাপ্ত হইয়া রাজস্ববিভাগকে একেবারে নিজ করতলগত করিয়া ফেলিলেন।

মুসলমানরাজত্বের সময় হইতে নায়েব-কাননগোর এবং ইংরেজরাজত্বের সময় হইতে দেওয়ানের উৎপত্তি। উভয় রাজত্বের রাজস্বসম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান পদে একই ব্যক্তি নিযুক্ত হওয়ায়, তাঁহার যতদূর সুবিধা ঘটিবার, সমস্তই ঘটিল। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দুইটি পদের সৃষ্টি হওয়ায়, একের উপর অন্যের কোন ক্ষমতা ছিল না; কিন্তু এক্ষণে একজনেই উভয় পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, দেশমধ্যে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এদিকে রাজস্ব-সমিতির সভ্যেরা সমস্ত ভার গঙ্গাগোবিন্দের হস্তে অর্পণ করিয়া, তাঁহার ক্রীড়াপুত্তলস্বরূপ হইয়া উঠিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ তাঁহাদিগকে যে পরামর্শ দিতেন, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাহাই করিতেন। হেস্টিংস চারিজনকে সভ্য নিযুক্ত করেন। সমিতির জন্য বৎসরে ৬ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ব্যয় হইত।[১২] সমিতির সভ্যেরা আপন আপন প্রাপ্য অংশ পাইয়াই সন্তুষ্ট হইতেন এবং গঙ্গাগোবিন্দের হস্তে সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্ত মনে কাল কাটাইতেন। শোর ও এণ্ডারসন্ এই দুইজন সমিতির প্রধান সভ্য ছিলেন; শোর কিছুদিন সমিতির সভাপতির কার্যও করেন। তাঁহারা স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছিলেন যে, গঙ্গাগোবিন্দ সমিতির সর্বেসর্বা ছিলেন; তাঁহারা তাঁহার হস্তে ক্রীড়াপুত্তলরূপে অবস্থিতি করিতেন। গঙ্গাগোবিন্দের এরূপ প্রভুত্বের কারণ যে স্বয়ং হেস্টিংসসাহেব, তাহা বোধহয়, সকলে অনুমান করিতে পারিবেন। গঙ্গাগোবিন্দকে রাজস্ববিভাগের সর্বেসর্বা না করিলে, তাঁহার দুষ্পূরণীয় ধন-লালসা মিটে কৈ? কাজেই সমিতির সভ্যগণকে কেবল বৃত্তিভোগী করিয়া হেস্টিংস্ গঙ্গাগোবিন্দের হস্তে রাজস্ববিভাগের সমস্ত ভার প্রদান করেন।

এইরূপে নিজে রাজস্ব-সমিতির দেওয়ান ও নায়েব-কাননগো এবং পুত্র প্রাণকৃষ্ণকে নায়েব-দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিয়া, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ সিংহপরাক্রমে রাজস্ববিভাগের বন্দোবস্ত আরম্ভ করিলেন। বর্ধমান, নদীয়া, রাজশাহী, দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানের জমিদারেরা তটস্থ হইয়া, সর্বদা দেওয়ানজীর মনস্তুষ্টির জন্য প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। সকলে অবগত হইলেন যে, গবর্নর জেনারেল দেওয়ানজীর হাতধরা এবং সমিতির সভ্যগণ তাঁহার হস্তে ক্রীড়াপুত্তল। এক্ষেত্রে দেওয়ানজীকে সন্তুষ্ট করা ব্যতীত আর দ্বিতীয় উপায় নাই। তিনি ইচ্ছা করিলে, একের জমিদারী অন্যকে প্রদান করিতে পারেন, কাহাকেও একেবারে উচ্ছেদ করিতেও পারেন, কাহারও দ্বিগুণ মাত্রায় করবৃদ্ধি করিতে পারেন। গবর্নর জেনারেলকে তিনি যে পরামর্শ দিতেন,

১২ Burke's Impeachment of W. H., Vol. I, p. 166. Ibid, pp. 208-9.

তিনি সেই পরামর্শানুসারে কার্য করিতেন। কাজেই জমিদার, তালুকদার, ইজারদারগণ, ভীত ও চকিত অবস্থায় দেওয়ানজীর সন্তোষের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভেট, উপহার, ডালিতে প্রতিদিন দেওয়ানজীর বাটী পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। রাশি রাশি নজরে দেওয়ানজীর নজর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে নিজের ও গবর্নর জেনারেলের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির জন্য জমিদার ও তালুকদারদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ হইল। সামান্য উৎকোচ দিয়া কাহারও নিস্তার ছিল না। যেরূপে হউক, ভূস্বামিগণ তাঁহাদের আশা পূর্ণ করিতে সচেষ্ট হইলেন। ক্রমে নিরীহ প্রজারা অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া উঠিল। কিন্তু কে তাহাদের কথায় কর্ণপাত করে? গবর্নর জেনারেল ও দেওয়ানজী আপনাদের ক্ষতির আশঙ্কায় প্রজাদিগের কাতরোক্তিতে কর্ণপাত করিলেন না। তাহাদের কাতর কণ্ঠধ্বনি বিরাট আকাশে বিলীন হইতে লাগিল।

জমিদারগণের নায়েব, গোমস্তা, উকিল, মুৎসুদ্দীতে দেওয়ানজীর বাসভবন প্রতিনিয়ত সমারোহময় হইতে লাগিল। আজ বঙ্গের দিক্‌পাল জমিদারগণ ভয়ে গঙ্গাগোবিন্দের শরণাপন্ন হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্রগণের মধ্যে বিষয়ের বিভাগ লইয়া বিবাদ উপস্থিত হওয়ায়, পুত্র শম্ভুচন্দ্র গঙ্গাগোবিন্দেরর শরণাপন্ন হন। শুনা যায়, রাজা বিপদ দেখিয়া দেওয়ানজীকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "দরবার অসাধ্য, পুত্র অবাধ্য, ভরসা কেবল গঙ্গাগোবিন্দ", কিন্তু গঙ্গাগোবিন্দ তাহাতেও কর্ণপাত করেন নাই। শম্ভুচন্দ্রের মুখে তদীয় পিতা ও কর্মচারিগণ-কর্তৃক স্বীয় নিন্দাবাদশ্রবণে সিংহ ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় কৃষ্ণচন্দ্রের সমস্ত প্রার্থনা নিষ্ফল করিয়া, শম্ভূচন্দ্রকে নদীয়ার জমিদারী দিবার জন্য গবর্নর জেনারেলকে পরামর্শ প্রদান করেন। কথিত আছে, রাজার সর্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া তদীয় দেওয়ান কালীপ্রসাদ বণিগ্‌বেশে হেস্টিংসপত্নীকে একছড়া মুক্তা-মালা প্রদান করিয়া সে যাত্রা রাজাকে অপমান হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।[১৩] এইরূপে বাঙ্গলার সমস্ত রাজা ও জমিদার আপনাদিগের পিতৃপুরুষদিগের মান ও সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য দেওয়ানজীর মনস্তুষ্টিসাধনে বিশেষরূপে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

গঙ্গাগোবিন্দ নিজ পুত্রকে নায়েব-দেওয়ানের পদ প্রদান করিয়া, কার্যের আরও সুবিধা করিয়া তুলিলেন। প্রথমতঃ পুত্রের দ্বারা সমস্ত কার্য চালাইতে থাকেন এবং নিজের আবশ্যকমত ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া, আপনার ও স্বীয় প্রভু হেস্টিংসের আশালতাকে পরিবর্ধিত করিবার জন্য জমিদার ও প্রজাদিগের রক্ত শোষণ করিয়া, তাহাদের মূলে সেচন করিতে লাগিলেন। তাঁহারই ইঙ্গিতমাত্রে সমস্ত রাজস্ববিভাগ পরিচালিত হইত। কাহারও প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতা ছিল না। দেশীয় কর্মচারিগণ দূরে থাকুক, অনেক ইউরোপীয় কর্মচারীও প্রতিবাদে সাহসী হইতেন না।

১৩ ক্ষিতীশবংশাবলী—সপ্তদশ অধ্যায়।

তাঁহারা জানিতেন যে, হেস্টিংসসাহেবের প্রিয়পাত্রের প্রতিবাদ করিতে গেলে, তাঁহাদিগকেই অবসর গ্রহণ করিতে হইবে। ইংরেজরাজত্বে কোন বাঙ্গালী এরূপ অসীম ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া, দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হইতে পারেন নাই। ধন্য গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের সৌভাগ্য যে, আজ সমস্ত বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা একমাত্র তাঁহারই পদানত।

সমস্ত জমিদারদিগের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া, গঙ্গাগোবিন্দ নিজের ও হেস্টিংস-সাহেবের জন্য সকলের নিকট হইতে অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলেন। সর্বাপেক্ষা দিনাজপুরেই তাঁহাদের অত্যন্ত সুযোগ ঘটিয়া উঠে। বাঙ্গলা ১১৮৪ সালের বর্ষাকালে দিনাজপুরের তদানীন্তন রাজা বৈদ্যনাথ চিররোগী অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিলে, তাঁহার দত্তকপুত্র রাধানাথ ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কান্তনাথের মধ্যে উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। বৈদ্যনাথ কান্তনাথের প্রতি তাদৃশ সন্তুষ্ট ছিলেন না; এইজন্য রাধানাথকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। ইঁহাদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হওয়ায়, অবশেষে সকাউন্সিল গবর্নর জেনারেলের উপর বিবাদ-মীমাংসার ভার পতিত হয়। বলা বাহুল্য, গবর্নর জেনারেল গঙ্গাগোবিন্দকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কে প্রকৃত উত্তরাধিকারী? গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বলেন যে, যখন রাধানাথকে বৈদ্যনাথ দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, তখন হিন্দু নিয়মানুসারে তিনি বাস্তবিকই অধিকারী; সুতরাং তাঁহাকেই জমিদারী প্রদান করা কর্তব্য; কান্তনাথ বৈদ্যনাথের সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারেন না। যদি রাধানাথকে বৈদ্যনাথ পোষ্যপুত্র গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে, কান্তনাথ বিষয় পাইলেও পাইতে পারিতেন। আবার গোপনে গোপনে গবর্নমেণ্টকে বুঝাইয়া দিলেন যে, রাধানাথের বয়স যখন ৫।৬ বৎসর মাত্র, তখন তাঁহার জমিদারীর ভার গবর্নমেণ্টের হস্তেই পতিত হইবে। একে তিনি প্রকৃত উত্তরাধিকারী, তাহাতে আবার তাঁহাদের হস্তে বিষয়ের ভার পতিত হইলে তাঁহাদেরও যথেষ্ট সুবিধা ঘটিবে। অতএব রাধানাথকে না দিয়া, কান্তনাথকে জমিদারী দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। সুতরাং গবর্নর জেনারেল রাধানাথকে জমিদারী প্রদান করিলেন। রাধানাথ অপ্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া গবর্নমেণ্টকেই তাঁহার তত্ত্বাবধানের ভার লইতে হইল। সমিতির দেওয়ান তাহার সুবন্দোস্তের জন্য আদিষ্ট হইলেন।

হেস্টিংসসাহেবের নিজ মনোমত লোকের অভাব কোথায়? অমনি দিনাজপুরের নাবালক রাজার তত্ত্বাবধানের জন্য গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পরামর্শানুসারে সুবিখ্যাত দেবীসিংহ নিযুক্ত হইলেন। সাধারণে ভাবিল যে, রাধানাথ যখন বৈদ্যনাথের দত্তক, তখন গবর্নর জেনারেল তাঁহাকে জমিদারী দিয়া ভালই করিয়াছেন। কিন্তু ভিতরের কথা এক্ষণে প্রকাশ করিয়া বলা আবশ্যক। রাধানাথের পক্ষীয়েরা যখন অবগত হইলেন যে, গঙ্গাগোবিন্দের নিকট গবর্নর জেনারেল পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং তাঁহার ও তাঁহার পুত্র প্রাণকৃষ্ণের হস্তে জমিদারী-সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজপত্র এবং প্রত্যেক বংশের বংশতালিকা রহিয়াছে, তখন তাঁহার শরণাগত না হইলে, আর কোন

উপায় নাই। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, যদিও রাধানাথ দত্তক পুত্র বলিয়া বিষয়ের প্রকৃত উত্তরাধিকারী, তথাপি গঙ্গাগোবিন্দ যদি কোনরূপে বুঝাইয়া দেন যে, দিনাজপুরের জমিদারী তাঁহাদিগের পূর্বপুরুষ হইতে চলিয়া আসায়, উভয়েই সমানভাবে উত্তরাধিকারী হইতে পারে, তাহা হইলে, রাধানাথকে বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। অগত্যা তাঁহারা দেওয়ানজীর আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। দেওয়ানজীও সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। তিনি রাধানাথকে সম্পত্তি দিবার পূর্বে হেস্টিংস-সাহেবের নাম করিয়া সেই নাবালকের পক্ষীয়গণের নিকট ৪ লক্ষ টাকা দাবী করিয়া বসিলেন এবং ৪ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত না হইলে, রাধানাথের জমিদারীপ্রাপ্তি লইয়া বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইবে, এ কথাও বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিলেন। অন্ততঃ রাধানাথের সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী হওয়া সুকঠিন হইবে, এ কথাও প্রকাশ করিতে ছাড়েন নাই। তাঁহারা যখন দেখিলেন, বাস্তবিক দেওয়ানজী যাহা মনে করেন, তাহাই করিতে পারেন, গবর্নর জেনারেল কদাচ তাঁহার পরামর্শব্যতীত কোন কার্যই করিতে চাহেন না, তখন তাঁহারা দেওয়ানজীর কথা শুনিতে বাধ্য হইলেন, এবং তাঁহার প্রস্তাবমতে ৪ লক্ষ টাকা দিবার অঙ্গীকার করিয়া বালক রাধানাথের দিনাজপুর জমিদারীপ্রাপ্তির উপায় করিয়া লইলেন।

নাবালক রাধানাথের নিকট হইতে এই ৪ লক্ষ টাকা গ্রহণ করা, হেস্টিংসসাহেবের এক ভীষণ কলঙ্ক এবং তজ্জন্য গবর্নর জেনারেল সম্পূর্ণ দোষী। যে নাবালক প্রকৃত উত্তরাধিকারী হইয়া তাঁহাদের নিকট বিচারের আশায় উপস্থিত হইয়াছে এবং প্রকৃত প্রস্তাবে যে গবর্নমেন্টের পালনীয়, তাহার নিকট এরূপ বিচারবিক্রয় যে অতীব লজ্জার ও ঘৃণার কথা, তাহাতে সন্দেহ নাই। উক্ত ৪ লক্ষ টাকার মধ্যে হেস্টিংস নিজে ৩ লক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ করেন; অবশিষ্ট এক লক্ষ গঙ্গাগোবিন্দ তাঁহাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছেন বলিয়া, হেস্টিংস গঙ্গাগোবিন্দের উপর অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তাঁহার উপর বিশ্বাস করিতে অনিচ্ছুক হন।[১৪] কিন্তু এ সমস্তই রহস্যময়। হেস্টিংস কোন কালে দেওয়ানজীর প্রতি আন্তরিক অসন্তুষ্ট হন নাই। যেখানে উৎকোচাদি সম্বন্ধে বিশেষ পীড়াপীড়ি উপস্থিত হইত, সেই স্থানে তিনি তাঁহার প্রতি কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিতেন। এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছিল। হেস্টিংস বলেন যে, তিনি যে ৪ লক্ষ টাকার মধ্যে ৩ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হন, তাহা কোম্পানীর ব্যবহারের জন্যই প্রদান করিয়াছিলেন; তিনি তাহা হইতে এক কপর্দকও লন নাই; কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধানে প্রকাশ পায় যে, দিনাজপুরের ৪ লক্ষ টাকার মধ্যে কেবল ২ লক্ষ টাকা কোম্পানীর কার্যে প্রদত্ত হয়।[১৫] অবশিষ্ট ২ লক্ষ টাকার কথা হেস্টিংসসাহেব উত্তমরূপে প্রমাণ দিতে পারেন নাই; কেবল গঙ্গাগোবিন্দের নিকট হইতে এক লক্ষ প্রাপ্ত হন নাই

১৪ Burke's Impeachment of W. H., Vol. I, p. 199.
১৫ Burke's Impeachment of W. H., Vol. I, p. 427.

বলিয়া, তাঁহার উপর ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ৪ লক্ষ টাকার মধ্যে অবশিষ্ট ২ লক্ষ টাকার কি হইল, তাহা বোধ হয়, নূতন করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না। হেস্টিংস ও তাঁহার প্রিয় দেওয়ানজী গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ উভয়ে যে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন, ইহা বোধ হয়, বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইবে না। কোম্পানীর সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, সেই ৪ লক্ষ টাকাই তাঁহাদের বিশ্বস্ত কর্মচারিগণের উপহারে প্রযুক্ত হয় নাই।

দিনাজপুরের পর বিহারের বন্দোবস্তের সহিত গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বিজড়িত ছিলেন বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন। নূতন বন্দোবস্তের সময় খেলারাম ও কল্যাণসিংহকে বিহারের ইজারা প্রদান করা হয় এবং কল্যাণসিংহকে সেখানকার দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করাও হইয়াছিল। এই সমস্ত বন্দোবস্তের ভার গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের হস্তে পতিত হওয়ায়, তিনি নিজের ও প্রভু হেস্টিংসের সুবিধা করিতে ত্রুটি করেন নাই। দিনাজপুরের রাধানাথের ন্যায় দেওয়ানজী খেলারাম ও কল্যাণসিংহকে চাপিয়া ধরিলেন এবং তাহাদের নিকট হইতে ৪ লক্ষ টাকা আদায় করিয়া লইলেন। যদিও এ সম্বন্ধে প্রমাণ হইয়াছিল যে, হেস্টিংস তাহাদের নিকট হইতে ৪ লক্ষ টাকা গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, তথাপি দিনাজপুরের ন্যায় স্পষ্টতঃ গঙ্গাগোবিন্দের দ্বারা তাহা গ্রহণ করা হইয়াছিল কি না, তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ইয়ং, এণ্ডার্সন, মুর প্রভৃতি হেস্টিংসের বিচারে সাক্ষ্য-প্রদানকালে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা শুনিয়াছেন, গঙ্গাগোবিন্দের দ্বারাই হেস্টিংস খেলারাম ও কল্যাণসিংহের নিকট হইতে উক্ত ৪ লক্ষ টাকা গ্রহণ করেন।[১৬] গঙ্গাগোবিন্দ যে তাহাদের নিকট হইতে সেই ৪ লক্ষ টাকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ সে সময়ে তিনি রাজস্ববিষয়ে সর্বেসর্বা। সমিতির দেওয়ান হওয়ায়, তাঁহার প্রতি রাজস্ব-সম্বন্ধীয় যাবতীয় প্রমাণের ভার অর্পিত ছিল, এবং খেলারাম ও কল্যাণসিংহকে বিহারের ইজারা ও কল্যাণসিংহকে দেওয়ান নিযুক্ত করা যে তাঁহার দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছিল, ইহারও বেশ প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং তিনি যে তাহাদের নিকট হইতে টাকা লইয়াছিলেন, তাহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। দিনাজপুরের ন্যায় এখানে ২ লক্ষ টাকা অনাদায়ের কথাও শুনা যায়।[১৭] অবশিষ্ট টাকার কি হইল, অথবা তাহা আদায় হইয়াও অনাদায়ের ন্যায় গণ্য হইয়াছে, এ সমস্ত রহস্যজনক কথা হেস্টিংস ও দেওয়ানজীব্যতীত আর কেহই অবগত নহেন। হেস্টিংস স্পষ্টতঃ স্বীকার না করিলেও, অন্যান্য প্রমাণ হইতেও বেশ বুঝা যায় যে, বিহারের উৎকোচ-ব্যাপারে তাঁহার প্রিয়বন্ধু গঙ্গাগোবিন্দই লিপ্ত ছিলেন এবং দিনাজপুরের ন্যায় বিহারেও দেওয়ানজী নিজের ও নিজ প্রভুর উদরপূরণের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।

১৬ Minutes taken in W. H's Trial, pp. 1217 & 1240.
১৭ Burke's Impeachment of W. H., Vol. I, p. 427.

দিনাজপুর ও পাটনা ব্যতীত নদীয়া হইতে দেড় লক্ষ টাকা উৎকোচ লওয়া হইয়াছিল বলিয়া ওয়ারেন হেস্টিংস অভিযুক্ত হন। নদীয়ারাজের দানপত্রে সম্মতি-দানের জন্য এইরূপ উৎকোচ দেওয়া হয় বলিয়া কথিত আছে।[১৮] এ বিষয়ে আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র রাজা শিবচন্দ্রকে এক দানপত্র দ্বারা সমস্ত জমিদারী দিবার ইচ্ছা করিয়া অন্যান্য পুত্রের বৃত্তির বন্দোবস্ত করেন। তাঁহার কনিষ্ঠা রানীর গর্ভজাত রাজা শম্ভুচন্দ্র অর্ধাংশ-প্রাপ্তির জন্য পিতার দানপত্রের বিরুদ্ধে গঙ্গাগোবিন্দের শরণাপন্ন হন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র পূর্ব হইতে দেওয়ানজীর মনস্তুষ্টির চেষ্টা পাইতেছিলেন ; কিন্তু শম্ভুচন্দ্র গঙ্গাগোবিন্দকে পিতার বিরুদ্ধে নানারূপ কথা বলায়, তিনি রাজার উপর একান্ত অসন্তুষ্ট হন এবং গবর্নর জেনারেলকে রাজার দানপত্রে সম্মতি প্রদান না করিতে অনুরোধ করেন। পরে রাজার দেওয়ান কালীপ্রসাদ মুক্তার মালার দ্বারা হেস্টিংসপত্নীর মনোরঞ্জন করিয়া রাজার কার্য উদ্ধার করেন। কালীপ্রসাদ সে মালার মূল্য ৪০ হাজার মুদ্রামাত্র হেস্টিংসপত্নীর নিকট বলিয়াছিলেন।[১৯] পরে রাজার কার্যোদ্ধারের জন্য তাঁহাকে উপহার প্রদান করেন। উপরোক্ত ঘটনা দেশীয় প্রবাদ। কিন্তু প্রাচীন কাগজপত্রে সেই দানপত্রের সম্মতির জন্য দেড় লক্ষ টাকার উল্লেখ দেখা যায়। হয়ত, মতির মালা দেওয়ার পর, যখন হেস্টিংসসাহেব দানপত্রে সম্মতিদান করিতে স্বীকৃত হন, তখন কেবলই যে একগাছি মালায় তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এমত বোধ হয় না। তিনি সুযোগ বুঝিয়া, শেষে হয়ত রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট হইতে দেড় লক্ষ টাকা লইয়া থাকিবেন। কিন্তু যদি দেশীয় প্রবাদ সত্য হয়. তাহা হইলে এ ক্ষেত্রে হেস্টিংস দেওয়ানজীর অনুরোধ রক্ষা না করিয়া, রাজার দানপত্রে সম্মতিদান করিয়াছিলেন।

হেস্টিংসের অনেকগুলি লোক উৎকোচগ্রহণে নিযুক্ত থাকিত। যখন যাহার দ্বারা সুবিধা হইত, তখন হেস্টিংস তাহারই কথায় কর্ণপাত করিতেন ; অন্যে আপত্তি করিলে সে কথা গ্রাহ্য করিতেন না। এক্ষেত্রে দেওয়ানজী তাঁহার আয়ের ব্যাঘাত জন্মাইতেছেন জানিয়া, তিনি তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করেন নাই এবং মুক্তামালার ঘটনা যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে স্বীয় প্রিয়তমা পত্নীর মনোরঞ্জন না করিয়া, তিনি কি প্রকারে অন্যের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন ? যাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহার পূর্বস্বামীকে অর্থপ্রদান করিয়া বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিয়া লন,[২০] এবং যাঁহার নিকট তিনি মনঃপ্রাণ বিক্রয় করিয়াছিলেন, তাঁহার অনুরোধ যে সর্বাগ্রে রক্ষণীয়

১৮ Debrett's Trial of W. H., Pt. III, p. 4.

১৯ ক্ষিতিশবংশাবলীচরিত—সপ্তদশ অধ্যায়।

২০ হেস্টিংস ইম্হফ নামে একজন ইউরোপীয়কে অর্থ প্রদান করিয়া তাঁহার পত্নীকে নিজ পত্নীরূপে গ্রহণ করেন।

সে বিষয়ে কি কোন সন্দেহ থাকিতে পারে ? গঙ্গাগোবিন্দ সহস্রগুণে হিতৈষী বন্ধু হইলেও, এ হেন প্রিয়তমার মনস্কামনা পূর্ণ না করিলে, তাঁহার যে বিষম অনর্থ উপস্থিত হইত ! যাহা হউক, হেংস্টিস দুই এক স্থান ভিন্ন, অধিকাংশ স্থলেই যে গঙ্গাগোবিন্দের দ্বারা উৎকোচ গ্রহণ করিতেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

যে কয়েকজন দেশীয় লোক হেস্টিংসের উৎকোচসংগ্রহে নিযুক্ত ছিল, তন্মধ্যে গঙ্গাগোবিন্দ ও কান্তবাবুই প্রধান। এই সকল লোকেরা ৯ লক্ষ টাকা উৎকোচ লয়। তন্মধ্যে পীড়াপীড়িতে কোম্পানীর কোষাগারে ৫।।০ লক্ষ প্রদান করার কথা জানা যায় ; অবশিষ্ট টাকা হেস্টিংস ও তাঁহার প্রিয় কর্মচারিগণ-কর্তৃক যে আত্মসাৎ হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।[২১]

দেশীয় জমিদার ও ইজারদারদিগকে উৎকোচের জন্য জ্বালাতন করিয়া, গঙ্গা-গোবিন্দ যে হেস্টিংসসাহেবের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহার যথাযথ বিবরণ আমরা পূর্বে প্রদান করিয়াছি। উৎকোচ গ্রহণ করিয়া, দিন দিন তাঁহার অর্থলালসা আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাহারই বশবর্তী হইয়া, অবশেষে তাঁহাকে কোম্পানীর রাজস্বেও হস্তক্ষেপ করিতে হয়। পূর্বে যে তিন স্থান হইতে উৎকোচ লওয়ার বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে, সেই তিন স্থান অর্থাৎ দিনাজপুর, পাটনা ও নদীয়ার রাজস্বব্যাপারে দেওয়ানজীর নিকট অনেক টাকা পাওনা হইয়াছিল। কেবল নদীয়ার টাকা তিনি ক্রফ্‌টস সাহেবের হস্তে প্রদান করিয়াছেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। কিন্তু দিনাজপুরের হিসাবের ৯৭,৬৬৩ টাকা ও পাটনার ২১,৮০১ টাকা তিনি প্রত্যর্পণ করেন নাই। হেস্টিংসসাহেব ইহার জন্য গঙ্গাগোবিন্দের কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছিলেন। দেওয়ানজী তাহার যে উত্তর প্রদান করেন, তাহাতে হেস্টিংসসাহেব সন্তোষ লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়া প্রকাশ করেন। গঙ্গাগোবিন্দের নিকট ঐ সমস্ত টাকা পাওনাও রহস্যময়। কারণ হেস্টিংসসাহেব যখন জানিতে পারিয়াছিলেন যে, কোম্পানীর হিসাবপত্রে বাস্তবিকই গঙ্গাগোবিন্দের নামে যথেষ্ট টাকা পাওনা রহিয়াছে, তখন তিনি কেবল তাঁহার কৈফিয়ৎ তলব করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন এবং নিজেও যে তাঁহার উত্তরে সন্তুষ্ট হন নাই, তাহাও আমরা বলিয়াছি ; তথাপি হেস্টিংসসাহেব সে টাকা আদায়ের জন্য কখনও গঙ্গাগোবিন্দকে পীড়াপীড়ি করেন নাই।[২২] কোম্পানীর ক্ষতি করিয়া যে গঙ্গাগোবিন্দ রাজস্বের অর্থও আত্মসাৎ করিয়াছিলেন, সেই গঙ্গাগোবিন্দের নিকট হইতে স্বয়ং গবর্নর জেনারেল তাহা আদায়ের চেষ্টা করেন নাই কেন ? সুতরাং সে বিষয়েও যে গঙ্গাগোবিন্দের সহিত তাঁহার বিশেষরূপ সম্বন্ধ ছিল, এ কথা বলা নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয় না।

এইরূপে যখন সকল দিক হইতেই তাঁহার অর্থলালসা পরিতৃপ্তির চেষ্টা হইতে

২১ Debrett also Burke, Pt. II, p. 37.
২২ Minutes of Evidence taken in W. H's Trial, pp. 1190-91.

লাগিল, তখন দিন দিন গঙ্গাগোবিন্দ সাধারণের চক্ষে অত্যন্ত হেয় হইয়া উঠিলেন। যেমন উৎকোচগ্রহণ-ব্যাপারে দেশীয় জমিদার ও প্রজাগণ তাঁহাকে ভীতির চক্ষে দেখিত, তেমনি ইউরোপীয়গণ তাঁহাকে আন্তরিক ঘৃণা করিতেন। বিশেষতঃ কোম্পানীর রাজস্ববিষয়ে হস্তক্ষেপ করায়, গঙ্গাগোবিন্দের প্রতি তাঁহাদের ঘৃণা বদ্ধমূল হয়। রাজস্ব-সমিতির সভ্যেরা সাহস করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে পারিতেন না। কারণ গবর্নর জেনারেলকে ভয় করিয়া সকলকেই চলিতে হইত এবং গবর্নর জেনারেলের সাহসেই গঙ্গাগোবিন্দ এই সমস্ত গুরুতর কার্য অনায়াসে সম্পন্ন করিতেন। গঙ্গাগোবিন্দের এই সমস্ত অত্যাচারের কথা হেস্টিংসের বিচার সময়ে সেই বিশাল ওয়েস্টমিনিস্টার হলে সমবেত ব্রিটিশ জাতির সমক্ষে কোম্পানীর কর্মচারিগণ অবিচলিত-চিত্তে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সাক্ষ্যে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। গঙ্গাগোবিন্দের অত্যাচার কিরূপ ভাবে বিস্তৃত হইয়াছিল, সেই সমস্ত সাক্ষ্য হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়। ইয়ং, মুর প্রভৃতি স্পষ্টাক্ষরে গঙ্গা-গোবিন্দের অত্যাচারের উল্লেখ করিয়া সমস্ত ব্রিটিশ জাতির প্রতিনিধির সমক্ষে তাঁহার চরিত্রের কালিমাময় চিত্র পূর্ণভাবে প্রদান করিয়াছেন।[২৩]

যদিও গঙ্গাগোবিন্দের অত্যাচারে লোকে অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়াছিল, তথাপি হেস্টিংসসাহেব তাঁহার সমস্ত দোষ আচ্ছাদন করিয়া রাখায় এবং তাঁহার সমস্ত কার্যের সমর্থন করায়, কেহ তাঁহার বিরুদ্ধে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিত না। যেখানে তাঁহাকে লইয়া পীড়াপীড়ি উপস্থিত হইত, সেইখানে হেস্টিংসসাহেব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সমস্ত গোলযোগ মিটাইয়া দিতেন। গবর্নর জেনারেলের জন্য তাঁহার অত্যাচার জনসাধারণের গোচরীভূত হইত না। কেবল যাহারা সেই অত্যাচার ভোগ করিত, তাহারাই তাঁহাকে বিশেষরূপে চিনিত।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, অত্যাচারের জন্য গঙ্গাগোবিন্দ একবার পদচ্যুত হইয়াছিলেন। এই পদচ্যুতি ঘটিবার পূর্বে তাঁহার উৎকোচ গ্রহণব্যাপার লইয়া এক গোলযোগ উপস্থিত হয়। কিন্তু হেস্টিংসসাহেবের মধ্যস্থতায় তিনি সে যাত্রা নিষ্কৃতি পান। যে ব্যক্তি তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করে, যদিও তাঁহার ন্যায় ইতর-

২৩ "G. G. Sing bore a very bad character, both amongst the Natives and Europeans." (Young's Evidence) Ibid. p. 1215. "He (G. G. Sing) was considered as a general oppressor of every native he had to deal with. He was considered as such by all ranks of people; by Europeans he was detested, and by natives he was dreaded." (Peter Moor's Evidence), Ibid, p. 1239. "In his (G. G. Sing's) public employment I have heard he was very arbitrary and oppressive, and that was his general character." (W. Harwood's Evidence), Ibid, p. 1247.

প্রকৃতির লোক অতি অল্পই দৃষ্ট হইত, তথাপি এ ক্ষেত্রে তাহার অভিযোগের যে একেবারে কোনই মূল ছিল না, তাহা বলা যায় না। হেস্টিংসসাহেবের মধ্যস্থতা হইতে তাহা একরূপ প্রমাণীকৃত হইয়াছিল। যে কমলউদ্দীনের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া সুপ্রীমকোর্টের জজেরা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মহারাজ নন্দকুমারকে ফাঁসীকাঠে লম্বমান করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই কমলউদ্দীনই গঙ্গাগোবিন্দের নামে অভিযোগ উপস্থিত করে। সে এই বলিয়া কাউন্সিলে আর্জি দাখিল করে যে, বাঙ্গলা ১১৮১ সালের মাঘ মাসের শেষে রাজস্ব-সমিতির নিকট হইতে ৪ বৎসরের জন্য আমি হিজলী পরগণায় লবণের ইজারা গ্রহণ করি। লক্ষ মণ করিয়া লবণ চালান দিবার জন্য আমার প্রতি আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু সমিতির দেওয়ান আমার নিকট হইতে গোপনভাবে ২৬ হাজার টাকা প্রার্থনা করিয়া বলেন যে, লক্ষ মণের অধিক যে লবণ হইবে, তাহা আমি নিজে বিক্রয় করিয়া লাভ করিতে পারিব। তজ্জন্য গবর্নমেণ্ট হইতে কোনরূপ গোলযোগ হইবে না। আমি সেই কথায় প্রথমতঃ ১৫ হাজার টাকার মোহর প্রদান করি। পরে লক্ষ মণের অতিরিক্ত লবণের ছাড় চাহিলে, দেওয়ান সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া অবশিষ্ট টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া আমার নিকট হইতে সমস্ত টাকা আদায় করিয়া লন। এক্ষণে যাহারা লবণ প্রস্তুত করে, তাহারা টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছে। সুতরাং যাহাতে দেওয়ান আমাকে উক্ত টাকা প্রদান করেন, তাহার বিধান করা হউক।[২৪]

এই আর্জি লিখিয়া কমলউদ্দীন মহারাজ নন্দকুমার ও ফাউকসাহেবের দ্বারা কাউন্সিলে আর্জি প্রেরণ করে; গবর্নর জেনারেল তাহা অবগত হইয়া কমলউদ্দীনকে বশীভূত করিয়া ফেলেন এবং গ্রেহামনামে তদানীন্তন কোম্পানীর জনৈক মুন্সী সদর-উদ্দীনের দ্বারা গঙ্গাগোবিন্দ ও কমলউদ্দীনের গোলযোগ মিটাইয়া দেন। নন্দকুমার-প্রবন্ধে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। হেস্টিংস কমলউদ্দীনকে বশীভূত করিয়া, সেই বিচারে তাহার সাক্ষ্য প্রদান করাইয়াছিলেন। সেই সাক্ষ্য ও জেরায় কমলউদ্দীন বলিয়াছিল যে, গঙ্গাগোবিন্দের নামে প্রকৃত প্রস্তাবে অভিযোগ করিবে বলিয়া আর্জি লেখে নাই। তাঁহার সহিত মনোবিবাদ থাকায়, তাঁহাকে ভয় দেখাইবার জন্য আর্জি লিখিয়াছিল এবং মহারাজ নন্দকুমার ও ফাউকসাহেবকে কাউন্সিলে আর্জি দাখিল করিতে নিষেধ করিয়াছিল। মুন্সী সদরউদ্দীন তাহাদের বিবাদ মিটাইতে প্রতিশ্রুত হন। তিনি অনুপস্থিত থাকায়, যতদিন তিনি উপস্থিত না হন, ততদিন আর্জি কাউন্সিলে পাঠাইতে সে নিষেধ করিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ করে। সে এইরূপ বলে যে, গঙ্গাগোবিন্দও তাহার নিকট ১৬ হাজার টাকা পাইতেন। মুন্সী সদরউদ্দীন উভয়ের দেনা-পাওনা মিটাইয়া সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং

২৪ Holwell's State Trial, Vol. XX. (The Trial of J. Fowke and others for a conspiracy.)

গঙ্গাগোবিন্দের প্রতি এক্ষণে তাহার কোন বিরুদ্ধ ভাব নাই।[২৫] এইরূপ অনেক স্থলে গঙ্গাগোবিন্দ হেস্টিংসসাহেবের জন্য লাঞ্ছনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন।

আর এক সময়ে গঙ্গাগোবিন্দ ও তাঁহার পুত্র প্রাণকৃষ্ণ এক জাল ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া অভিযুক্ত হন। কিন্তু ভাগ্যবলে সেবারও লাঞ্ছনা ও অবমাননার হস্ত হইতে উভয়েই নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। ১৭৮২ খ্রীঃ অব্দে হিজলীর ফৌজদারের উকীল গোলাম আশ্‌রফ নবাব মহম্মদ রেজা খাঁ মজঃফরজঙ্গের নামে কতকগুলি দাখিলা জাল করায় ধৃত হয়। রেজা খাঁ যে সময়ে ফৌজদারী আদালতের প্রধান কর্তা ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার অধীন কর্মচারীদিগের বেতনের জন্য ঐ সকল দাখিলা দেওয়া হয় বলিয়া জাল করা হয়। গোলাম আশ্‌রফ ইহাতে প্রাণকৃষ্ণকে বিজড়িত করিয়া ফেলে। তৎকালে সরকারপক্ষের ফৌজদারী বিচারের তত্ত্বাবধায়ক উইলেসসাহেব এক মাসের উপর এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া সমিতির নিকট আপনার মন্তব্য প্রেরণ করেন। তাহাতে প্রাণকৃষ্ণকে অব্যাহতি দিয়া গোলাম আশ্‌রফকেই দোষী স্থির করা হয়। তাঁহার মন্তব্যানুসারে গোলাম আশ্‌রফ দাওরা সোপর্দ হয়। গোলাম আশ্‌রফ তাহার হাজতে অবস্থানকালে পুনর্বার প্রাণকৃষ্ণ ও গঙ্গাগোবিন্দ উভয়ের বিরুদ্ধে গবর্নর জেনারেলের নিকট এক আবেদনপত্র প্রেরণ করে। এই বিষয়ের অনুসন্ধানের জন্য রাজস্ব-সমিতির সভ্যগণের মধ্যে চার্লস উইল্‌কিন্স, জেম্‌স্ গ্রাণ্ট, জোনাথান ডন্‌কান এবং জন্ হোয়াইটকে লইয়া একটি অনুসন্ধান সমিতি গঠিত হয়। ১২ই এপ্রিল হইতে তাঁহারা এবিষয়ের তদন্ত আরম্ভ করেন। তাঁহারা গোলাম আশ্‌রফের প্রত্যেক সাক্ষীকে জেরার উপর জেরা করিয়া তাহাদের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করিয়া ২৩শে গোলাম আশ্‌রফের নিকট প্রকাশ করেন যে, ১৫ দিনের মধ্যে যদি সে অন্য সাক্ষী আনয়ন করিতে না পারে, তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাদিগের মন্তব্য রাজস্ব-সমিতির নিকট পাঠাইতে বাধ্য হইবেন।

গোলাম আশ্‌রফ উপায়ান্তর না দেখিয়া পুনর্বার সাক্ষীর চেষ্টা দেখিতে লাগিল। ৭ই জুন সে তিন জন সাক্ষী লইয়া যায়। কিন্তু সে সাক্ষীর প্রমাণ গ্রাহ্য না করিয়া, তাঁহারা তাহাদিগকে মিথ্যাসাক্ষী স্থির করিয়া সমিতিকে অবগত করান। সমিতি সরকারী পক্ষের তৎকালীন সর্বপ্রধান কৌন্সিলী সার্‌জন্সন ডেকে এই সকল মিথ্যাসাক্ষীর দণ্ডবিধানার্থ তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিতে আদেশ দেন। দুই জন দাওরা সোপর্দ হয়; তন্মধ্যে একজনকে শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল। অনুসন্ধান-সমিতি ক্রমান্বয়ে আপনাদের অনুসন্ধান চালাইতে লাগিলেন। অবশেষে আগস্ট মাসে তাঁহারা তাঁহাদের অনুসন্ধানের পূর্ণ বিবরণ সমিতির নিকট উপস্থিত করেন। তাহাতে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ ও প্রাণকৃষ্ণকে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি দেওয়া হয়।[২৬]

২৫ Ibid.

২৬ Calcutta Review, 1874. Kandi Family.

জানি না, গোলাম আশ্‌রফের উক্ত ব্যাপারে দেওয়ানজী ও তাঁহার পুত্র লিপ্ত ছিলেন কি না। অর্থতৃষ্ণায় তাঁহাদিগকে যেরূপ অন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাতে ঐরূপ ব্যাপার তাঁহাদিগের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব বলিয়াও বোধ হয় না এবং সমিতির অনুসন্ধান ও মন্তব্য যে সম্পূর্ণ নির্দোষ, তাহাই বা কেমন করিয়া বলিতে পারি। আমরা যে সমিতিকে বরাবর গঙ্গাগোবিন্দের ক্রীড়াপুত্তল স্বরূপ বলিয়া আসিয়াছি, সে সমিতির অনুসন্ধান ও বিচারে তিনি ও তাঁহার পুত্র নিষ্কৃতি পাইবেন, তাহারই বৈচিত্র্য কি? গবর্নর জেনারেল হেস্টিংসেরও যে ইহাতে কোন ইঙ্গিত থাকিতে না পারে, তাহাই বা কে বলিতে পারে? এই সকল কথা বলিবার কোন বিশেষ কারণ আছে বলিয়া আমাদিগকে বলিতে হইল। উক্ত জাল অভিযোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, প্রাণকৃষ্ণ এক মানহানির অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র সেন ও গোপী নাজির নামে দুই জন গোলাম আশ্‌রফের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার সম্মানহানির জন্য মিথ্যা মোকর্দমা উপস্থিত করিয়াছে বলিয়া প্রাণকৃষ্ণ এই অভিযোগ উপস্থাপিত করেন।

এই স্থলে আমরা রামচন্দ্র সেনের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতে ইচ্ছা করিতেছি। রামচন্দ্র সেন বৈদ্যবংশসম্ভূত। তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণের নিবাস কৃষ্ণনগরে ছিল এবং নদীয়ার রাজসরকারে তাঁহারা কার্য করিতেন। রামচন্দ্রের পিতা কৃষ্ণরাম, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কোপে পতিত হইয়া কিছুদিন কারাবাস ভোগ করেন। শুনা যায় যে, রামচন্দ্র দিল্লীর বাদশাহ ও মুর্শিদাবাদের নবাবের সাহায্যে পিতার অবমাননার প্রতিশোধ লইবার জন্য, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র কৃষ্ণনগর হইতে গুপিপাড়ার নিকট সোমড়ায় বাস করেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন বলিয়া নবাব ও কোম্পানীর সরকারে অনেক কার্য করিয়াছিলেন। ১৭৭৯ খ্রীঃ অব্দে গঙ্গাগোবিন্দের পদচ্যুতি ঘটিলে, রামচন্দ্র ফিলিপ ফ্রান্সিসের যত্নে তাঁহার পদে নিযুক্ত হন। এইজন্য গঙ্গাগোবিন্দ সর্বদা তাঁহাকে হিংসার চক্ষে দেখিতেন। তাহার পর গঙ্গাগোবিন্দ পুনর্বার স্বীয় পদে নিযুক্ত হইয়া সর্বদা রামচন্দ্রের অনিষ্ট চেষ্টা করিয়া বেড়াইতেন। উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত মনোবিবাদ ছিল। রামচন্দ্রের বিবরণে জানা যায় যে, তাঁহার ন্যায় পরদুঃখকাতর, পরোপকারী, উদারচেতা লোক অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোম্পানীর কর্মচারিগণ-কর্তৃক উৎপীড়িত জমিদার ও প্রজাগণের জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়া তিনি গবর্নর জেনারেল হইতে সামান্য কর্মচারী পর্যন্ত সকলেরই বিরাগভাজন হইয়া উঠেন; এবং গঙ্গাগোবিন্দের সহিত অত্যন্ত বিবাদ থাকায়, গোলাম আশ্‌রফের সহিত লিপ্ত বলিয়া অভিযুক্ত হইয়া পড়েন। ৪০ দিবস ব্যাপিয়া এই মানহানির বিচার হয়। জুরীগণের বিচারে গোপীনাথ মুক্তি পায়। রামচন্দ্র গোলাম আশ্‌রফের সহিত মিলিত হইয়া প্রাণকৃষ্ণ ও দেওয়ানের বিরুদ্ধে এক মিথ্যা আর্জি লিখিয়া দাখিল করিয়াছেন বলিয়া

দোষী স্থির হন।[২৭] পরে অনেক অর্থব্যয় করিয়া মুক্তিলাভ করেন। এই মোকর্দমায় রামচন্দ্র দোষী স্থির হইলে, তাঁহার নিকট হইতে ৯ লক্ষ টাকার জামিন চাওয়া হয়। কিন্তু কলিকাতাদুর্গের অধ্যক্ষসাহেবের সহিত তাঁহার পরিচয় থাকায় তিনি রামচন্দ্রকে জামিনে খালাস করেন।[২৮] রামচন্দ্রের সাধুচরিত্রের কথায় বিশ্বাসস্থাপন করিতে হইলে, গোলাম আশ্‌রফের আবেদনপত্রে অবিশ্বাস করা যায় না। বাস্তবিক রামচন্দ্র তৎকালে বিপন্ন লোকদিগের উদ্ধারের জন্য অত্যন্ত চেষ্টা করিতেন। সুতরাং দেওয়ানজী ও তৎপুত্রের সহিত গোলাম আশ্‌রফের যে কোনই সম্পর্ক ছিল না, তাহা একেবারে বলা যায় না। তবে ভাগ্য যাহাদের সহায় হয়, সত্য ঘটনা হইলেও তাহারা কোন স্থলে লাঞ্ছিত হয় না।

এইরূপ প্রায় সর্বস্থলেই হেস্টিংস গঙ্গাগোবিন্দকে সমস্ত বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। আমরা বারংবার বলিয়াছি যে, যদিও দুই এক স্থলে হেস্টিংস তাঁহার উপর কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তাহার বিশ্বস্ততার উপর সন্দিহান হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার উপর আন্তরিক অসন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি ভারতবর্ষ-পরিত্যাগের পূর্বে কাউন্সিলের নিকট গঙ্গাগোবিন্দের কার্যের পুরস্কারের জন্য অনুরোধ করিয়া যান। হেস্টিংস ১৭৮৫ খ্রীঃ অব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি কাউন্সিলের নিকট অনুরোধ করেন যে, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বাল্যকাল হইতে কোম্পানীর কার্য করিয়াছে এবং তাহার অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার জন্য তাহাকে ১১ বৎসর ব্যাপিয়া কমিটির দেওয়ানী পদে নিযুক্ত রাখা হইয়াছে। সে যেরূপ বিশ্বস্ততা, তৎপরতা ও দক্ষতার সহিত কোম্পানীর রাজস্ববিভাগের কার্য নির্বাহ করিয়াছে, তাহাকে তজ্জন্য বিশেষরূপে পুরস্কৃত করা উচিত। এক্ষণে সে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় তাহার ট্রস্টী রাধাগোবিন্দ ঘোষ ও ব্রজকিশোর ঘোষের নামে কতকগুলি জমাজমি চাহিতেছে। গঙ্গাগোবিন্দ ২,৩৮,০৬৯৵৫ খাজনায় সেই সমস্ত জমি বন্দোবস্ত করিতে চাহে। অতএব তাহার প্রার্থনা পূরণ করিয়া তাহার কার্যের পুরস্কার প্রদান করা হউক।"[২৯]

হেস্টিংসের কৃপায় গঙ্গাগোবিন্দ বাঙ্গলায় অনেক স্থানের জমিদারী লাভ করিয়া ছিলেন। যে দিনাজপুরের অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজার তত্ত্বাবধানের ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল, তিনি তাঁহার সর্বনাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই; তাঁহাকে জমিদারী দেওয়ার কালে তাঁহার নিকট হইতে যে ৪ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়, তদ্ব্যতীত তাঁহার জমিদারীর কত অংশ গঙ্গাগোবিন্দ গ্রাস করিয়া বসেন। তিনি নাবালক রাধানাথকে ভুলাইয়া তাঁহার নিকট হইতে সালবাড়ী পরগণা অল্পমূল্যে ক্রয় করিয়া, তাঁহার কোন আত্মীয়ের সম্মতি লিখাইয়া লন। কিন্তু রাজার পক্ষীয় অন্যান্য লোকেরা নাবালকের

---

২৭ Calcutta Review, 1874. Kandi Family.

২৮ চাঁদরানী ২০২ পৃ:। যাঁহারা রামচন্দ্রের বিস্তৃত বিবরণ জানিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে চাঁদরানী পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

২৯ Evidence taken in W. H's Trial, p. 1191.

সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার কোন ক্ষমতা নাই বলিয়া, কাউন্সিলে আবেদন করিলে, কাউন্সিলের অনুসন্ধানে এইরূপ জ্ঞাত হওয়া যায় যে, রাজার যে আত্মীয় সম্মতি দিয়াছিলেন, তিনি এইরূপ বলেন যে, আমি জাতিনাশের ভয়ে সম্মতি দিয়াছি। আমি যদি সম্মতি না দিতাম, তাহা হইলে গঙ্গাগোবিন্দের মাতৃশ্রাদ্ধে আমার নিমন্ত্রণ হইত না।[৩০] সুতরাং তাহাতে আমাকে একরূপ সমাজচ্যুত হইতে হইত।

গঙ্গাগোবিন্দ যখন দেখিলেন যে, নাবালকের সম্পত্তি লওয়ায় বাস্তবিক বিপদ ঘটিতেছে, তখন তিনি এই সুর ধরিলেন যে, নাবালকের সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষমতা না থাকিলেও গবর্নমেণ্ট যাহাকেই ইচ্ছা তাহাকেই সে সম্পত্তি দিতে পারেন। অতএব গবর্নমেণ্টের নিকট হইতে যখন আমি অনুমতি পাইয়াছি, তখন সালবাড়ী প্রত্যর্পণ করিতে পারি না। তিনি জানিতেন যে, যদিও হেস্টিংস গমনোন্মুখ, তথাপি তাঁহার ক্ষমতা একেবারে তিরোহিত হয় নাই। কাউন্সিলের সভ্যেরা রাজস্ব-সমিতির মত চাহিয়া পাঠান। জনৈক সভ্য স্টেবল্‌সসাহেব গঙ্গাগোবিন্দের বিরুদ্ধে মত দিয়া সালবাড়ী প্রত্যর্পণ করিতে এবং গঙ্গাগোবিন্দ ও প্রাণকৃষ্ণকে পদচ্যুত করিয়া রাজস্ব-বিভাগের সমস্ত ভার রায়রায়ান রাজা রাজবল্লভের হস্তে অর্পণ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়।[৩১] তাহার পরে হেস্টিংসসাহেব ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। গমনকালে গঙ্গাগোবিন্দ জাহাজে স্বীয় প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। দুই বন্ধুর বহুকালজাত প্রণয় বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, দুই জনে উষ্ণ দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত বিদায় গ্রহণ করেন।

হেস্টিংসের পর শান্তিপ্রিয় লর্ড কর্নওয়ালিস আসিয়া ভারতসিংহাসনে উপবিষ্ট হন। হেস্টিংস অশান্তির অগ্নিতে ভারতবর্ষ দগ্ধ করিয়াছিলেন, কর্নওয়ালিস্ তাহাতে শান্তিবারি সেচন করিতে উদ্যোগী হইলেন। বিশেষতঃ বাঙ্গলার বিপন্ন জমিদার ও প্রজাগণ অবিরত যে অর্থশোষণের অগ্নিতে পুড়িয়া মরিতেছিল, তিনি একেবারে তাহা নির্বাপিত করিয়া ফেলিলেন। বাঙ্গলায় তাঁহার বিরাট্‌ কীর্তি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে তিনি জমিদার ও প্রজা উভয়েরই বিশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি গঙ্গাগোবিন্দ প্রভৃতি সকলেরই বিশেষরূপ পরিচয় পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা অনেক দিন হইতে রাজস্ববিভাগের কার্য করায়, কর্নওয়ালিস্ তাঁহাদিগের দ্বারা সাহায্য হইবে বিবেচনায় গঙ্গাগোবিন্দকে জমানবিশের পদে নিযুক্ত করেন। তাঁহার সময়ে রায়রায়ান রাজবল্লভ পুনর্বার রাজস্ববিভাগের কর্তা হন; গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ প্রভৃতি তাঁহার অধীন ছিলেন। এইরূপ অবগত হওয়া যায় যে, জমানবিশ ১৭৮৬ খ্রীঃ অব্দের জুন মাসে রায়রায়ানের নিকট বাঙ্গলা ১১৮৮, ১১৮৯, ১১৯০ এবং ১১৯১ সালের বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার যাবতীয় জমাওয়াশীল বাকি উপস্থাপিত

৩০ দিনাজপুরের রাজারা গঙ্গাগোবিন্দের স্বজাতি ও স্বশ্রেণী। তাঁহারাও উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ।
৩১ Burke's Impeachment of W. H., pp. 221-224.

করেন। সেই জমাওয়াশীলপত্র হইতে জানা যায় যে, তৎকালে কোম্পানীর মোট জমা ১১,১৮,০১,৪০৮৷৷৵৫ ছিল; কিন্তু সে কয় বৎসরে গড়ে ১০,০৯,২৬,৪১১৷৷১৫ আদায় হয়।[৩২] গঙ্গাগোবিন্দ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় বন্দোবস্তকার্যে কর্ণওয়ালিসের অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। বঙ্গের রাজস্ববন্দোবস্তের সর্বপ্রধান কীর্তি হইতেও তিনি বিচ্ছিন্ন নহেন।

উৎকোচগ্রহণ, জমিদারীলাভ প্রভৃতিতে অগাধ সম্পত্তির অধীশ্বর হইয়া, গঙ্গাগোবিন্দ অনেক সময়ে নিজ ঐশ্বর্যগর্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। সেই সময়ের লোকদিগের এক চমৎকার প্রথা ছিল যে, জাল, জুয়াচুরি, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, বলপ্রয়োগ প্রভৃতি গর্হিত উপায়ে অর্থ উপার্জন করিয়া তাঁহারা অনেক সদনুষ্ঠান করিতেন। সেই সমস্ত অর্থ দেবসেবা, ব্রাহ্মণসেবা ও অতিথিসেবায় ব্যয়িত হইত। এই সকল সদনুষ্ঠান যে কেবল সৎপ্রবৃত্তিজাত, তাহা বলিতে পারা যায় না; ইহাতে ঐশ্বর্যাভিমান বিমিশ্রিত থাকিত বলিয়া মনে হয়। তাহা না হইলে, অর্থোপার্জনের উপায় কদাচ এরূপ নিকৃষ্ট হইতে পারিত না। কিন্তু তাই বলিয়া এরূপ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য যে কিয়ৎপরিমাণে উৎকৃষ্ট, তাহাও বলিতে হইবে। সেই অর্থ নৃত্যগীতাদি আমোদপ্রমোদে নষ্ট না করিয়া, দেশের উপকারে যদি ব্যয় করা হয়, তাহা হইলে, তাহাকে মন্দের ভাল বলা যাইতে পারে। কিন্তু যে সৎকার্যের মূলে মূর্তিমান পাপ বিরাজ করে, কদাচ তাহাকে প্রাণ খুলিয়া প্রশংসা করা যায় না। শৌচপ্রসঙ্গে মনু বলিয়াছেন যে, সর্বাপেক্ষা অর্থশৌচই শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ অন্যায় পথ পরিত্যাগপূর্বক যে ব্যক্তি অর্থ উপার্জন করে, তাহাকেই প্রকৃত নির্মল বলা যায়। দুঃখের বিষয়, সে কালের অনেক ধনবান্‌দিগের সদনুষ্ঠানে অর্থশৌচ অতি অল্পপরিমাণে দৃষ্ট হইত।

গঙ্গাগোবিন্দ যে সমস্ত সৎকার্য করেন, তন্মধ্যে তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ সর্বপ্রধান। কান্দীতেই এই সমারোহপূর্ণ কার্য সম্পন্ন হয়। কাশী, মিথিলা, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানেই যাবতীয় পণ্ডিত শিষ্যগণসহ নিমন্ত্রিত হইয়া, শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এইরূপ কথিত আছে যে, সেই সেই স্থানের প্রত্যেক চতুষ্পাঠী হইতেই পণ্ডিতগণ আগমন করেন। এতদ্ভিন্ন দেশের অন্যান্য ব্রাহ্মণগণও সমবেত হন। ভাট, ভিক্ষুকের সীমা পরিসীমা ছিল না। বাঙ্গলার প্রধান প্রাধান জমিদার, রাজা, মহারাজগণ, উপস্থিত হইয়া শ্রাদ্ধসভার শোভাবর্ধন করিয়াছিলেন। নদীয়া, নাটোর, বর্ধমান, দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানের রাজগণ এই বিরাট্ ব্যাপারে আগমন করেন। সভাতে নদীয়ার ও নাটোরের ব্রাহ্মণরাজকে শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া হইয়াছিল; তৎপরে বর্ধমান, দিনাজপুর, তাহার পর যশোহরের ও পাটুলীর মহাশয়দিগের আসন স্থাপন করা হয়। গঙ্গাগোবিন্দ এই শ্রাদ্ধের সময়, অল্পকাল স্থায়ী বৃহৎ বৃহৎ অনেক বাটী নির্মাণ করিয়া, নিমন্ত্রিতগণের জন্য বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দেন। শত শত মণ

৩২ Calcutta Review, 1874. Kandi Family.

সিধা প্রতিনিয়ত বিতরিত হইত। চাউল প্রভৃতি পর্বতের ন্যায় স্তূপাকারে অবস্থিতি করিত। পুষ্করিণীর ন্যায় চৌবাচ্চা খনন করিয়া তাহাতে তৈল, ঘৃতাদি রক্ষিত হইয়াছিল। নানাবিধ মিষ্টান্নে ব্রাহ্মণ ও ভিক্ষুকদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া, তাহাদিগকে আশাতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হয়। কথিত আছে যে, পুরীধাম হইতে জগন্নাথদেবের সদ্যঃপ্রসাদ আনাইয়া এই সময়ে ব্রাহ্মণভোজন করান হইয়াছিল। ফলতঃ এরূপ বিরাট্ শ্রাদ্ধ তৎকালে কেহ সম্পন্ন করিতে পারেন নাই বলিয়া প্রবাদ আছে।

এই শ্রাদ্ধের সময় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র পীড়িত ছিলেন; তজ্জন্য তিনি শ্রাদ্ধসভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। কৃষ্ণচন্দ্র জ্যেষ্ঠপুত্র শিবচন্দ্রকে গঙ্গাগোবিন্দের মাতৃশ্রাদ্ধে গমন করিতে বলেন। শিবচন্দ্র প্রথমে স্বীকৃত হন নাই। পরে রাজা, গঙ্গাগোবিন্দের অপরিসীম ক্ষমতার উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে উপদেশ দিলে, তিনি অনেক লোকজন লইয়া কান্দীতে উপস্থিত হন। শিবচন্দ্র উপস্থিত হইলে, স্তূপাকার সিধা তাঁহার নিকট প্রেরিত হয়। শিবচন্দ্র দেওয়ানজীর ভাণ্ডারসঞ্চিত দ্রব্যাদির পরীক্ষার জন্য সে সমস্তই ভিক্ষুকদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেন। দেওয়ানজী দ্বিতীয়বার সেইরূপ সিধা পাঠাইলেন, শিবচন্দ্র সেবারও বিতরণ করিয়া দিলেন। তৃতীয়বার যখন গাড়িগাড়ি দ্রব্য উপস্থিত হইতে লাগিল, তখন শিবচন্দ্র আশ্চর্যান্বিত হইয়া উঠিলেন। কথিত আছে যে, কেবল ৪ গাড়ি হরিদ্রাই প্রেরিত হইয়াছিল। শিবচন্দ্র বহুজনাকীর্ণ সভামধ্যে দেওয়ানজীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—'দেওয়ানজী, এ যে দেখিতেছি দক্ষযজ্ঞের আয়োজন'! দেওয়ানজী উত্তর করিলেন,—'ইহা তদপেক্ষাও অধিক; কারণ দক্ষযজ্ঞে শিবের আগমন হয় নাই; এখানে স্বয়ং শিবই উপস্থিত।' তাহার পর শিবচন্দ্র নিজেই কোমর বাঁধিয়া দেওয়ানজীর মাতৃশ্রাদ্ধে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া এতদঞ্চলে প্রবাদ আছে।

এইরূপ মহাসমারোহে দেওয়ানজীর মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয়। এজন্য জমিদার ও অন্যান্য ভূস্বামিগণ যে যথাসাধ্য অথবা সাধ্যাতিরিক্ত নজর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয়, নূতন করিয়া উল্লেখ করিতে হইবে না। বর্ধমানের মহারানী দেওয়ানজীর মাতৃশ্রাদ্ধে মিষ্টান্ন প্রভৃতিতে ১০।১২ খানি নৌকা বোঝাই করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা যথাসময়ে পৌঁছিতে না পারায় নষ্ট হইয়া যায়।

গঙ্গাগোবিন্দ এই সময়ে নিজ মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। সমস্ত রাজা ও মহারাজদিগের জন্য আসন নির্দিষ্ট হইলে, তাঁহার ভূস্বামীর জন্য কোথায় আসন স্থাপিত হইবে, তদ্বিষয়ে তর্কবিতর্ক উপস্থিত হয়। গঙ্গাগোবিন্দ তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র আসনের বন্দোবস্ত না করিয়া, তাঁহাকে দানোৎসর্গের সময় থাকিতে অনুরোধ করেন। যথাসময়ে ভূস্বামী উপস্থিত হইলে গঙ্গাগোবিন্দ নিজ গাত্র হইতে দোশালা খুলিয়া ভূস্বামীকে বসিতে দেন। দেওয়ানজী এরূপ সম্মান করিতেছেন দেখিয়া, সভাস্থ সকলেই আসন হইতে উত্থিত হন; তখন দেওয়ানজী করযোড়ে তাঁহাকে নিজ ভূস্বামী বলিয়া পরিচয় দেন; উক্ত ভূস্বামী বর্তমান জেমুয়ারাজগণের পূর্বপুরুষ। এই আদ্যশ্রাদ্ধে

২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়, এবং তাহার বাৎসরিক ক্রিয়ায় প্রতিবৎসর এক লক্ষ টাকা ব্যয় হইত।

মাতৃশ্রাদ্ধব্যতীত গঙ্গাগোবিন্দ আরও দুইটি সমারোহময় কার্য সম্পন্ন করেন; একটি তাঁহার পৌত্র লালাবাবুর অন্নপ্রাশন, দ্বিতীয় পুরাণের কথা-প্রদান। পৌত্রের অন্নপ্রাশনে তিনি স্বর্ণপত্র ক্ষোদিত করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সোনামুখীর প্রসিদ্ধ পুরাণকথক গদাধর শিরোমণি গঙ্গাগোবিন্দের পুরাণ-কথায় ব্রতী ছিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে লক্ষ টাকা প্রদান করেন।

গঙ্গাগোবিন্দ নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতদিগকে বৃত্তি প্রদান করিয়া উৎসাহিত করিতেন, এবং তাঁহাদিগের গৃহাদির সংস্কার ও ছাত্রগণের আহারপরিচ্ছদের ব্যয়ের জন্য অজস্র অর্থ প্রদান করিতেন!

পণ্ডিতপ্রতিপালনব্যতীত দেবসেবায় তাঁহার যথেষ্ট ভক্তি ছিল। তিনি নদীয়ার নিকট রামচন্দ্রপুরে শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, কৃষ্ণজী ও মদনমোহনজীর প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাঁহাদের সেবার জন্য অনেক দেবোত্তর সম্পত্তি নির্দেশ করিয়া যান। কান্দীতে তাঁহার রাধাকান্ত নিজ নামে রাধাবল্লভমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে ভ্রাতা গঙ্গাগোবিন্দ রাধাবল্লভের সেবায়ত নিযুক্ত হন। গঙ্গাগোবিন্দ রাধাবল্লভের বাটী নির্মাণ করিয়া, অভ্যাগতগণের বাসের উত্তম সুবন্দোবস্ত করেন। রাধাবল্লভের নিত্যভোগ অতি সমারোহপূর্বক সম্পন্ন হইয়া থাকে। যদিও এক্ষণে তাহার কিছু কিছু হ্রাস হইয়াছে, তথাপি কান্দীর রাধাবল্লভের যেরূপ সেবার বন্দোবস্ত আছে, মুর্শিদাবাদের কোন দেবভবনে সেরূপ বন্দোবস্ত নাই।[৩৩] রাধাবল্লভের রাসযাত্রা মহা-সমারোহে সম্পন্ন হয়। সেই সময়ে, কান্দীতে উৎসব দেখিবার জন্য নানাস্থান হইতে বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে।

গঙ্গাগোবিন্দ যদিও অসদুপায়ে অর্থোপার্জন করিয়াছিলেন, তথাপি তৎসমুদায়

৩৩ রাধাবল্লভের সেবার সম্বন্ধে বাবু ভোলানাথ চন্দ্র এইরূপ লিখিয়াছেন ঃ

"Of all the shrines, the one at Kandi is maintained with the greatest liberality. The God here seems to live in the style of the Great Mogul. His musnud and pillows are of the best velvet and damask richly embroidered. Before him are placed gold and silver salvers, cups, tumblers, pawn-dans, and jugs all of various size and pattern. He is fed every morning with fifty kinds of curries, and ten kinds of pudding. His breakfast over, gold hookas are brought to him to smoke the most aromatic tobacco. He then retires to his noonday *siesta*. In the afternoon he tiffs and lunches, and at night sups the choicest and richest viands with new names in the vocabulary of Hindoo confectionary. The daily expense at this shrine is said to be 500 rupees, inclusive of alms and charity to the poor." (Travels of a Hindoo, Vol. I, p. 66)

সংকার্যে ব্যয় করিয়া বঙ্গদেশে নিজ নামকে কিয়ৎপরিমাণে প্রশংসনীয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর প্রাণকৃষ্ণ সম্পত্তির আরও উন্নতিসাধন করেন। রাধাকান্ত অপুত্রক হওয়ায়, প্রাণকৃষ্ণকে আপনার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। প্রাণকৃষ্ণ পিতার ও জ্যেষ্ঠতাত উভয়ের সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া, অত্যন্ত ধনী হইয়া উঠেন। হেস্টিংস ও গঙ্গাগোবিন্দের সঙ্গে তিনি কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন নাই। আজিমাবাদবন্দোবস্তের সময় তিনি একজন প্রধান কর্মচারীর পদে নিযুক্ত হইয়া, অনেক অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। ১৮০১ খ্রীঃ অব্দে প্রাণকৃষ্ণ বোর্ড অব্ রেভিনিউর নিকট হইতে সুপ্রসিদ্ধ বাগওয়ান ও নলদী পরগণা ক্রয় করেন; এবং বীরভূম জেলার জোবীর ও শ্রীহাটির কিয়দংশ তাঁহার সময়ে ক্রীত হয়। প্রাণকৃষ্ণের সময়ে তাঁহাদের উন্নতি চরমসীমায় উপস্থিত হয়। প্রাণকৃষ্ণও অনেক সময়ে সংকার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠতাত ও পিতার পথানুসরণ করিয়া, তিনিও দেবসেবা, ব্রাহ্মণ-সেবা, অতিথিসেবায় সর্বদা মনোযোগ দিতেন। তিনি অনেক স্থানে দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া, দেবসেবার সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন।

কান্দীর রাজবংশ চিরদিনই ধর্মানুরাগের জন্য বিখ্যাত। প্রাণকৃষ্ণের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ সর্বাপেক্ষা ধর্মানুরাগের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্রই সমগ্র উত্তর-ভারতবর্ষে লালাবাবু নামে খ্যাত। কৃষ্ণচন্দ্র প্রথমে বর্ধমানের ম্যাজিস্ট্রেট কালেক্টর ও জজের আফিসের সেরেস্তাদারী কার্য করিতেন। তৎকালে সম্ভ্রান্তবংশীয় লোকব্যতীত অপর কাহাকেও ঐরূপ পদে নিযুক্ত করা হইত না। সপ্তদশ বৎসর বয়সে তিনি উক্ত কার্যে নিযুক্ত হন। তাহার পর উড়িষ্যার বন্দোবস্তের সময় তিনি তথায় দেওয়ানের কার্য করিয়াছিলেন। উড়িষ্যায় তিনি অনেক জমিদারী ক্রয় করেন। লালাবাবুও মহাসমারোহে পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। তিনি আরবী, ফারসী ও সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার স্বধর্মের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ ছিল এবং সেই অনুরাগ ক্রমে বর্ধিত হইয়া তাঁহার সংসারবৈরাগ্য উৎপাদন করে। অবশেষে তিনি সহসা স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করিয়া, শ্রীবৃন্দাবনধামে যাত্রা করেন; এবং তথায় জীবনের অবশিষ্টাংশ যাপন করিয়াছিলেন।

তাঁহার সহসা সংসারপরিত্যাগ সম্বন্ধে নানারূপ গল্প প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে আমরা একটির বিষয় উল্লেখ করিতেছি। তাঁহার মনে পূর্ব হইতেই বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়াছিল। একদা সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাঁহার একজন পরিচারিকা বলিয়া উঠে,—"সন্ধ্যা হইল, বাসনায় আগুন দিতে হইবে।" লালাবাবু বুঝিলেন যে, জীবনেরও সন্ধ্যা উপস্থিত; অতএব বাসনা জ্বালাইবার সময় হইয়াছে। অতঃপর তিনি সংসার-পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

লালাবাবু ২৫ লক্ষ টাকা লইয়া প্রথমে বৃন্দাবনে উপস্থিত হন। তথায় দস্যুগণ তাঁহার বাটী লুণ্ঠন করিয়া প্রায় ৩ লক্ষ টাকা লইয়া যায়। বৃন্দাবনধামে লালাবাবু কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়া সময় অতিবাহিত করিতেন। দেবসেবা ও অতিথিসেবা

তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার ন্যায় ধর্মপ্রাণ পুরুষ বাঙ্গালী জাতির মধ্যে দুর্লভ। আজিও সমগ্র উত্তর-ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ প্রতিনিয়ত লালাবাবুর জয় কীর্তন করিয়া থাকে। উত্তর-ভারতবর্ষে এমন কেহই নাই যে, লালাবাবুর সদনুষ্ঠানের বিষয় অবগত নহে। এই সমস্ত সদনুষ্ঠানের জন্য তিনি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে পরগণা অনুপসহর ও মথুরার কিয়দংশ ক্রয় করিয়াছিলেন।

এই সময়ে বৃন্দাবনে কৃষ্ণদাস বাবাজী নামে এক পরম সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তিনি লালাবাবুর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। লালাবাবু বৃন্দাবনধামে কৃষ্ণচন্দ্রবাবাজীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া মর্মর প্রস্তরে তাহার এক বিশাল মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। রাজপুতানা হইতে সেই সকল প্রস্তর আনীত হয়। রাজপুতানার কোন রাজা তাঁহাকে বিনামূল্যে মর্মরপ্রস্তর সকল প্রদান করেন। সেই সময়ে উক্ত রাজার সহিত ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের সন্ধির প্রস্তাব হইতেছিল। রাজা সম্মতিদানে বিলম্ব করায়, দিল্লীর রেসিডেণ্ট মেট্‌কাফ্‌সাহেব লালাবাবুর পরামর্শে এইরূপ হইতেছে সন্দেহ করিয়া, তাঁহাকে দিল্লীতে ধৃত করিয়া লইয়া যান। পরে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ না থাকায় এবং তাঁহার সংসারত্যাগের কথা শুনিয়া, তাঁহাকে বিষয়-নির্লিপ্ত জানিয়া, মুক্তিদান করিতে বাধ্য হন। গোবর্ধনের ছায়াময় সানুপ্রদেশে অশ্বপদাঘাতে লালাবাবুর প্রাণবায়ুর অবসান হয়।

লালাবাবুর মৃত্যুর সময় তাঁহার পুত্র শ্রীনারায়ণ সিংহ অত্যন্ত অল্পবয়স্ক ছিলেন। তাঁহার মাতা কাত্যায়নী তাঁহার অভিভাবক নিযুক্ত হন। রানী কাত্যায়নীও অনেক সদনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; পরোপকারের জন্য তাঁহার ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। রানী কাত্যায়নী ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া, বেলুড়ের বাটীতে এক অন্নমেরু ব্রত-প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীনারায়ণ মৃত্যুকালে তাঁহার দুই পত্নীকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে অনুমতি দিয়া যান। জ্যেষ্ঠা পত্নী প্রতাপচন্দ্র ও কনিষ্ঠা ঈশ্বরচন্দ্রকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। প্রতাপচন্দ্র অনেক সৎকার্যের জন্য গবর্নমেণ্ট হইতে রাজাবাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। কান্দীর ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতাপচন্দ্রেরই প্রতিষ্ঠিত। ঈশ্বরচন্দ্রের গানবাদ্যে অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। তাঁহারই যত্নে বেলগাছিয়ার উদ্যানে কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত লোক মিলিত হইয়া মাইকেল মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটক অভিনয় করেন।

প্রতাপচন্দ্রের কুমার গিরিশচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, কান্তিচন্দ্র ও শরচ্চন্দ্র নামে চারি পুত্র হয়। গিরিশচন্দ্র কান্দীতে এক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্রের একটি মাত্র পুত্র হয়; ইনিই বিখ্যাত ইন্দ্রচন্দ্র। ইনি অত্যন্ত তেজস্বী ছিলেন। যৌবনারম্ভে ইন্দ্রচন্দ্র অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠেন; পরে তাহার বেগ অনেক পরিমাণে প্রশমিত হয়। ইন্দ্রচন্দ্র অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি স্বীয় পত্নীকে দত্তক গ্রহণে অনুমতি দিয়া যান; তদনুসারে তাঁহার পত্নী ভ্রাতাকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছেন। কান্দীর রাজবংশ এক্ষণে কলিকাতার নিকট পাইকপাড়ায় বাস করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহারা কান্দীতে আগমন করিয়া থাকেন।

দেবীসিংহ

যদি কেহ অত্যাচারের বিভীষিকাময়ী মূর্তি দেখিতে ইচ্ছা করেন, যদি কেহ মানব প্রকৃতির মধ্যে শয়তানবৃত্তির পাপ অভিনয় দেখিতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি একবার দেবীসিংহের বিবরণ অনুশীলন করিবেন ; দেখিবেন, সেই ভীষণ অত্যাচারে কত কত জনপদ অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। কত কত দরিদ্র প্রজা অন্নাভাবে জীবন বিসর্জন দিয়াছে! কত কত জমিদার ভিখারীরও অধম হইয়া দিন কাটাইয়াছে! কুল-ললনার পবিত্রতা-হরণ, ব্রাহ্মণের জাতিনাশ, মানীর অপমান, এই সকল পৈশাচিক কাণ্ডের শত শত দৃষ্টান্ত ছত্রে ছত্রে দেখিতে পাইবেন। দেবীসিংহের নাম শুনিলে, আজিও উত্তরবঙ্গ প্রদেশের অধিবাসিগণ শিহরিয়া উঠে। আজিও অনেক কোমল-হৃদয়া মহিলা মূর্ছিতা হইয়া পড়েন! শিশুসন্তানগণ ভীত হইয়া জননীর ক্রোড়ে আশ্রয় লয়! সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে এরূপ পাশব অত্যাচারের দৃষ্টান্ত অধিক নাই বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। মানুষ হইয়া মানুষের প্রতি এরূপ নির্দয় ব্যবহার কখনও সম্ভবপর কি না, তাহা আমরা স্থির করিয়া উঠিতে পারি না। সে চিত্র অঙ্কিত করিতে কল্পনা স্বয়ংই ভীত ও চকিত হইয়া উঠে। মানুষ কখনও সে চিত্র দেখাইতে পারে না ; দেখাইতে হইলে, অমানুষী ক্ষমতার প্রয়োজন। কঠোরতায় হৃদয় না বাঁধিলে, তাহার পূর্ণ চিত্র অঙ্কিত করা দুঃসাধ্য। মহামতি বার্ক ইংলণ্ডের মহাসমিতির নিকট সেই অত্যাচারকাহিনী বর্ণনা করিতে করিতে এরূপ অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তথাপি তাঁহার সেই অবিনাশিনী বর্ণনা হইতে, আজ আমরা দেবীসিংহের পৈশাচিক চরিত্রের যে চিত্র দেখিতে পাই, তাহাতেই স্তম্ভিত হইতে হয়। তাই বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন,—"পৃথিবীর ওপারে ওয়েস্টমিনিস্টার হলে দাঁড়াইয়া, এদ্মন্দ বর্ক দেবীসিংহকে অমর করিয়া গিয়াছেন। পর্বোতোদগীর্ণ অগ্নিশিখাবৎ জ্বালাময় বাক্যস্রোতে বর্ক দেবীসিংহের দুর্বিষহ অত্যাচার অনন্তকালসমীপে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার নিজ মুখে সে দৈববাণীতুল্য বাক্যপরম্পরা শুনিয়া, শোকে অনেক স্ত্রীলোক মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল—আজিও শতবৎসর পরে, সেই বক্তৃতা পড়িতে গেলে, শরীর লোমাঞ্চিত ও হৃদয় উন্মত্ত হয়।"

নৃশংস দেবীসিংহের অত্যাচারে সমগ্র উত্তরবঙ্গ হাহাকারধ্বনিতে পূর্ণ হইয়া উঠে। রঙ্গপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি প্রদেশ মহাশ্মশানে পরিণত হয়। কোম্পানীর রাজত্বারম্ভে বাঙ্গলাদেশে যে মূর্তিমতী অরাজকতা দেখা যায়, দেবীসিংহের অত্যাচার তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ-স্থান অধিকার করে। অর্থলোলুপ কোম্পানীর কর্মচারিগণের বিশ্বগ্রাসিনী লালসার নিবৃত্তির জন্য এবং নিজের রাক্ষসী বৃত্তির পরিতুষ্টির জন্য, দেবীসিংহ মনুষ্যনামে কলঙ্ক প্রদান করিয়াছে। ওয়ারেন হেস্টিংসের পোষকতায় তাহার অত্যাচার-স্রোত প্রতিনিয়ত শতমুখেই প্রবাহিত হইত। কাহারও সাধ্য ছিল না যে, সে স্রোতের গতি রোধ করে। হেস্টিংসের যতগুলি প্রিয়পাত্র ছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ এমন পিশাচ-

প্রকৃতির পরিচয় প্রদান করে নাই। সুসভ্য ইংরেজ! আজ তোমরা মুসলমান রাজত্বের নিন্দা করিয়া, জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাক; কিন্তু তোমাদের সেই পূর্বকালীন বণিগ্‌-রাজত্ব যাহার ভিত্তিতে স্থাপিত, তাহা মনে করিতে গেলে ভয় ও লজ্জায় হৃদয় অবনত হইয়া পড়ে এবং আমাদিগেরও শত ধিক্কার যে, দেবীসিংহের জাতি বলিয়া আজিও আমাদিগকে পরিচয় দিতে হইতেছে।

ভারতের ভাগ্য-পরীক্ষাস্থল সুপ্রসিদ্ধ পাণিপথ-ক্ষেত্রে দেবীসিংহের পূর্ব-নিবাস। তারাচাঁদসিংহ নামক দেবীসিংহের এক পূর্বপুরুষ হইতে, তাঁহাদের বংশের ধারাবাহিক বিবরণ অবগত হওয়া যায়। ইঁহারা জাতিতে আগরওয়ালা বৈশ্য; ব্যবসায়বাণিজ্য ইঁহাদের জীবিকার উপলক্ষ ছিল। তারাচাঁদের পৌত্র অজিতসিংহ মোগল রাজত্বকালে রায় উপাধি লাভ করেন। অজিতসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র অমরসিংহের চারি পুত্র হয়; কনিষ্ঠ দেওয়ালীসিংহ হইতে দেবীসিংহের উৎপত্তি; দেবীসিংহ দেওয়ালীর দ্বিতীয় পুত্র। জ্যেষ্ঠের নাম তুলসীরামসিংহ ও কনিষ্ঠের নাম বাহাদুরসিংহ।

যৎকালে মুর্শিদাবাদ আপন গৌরবপ্রভায় মোগল-সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লী-নগরীকেও লজ্জা প্রদান করিয়াছিল, ব্যবসায়বাণিজ্যে মুর্শিদাবাদ ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়া বসে, সেই সময়ে দেবী সুদূর পাণিপথ হইতে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হন। বলা বাহুল্য, ব্যবসায়কার্যে উন্নতিসাধন তাঁহার আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তিনি আসিয়া দেখিলেন যে, ইউরোপীয় ও দেশীয় বণিগ্‌গণে মুর্শিদাবাদের চারিদিক্ পরিপূর্ণ,—অনন্তমুখ বাণিজ্যস্রোত অবিরাম গতিতে প্রবাহিত হইতেছে। দেবী সেই বিরাট প্রবাহে আপনার জীবনস্রোত মিশাইতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু সে স্রোত প্রবলবেগে বহিতে পারিল না; ব্যবসায়কার্যে তাঁহার সুবিধা হইল না। ভিন্ন ভিন্ন জাতির অশেষ প্রকার উদ্যম. চেষ্টা অতিক্রম করা, তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল। তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কৃতকার্য হইতে না পারায়, ক্রমে ক্রমে তাঁহার ব্যবসায়ের ক্ষতি হইতে লাগিল। তখন অগত্যা তিনি ব্যবসায়ের আশা পরিত্যাগ করিয়া কর্মের চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলেন। বাঙ্গলার রাজধানীতে কর্মের অভাব কোথায়? তৎকালে যে একটু বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছে, ভাগ্যলক্ষ্মী তাহারই প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। তাঁহারই কৃপাদৃষ্টিতে দেবীসিংহের ভবিষ্যৎ ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে।

যে সময়ে দেবীসিংহ কর্মের চেষ্টায় ফিরিতেছিলেন, সে সময়ে মুসলমান রাজত্বের অবসান ও ইংরেজরাজত্বের সূত্রপাত হইয়াছে। সিরাজউদ্দৌলা, মীরজাফর, মীর কাসেমের নাম বিস্মৃতিগর্ভে ডুবিতে আরম্ভ করিয়াছে। কোম্পানীর রাজ্যগ্রহণলালসা বলবতী হওয়ায় তাঁহারা নামমাত্র বাদশাহ শাহ আমলের নিকট হইতে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করিলেন। নজমউদ্দৌলা নামেমাত্র নাজিম থাকিয়া, ইংরেজ কোম্পানীর বৃত্তিভোগী হইয়া দাঁড়াইলেন। ক্লাইবসাহেব মহানন্দে রাজস্বসংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল যে, দেশীয়গণ ব্যতীত বিদেশীগণের দ্বারা বাঙ্গলার রাজস্ব আদায়ের সুবিধা নাই; তাই তিনি মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় দুই জন

নায়েব-দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া, তাঁহাদের প্রতি রাজস্ব-আদায়ের যাবতীয় ভার প্রদান করিলেন। মুর্শিদাবাদে মহম্মদ রেজা খাঁ ও পাটনায় সেতাবরায় নায়েব-দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া আপনাদিগের কার্যদক্ষতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। মহম্মদ রেজা খাঁ মুর্শিদাবাদে আপনার প্রধান স্থান স্থাপন করিয়া, বাঙ্গলার রাজস্ব-আদায়ের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি সকল অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কোম্পানীর কর্ম পাইব বলিয়া, দেশবিদেশের লোক তাঁহার নিকট আসিতে আরম্ভ করিল। দেবীসিংহও এই সুযোগে আপনার ক্ষতিজনক ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া রেজা খাঁর কৃপাভিখারী হইবার ইচ্ছা করিলেন।

দেবীসিংহ মহম্মদ রেজা খাঁকে বশীভূত করিবার জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করেন। কিন্তু রেজা খাঁ সহজে বশীভূত হইবার লোক ছিলেন না, দেবীসিংহও ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, রাজস্ববিভাগ হইতে যেরূপ অর্থোপার্জনের সম্ভব, অন্য কোন বিভাগে তাদৃশ সুবিধা নাই, এবং উক্ত বিভাগের কর্মচারিগণের যে সকল অমোঘ অস্ত্রের আবশ্যক, তাঁহার নিকট সে সমস্তেরও অভাব ছিল না। জাল, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি মহাস্ত্র আপনার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিশাণে শাণিত করিয়া, তিনি সুযোগ বুঝিয়া অনায়াসে নিক্ষেপ করিতে পারিবেন। সুদূর পাণিপথ হইতে স্বর্ণপ্রসবিনী বঙ্গভূমির নাম শুনিয়া, তিনি মুর্শিদাবাদে আসিয়াছিলেন। যে কার্যের উদ্দেশে আগমন করেন, যদিও তাহাতে সফলকাম হইতে পারেন নাই, তথাপি বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বঙ্গভূমি কামদুঘা ; যে কোন উপায়ে হউক না কেন, দোহন করিতে পারিলেই লাভ। যদি এক উপায় নষ্ট হয়, অন্য উপায় অবলম্বন করিলে, নিশ্চয়ই কৃতকার্য হইবার সম্ভাবনা। রাজস্ববিভাগে নিযুক্ত হওয়া ব্যতীত অন্য কোন সহজ উপায়ে অল্পদিনের মধ্যে অগাধ সম্পত্তি করতলগত করা সুবিধাজনক নহে। তাই তাঁহার তাদৃশ কূটবুদ্ধির প্রবাহ প্রতিনিয়ত মহম্মদ রেজা খাঁকে বশীভূত করিবার জন্য নানাভাবে নানাপথে পরিচালিত হইতে লাগিল। তিনি সামান্য পদের প্রত্যাশী ছিলেন না ; যে পদ প্রাপ্ত হইলে শীঘ্রই তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়, তিনি সেইরূপ পদপ্রাপ্তির ইচ্ছা করিতেছিলেন। সুতরাং একটু গুরুতরভাবে রেজা খাঁকে বাধ্য করিতে হইবে, ইহা তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন।

ক্রমে ক্রমে সমস্ত সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। রেজা খাঁ নানা কারণে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়েন ; তাঁহাকে ঋণভারপীড়িত হইয়া অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। অর্থাভাবে সময়ে সময়ে তাঁহার চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিত, তজ্জন্য তাঁহাকে নানাপ্রকার লাঞ্ছনাও ভোগ করিতে হইয়াছিল। দেবীসিংহ এই সময়ে উত্তম সুযোগ বুঝিয়া, ধীরে ধীরে জাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। ব্যবসায়বাণিজ্য হইতে তিনি যাহা কিঞ্চিৎ উপার্জন করেন, ক্রমে ক্রমে চাতুরী, প্রবঞ্চনা দ্বারা সেই অর্থ অনেক বিষয়ে নিয়োগ করিয়া তাহা হইতে অগাধ সম্পত্তির অধিপতি হন। যে ভীষণ

অত্যাচার-বহ্নিতে বঙ্গভূমি দগ্ধ হয়, দেবীসিংহ পূর্ব হইতেই তাহার সূচনা করিয়া রাখেন। সেই সমস্ত অর্থরাশি লইয়া, তিনি এক্ষণে রেজা খাঁর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার যখনই বিপদ্ উপস্থিত হইত, দেবী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিজের অর্থ দ্বারা তাঁহাকে সেই সেই বিপদ হইতে মুক্ত করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্ষমতাশালী রেজা খাঁ ক্রমে ক্রমে দেবীসিংহের বিশাল বাগুরায় আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। দেবীসিংহও আপনার চতুর নীতি অবলম্বন করিয়া, কার্যোদ্ধারের চেষ্টায় মনোনিবেশ করিলেন। রেজা খাঁ দেবীসিংহের উপকার ভুলিতে পারিলেন না; কাজেই তাঁহাকে সেই চতুরপ্রবরের অনুরোধ রক্ষা করিতে হইল। তিনি বাধ্য হইয়া দেবীসিংহকে পূর্ণিয়ার ইজারা ও তৎসঙ্গে উক্ত প্রদেশের শাসনভারও অর্পণ করিলেন।

দেবীসিংহ পূর্ণিয়ার ভার প্রাপ্ত হইয়া, আপনার বহুদিনের সঞ্চিত আশার পরিতৃপ্তিসাধনে সচেষ্ট হইলেন। তিনি নিজ প্রকৃতির এক এক স্তর উদঘাটন করিতে লাগিলেন। যে সমস্ত শাণিত অস্ত্রে তাঁহার মস্তিষ্ক-তূণ পরিপূর্ণ ছিল, একে একে সে সকলের ক্রীড়া আরম্ভ হইল। অবিলম্বে পূর্ণিয়ার জমিদার ও প্রজাগণ তাঁহাকে বিশেষরূপে চিনিতে পারিল। যে একবার অল্পকালের জন্য তাঁহার হস্তে পতিত হইয়াছে, অমনি তাহাকে তাঁহার শাণিত অস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হইতে হইয়াছে। ক্রমে কাল্পনিক অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া, দেবীসিংহ বাস্তব অস্ত্র চালাইতে আরম্ভ করিলেন। প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতায় সুযোগ না পাইয়া, তিনি প্রজা ও জমিদারগণের উপর ভীষণ অত্যাচারের অভিনয় দেখাইতে লাগিলেন। তাঁহার অত্যাচারে পূর্ণিয়াবাসিগণ আপন আপন বাসভবন পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। অচিরকাল মধ্যে সমগ্র প্রদেশ অর্ধজনশূন্য হইয়া ধ্বংসপথে অগ্রসর হইতে লাগিল। যাহারা অবশিষ্ট রহিল, তাহারা দ্বিগুণ অত্যাচারে অতিমাত্র প্রপীড়িত হইয়া, অবিরত 'ত্রাহি ত্রাহি' করিতে লাগিল।

অল্পদিনের মধ্যে বাঙ্গলার চারিদিকে দেবীসিংহের নাম রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। পূর্বে নয় লক্ষ টাকায় পূর্ণিয়ার ইজারা বন্দোবস্ত হইত, কিন্তু সুজন্মার বৎসরেও কোন কালে ছয় লক্ষের অধিক টাকা আদায় হয় নাই। কিন্তু দেবীসিংহ ১৬ লক্ষ টাকার বন্দোবস্তে ইজারা গ্রহণ করেন।[১] নিজের লাভ রাখিয়া সেই ষোল লক্ষ টাকা আদায় করিতে তাঁহার যাহা আবশ্যক, সমস্তই অবলম্বন করিতে হইল। যেখানে ছয় লক্ষ টাকার অধিক আদায়ের সম্ভাবনা ছিল না, সেখান হইতে কিরূপে ১৬ লক্ষের অধিক আদায় হইতে পারে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কোন স্থান হইতে পূর্বনির্দিষ্ট রাজস্বের তিনগুণ আদায় করিতে হইলে, নিরীহ প্রজা এবং জমিদারদিগেরও প্রতি কি প্রকার অত্যাচার করিতে হয় তাহা ভাবিয়া স্থির করা যায় না। কিন্তু

---

১ Burke's Impeachment of Warren Hastings (Bohn), Vol. I, p. 176.

মনুষ্যে যাহা ভাবিয়া স্থির করিতে না পারে, দেবীসিংহের নিকট তাহা সহজেই উপস্থিত হয়। কাজেই অত্যাচারের যত প্রকার উপায় হইতে পারে, তাঁহার উদ্ভাবনী শক্তি দিন দিন তত প্রকারের সৃষ্টি করিতে লাগিল। সেইজন্য পূর্ণিয়া মরুভূমিতে পরিণত হইয়া উঠে।

দেবীসিংহ-কর্তৃক পূর্ণিয়া কিরূপে শাসিত হইয়াছিল নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়। দেবীসিংহের পর কলিকাতা হইতে এক দল লোক পূর্ণিয়ার ইজারা লইতে প্রস্তুত হয়। তাহারা আপনাদিগের ভবিষ্যৎ লাভালাভের বিষয় স্থির করিবার জন্য পূর্ণিয়ায় উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহাদের প্রাণ শুষ্ক হইয়া গেল। তাহারা স্বচক্ষে পূর্ণিয়ার চারিদিকে হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিয়া তথা হইতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিল, এবং আপনাদিগের নির্বুদ্ধিতার জন্য ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা দণ্ড প্রদান করিয়া, ইজারা গ্রহণ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিল। এইরূপে দেবীসিংহের ভীষণ অত্যাচারে যখন সমগ্র পূর্ণিয়া জনশূন্য হইবার উপক্রম হয়, তখন কর্তৃপক্ষীয়গণ ইহার প্রতিবিধানের জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সবিশেষ অনুসন্ধানে স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, হৃদয়হীন দেবীসিংহের হস্তে আর পূর্ণিয়ার ভার রাখা কদাচ সঙ্গত নহে।

এই সময়ে হেস্টিংসসাহেব পর্যাটক-সমিতির সভাপতি ছিলেন। তিনি ১৭৭২ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দেবীসিংহকে পদচ্যুত করিলেন এবং সরকারী বিবরণীতে তাঁহার ভীষণ অত্যাচারের কথা উল্লেখ করিয়া সাধারণকে অবগত করাইলেন। কিন্তু হায়! এই হেস্টিংসসাহেবও ক্রমে ক্রমে কিরূপে দেবীসিংহের বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহাও পরে জানিতে পারা যাইবে।

যদি হেস্টিংসসাহেব প্রকাশ্যভাবে দেবীসিংহকে পূর্ণিয়া হইতে বিতাড়িত করিতে বাধ্য হন, তথাপি তিনি মনে মনে দেবীসিংহের প্রতি তাদৃশ বিরক্ত ছিলেন না। দেবীও জানিতেন যে, হেস্টিংস তাঁহার উপর সহজে অসন্তুষ্ট হইবার লোক নহেন। চতুরে চতুরে তলে তলে বিলক্ষণ প্রণয় ছিল। দেবীসিংহের নাম ও যশে কলঙ্ক পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার সম্পত্তির এক কপর্দকও নষ্ট হয় নাই। সেই সম্পত্তিবলে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, হেস্টিসংকে অচিরকাল মধ্যেই করতলগত করিতে পারিবেন। তাঁহার ইচ্ছাও অবিলম্বে পূর্ণ হইল। হেস্টিংসকে বশীভূত করিয়া তিনি পুনর্বার পদপ্রার্থী হইলেন।

১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে প্রাদেশিক সমিতির গঠন আরম্ভ হইল। এই সময়ে মুর্শিদাবাদেও প্রাদেশিক সমিতি স্থাপিত হয়। মুর্শিদাবাদ বাঙ্গলার শেষ রাজধানী বলিয়া, এই প্রদেশকে অনেকটা বিস্তৃতভাবে গ্রহণ করা হইত। এমন কি, মুর্শিদাবাদ বিভাগই তৎকালে বাঙ্গলার সর্বপ্রধান বলিয়া কথিত ছিল। মুর্শিদাবাদ প্রাদেশিক সমিতির প্রতি অন্যান্য অনেক বিস্তৃত বহুজনপূর্ণ প্রদেশের ভারও অর্পিত হয়। সেই সমস্ত প্রদেশের মধ্যে রঙ্গপুর, ইদ্রাকপুর প্রভৃতিই প্রধান। এই বিস্তৃত ভূভাগ হইতে বার্ষিক

১ কোটি ২০ লক্ষ টাকার রাজস্ব আদায় হইত। সুতরাং সমিতিতে কিরূপ উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিলে, তাহার শাসনভার সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। যে বিভাগে অনেক প্রধান প্রধান সম্ভ্রান্ত জমিদার ও প্রজা বাস করিত, তাহার শাসনভার বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের হস্তে অর্পণ করাই একান্ত আবশ্যক ছিল। অল্পবুদ্ধি বা নীচপ্রকৃতি ব্যক্তির হস্তে সে ভার প্রদান করা কদাচ যুক্তিসিদ্ধ নহে। কিন্তু আমরা দেখাইতেছি যে, হেস্টিংসসাহেব কিরূপ লোকের হস্তে বাঙ্গলার তৎকালীন প্রধান প্রদেশের শাসন-ভার অর্পণ করিয়াছিলেন।

হেস্টিংস বাছিয়া বাছিয়া কতকগুলি অপরিণতবয়স্ক কার্যানভিজ্ঞ ইংরেজ-যুবক লইয়া মুর্শিদাবাদ প্রাদেশিক সমিতির গঠন করিলেন। কি উদ্দেশ্যে এইরূপ অকর্মণ্য যুবকদিগের হস্তে বাঙ্গলার সর্বপ্রধান প্রদেশের শাসনভাব প্রদান করা হয়, তাহা বুঝিতে কাহারও অধিক বিলম্ব হইবে না। তিনি ঐ সমস্ত অপদার্থ লোকদিগকে নামতঃ সমিতির প্রধান কর্তা রাখিয়া, দেবীসিংহকে তাহাদের সহকারী কার্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিলেন। দেবীসিংহকে নিযুক্ত না করিলে, তাঁহার অর্থপিপাসা মিটিবার সুন্দর উপায় সহসা ঘটিয়া উঠিবার সম্ভাবনা ছিল না। হেস্টিংসসাহেব এইরূপ মনে করিয়াছিলেন যে, ইহারা শাসনসম্বন্ধে কিছুই দেখিবে না ও বুঝিবে না, দেবীসিংহ কার্যতঃ সমস্তই করিবেন এবং তাহা হইলে, তাঁহারও যথেষ্ট সুবিধা হইবে। উপযুক্ত ইংরেজ কর্মচারী নিযুক্ত করিলে, হয়ত, তাঁহাদের সঙ্গে দেবীসিংহের ঐক্য না হইতে পারে। কাজেই কতকগুলি অল্পবয়স্ক যুবককে তিনি মুর্শিদাবাদ-সমিতির সভ্য করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে দেবীসিংহকেই উক্ত প্রদেশের শাসনভার অর্পণ করিলেন। কয়েক মাস পূর্বে যে দেবীসিংহকে ঘোর অত্যাচারী বলিয়া কোম্পানীর কর্ম হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছিল এবং জনসাধারণের অবগতির জন্য যাহার অত্যাচারকথা সরকারী বিবরণীতেও প্রকাশ করা হইয়াছিল, ভারতের প্রধান শাসনকর্তা কোম্পানীর প্রতিনিধি পুনরায় তাহার গুণের যথেষ্ট পরিচয় পাইলেন! এক সময়ে তিনি যাহার চরিত্র ঘোর অন্ধকারময় দেখিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার চরিত্রে কিরূপে উজ্জ্বল আলোক দেখিলেন, তাহা তিনিই বলিতে পারেন। আমরা কিন্তু জানি, সে আলোক দেবীসিংহের চরিত্রের নহে; কিন্তু তাহার সঞ্চিত অগাধ স্বর্ণ, রৌপ্য মুদ্রার মনোমোহন চাকচিক্যের! সেই চাকচিক্যে হেস্টিংসসাহেবের চক্ষু ঝলসিত হইয়া যায়।

দেবীসিংহ মুর্শিদাবাদ-সমিতির সহকারী কার্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া সেই সমস্ত তরুণ-বয়স্ক ইংরেজ যুবকদিগকে হস্তগত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তৎকালে নর্তকীগণের উপর কর স্থাপন করিয়া অনেক টাকার রাজস্ব সংগ্রহ হইত। দেবীসিংহ এই কার্যের জন্য বিশেষ যত্নবান্ হইলেন। এই সময়ে তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার উচ্চতম কর্মচারিগণ সকলেই অল্পবয়স্ক যুবক। যৌবনের প্রারম্ভে যাবতীয় বিলাস-প্রবৃত্তি তাঁহাদের হৃদয়মধ্যে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। সেই বিলাস-প্রবৃত্তির সহায়তার জন্য দেবীসিংহ নর্তকীদিগের মধ্য হইতে কতকগুলি সুন্দরী ও সুগায়িকা

লইয়া তাঁহাদিগকে প্রতিনিয়ত উপহার প্রদান করিতে লাগিলেন। এক কথায় দেবী সেই সমস্ত ইংরেজ যুবকদিগের জন্য একটি নর্তকীসমাজ গঠন করিলেন এবং যখনই তাঁহাদের বিলাস-প্রবৃত্তির পরিতুষ্টির প্রয়োজন হইত, অমনি দেবীসিংহ তাহাদিগকে লইয়া উপস্থিত হইতেন। দৌলৎজান, দেলখোশ প্রভৃতি তাহাদের সুমধুর নাম, শ্বেতাঙ্গ যুবকদিগের কর্ণে ভাল লাগিত।[২] তাঁহারা তাহাদিগকে লইয়া অশেষপ্রকার আমোদ উপভোগ করিতেন। কখনও বা মুর্শিদাবাদের ভিন্ন ভিন্ন উদ্যানে, কখনও বা ভাগীরথীবক্ষে ময়ূরপঙ্ক্ষী-আরোহণে সেই সুকণ্ঠীগণের কলকণ্ঠ ও কুটিল কটাক্ষ তাঁহাদিগকে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় করিয়া রাখিত। সেই সময়ে ফরাসীদেশজাত সুস্বাদু মদ্য তাঁহাদের আমোদের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করিত। এতদ্ভিন্ন সুগন্ধি চুরুটের ত কথাই ছিল না। তাঁহাদের স্বদেশীয় ও বিদেশীয় যত প্রকার আমোদের সম্ভব, সকলেরই অভিনয় চলিতে থাকিত। যখন সেই তপ্তকাঞ্চনবর্ণা পূর্ণদেহা নর্তকীগণ ফরাসীদেশ-জাত মদ্যে গণ্ডস্থল রক্তিম করিয়া ঢুলু ঢুলু নয়নে ও অর্ধস্খলিত স্বরে নানারূপ বিভ্রমচেষ্টা দেখাইত, তখন সেই সুরামত্ত যুবকগণ যেরূপ পাশব প্রবৃত্তির পরিচয় প্রদান করিত, তাহা লিখিয়া লেখনী কলঙ্কিত করা যায় না। তখন তাহারা সুসভ্য ইউরোপের সন্তান বলিয়া আপনাদিগকে ভুলিয়া যাইত এবং নিতান্ত অসভ্য বা ইতর জাতির বংশধরের ন্যায় আপামর সাধারণের চক্ষে প্রতিপন্ন হইত।

আমরা ইংরেজী ইতিহাসে মুসলমান বাদশাহ ও নবাবদিগের এইরূপ বিলাসিতার অনেক চিত্র দেখিয়া থাকি। তাঁহারা সর্বদা নর্তকীপরিবেষ্টিত হইয়া আমোদ-প্রমোদে বিভোর থাকিতেন, কখনও রাজকার্যে মনোনিবেশ করিতেন না। কিন্তু ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ তাঁহাদের স্বদেশবাসী ও কোম্পানীর রাজত্বের প্রারম্ভকালের শাসনকর্তা-দিগের চিত্র একবার স্মরণ করিবেন কি? যদি ইংরেজরাজত্বের আরম্ভে তাহার সহিত মুসলমানরাজত্বের কোনই পার্থক্য দেখিতে না পাই, যে অত্যাচার সত্যই হউক, মিথ্যাই হউক, মুসলমানরাজত্বে প্রবল ছিল বলিয়া আমরা তথাকথিত ইতিহাসসমূহে দেখিতে পাই, যে বিলাসিতার জন্য মুসলমানরাজত্বের পতন বলিয়া এক প্রকার স্বীকার করা যাইতে পারে, সেই সমস্ত পূর্ণমাত্রায় যদি ইংরেজশাসনের প্রথমে দেখিতে পাই, তবে মুসলমানরাজত্বের অবসানের পর ইংরেজবণিগ্‌রাজত্বে প্রজারা সুখী হইয়াছিল, এ কথা কেমন করিয়া স্বীকার করিব? সকলের স্মরণ রাখা আবশ্যক, আমরা বর্তমান রাজত্বের কথা বলিতেছি না। যে সময়ে কোম্পানীর প্রথম রাজত্বের আরম্ভ হয়, সেই সময়েরই কথা বলিতেছি।

---

২ বার্ক লিখিয়াছেন যে, দেবীসিংহ তাহাদিগকে ঐ সকল সুমিষ্ট নামে অভিহিত করিত, কিন্তু সে কথা প্রকৃত নহে। এতদ্দেশে নর্তকীগণের সাধারণতঃ ঐ সকল নাম দেখা যায়, তাহারাই ইচ্ছা করিয়া ঐ সকল নাম ব্যবহার করে। সুতরাং দেবীসিংহকে নূতন করিয়া ঐ সমস্ত নাম প্রদান করার বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না।

আমরা শুনিয়া থাকি যে, মুসলমানরাজত্বের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, তৎকালীন ইংরেজ বণিগ্‌রাজত্বে প্রজাগণ নাকি সুখী হইয়াছিল। সেইজন্য আমরা দেখাইলাম যে, তদুভয়ের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য অনুভব করিতে পারা যায় না। বরং বাদশাহ নবাবগণ কেবল প্রাচ্য আমোদ-প্রমোদে বিভোর থাকিতেন; কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায়, কোম্পানীর প্রথম সময়ের শাসনকর্তৃগণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ বিলাসিতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের কোন কোন অত্যাচার সুসভ্য ইউরোপীয় প্রথানুযায়ীও ছিল।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, দেবীসিংহের জন্য তাঁহারা এরূপ বিলাসতরঙ্গে গা ঢালিয়া দেন; অবশ্য এ কথা স্বীকার্য। কিন্তু যাঁহারা প্রলোভনের হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ না হন, তাঁহারা কোন্ বিস্তৃত প্রদেশের শাসনের কিরূপ উপযোগী, তাহাও একবার চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। বাস্তবিকই দেবীসিংহ সেই সকল তরুণবয়স্কদিগকে সর্বদা বিলাসেই ভাসাইয়া রাখিতেন। যখন তাঁহাদের যে সমস্ত বিলাস-সামগ্রীর প্রয়োজন হইত, দেবীসিংহ অমনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের নিকট সেই সকল উপস্থিত করিতেন। সমস্ত সামগ্রীই পূর্ব হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখা হইত। কেবল যে বিলাস-দ্রব্যে তাঁহাদিগকে বশীভূত করিয়া রাখিতেন এমন নহে. যখনই তাঁহাদের অর্থের প্রয়োজন হইত, দেবীসিংহ তৎক্ষণাৎ তাহাই প্রদান করিতেন। যে অর্থের প্রলোভনে স্বয়ং হেস্টিংসসাহেব দেবীসিংহের বশবর্তী হইয়া পড়েন, তাহার মাহাত্ম্যে এই কয়জন অল্পমতি ইংরেজ যুবক যে অত্যল্প আয়াসেই তাঁহার করতলগত হইবেন ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি।

এইরূপে দেবীসিংহ স্বীয় উচ্চতর কর্মচারীদিগকে বিলাসমুগ্ধ করিয়া, আপনার কার্যোদ্ধারে সচেষ্ট হন। তিনি নিজে কোন প্রকার আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত থাকিতেন না। যৎকালে বিলাসবিভোর ইংরেজ কর্মচারিগণ আপনাদের কর্তব্য বিস্মৃতির অতল গর্ভে নিমগ্ন করিয়া পশুরও অধম হইয়া উঠিলেন, সেই সময়ে দেবীসিংহ রাজস্ব-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য নিজ হস্তে লইয়া আপনার অর্থোপার্জনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জমিদারীর ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া লইতে আরম্ভ করিলেন। কখনও স্বনামে কখনও বা বেনামীতে তাঁহার কার্যোদ্ধার হইতে লাগিল এবং নানারূপ প্রতারণায়, প্রবঞ্চনায় তাঁহার সম্পত্তি দিন দিন বর্ধিত হইয়া উঠিল। রাজস্বসংক্রান্ত যে সমস্ত ভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত ছিল, তাহা হইতে তিনি যথেষ্ট লাভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে মুর্শিদাবাদ প্রদেশের রাজস্ব কোম্পানীর ভাণ্ডারে সঞ্চিত না হইয়া, দেবীসিংহের সম্পত্তির সহিত একীভূত হইয়া গেল।

যখন কোম্পানীর প্রায় সমস্ত রাজস্ব দেবীসিংহের হস্তগত হইবার উপক্রম হইল, তখন উর্ধ্বতন কর্মচারিগণের চৈতন্যোদয় হয়। বিবেক মনুষ্যহৃদয় হইতে একেবারে চিরবিদায় লইতে পারে না। জগতে ক্রিয়ার পর প্রতিক্রিয়াও দেখা যায়। কাজেই সেই বিলাসবিভোর ইংরেজ যুবকগণের চমক ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহারা যেন বহুকালের

নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া দেখিলেন যে, দেবীসিংহ তাঁহাদের ও তাঁহাদের প্রভু কোম্পানীর উভয়েরই সর্বনাশসাধনে উদ্যত হইয়াছে। জঘন্য আমোদ-প্রমোদে ভুলাইয়া, তাঁহাদিগকে পশুরও অধম করিয়া তুলিয়াছে এবং কোম্পানীর সর্বনাশ করিয়া নিজের উদর পরিপূর্ণ করিয়াছে। তাঁহাদিগকে নিজ কর্তব্য হইতে দূরে রাখিয়া, নিজের ইচ্ছামত সমস্ত কার্যই সম্পন্ন করিয়াছে। তখন তাঁহারা দেবীসিংহের ঘোরতর চাতুরী বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। যখন দেবীসিংহ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার উর্ধ্বতন কর্মচারিগণ তাঁহার প্রতারণা বুঝিতে পারিয়াছেন, তখন তিনি তাঁহাদিগকে অনুনয়-বিনয়ে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে স্বীয় সঞ্চিত অগাধ অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া তাঁহাদিগকে বশীভূত করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন রূপে এবং সকলকে এক সঙ্গে নানারূপ অর্থের প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন। কিন্তু এবার তাঁহার সকল কৌশল ব্যর্থ হইল। সমিতির সভ্যগণ একবাক্যে তাঁহার উৎকোচ অগ্রাহ্য করিলেন।

কিন্তু দেবীসিংহ কিছুতেই বিচলিত হইবার লোক নহেন। তিনি তলে তলে হেস্টিংসসাহেবকে বশীভূত করিয়া ফেলিলেন। হেস্টিংস নিজেও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দেবীসিংহ যে অর্থ সঞ্চয় করিতেন, তাহার কতক অংশ তাঁহার নিজের হস্তগত হইবেই হইবে। তাই দেবীসিংহকে পদচ্যুত করা দূরে থাকুক, তিনি অচিরকালমধ্যে মুর্শিদাবাদ প্রাদেশিক সমিতি ভঙ্গ করিবার আদেশ দিলেন। দেবীসিংহের জন্য তিনি কোম্পানীর ক্ষতি করিতেও ত্রুটি করিলেন না। স্বদেশীয় কর্মচারিগণকে অবমানিত করিয়া এবং দেশের যাবতীয় লোকের অনুনয় উপেক্ষা করিয়া, হেস্টিংস দেবীসিংহকে রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইলেন। যে কোম্পানীর প্রতিনিধি-স্বরূপ হইয়া তিনি ভারতশাসন করিতেছিলেন, সেই কোম্পানীর লাভালাভের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি করিলেন না। যে তাঁহাকে অর্থ দিয়া বশীভূত করিতে পারিত, তিনি তাহার পরিপোষক হইয়া, ন্যায়, ধর্ম, সমস্তই অকাতরে বিসর্জন দিতে পারিতেন। হেস্টিংস মুর্শিদাবাদ প্রাদেশিক সমিতি ভঙ্গ করিলেন, অথচ দেবীসিংহকে একটু সামান্য তিরস্কার পর্যন্তও করিলেন না। দেবীসিংহকে কোনরূপ দণ্ড দেওয়া দূরে থাকুক, তাঁহাকে পুনর্বার দিনাজপুর, রঙ্গপুর, ইদ্রাকপুর প্রভৃতির ইজারা প্রদান করিয়া, দিনাজ-পুরের নাবালক রাজার দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এই দিনাজপুর প্রদেশই দেবীসিংহের অত্যাচারের প্রধান রঙ্গভূমি।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ প্রবন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে যে, দিনাজপুরের রাজা বৈদ্যনাথ প্রাণত্যাগ করায়, তাঁহার দত্তক পুত্র রাধানাথ ও ভ্রাতা কান্তনাথের মধ্যে বিষয়প্রাপ্তি লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হয়। অবশেষে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পরামর্শে সকাউন্সিল গবর্নর জেনারেল রাধানাথকেই উত্তরাধিকারী স্থির করেন। এই সময়ে রাধানাথের বয়স ৫।৬ বৎসর মাত্র; সুতরাং তাঁহার অভিভাবকস্বরূপ হইয়া দিনাজপুরের জমিদারী পরিচালনের জন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তির প্রয়োজন হইল। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ তৎকালে

কোম্পানীর রাজস্ব-সমিতির দেওয়ান, দেশের একরূপ সর্বেসর্বা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গঙ্গাগোবিন্দ ও দেবীসিংহের মধ্যে একটু ঈর্ষার ভাব প্রচলিত থাকার কথা শুনা যায়। উভয়েই হেস্টিংসের প্রিয়পাত্র বলিয়া, উভয়ে উভয়কে হিংসার চক্ষে দেখিতেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষের মিলন হইল। দেবীসিংহ নানাপ্রকারে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে সন্তুষ্ট করিলেন এবং গঙ্গাগোবিন্দও দেখিলেন যে, দেবীসিংহ ভিন্ন তাঁহার ও তাঁহার প্রভু হেস্টিংসসাহেবের আকাঙ্ক্ষাপরিতৃপ্তির জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি দুর্লভ। কাজেই এই দুই ভীষণ ব্যক্তির সংযোগে দিনাজপুর প্রদেশে পৈশাচিক অত্যাচারের অভিনয় আরম্ভ হইল।

দেবীসিংহ ১০০০ হাজার টাকা বেতনে দিনাজপুরের নাবালক রাজার দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন। বৈদ্যনাথের বিধবা রানী যদিও অভিভাবকরূপে রহিলেন, তথাপি দেবীসিংহই কার্যতঃ সমস্ত বিষয়ের ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি নামে দিনাজপুরের দেওয়ান হইলেও কার্যতঃ সেই প্রদেশের অধীশ্বর হইয়া উঠিলেন। দেবীসিংহ যাহা মনে করিতেন, তাহাই অবিলম্বে সম্পাদিত হইত। রাজার শিক্ষাদির ভারও তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। এরূপ লোকের হস্তে শিক্ষার ভার থাকিলে যেরূপ হইবার সম্ভাবনা, রাধানাথের শিক্ষা দিন দিন তেমনই হইতে লাগিল। দিনাজপুর-সংসারে যে সমস্ত পুরাতন কর্মচারী ছিল, সকলেরই পদচ্যুতি ঘটিল। দেবীসিংহ নিজের মনোমত লোক নিযুক্ত করিলেন। এই সময়ে হেস্টিংসের প্রিয়পাত্র গুড্‌ল্যাড্‌সাহেব রঙ্গপুরের কালেক্টর ছিলেন। দেবীসিংহের সহিত তাঁহার মিত্রতা থাকায়, তাঁহারা পরামর্শ করিয়া রাধানাথের মাসহারা ১৬০০ টাকা হইতে ৬০০ শত টাকা করিয়া দিলেন। ১০০০ টাকা মাসহারার লাঘব হওয়ায় রাধানাথের কিরূপ কষ্ট উপস্থিত হইল, তাহা সকলে অনুমান করিতে পারেন।[৩]

অনেকে মনে করেন, দেবীসিংহ হেস্টিংসসাহেবকে তিন লক্ষ টাকা দিয়া দিনাজপুরের দেওয়ানী লাভ করায়, সেই টাকাসংগ্রহের জন্য তিনি এরূপ পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হন। দিনাজপুরের দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া দেবীসিংহ পর বৎসরে দিনাজপুর রঙ্গপুর ও ইদ্রাকপুর প্রদেশত্রয়ের ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া লয়েন। তৎকালে যে ব্যক্তি যে প্রদেশের দেওয়ান নিযুক্ত হইত, তাহাকে সে প্রদেশের ইজারা দেওয়া হইত না ; কিন্তু কল্যাণসিংহ ও দেবীসিংহ এতদুভয়ে দেওয়ান হইয়াও বিহার ও দিনাজপুর প্রদেশদ্বয়ের ইজারা গ্রহণ করেন।[৪] দেবীসিংহ ইজারা লইয়া জমিদার ও

৩ দুঃখের বিষয় এই রাধানাথই অবশেষে হেস্টিংসসাহেবের প্রশংসা করিয়া লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। যে হেস্টিংস তাঁহাদের সর্বনাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই, সে হেস্টিংসের সুবিচারের কথা তিনিও উল্লেখ করিয়াছিলেন। আমাদের দেশের লোকেরা এরূপ না হইলে দেশের এরূপ দুর্ভাগ্য ঘটিবে কেন ?

৪ Minutes of the Evidence of W. H's Trial, p. 1260.

প্রজা উভয়েরই প্রতি ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। হররাম নামে এক পিশাচ-প্রকৃতির মনুষ্য তাঁহার সহকারী নিযুক্ত হইয়া, দেশমধ্যে ভয়াবহ কাণ্ডের ক্রীড়া দেখাইতে লাগিল। কি জমিদার, কি প্রজা, কি পুরুষ, কি স্ত্রী কাহারও বিন্দুমাত্র নিষ্কৃতি ছিল না। এরূপ লোমহর্ষণ অত্যাচার কেহ কখনও দেখে নাই, বা কেহ কখনও শুনে নাই। দেবীসিংহের পূর্ণিয়ার অত্যাচারের কথা দিনাজপুর প্রদেশের লোকেরা পূর্ব হইতেই জানিত। যে সময়ে তাহারা শুনিল যে, দেবীসিংহ দেওয়ান হইয়া, দিনাজপুর প্রদেশে আগমন করিতেছে, তদবধি তাহাদের হৃদয়ে মহাভীতির সঞ্চার হয়; এবং তাহারা আপনাদিগের ধনপ্রাণ বিঘ্নসঙ্কুল মনে করিয়া, দেশ পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়। কিন্তু কিঞ্চিন্মাত্র অত্যাচার ভোগ না করিয়া, কেহই দেশ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় নাই। আমরা ক্রমান্বয়ে সেই অত্যাচার-কাহিনী বিবৃত করিতে চেষ্টা পাইতেছি।

ইজারা গ্রহণ করিয়া দেবীসিংহ জমিদার ও অন্যান্য ভূস্বামীদের উপর অসম্ভব কর স্থাপন করিলেন। যেরূপ বর্ধিত হারে করদানের জন্য তাঁহাদিগকে বাধ্য করা হয়, তাহারা শত চেষ্টায়ও কদাচ তাহা সংগ্রহ করিতে পারিত না। এইরূপ কর-প্রদানে যাহারা অস্বীকৃত হইত, দেবসিংহ অমনি তাহাদিগকে কারাগারে প্রদান করিয়া, অশেষরূপে পীড়ন করিতেন। জমিদারগণ রজ্জুবদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া, অবশেষে দেবীসিংহের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিতেন। কিন্তু কোনরূপেই তাঁহার প্রস্তাবানুযায়ী কার্য করিয়া উঠিতে পারিতেন না। কেহ একবার কোন প্রকারে স্বীকৃত হইলে, তাহার আর নিস্তার ছিল না। দিন দিন নূতন নূতন করপ্রদানের জন্য সকলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিত। অবশেষে যখন জমিদারগণ নিতান্ত অসমর্থ হইয়া পড়িতেন, তখন রাজস্ব অনাদায়ের জন্য তাঁহাদের সমস্ত জমিদারী অল্পমূল্যে বিক্রীত হইয়া যাইত। বলা বাহুল্য, দেবীসিংহ নিজেই সেই জমিদারীর ক্রেতা; তিনিই মূল্য নির্ধারণ করিতেন, তিনিই বিক্রয় করিতেন, পরে বেনামীতে নিজেই কিনিয়া লইতেন। যাহারা পুরুষানুক্রমে লাখেরাজ ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছিল, তাহারাও অবশেষে সে সকল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। জমিদারী বিক্রয় করিয়াও যখন তাঁহার প্রস্তাবানুযায়ী অর্থের সংকুলান হইত না, তখন সেই সমস্ত লোকদিগের অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া, কিয়ৎপরিমাণে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করা হইত।

এই সময়ে দিনাজপুর প্রদেশে অনেক স্ত্রী-জমিদারও ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সম্ভ্রান্ত মহিলা। এই সময় মাননীয়া মহিলাবৃন্দ দেবীসিংহের হস্তে ঘোর অত্যাচার ভোগ করেন। দেবীসিংহ সেই সমস্ত স্ত্রী-জমিদারদের ভবনের চতুর্দিকে প্রহরী নিযুক্ত করিয়া নাজির ও পদাতিক দ্বারা তাঁহাদিগের ধন, রত্ন, অলঙ্কারাদি ক্রোক করিয়া লইতেন। সুখের বিষয়, এই সকল কার্যে স্ত্রীলোকই নিযুক্ত হইত। সেই সমস্ত মহিলাগণ অত্যন্ত উৎপীড়িত হইয়া সামান্যবেশে আপনাদিগের বাসস্থান পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। সূর্যকিরণও কখনও যাঁহাদিগের কোমল অঙ্গ-

স্পর্শ করিতে পারে নাই, আজ তাঁহারা নিরাশ্রয়া হইয়া দীনবেশে অরণ্য ও কুটীরে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। ইহার পর, দেবসেবা, অতিথিসেবা ও ব্রাহ্মণসেবার জন্য যে সমস্ত জমি নির্দিষ্ট ছিল, দেবীসিংহ কৌশলপূর্বক তাহাও আত্মসাৎ করিলেন। বহুদিন হইতে যে সমস্ত সম্পত্তির আয় অনাথগণের প্রতিপালনের জন্য ব্যয়িত হইত, যাহার জন্য জমিদারগণের পূর্বপুরুষগণ অক্ষয় পুণ্য ভোগ করিতেছিলেন, আজ জমিদারগণের চক্ষের সমক্ষে হৃদয়হীন রাক্ষস দেবীসিংহ তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণের পুণ্যকীর্তিগুলির বিলোপ-সাধনে অগ্রসর হইলেন! দীন দুঃখীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া আপনার ঐশ্বর্য বৃদ্ধির জন্য অগ্রসর হইলেন। হিন্দু হইয়া দেবসম্পত্তি অপহরণ করিয়া নরকের দ্বার উদ্ঘাটন করিবার ইচ্ছা করিলেন!

অর্থশালী জমিদার ও ভূস্বামীদের লাঞ্ছনার একশেষ করিয়া, নিরীহ প্রজা ও কৃষকগণের উপর, তাঁহার অত্যাচার-স্রোত প্রবাহিত হয়। যাহারা নিদাঘের রৌদ্র, বর্ষার বর্ষণ মাথায় লইয়া, শীতের তুষারপাতের মধ্যেও অতি কষ্টে কিঞ্চিৎ শস্য সঞ্চয় করে, যাহারা স্বচ্ছন্দ-বনজাত শাক ও কঙ্করমিশ্রিত লবণের সহিত দুই এক গ্রাস অন্ন মুখে দিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকে, শতছিদ্রযুক্ত পর্ণকুটীর যাহাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল, দেবীসিংহের অত্যাচার হইতে তাহারাও নিষ্কৃতি পাইল না। এই সকল লোকদিগের অত্যাচারে কিরূপ অর্থলাভের সম্ভাবনা, তাহা দেবীসিংহ নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি এইরূপ লিখিয়াছিলেন, "ইহা অত্যন্ত বিড়ম্বনার বিষয় যে, বাঙ্গলার অন্যান্য স্থান অপেক্ষা রঙ্গপুর প্রদেশের কৃষকদিগের মধ্যেই ঘোর অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। শস্য কাটার সময় ব্যতীত অন্য কোন সময়ে তাহাদের ঘরে কোনরূপ সম্পত্তি পাওয়া যায় না; কাজেই তাহাদিগকে অন্য সময়ে অতি কষ্টে আহারের উপায় করিতে হয় এইজন্য দুর্ভিক্ষে বহুসংখ্যক লোক কাল-কবলে পতিত হইতেছে। দুই একটি মৃৎপাত্র ও একখানি পর্ণকুটীর মাত্র তাহাদের সম্বল; ইহাদের সহস্রখানি বিক্রয় করিলেও দশটি টাকা পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।" কিন্তু সেই মহাপ্রভু এই সকল দরিদ্র পর্ণকুটীরবাসিগণের প্রতিও নিজ ক্ষমতা প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। সামান্য গোপাল মেষপালের ন্যায় কৃষিজীবিগণ দলে দলে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া, কারাগারে প্রেরিত হইল; তাহার উপর অবিরত বেত্রাঘাতে তাহাদের অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইতে লাগিল। অধিকাংশ লোক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। অশ্রুপূর্ণলোচনে সকলে প্রিয় বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া, অরণ্যে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল। ক্রমে ক্রমে সমস্ত দেশ মহাশ্মশানের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইল। যাহারা অবশিষ্ট রহিল, তাহাদের নিকট হইতে সমস্ত টাকা আদায়ের চেষ্টা হইতে লাগিল।

এই সময়ে রঙ্গপুর অঞ্চলে কতকগুলি রাক্ষস প্রকৃতির কুসীদজীবী বাস করিতে-ছিল। মহাকবি সেক্ষপীয়রের বর্ণিত শাইলকও তাহাদের সমকক্ষ ছিল না। কৃষিজীবিগণ অসহনীয় কষ্টে পতিত হইয়া, তাহাদের নিকট আপনাদের জমাজমি

আবদ্ধ রাখিতে বাধ্য হইয়া, যাহা কিছু অর্থ পাইল, তদ্দ্বারা দেবীসিংহের করপরিশোধের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। এদিকে তাহাদের ঋণ দিন দিন বন্যাস্রোতের ন্যায় বৃদ্ধি পাইয়া তাহাদিগকে চিরদিনের মত ভাসাইবার উপক্রম করিল। শুনিলে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয় যে, সেই সমস্ত কুসীদজীবী বিপন্ন কৃষকদিগের নিকট হইতে শতকরা বার্ষিক ছয় শত টাকা সুদ আদায় করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল !!

একদিকে দেবীসিংহের অন্যদিকে কুসীদজীবীগণের ভীষণ অত্যাচারে সেই নিরীহ প্রজাগণ প্রতিনিয়ত ঊর্ধ্বমুখে ভগবানকে আহ্বান করিত ; কিন্তু জানি না, কি কারণে তাঁহারও করুণাকণা তাহাদের উপর নিপতিত হয় নাই। তাহাদের কঠোর-পরিশ্রমোৎপাদিত শস্যরাশি বলপূর্বক বাজারে লইয়া এক-চতুর্থাংশেরও কম মূল্যে বিক্রীত হইতে লাগিল। হতভাগ্যগণের সংবৎসরের আহার্য সম্পত্তি অপহৃত হইল, অথচ তাহাদের ঋণপরিশোধের বিশেষ কোন সুবিধাও হইল না !! অবশেষে তাহাদের লাঙ্গল, বলদ, মই, বিদা প্রভৃতি বিক্রয় করিতে আরম্ভ করা হয়। এইরূপে তাহাদিগের ভবিষ্যৎ শস্যোৎপাদনের পথও একবারে নিরুদ্ধ হইল। তাহার পর, তাহাদিগের জীর্ণ পর্ণকুটীর লুণ্ঠন করিয়া, দেবীসিংহের অনুচরগণ সেই সকল কুটীর অগ্নিমুখে সমর্পণ করিয়া চলিয়া যায়। দরিদ্রের দীর্ঘশ্বাসের সহিত সেই অগ্নিশিখা চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এতদিন যাহারা শত কষ্ট স্বীকার করিয়াও আপনাদের আশ্রয়স্থান পরিত্যাগ করে নাই, এক্ষণে তাহারা বাধ্য হইয়া বন্যপশুর ন্যায় বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিল ! ইহাতেও নিস্তার নাই, তাহার উপরও আবার অত্যাচারের স্রোত চলিল ! অনাহারে রঙ্গপুরবাসী প্রজাগণের মধ্যে ঘোর কষ্ট দেখা দিল ; পিতা পুত্রকে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইল, স্বামী স্ত্রীকে চিরবিসর্জন দিল। এইরূপে প্রত্যেক গৃহস্থসংসার হাহাকার ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

আমরা এতক্ষণ সাধারণ অত্যাচারের কথা বলিতেছিলাম ; এক্ষণে দেবীসিংহের উদ্ভাবিত অত্যাচারের কতিপয় দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। দেখিবেন, এরূপ পাশবিক অত্যাচার কখনও সম্ভবপর কি না ! শত বৎসরের পর সেই সমস্ত অত্যাচার পড়িতে গেলে, উপন্যাস বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তাহা উপন্যাস বা কাহিনী নহে,—জ্বলন্ত সত্য। মনুষ্য-প্রকৃতিতে এরূপ পিশাচপ্রকৃতির সমাবেশ আর কোথাও আছে কি না জানি না। দেবীসিংহের পাইকবর্গ সেই নিরীহ প্রজাগণের অঙ্গুলিতে রজ্জু বন্ধন করিয়া, ক্রমাগত পাক দিতে দিতে অঙ্গুলিগুলির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিত এবং তাহারা যখন যন্ত্রণায় কাতর হইয়া, আর্তনাদ করিয়া উঠিত, সেই সময়ে হাতুড়ির দ্বারা তাহা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া, একেবারে অকর্মণ্য করিয়া দিত। গ্রামের মণ্ডল, পঞ্চায়েৎ ও অন্যান্য প্রধানবর্গের দুই দুই জনকে শৃঙ্খলে বাঁধিয়া পদদ্বয় ঊর্ধ্বমুখে ও মস্তক অধোমুখে লম্বমান করিয়া, পদতলে বেত্রাঘাত করিতে করিতে, অঙ্গুলি হইতে নখগুলি বিচ্যুত করিয়া দিত ; অবশেষে মস্তকে আঘাত করিয়া মুখ, চক্ষু ও নাসিকা হইতে রুধির বহির্গত না করিয়া ক্ষান্ত হইত না। বেত বা লাঠির দ্বারা যদি পদে

অধিক কষ্ট বোধ না করে, এই ভাবিয়া সেই কৃতান্তের অনুচরেরা কণ্টকপূর্ণ বিল্বশাখার দ্বারা তাহাদের ছিন্ন ভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আরও ক্ষত-বিক্ষত করিত ; তাহার উপর বিছুটির আঘাত করিয়া অপরিসীম যন্ত্রণায় তাহাদিগকে মৃতকল্প করিয়া তুলিত। রাত্রিতেও তাহাদিগের নিস্তার ছিল না। প্রত্যেক রাত্রিতে তাহাদিগকে তিন বার করিয়া বেত্রাঘাত করার নিয়ম ছিল। পরে তাহাদিগকে প্রবল শীতে, নগ্ন দেহে দণ্ডায়মান করিয়া রাখা হইত। প্রভাত হইলে, তুষারশীতল জলে নিমজ্জিত করিয়া, পুনর্বার বেত্রাঘাত করিতে করিতে, গ্রামমধ্যে লইয়া গিয়া, লুক্কায়িত অর্থের জন্য পীড়াপীড়ি করিত। বৃক্ষতলব্যতীত যাহাদের অবলম্বন নাই, তাহারা অর্থ কোথায় পাইবে, ইহাও কি পিশাচদিগের মনে উদয় হইত না ? তাহার পর আবার কারাগারে প্রেরণ।

ক্রমে ক্রমে নূতন নূতন অত্যাচারের উদ্ভাবন হয়। পিতার সম্মুখে তাহার স্নেহপুত্তলী শিশুসন্তানকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া তাহার সুকোমল দেহে ক্রমাগত বেত্রাঘাতের লীলা চলিতে থাকিত। সেই বেত্রাঘাতে বালকগণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া, রুধিরস্রোতে পিতার মুখমণ্ডল প্লাবিত করিত। পুত্র যন্ত্রণায় এবং পিতা হৃদয়ভেদী দৃশ্যে মূর্ছিত হইয়া, ভূতলে পড়িয়া যাইত। কখন কখন বা পিতাপুত্রকে একত্র রজ্জুবদ্ধ করিয়া, গাত্রে একসঙ্গে বেত্র ও যষ্টির আঘাত পড়িত ; পিতা যাহাতে পুত্রের অঙ্গে আঘাত না লাগে এবং পুত্র যাহাতে পিতার শরীর ক্ষত বিক্ষত না হয়, তজ্জন্য চেষ্টা পাইত ; কিন্তু উভয়েই সমানরূপে আহত হইয়া, রুধিরাপ্লুত দেহে বায়ু-বিকম্পিত অশ্বত্থপত্রের ন্যায় অবিরত কাঁপিতে থাকিত।[৫]

এই ত গেল পুরুষদিগের প্রতি অত্যাচারের কথা ! তাহার পর স্ত্রীলোকদিগের প্রতি যেরূপ লোমহর্ষণ অত্যাচার হইত, তাহা স্মরণ করিতে গেলেও হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। যে দেশের কুমারীগণকে বিশ্বজননী ভগবতী বলিয়া পূজা করা হইয়া থাকে, সেই সমস্ত কুমারীদিগকে তাহাদের পবিত্র নিকেতন হইতে বলপূর্বক প্রকাশ্য বিচারালয়ে আনয়ন করিয়া, তাহাদের পবিত্রতা নষ্ট করা হইত। যে ধর্মাধিকরণে বসিয়া বিচারক ধর্ম সংস্থাপন করেন, সেই বিচারালয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে কুলকামিনীর পবিত্রতা অপহৃত হইতে লাগিল। কুমারীগণের আর্তনাদে, তাঁহাদের আত্মীয়গণের হাহাকারে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইল ! কিন্তু কে তাহাদের কথায় কর্ণপাত করে ? যেখানে ন্যায় ও ধর্মের মূর্তিমান্ অবতারগণ উপবেশন করিয়া থাকেন, তাহারা জানিত না যে, সেই পবিত্র স্থানে ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রেরিত কতকগুলি শয়তান বসিয়া আছে। স্বামীর অঙ্ক হইতে পত্নীকে কাড়িয়া আনা হইত। এই সময়ে কত স্ত্রীলোকের যে সতীত্ব নষ্ট হইয়াছে তাহা কে বলিতে পারে ? সেই সমস্ত স্ত্রীলোকদিগকে সাধারণের সমক্ষে উলঙ্গিনী করিয়া, অবিরত বেত্রাঘাত করা হইত ! লজ্জায়, যন্ত্রণায়, তাহারা

৫ এই সমস্ত অত্যাচারের কাহিনী কেবল বার্ক নহেন মিঃ আনস্ট্রথারও ওয়েস্টমিনিস্টার মহাসভায় বিশদরূপে বিবৃত করিয়াছিলেন। (Debrett's Trial of W. H., Part III, p. 3.)

ক্রমাগত বসুন্ধরাকে দ্বিধা হইয়া স্থানদানের জন্য অনুনয় করিত ! তাহাদের স্বামিপুত্রগণ অপমানে ও মর্মভেদী যন্ত্রণায় প্রতিনিয়ত বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিয়া হাহাকার করিতে থাকিত ! ইহাতেও তাহাদের নিস্তার নাই, তাহার পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূচাগ্র বংশখণ্ড বক্রভাবে আনত করিয়া, যুবতীগণের স্তনবৃন্তে বিঁধিয়া দিত ! স্থিতিস্থাপক বংশখণ্ডগুলি স্ত্রীলোকদিগের স্তন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া, ঋজুভাব অবলম্বন করিত ! রুধিরপ্রবাহে ধরাতল অভিষিক্ত করিয়া, তাহারা ভূতলে মূর্ছিত হইয়া পড়িত ![৬] সর্বংসহা বসুন্ধরা ক্ষণকালের জন্য তাহাদিগকে আপনার ক্রোড়ে স্থানদান করিতেন, কিন্তু পরে তাহাদের সেই সমস্ত ক্ষতস্থান গুল ও মশালের আগুনে দগ্ধ করিয়া, যন্ত্রণার সীমা ক্রমেই বৃদ্ধি করা হইত !

কতদেশে কত অত্যাচার শুনিয়াছি, কিন্তু রমণীজাতির প্রতি এরূপ অত্যাচার কখনও শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। যে দেশের রমণীগণ অতি নিরীহভাবে আপনাদিগের ক্ষুদ্র সংসার জগতে নীরবে দিন কাটাইয়া থাকে, যাহারা সামান্য সূর্যোত্তাপে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, সেই কোমলপ্রাণা ললনাদিগের প্রতি এরূপ অত্যাচার কেমন করিয়া হইয়াছিল, তাহা ভাবিয়া উঠা যায় না। সে সময়ে বিধাতার হস্ত হইতে দেবীসিংহের মস্তকে শত অশনি পতিত হয় নাই কেন, বুঝিতে পারি না। দেবকুলের শাপাগ্নি তৎক্ষণাৎ তাহাকে দগ্ধ করে নাই কেন, জানি না। জগতে এমন প্রাণ কাহার আছে যে, এই সকল কুলললনার প্রতি জ্ঞানাতীত, ভাবাতীত অত্যাচারে কাঁদিয়া না উঠে। ইউরোপীয় মহিলাগণ এই ব্যাপারশ্রবণে মূর্ছিত হইয়া পড়েন ; মহামতি বার্কের অনলবর্ষিণী বক্তৃতা ইউরোপীয় জনসমাজকে স্তম্ভিত করিয়াছিল। কিন্তু হায় ! আমরা ভারতবাসী হইয়া সেই দেবীসিংহের কি করিয়াছিলাম ? বরং সে সময়ে বাঙ্গলার সকল বড়লোকই তাহার সহায় ! এরূপ না হইলে আমাদের দুর্দশার একশেষ হইবে কেন ? হায় মাতঃ ভারতভূমি ! তোমার পুণ্যগর্ভে দেবীসিংহের ন্যায় সন্তানেরও জন্ম হইয়াছিল !! স্ত্রীলোকগণ যখন ঐরূপ অত্যাচার সহ্য করিয়া গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইত, তখন আত্মীয়স্বজনগণ তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিত না। যাহাদের পবিত্রতা নষ্ট হয়, কে তাহাদিগকে গৃহে স্থান দিয়া থাকে ? এইরূপ অবস্থায় তাহারা নিরাশ্রয়া হইয়া অনাথার ন্যায় দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইত !

ব্রাহ্মণদিগের জাতিনাশের এক নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছিল। তাঁহাদিগকে বিচারালয়ের সম্মুখে আনিয়া বলদে আরোহণ করাইয়া, বাদ্যধ্বনির সহিত নগর প্রদক্ষিণ করাইতে করাইতে লাঞ্ছনার একশেষ করা হইত ! সমস্ত লোক ব্রাহ্মণের এরূপ অপমানদর্শন পাপজনক মনে করিয়া দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিত ! সেই সমস্ত

৬ বার্ক মহাসভায় সেই বংশখণ্ড সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"Here ; in my hand is my authority ; for otherwise one would think it incredible" (Burke's Impeachment of W. H. Bhon, Vol. I, p. 190.)

ব্রাহ্মণদিগকে তাহাদের স্বজাতিগণ সমাজে গ্রহণ করিতেন না। কাজেই তাঁহাদিগকে জাতিচ্যুত হইয়া দীনবেশে সময় কাটাইতে হইত। এইরূপে অপমানের ভয়ে, অনেক ব্রাহ্মণ দেবীসিংহের কঠোর প্রস্তাবে স্বীকৃত হইতেন; যাঁহারা স্বীকৃত না হইতেন, তাঁহারা ঐরূপ শাস্তি ভোগ করিয়া, জাতি হারাইয়া দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেন।

এইরূপ দিন দিন শত শত অত্যাচারে দিনাজপুর ও রঙ্গপুর প্রদেশ শয়তানের বাসভূমি হইয়া উঠিল। জমিদার, প্রজা, ধনী, কৃষক, পুরুষ, স্ত্রী সকলেরই প্রতি সমানভাবে অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। শিশুসন্তান ও কুমারীবালিকা পর্যন্ত নিস্তার পায় নাই। ভারতবর্ষে হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, এরূপ পিশাচ-প্রকৃতির পরিচয় বোধ হয়, আর কেহ প্রদর্শন করে নাই। কাহিনী বা উপন্যাসে এরূপ ভয়ানক কাণ্ড কেহ কখন শুনে নাই বলিয়া অনুমান হয়। হায়, দেবীসিংহ! যেরূপ অত্যাচারে তুমি সমগ্র উত্তরবঙ্গ প্রপীড়িত করিয়াছ, শত শত জমিদার ও প্রজার সর্বনাশ করিয়াছ, পিতাপুত্রের স্বামিস্ত্রীর সম্বন্ধ ঘুচাইয়াছ, কুমারীর কৌমার্য, পত্নীর পবিত্রতা বিসর্জন করাইয়াছ, ব্রাহ্মণের জাতিনাশ ও মানীর সম্মান নষ্ট কয়িয়াছ, না জানি তোমার জন্য কোন্ নরক প্রস্তুত হইয়াছে। যত প্রকার নরকের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের বোধ হয়, সকল প্রকার নরকের ভিন্ন ভিন্ন উপকরণ লইয়া, তোমার জন্য নূতন নরকের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। অনন্তকোটি মহারৌরবে অনন্তকাল থাকিলেও তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। জানি না, কতদিনে ভারতবর্ষ হইতে তোমার নাম বিলুপ্ত হইয়া সেই নবনির্মিত মহানরক উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে।

এই সমস্ত ভীষণ অত্যাচারের অভিনয় করিয়াও যখন প্রজাদের নিকট হইতে আপনার আশানুযায়ী, আকাঙ্ক্ষানুযায়ী অর্থপ্রাপ্তির কিছুমাত্র সম্ভাবনা হইল না, তখন দেবীসিংহ রাজস্বসংগ্রহের সুবিধা হইবে বিবেচনা করিয়া, নিজ দেওয়ান বা রাজস্ব-সংগ্রাহকের পদ পরিবর্তন করিতে লাগিলেন। ১১৮৮ সালে কৃষ্ণপ্রসাদ নামে একব্যক্তি দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন। উক্ত বৎসরের ভাদ্রমাসে তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া হররামকে নিযুক্ত করা হয়। ১১৮৯ সালের আষাঢ় মাসে হররাম কার্যে ইস্তফা দেওয়ায়, সূর্যনারায়ণ তাহার পদ অধিকার করেন। অগ্রহায়ণ মাসে দেবীসিংহের ভ্রাতা বাহাদুরসিংহ মুর্শিদাবাদ হইতে গমন করিয়া সমস্ত রাজস্বসংক্রান্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধানের ভারগ্রহণ করেন। সূর্যনারায়ণ দেওয়ানরূপে কার্য করিতে থাকেন। এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন লোকের হস্তে পড়িয়া প্রজাগণ যৎপরোনাস্তি কষ্টভোগ করিতে লাগিল। যিনি যখনই দেওয়ান নিযুক্ত হন, তিনি অমনি নিজ ক্ষমতার পরিচয় দিবার জন্য নূতন নূতন কর বসাইতে আরম্ভ করেন। কোন কোন সময়ে, ভূমির প্রকৃত রাজস্ব ব্যতীত অতিরিক্ত কর ও বাটা প্রভৃতির জন্য প্রজাদিগকে প্রতি টাকায় অতিরিক্ত আট আনা পর্যন্ত দিতে বাধ্য করা হইয়াছিল।[৭]

৭ Glazier's Report on Rungpore, p. 21.

যখন এইরূপ করবৃদ্ধির অত্যাচারের সহিত প্রজাদিগের স্ত্রী, পুত্র পরিবারের প্রতি ভীষণ পাশবিক অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল, যখন প্রজাগণ আরণ্য পশুর ন্যায় দলে দলে, বনে বনে ভ্রমণ করিয়াও অত্যাচারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইল না, আপনাদিগের সম্মুখে দিন দিন স্ত্রীকন্যার পবিত্রতা অপহৃত এবং অগ্নিমুখে আপনাদের কুটীরগুলি ভস্মীভূত হইতে দেখিতে লাগিল, তখন তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না। সামান্য পিপীলিকাকে পদদলিত করিলে সেও দংশন করিতে উদ্যত হয়। সুতরাং সেই সমস্ত ভীষণ অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া উত্তরবঙ্গের প্রজাগণ ঘোর বিদ্রোহের অবতারণা করিল। তাহারা কিছুতেই করপ্রদানে স্বীকৃত হইল না; অবশেষে তাহারা অস্ত্রধারণ করিয়া, দেবীসিংহের অনুচরবর্গকে প্রতিনিয়ত আক্রমণ করিতে লাগিল। ১৭৮৩ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে কাজীর হাট, কাকিনা, টেপা ও ফতেপুর চাকলার প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া, কুচবিহার ও দিনাজপুরের প্রজাদিগকে তাহাদের সঙ্গে যোগ দিবার জন্য আহ্বান করে। নায়েব, গোমস্তা ও অন্যান্য কর্মচারীদিগকে যেখানে দেখিতে পাইল, সেইখানে হত্যা করিল। টেপা প্রভৃতি স্থানের নায়েব তাহাদের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। ইহাদের মধ্যে নুরুলউদ্দীন নামে একজন আপনাকে নবাব বলিয়া ঘোষণা করিয়া, দয়াশীল নামে আর একজনকে তাহার দেওয়ান নিযুক্ত করে। এইরূপে তাহারা সমস্ত প্রদেশে ভীষণ বিদ্রোহের অভিনয় দেখাইয়াছিল। দেবীসিংহ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া, রঙ্গপুরের তদানীন্তন কালেক্টর গুড্‌ল্যাডের শরণাপন্ন হইলেন।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, গুড্‌ল্যাডের সহিত দেবীসিংহের বিলক্ষণ বন্ধুতা ছিল। তিনি দেবীসিংহের অনুরোধে প্রজাদিগকে দমন করিবার জন্য কয়েক দল সিপাহী প্রেরণ করিলেন। লেপ্টনাণ্ট ম্যাকডোনাল্ড উত্তর দিকে এবং আর একজন সুবেদার দক্ষিণ দিকে প্রেরিত হইল। প্রজারা ইহা শুনিয়া, ডিমলার জমিদার গৌরমোহন চৌধুরীর নিকট আশ্রয় লইতে যায়; কিন্তু চৌধুরী তাহাদিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করায়, একটা ভীষণ কলহ উপস্থিত হয়। তাহাতে গৌরমোহনের মৃত্যু ঘটে। কোম্পানীর সৈন্যগণ যাহাকে সম্মুখে দেখিতে পাইল, তাহাকেই বন্যপশুর ন্যায় গুলি করিতে করিতে অগ্রসর হইল। মোগলহাট ও পাটগ্রাম নামক স্থানে তাহাদিগের সহিত প্রজাদিগের দুইটি ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইয়াছিল। মোগলহাটের যুদ্ধে দয়াশীল নিহত ও নুরুলউদ্দীন গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয় এবং সেই আঘাতেই অল্পদিন পরেই তাহার ইহজীবনের লীলা শেষ হয়।[৮] দলে দলে প্রজাদিগকে বন্দী করিয়া, কোম্পানীর সিপাহীগণ বিজয়গৌরবে রঙ্গপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবীসিংহের অত্যাচার হইতে প্রজাগণের যাহা কিছু রক্ষা পাইয়াছিল, এক্ষণে সমস্তই

৮ Glazier's Report on Rungpore (Appendix, Goodlad's Report of Insurrection), pp. 68-71.

লুণ্ঠিত হইল। ভগ্নাবশিষ্ট দুই একখানি কুটীর ভস্মস্তূপের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া, কোম্পানীর শান্তিময় রাজত্বের পরিচয় দিতে লাগিল! এককথায় সমস্ত উত্তরবঙ্গ জনমানবহীন হইয়া শ্মশান অপেক্ষাও ভয়াবহ হইয়া উঠিল। দেবীসিংহ এক কপর্দকও কর না পাওয়ায়, কোম্পানীর রাজস্ব প্রদান করিতে পারিলেন না।

যখন কর্তৃপক্ষগণ দেখিলেন যে, দেবীসিংহের রাজস্ব অনেকদিন হইতে পাওয়া যাইতেছে না এবং সেই সকল অত্যাচারের কথা অবিরত শ্রবণ করিয়া যখন তাঁহাদের কর্ণ বধির হইবার উপক্রম হইল, তখন তাঁহারা লজ্জার ভয়ে সেই ভীষণ অত্যাচারের অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা প্যাটারসন্ নামক একজন ন্যায়পর ইংরেজকে কমিশনার নিযুক্ত করিয়া রঙ্গপুরে পাঠাইলেন। প্যাটারসন্ অত্যন্ত নির্ভীক ও সাধুপ্রকৃতির লোক ছিলেন; তিনি কদাচ আপনাকে ন্যায়পথ হইতে বিচলিত করিতে ইচ্ছা করিতেন না। রঙ্গপুরপ্রদেশে উপস্থিত হইয়া, প্যাটারসন্ প্রজাদিগের দুর্দশা স্বচক্ষে দেখিয়া এইরূপ লিখিয়া পাঠাইলেন,—"রঙ্গপুর ও দিনাজপুর প্রদেশের প্রজাগণের উপর রাজস্ব অনাদায়ের জন্য যেরূপ কঠোর শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে, সেই সকল দৃষ্টান্ত দ্বারা আপনাদিগের মনশ্চাঞ্চল্য উপস্থিত না করিয়া, সেগুলিকে চিরযবনিকাবৃত করিয়া রাখিবার ইচ্ছা করি। কিন্তু আমার নিকট যতই অপ্রীতিকর হউক না কেন, ন্যায়, মনুষ্যত্ব এবং গবর্নমেণ্টের সম্মানের জন্য যাহাতে ভবিষ্যতে এরূপ অত্যাচার স্রোত পুনঃ প্রবাহিত না হয়, তজ্জন্য আমাকে সমস্তই অবগত করাইতে হইবে।"

তাহার পর প্যাটারসন্‌সাহেব ক্রমাগত দেশের চতুর্দিকের অবস্থা দেখিতে লাগিলেন; প্রতিদিন শত শত ভগ্নাবশেষ কুটীর তাঁহার চক্ষের সম্মুখে পড়িতে লাগিল, শত শত আহত ব্যক্তি আপনাদিগের দুঃখকাহিনী বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইল। কাহারও পুত্র যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, কাহারও ভ্রাতা কারাগারে অনাহারে দিন যাপন করিয়াছে, কাহারও কন্যার পবিত্রতা অপহৃত হইয়াছে, কাহারও ভগিনী পিশাচদিগের বেত্রদ্বারা ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে, এই সমস্ত শুনিয়া এবং নিজে প্রত্যক্ষগোচর করিয়া, সেই ন্যায়বান ব্রিটনসন্তানের হৃদয় বিচলিত হইল। তিনি বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিলেন যে, পৃথিবীর কোন স্থানে কোন যুগে এইরূপ পাশবিক অত্যাচার হয় নাই। ক্রমশঃ তাঁহার অনুসন্ধানের ফলে অনেক নূতন নূতন ব্যাপার জনসাধারণের গোচরীভূত হইতে লাগিল। দেবীসিংহ নিজের অত্যন্ত বিপদ উপস্থিত দেখিয়া, আপনার চির প্রথানুযায়ী অর্থপ্রলোভনে প্যাটারসন্‌কে বশীভূত করিবার প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু প্যাটারসনের প্রকৃতি সেরূপ ছিল না; সামান্য অর্থের প্রলোভন তাঁহাকে ন্যায়পথ হইতে বিচলিত করিতে পারিল না। তৎকালে কোম্পানীর অন্যান্য যাবতীয় কর্মচারী অর্থের দাস ছিলেন। গবর্নর জেনারেল হইতে সামান্য কর্মচারী পর্যন্ত সকলেই সেই প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন। প্যাটারসনের প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়ায়, সেই সকল লোকদিগের কৌশলে

অবশেষে তাঁহাকে অপদস্থ হইতে হইয়াছিল! তিনি জানিতেন না যে, কোম্পানীর রাজস্ব হইতে ন্যায়পরতা বহুদূরে পলায়ন করিয়াছে!

প্যাটারসন্ কাহারও অনুরোধে বিচলিত না হইয়া, দৃঢ়ান্তঃকরণে আপনার কর্তব্য করিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন, ন্যায়ই জগতে সকল রাজত্বের ভিত্তি এবং সকল কার্যের মূল। সুতরাং ন্যায়পথ অবলম্বন করিয়া, তিনি কলিকাতার কমিটিতে নিজ অনুসন্ধানের ফল ক্রমান্বয়ে লিখিয়া পাঠাইলেন। আমরা তাঁহার একখানি পত্রের বিষয় প্রকাশ করিতেছি। "আমার প্রথম দুই পত্রে প্রজাদিগের উপর কঠোর অত্যাচার এবং তাহারই জন্য যে তাহারা বিদ্রোহী হয়, সে কথা সাধারণভাবে বিবৃত করিয়াছি, তাহার পুনরুল্লেখ এক্ষণে নিষ্প্রয়োজন। প্রতিদিনের অনুসন্ধান আমার মন্তব্য আরও দৃঢ় করিতেছে। তাহারা যদি বিদ্রোহী না হইত, তাহা হইলে, আমি আশ্চর্য জ্ঞান করিতাম। প্রজাদিগের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করা হয় নাই, কিন্তু তাহাদের উপর রীতিমত দস্যুতা এবং সঙ্গে সঙ্গে কঠোর শারীরিক যন্ত্রণা ও সর্বপ্রকার অপমানে জর্জরিত করা হইয়াছে। ইহা যে কেবল কতিপয় প্রজার উপর হইয়াছিল এমন নহে, সমস্ত দেশেই এইরূপ ভাবে অত্যাচার বিস্তৃত হয়। মনুষ্য চিরকাল পরাধীন থাকিলেও যখন অত্যাচার সীমা অতিক্রম করিয়া উঠে, তখন তাহার প্রতিবিধানের জন্য তাহাকে অগত্যা উত্থিত হইতে হয়। আপনারা এই সমস্ত প্রজাদিগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, যখন অসম্ভব কর আদায়ের জন্য তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াও অর্ধাংশের পরিশোধ হইল না, তাহার উপর আবার তাহাদিগকে কঠোর শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল, ইহার উপর যখন তাহাদের পরিবারের পবিত্রতানাশ ও জাতিনাশের অত্যাচার হইতে লাগিল, এরূপ ক্ষেত্রে তাহাদের কি করা উচিত? আপনারা বিশেষরূপে অবগত আছেন যে, এতদ্দেশীয়েরা আপনাদিগের স্ত্রী ও জাতির উপর যেরূপ অনুরক্ত, তাহাতে তাহারা এরূপ অবস্থায় কতদূর সহ্য করিতে সমর্থ হয়।"[১]

এইরূপে প্যাটারসন্‌সাহেব প্রতিনিয়ত আপনার অনুসন্ধানের ফল কমিটিতে পাঠাইতে লাগিলেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে তাঁহাদিগকে জানাইলেন যে, প্রজাদিগের কিছুমাত্র দোষ নাই। দেবীসিংহের ভীষণ অত্যাচারে তাহারা বাধ্য হইয়া অস্ত্রধারণ করিয়াছে। যাহারা কৃষিকার্য করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, সেই নিরীহ প্রজা, অত্যাচারের শেষ সীমা উপস্থিত না হইলে, কদাচ অস্ত্রধারণ করিতে সাহসী হয় না। ন্যায়পর প্যাটারসন্ তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া, কলিকাতার কমিটির নিকট ঐরূপ মন্তব্য লিখিয়া পাঠান। কেবল দেবীসিংহের নহে, কিন্তু তাঁহার অনুরোধক্রমে গুড্‌ল্যাড সাহেব সিপাহী পাঠাইয়া সেই অত্যাচারের মাত্রা যে আরও বর্ধিত করিয়াছিলেন এবং সেই সকল অত্যাচারের জন্য রঙ্গপুর প্রদেশের অনেক টাকার রাজস্ব

১ Impeachment of W. H., Vol. I, pp. 194-95

অনাদায় হইয়া পড়ে, তাহাও তিনি বিশেষরূপে অবগত করান। কমিটি এই সমস্ত ব্যাপারের প্রমাণ পাইয়া, মনে মনে দেবীসিংহের প্রতি তাদৃশ বিরক্ত না হইলেও, ডিরেক্টরগণের ভয়ে এবং কতকটা চক্ষুলজ্জায় দেবীসিংহের প্রতি দস্তক জারি করিতে এবং তাঁহার হস্ত হইতে সমস্ত রাজস্ব-আদায়ের ভার উঠাইয়া লইয়া প্রহরী নিযুক্ত করিয়া রাখিতে আদেশ দিলেন, এবং জমিদার ও প্রজাদিগকে দেবীসিংহের নিকট খাজনা দিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু এ সমস্ত লোকদেখান মাত্র। আমরা পরে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

কলিকাতা-কমিটির আদেশ শুনিয়া দেবীসিংহ একেবারে স্তম্ভিত হইলেন। তিনি জানিতেন না যে, তাঁহাকে সামান্যমাত্র তিরস্কারও সহ্য করিতে হইবে। কোম্পানীর তৎকালীন যাবতীয় কর্মচারীর সহিত তাঁহার বিলক্ষণ বাধ্যবাধকতা ছিল; কিন্তু এক্ষণে তাঁহার প্রতি কঠোর আদেশের প্রচার হওয়ায়, তিনি নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া কাউন্সিলে এইরূপ দরখাস্ত লিখিয়া পাঠাইলেন। "আমাকে ৩,৯০,২০০ টাকারও অধিক রাজস্ব বাকীর জন্য দায়ী করা হইয়াছে এবং আমি অনেক লোকের প্রাণনাশ করিয়াছি বলিয়া দোষী সাব্যস্ত হইয়াছি, এই সকল কারণে আমার উপর দস্তক জারি করা হইয়াছে। পরন্তু আমাকে কারাগারে রাখিতে অনুমতি হওয়ায়, আমি সে আদেশও পালন করিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সাক্ষাতে আমার কৈফিয়ৎ না লইয়া, আমাকে একেবারে বন্দী করিবার হুকুম দেওয়া হইয়াছে। প্যাটারসন্‌সাহেব নিষেধ করিয়াছেন বলিয়া, জমিদারেরা কেহ আমাকে খাজনা দেয় নাই। যদি তাহাদের নিকট হইতে খাজনা লওয়া না হয়, আমার নিকট হইতে লওয়া হউক। কিন্তু আমার চরিত্র ও সুনামের উপর কলঙ্ক প্রদান করা কেন হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারি না। আমি কোন লোকের প্রাণনাশ করি নাই, অথবা রাজস্ব-আদায়ের জন্য কাহারও উপর কোনরূপ অত্যাচার করি নাই। আমি বলিতে পারি যে, আমার দ্বারা একটি পাখিরও পর্যন্ত প্রাণনাশ হয় নাই। যদি তাহা সপ্রমাণ হয়, তবে আমি তৎক্ষণাৎ তদ্বিনিময়ে নিজের ও নিজ পরিবারবর্গের জীবন বলি দিতে প্রস্তুত আছি। অতএব আমার একান্ত প্রার্থনা যে, আমাকে সাক্ষাতে লইয়া গিয়া আমার যাবতীয় কৈফিয়ৎ শুনা হয়।"[১০]

দেবীসিংহের প্রার্থনাপত্র কাউন্সিলে পঠিত হইলে, সভ্যেরা স্থির করিলেন যে, দেবীসিংহের কলিকাতায় আসিয়া কৈফিয়ৎ দেওয়াই সঙ্গত। তাঁহারা অমনি দেবীসিংহের প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া, তাঁহাকে কলিকাতায় আসিতে লিখিয়া পাঠাইলেন। দেবীসিংহ মনে করিয়াছিলেন যে, একবার কলিকাতায় সভ্যদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলে, যেরূপই হউক, তাঁহাদের বিরুদ্ধভাব অপনোদন করিতে সমর্থ হইবেন। তাঁহার অগাধ ঐশ্বর্যবলে তিনি যাহা মনে করিতেন, অবিলম্বে তাহাই সম্পাদন

১০ Minutes of the Evidence in H's Trial, (Appendix, p. 908)

করিতে পারিতেন। দেবীসিংহ প্রজাদিগের রক্তশোষণ করিয়া ৭০ লক্ষেরও অধিক টাকা লইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন।[১১]

প্যাটারসনের মন্তব্যে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসস্থাপন না করিয়া, হেস্টিংসসাহেব গুড্-ল্যাডের কোন দোষ নাই বলিয়া তাঁহাকে অব্যাহতি দিলেন। তিনি এইরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, যদি দেবীসিংহ কোনরূপ অত্যাচার করিয়া থাকেন, গুড্‌ল্যাডের তাহা জানিবার কোনই কারণ ছিল না। যদিও তিনি গুড্‌ল্যাডকে অব্যাহতি দেন, তথাপি স্পষ্টাক্ষরে দেবীসিংহকে নির্দোষ বলিতে পারেন নাই। যাহা হউক, দেবীসিংহের বিচারের ভার কমিটির উপর ন্যস্ত হইল।

দেবীসিংহ যদিও দোষীরূপে কলিকাতায় আনীত হইলেন, তথাপি সাধারণে তাঁহাকে দোষী বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিল না। যে সমস্ত রক্ষক তাঁহার প্রহরি-স্বরূপ নিযুক্ত হয়, তাহারা ক্রমে তাঁহার আর্দালীরূপে পরিণত হইল। তাঁহাকে কারাগারে রাখা দূরে থাকুক, তিনি আপনার বাটীতে পর্যন্ত আবদ্ধ ছিলেন না; ইচ্ছামত যেখানে সেখানে গমন করিতে পারিতেন। সেই সকল প্রহরী বন্দুকগুলি দূরে রাখিয়া বেয়নেট নিম্নাভিমুখ করিয়া কখন কখন রৌপ্যনির্মিত আশাসোটা লইয়া তাঁহার সহিত গমনাগমন করিত। সাধারণ লোকে অপরাধী মনে করা দূরে থাকুক, তাঁহাকে একজন মাননীয় শাসনকর্তা বলিয়া বিবেচনা করিত। যে ব্যক্তি শত শত লোকের প্রাণনাশ, শত শত গৃহ অগ্নিমুখে ভস্মীভূত করিয়া, নিরীহ প্রজাদিগের স্ত্রী, পুত্র, পরিবারের প্রতি পাশবিক অত্যাচারের একশেষ করিয়াছে, কোথায় তাহাকে শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া কারাগারের অন্ধতম প্রদেশে আবদ্ধ করিতে হইবে, না তাহার উপর নিযুক্ত প্রহরীদিগকে তাহার আর্দালীতে পরিণত করা হইল! যাঁহাদের উপর বিচারের ভার অর্পিত হয়, দেবীসিংহ সর্বদা তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। অপরাধী হইয়া বিচারকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তিনি একদিনের জন্যও নিষিদ্ধ হন নাই। বিচারকগণ দেবীসিংহের মহা-মহিমায় অর্থের দাসত্বে আপনাদিগকে যে বিক্রীত করিয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত ছিল না।

এই সমস্ত বিচারকগণ বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়া অপরাধী দেবীসিংহকে তাঁহার সমস্ত অপরাধের কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, প্যাটারসন্‌কে ক্রমাগত জিজ্ঞাসার উপর জিজ্ঞাসা আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা দেবীসিংহের বিচারের পরিবর্তে প্যাটারসনের বিচার করিতে বসিলেন। প্যাটারসন্ ইচ্ছাপূর্বক দেবীসিংহের নামে দোষারোপ করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার বিরুদ্ধে দেবীসিংহের অভিযোগ ও সাক্ষ্যগ্রহণ আরম্ভ হইল। তাঁহারা দেবীসিংহকে আপনাদিগের সহকারী নিযুক্ত করিয়া, এক সঙ্গে উপবেশন করিতে আদেশ দিলেন। আজ সেই ভীষণ নরহন্তা অপরাধী তাঁহাদের সাহায্যকারী হইয়া, বিচারাসনে পবিত্রতা বৃদ্ধি করিতে লাগিল! অর্থে মনুষ্যকে দেবতা ও পশু

১১ Impeachment of W. H., Vol. I, p. 195 also 200.

করিতে পারে ! দেবীসিংহ ও প্যাটারসন্ তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। বিচারকগণ প্রশ্নের পর প্রশ্ন, উত্তরের পর উত্তর, নানারূপ আপত্তি, আপত্তির খণ্ডন, হিসাবের বিপরীত হিসাব, এইরূপ নানারূপ গোলযোগে প্যাটারসন্‌কে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। তাঁহাদের বিচারপ্রথায় দেবীসিংহের ঘোর অত্যাচার যবনিকাবৃত হইয়া গেল এবং প্যাটারসন্ তাঁহাদের চক্ষে দোষী স্থির হইলেন। প্যাটারসন্ ইচ্ছাপূর্বক দেবীসিংহের নামে দোষারোপ করিয়াছেন স্থির করিয়া, তাঁহারা গবর্নর জেনারেলকে আপনাদের মন্তব্য জ্ঞাপন করিলেন।

রঙ্গপুরের লোকদিগের দুর্দশা দেখিয়া যে মহানুভব ব্রিটনসন্তান আপনার কর্তব্য পালন করিয়াছিলেন, আজ তিনি অপরাধী হইয়া দাঁড়াইলেন। ন্যায়পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া, এক্ষণে তাঁহার দুর্দশার একশেষ হইল। তিনি যদি কোম্পানীর অন্যান্য কর্মচারীর ন্যায় দেবীসিংহের অর্থচাকচিক্যে আপনাকে অন্ধ করিতে পারিতেন, কর্তব্যের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, স্বার্থসিদ্ধিকে জীবনের একমাত্র উপায় বিবেচনা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এরূপ অপদস্থ হইতে হইত না। তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, ন্যায়পথ অবলম্বন করিলে, কোম্পানীর কর্মচারিগণ তাঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হইবেন। তিনি জানিতেন না যে, দেবীসিংহের পদতলে গবর্নর জেনারেল হইতে কোম্পানীর সামান্য কর্মচারী পর্যন্ত আপনাদের জীবন বিক্রয় করিয়াছে।

প্যাটারসন্ হেস্টিংসের নিকট অপরাধী বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে, তিনি তাঁহার দোষক্ষালনের সাক্ষ্যসংগ্রহের উপায় করিতে বলিলেন। কাজেই তাঁহাকে বাধ্য হইয়া পুনর্বার রঙ্গপুর প্রদেশে গমন করিতে হইল। যেখানে তিনি দেশের রক্ষক হইয়া গমন করিয়াছিলেন, যাঁহার নিকট প্রাণের কথা খুলিয়া প্রজারা শান্তিলাভ করিয়াছিল, যাঁহার ন্যায়ানুমোদিত অনুসন্ধানে প্রজাদিগের তাপদগ্ধহৃদয়ে কিঞ্চিত সুবিচারের আশা হইয়াছিল, এক্ষণে সেই প্যাটারসন্‌কে সামান্য অপরাধীর ন্যায় সাক্ষ্যসংগ্রহে উপস্থিত হইতে দেখিয়া, তাহারা ভীত ও হতাশ হইয়া পড়িল। এক সময়ে যিনি শাসন-কর্তৃরূপে গমন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার দুর্দশা দেখিয়া প্রজাগণ ভীত হইয়া, তাঁহার পক্ষে সাক্ষ্য দিতেও সাহস করিতে পারিল না। তাহার পর হেস্টিংসসাহেব কতিপয় অল্পদিনের নিযুক্ত কর্মচারীকে কমিশনার নিযুক্ত করিয়া, প্যাটারসনের অপরাধের তদন্তের জন্য পাঠাইলেন। যিনি একসময়ে কমিশনার নিযুক্ত হইয়া, অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে আবার তাঁহার উপর কমিশনার নিযুক্ত হইল ! কমিশনারগণ রঙ্গপুরে গমন করিয়া, অনেক দিন মুখবন্ধেই কাটাইলেন। তাহার পর তাঁহারা পরামর্শ করিয়া, দেবীসিংহকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "তুমি তোমার উকীল না পাঠাইলে, অনুসন্ধানের সুবিধা হইবে না।" দেবীসিংহ উকীল পাঠাইতে অস্বীকার করিলেন। কমিশনারগণ তাহাতে আপনাদিগের কর্তব্য পালন না করিয়া দেবীসিংহকে স্বয়ং উপস্থিত হইতে আদেশ পাঠাইলেন। দেবীসিংহ তাহাই ইচ্ছা

করিতেছিলেন। তিনি এইরূপ মনে করিয়াছিলেন যে, রঙ্গপুরে উপস্থিত হইতে পারিলে, নিজের সমস্ত ঘটনা অন্ধকারাবৃত করিতে পারিবেন; তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইল।

দেবীসিংহ কলিকাতায় যেরূপভাবে থাকিতেন, রংপুরেও সেইরূপভাবে উপস্থিত হইলেন। পূর্বে যে সকল প্রহরীদ্বারা বেষ্টিত হইয়া, তিনি রঙ্গপুর হইতে কলিকাতায় গমন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারা তাঁহার সম্মানের অঙ্গ হইয়া তাঁহার সহিত পুনর্বার রঙ্গপুরে আসিল। রঙ্গপুরের লোকেরা দেবীসিংহকে আবার দেশের শাসনকর্তার ন্যায় আসিতে দেখিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধ ও শঙ্কিত হইল। প্যাটারসন্ দেবীসিংহকে ঐরূপভাবে থাকিতে দেখিয়া এবং প্রজাদিগের মনে ভীতির সঞ্চার বুঝিতে পারিয়া কলিকাতা কাউন্সিলে লিখিয়া পাঠাইলেন। কাউন্সিলের সভ্যগণ বিষম সমস্যায় পড়িলেন। তাঁহারা একেবারে দেবীসিংহকে বিনা প্রহরীতে রাখা সঙ্গত মনে করিলেন না, অথচ অপরাধীর ন্যায় প্রহরী নিযুক্ত করিলেও সাধারণ লোকে তাঁহার অবমাননা করা হইয়াছে মনে করিবে; এই সমস্যার সিদ্ধান্তের জন্য তাঁহারা দেবীসিংহকে প্রহরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতে আদেশ দিলেন বটে, কিন্তু তাহাদের বন্দুক ও বেয়নেট নিম্নাভিমুখে রাখিবার আজ্ঞা প্রদান করিয়া পাঠাইলেন। তাহার পর কমিশনারগণ প্যাটারসন্‌কে আপনাদের নিকট হইতে দূরে থাকিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু দেবীসিংহকে সর্বদা আপনাদিগের মধ্যে রাখিয়া অনুসন্ধান চালাইতে লাগিলেন। এই অনুসন্ধানের ফলে যাহা হইবার তাহাই হইল। দেবীসিংহ দেওয়ানী আদালতে অভিযুক্ত না হইয়া, ফৌজদারী বিচারালয়ে সমর্পিত হইলেন।

এই সময়ে মহম্মদ রেজা খাঁ ফৌজদারী আদালতের বিচারক ছিলেন। তাঁহারই প্রতি দেবীসিংহের বিচারের ভার পতিত হয়। মহম্মদ রেজা খাঁর সহিত দেবীসিংহের কিরূপ বাধ্যবাধকতা ছিল, তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে; সুতরাং তাঁহার বিচারে দেবীসিংহ অপরাধমুক্ত হইয়া নিষ্কৃতি পাইলেন। কোম্পানীর রাজত্বে লোকে সুবিচার দেখিয়া অবাক্ হইল। নরহন্তা পরস্বাপহারক শয়তান মুক্তি পাইল। ন্যায় ও ধর্ম মলিন-মুখে বঙ্গভূমি হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন! উক্ত কমিশনের ফলে দেবীসিংহ নিষ্কৃতি পাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার দেওয়ান হররাম একেবারে নিষ্কৃতি পায় নাই। তাহার প্রতি এক বৎসরের কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা দিয়া, রঙ্গপুর ও দিনাজপুর প্রদেশ হইতে তাহাকে বহিষ্কৃত করা হয়।

কমিশনারদের তদন্তে কতকগুলি নিরীহ প্রজাও বিদ্রোহী হইয়াছিল বলিয়া নির্বাসিত হয়। দেবীসিংহ ও হররাম যে সমস্ত জমিদারী নীলাম করাইয়া আপনারা কিনিয়া লইয়াছিলেন, তৎসমুদায়ের কতক কতক প্রত্যর্পণ করা হয়। হররাম যাহাদিগকে শারীরিক যন্ত্রণা দিয়া অর্থ আদায় করিয়াছিল, তাহাদিগকে কিছু কিছু অর্থ প্রদান করা হয়।

দশসালা বন্দোবস্তের সময় আরও অনেক রহস্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে। দশসালা বন্দোবস্তের বিবরণে দেখা যায় যে, দেবীসিংহের দেওয়ান (সম্ভবতঃ হররাম) টেপার চৌধুরাণীদের বাটীতে স্ত্রী-পদাতিক পাঠাইয়া বলপূর্বক রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া লয়।[১২] এইরূপ অনেক অত্যাচার প্রকাশ পাইয়াছিল।

দেবীসিংহ যেরূপ লোমহর্ষণ অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র দণ্ড হয় নাই। তিনি যে অপরিমিত সম্পত্তি উপার্জন করিয়াছিলেন, দরিদ্র প্রজাদিগের সর্বস্ব অপহরণ করিয়া যে পুঞ্জীকৃত অর্থরাশিতে আপনার ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছিলেন, তাহারই কিছু কিছু ব্যয় হইয়াছিল মাত্র। কোম্পানীর কর্মচারীদিগকে বশীভূত করিবার জন্য তাঁহাকে কিঞ্চিন্মাত্র অর্থ ব্যয় করিতে হয় বটে, তথাপি অবশিষ্ট যে সমস্ত সম্পত্তি ছিল, তাহাতেই তিনি তৎকালে সম্পত্তিশালী লোকদিগের মধ্যে গণনীয় হইয়া অবশেষে রাজোপাধিতে ভূষিত হন।[১৩] কোম্পানীর বিচারে তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু যাঁহার সর্বদর্শী চক্ষুর সমক্ষে একটি সামান্য তৃণও উপেক্ষিত হয় না, তাঁহার বিচারে যে তিনি অব্যাহতি পান নাই, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারা যায়।

যৎকালে দেবীসিংহের বিচার শেষ হয়, তাহার পূর্ব হইতে লর্ড কর্নওয়ালিসের রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছিলেন। দেবীসিংহ নিষ্কৃতি পাইয়া, কোম্পানীর আর কোন কার্যে নিযুক্ত হন নাই; অন্ততঃ কর্নওয়ালিসের সময় তাঁহার সে আশাও ছিল না। তিনি যে বিপুল অর্থ ও জমিদারী প্রভৃতি হস্তগত করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার শেষ জীবন অতিবাহিত হয়। মুর্শিদাবাদের নশীপুর তাঁহার বাসস্থান ছিল; তথায় তিনি জীবনের শেষ ভাগ যাপন করেন। ১৮০৫ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণ নশীপুরে অবস্থিত করিতেছেন।

দেবীসিংহের দুই পত্নী ছিলেন: জ্যেষ্ঠার নাম মনঃকিশোরী ও কনিষ্ঠার নাম কৃষ্ণা। উভয়েই নিঃসন্তান হওয়ায়, দেবীসিংহ স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাহাদুরসিংহের দ্বিতীয় পুত্র বলবন্তসিংহকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। বলবন্তসিংহের পুত্র গোপালসিংহ হইতে দেবীসিংহের বংশধারা অনন্ত কালসাগরে মিশিয়া যায়। এক্ষণে বাহাদুর-সিংহের বংশীয়েরা তাঁহার জমিদারীর অধিকারী। বাহাদুরসিংহের তৃতীয় পুত্র রাজা উদবন্তসিংহ দেবীসিংহের কলঙ্ক মোচন করিয়া, দেশমধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া-ছিলেন। তাঁহার জমিদারীর অধিকাংশ আয়ই দেবতা, ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদিগের জন্য

১২ Glazier's Report on Rungpore, p. 22.

১৩ কিন্তু বোর্ড অব রেভিনিউতে প্রেরিত মুর্শিদাবাদের কালেক্টরের ১৮০৫ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখের পত্রে তাঁহাকে মহারাজ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে দেখা যায়। Hunter's Bengal Records, Vol. IV, p. 228.

প্রতিনিয়ত ব্যয়িত হইত। জমিদারীর অনেক স্থলে, তিনি দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সুবন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। নশীপুর রাজবংশে তাঁহার ন্যায় উচ্চহৃদয় আর কেহ কখন জন্মগ্রহণ করেন নাই। রাজা উদ্বন্তসিংহ কিছুদিন মুর্শিদাবাদের নবাব-নাজিমের দেওয়ানী করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা অত্যল্প দিন মাত্র। তাঁহার সাধুতায় সকলে সবিশেষ প্রীত ছিলেন। নশীপুরের স্বর্গগত রাজা রণজিৎ সিংহ বাহাদুর, বাহাদুর-সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র হনুমন্তসিংহের জ্যেষ্ঠ পৌত্র রাজা কীরিতচাঁদসিংহের দত্তক পুত্র। রাজা উদ্বন্তসিংহ যে সমস্ত দেবালয়াদির প্রতিষ্ঠা করিয়া যান, রাজা রণজিৎসিংহ সে সমস্ত রক্ষা করিয়া সাধুতার পরিচয় দিয়াছেন। অত্যন্ত কার্যপটু বলিয়া তাঁহার প্রশংসা ছিল। গবর্নমেণ্ট-কর্তৃক তিনি রাজা বাহাদুর, পরে মহারাজ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। এবং তাঁহার বংশধরগণ বংশ-পরম্পরাক্রমে রাজা বাহাদুর উপাধি পাইবেন এইরূপ স্থির হয়। তিনি বঙ্গীয় ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় আসীন হইয়া দেশহিতার্থে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। দেশের কল্যাণের জন্য তিনি সর্বদা তৎপর ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার পুত্র ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ নশীপুরের রাজা বাহাদুর। ভগবান্ তাঁহাকে তাঁহার পিতার ন্যায় সাধুকার্যে নিয়োজিত করিয়া, দেশের ও তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করুন।

ব্যারা[১]

ভাদ্রমাস, ভাগীরথী কূলে কূলে পুরিয়াছেন, অনন্তপ্রবাহ সলিলরাশি তটে প্রতিহত হইয়া বেগে—সুবেগে—অতি বেগে—সেই বিরাট সাগর হৃদয়ে আত্মবিসর্জনের জন্য ছুটিয়াছে। দিগন্তপ্রসারিত নীলাকাশ, নিবিড় মেঘমালায় সমাবৃত হইয়া, বিষাদাচ্ছন্নের হাস্যের ন্যায় ক্ষীণ বিদ্যুল্লতার আলোকে মধ্যে মধ্যে আপনার অস্তিত্ব দেখাইতেছে। রাত্রিকাল, নৈশ অন্ধকারে পৃথিবী ঢাকিয়া ফেলিয়াছে, রজনী জ্যোৎস্নাশালিনী হইলেও মেঘাবরণে তাহা অন্ধকারময়ী। চতুর্দিক নীরব,—কেবল তটাভিঘাতিনী ভাগীরথীর জলোচ্ছ্বাস ও তটপতনশব্দ মধ্যে মধ্যে গভীর নৈশ নীরবতা ভঙ্গ করিতেছে।

এইরূপ রজনীযোগে, ভাদ্রমাসের শেষ বৃহস্পতিবারে মুর্শিদাবাদের প্রান্তবাহিনী ভাগীরথীবক্ষে এক অপূর্ব আলোক দৃশ্য নয়নপথে নিপতিত হয়। নিবিড় অন্ধকার-রাশিকে দূরদূরান্তরে বিক্ষিপ্ত করিয়া সেই সঞ্চারিণী আলোকমালা ভাগীরথীহৃদয় প্রতিফলিত করিতে করিতে, তরঙ্গে তরঙ্গে প্রতিহত হইয়া যখন গমন করিতে থাকে, তখন সে দৃশ্য বড়ই সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। শতহস্তপরিমিত আলোকযান অসংখ্য আলোকমালায় বিভূষিত হইয়া ভাসমান, চতুর্দিকে ক্ষুদ্রাকারের সেইরূপ যান, ও শত শত 'কমল'[২] প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় হাসিতে হাসিতে ভাসিতে থাকে। তাহাদিগকে দেখিলে মনে হয় যেন, নীলাকাশস্থ সমস্ত তারকারাজি বিরাট্ অনন্তরাজ্য হইতে আত্মবিসর্জন করিয়া ভাগীরথীবক্ষে পতিত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদের সৌধাবলী সেই আলোকমালায় পূর্ব গৌরবের ক্ষণস্মৃতির ন্যায় নিমেষের জন্য হাসিয়া, আবার অন্ধকারে আপনাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, ভাগীরথীবক্ষঃস্থিত তরণীনিচয় তাহাতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তরণী ও তীরস্থিত সহস্র সহস্র দর্শকের নয়ন-গোলক প্রতিবিম্বিত করিয়া, আপনাদিগের ছটা ছুটাইতে ছুটাইতে তাহারা ভাসিয়া চলিয়া যায়। জাহ্নবীসলিলরাশি জ্যোতির্লহরীতে প্রতিফলিত হইয়া বোধ হইতে থাকে, যেন নদীগর্ভে আলোকের তরঙ্গ ছুটাছুটি করিতেছে। মধ্যে মধ্যে আলোকযান হইতে এক এক প্রকারের আতসবাজী সহসা প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। কেহ বা মনস্তাপে ভাগীরথীগর্ভে প্রবেশ করে, কেহ বা অনন্ত স্পর্শ করিবার আশায় নৈশান্ধকারস্তূপ ভেদ করিয়া উঠিতে উঠিতে না জানি কি মর্মবেদনায় ফাটিয়া পড়ে; কেহ বা শত শত আলোকের ফুল ফুটাইয়া চতুর্দিকে ভাসমান কমলরাশিকে উপহাস করিতে থাকে। এই সময় তীর হইতেও নানাবিধ আতসবাজী তাহাদের সহিত প্রতি-

---

১ মুর্শিদাবাদের একটি প্রধান পর্ব। ইহার প্রকৃত নাম বেরা; কিন্তু সাধারণতঃ ইহা 'ব্যারা' বলিয়া অভিহিত হওয়ায়, আমরা এই প্রবন্ধে সেই নামই নির্দেশ করিলাম।

২ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজ্বালিত কর্পূরপূর্ণ মৃৎপাত্রকে 'কমল' বলিয়া থাকে।

দ্বন্দ্বিতায় প্রবৃত্ত হয়। তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও ভীষণ শব্দ নিবিড় মেঘাবৃত অম্বরের অনুহুঙ্কার করিয়া দর্শকবৃন্দকে চমকিত করিয়া তুলে। ভাসমান আলোকযান হইতে সুমধুর বাদ্যধ্বনি ভাগীরথীর জলোচ্ছ্বাসের সহিত মিশিয়া নীরব দিগন্তে ছড়াইয়া পড়ে।

এই আলোকোৎসব দেখিবার জন্য মুর্শিদাবাদে সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হয়। অনেক সুসজ্জিত তরণী ভাগীরথীবক্ষে ক্রীড়া করিতে থাকে। বাতায়ন হইতে পুরসুন্দরীগণ সেই জ্যোতির্লীলা দেখিতে থাকেন। মহাকবি কালিদাস বিলোলনেত্র-ভ্রমরালঙ্কৃত যে রমণীবদন-সরোজের বর্ণনা করিয়াছেন, এই সময়েই তাহা সুন্দররূপেই প্রতীত হয়। অন্ধকারময়ী রজনীতে এইরূপ আলোকোৎসব যে কত মনোরম, তাহা না দেখিলে বুঝা যায় না।

এই আলোকোৎসবের সাধারণ নান 'ব্যারা'। ব্যারা প্রতি বৎসর ভাদ্রমাসের শেষ বৃহস্পতিবারে সম্পন্ন হয়। খাজা খেজেরের স্মরণোদ্দেশে এই পর্বের অনুষ্ঠান। জ্ঞানী ইলায়াসকে[৩] মুসলমানেরা খেজের বলিয়া নির্দেশ করেন। খেজেরের উৎসবোপলক্ষে নদীবক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণী ভাসাইবার রীতি থাকায় ভাগীরথীবক্ষে এইরূপ আলোকযান ভাসাইয়া দেওয়া হয়। অনেক স্থল হইতে বহুসংখ্যক কদলীবৃক্ষ ও বংশ আনীত হইয়া আলোকযান প্রস্তুত হইয়া থাকে। যখন এই উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত, তখন উক্ত যানের পরিমাণ দৈর্ঘ্যে ৩০০ হস্ত ও প্রস্তে ১৫০ হস্ত ছিল। বর্তমান সময়ে দৈর্ঘ্যে ৮০ হস্ত ও প্রস্থে ৫০।৬০ হস্তমাত্র হয়। কদলীবৃক্ষ সকল জলে ভাসাইয়া, তদুপরি বংশের দ্বারা নানাবিধ গৃহ, দ্বিতল, ত্রিতল অট্টালিকা, রণতরী প্রভৃতি নির্মিত এবং নানা বর্ণের কাগজদ্বারা মণ্ডিত করিয়া, অগণ্য আলোক প্রজ্বালিত করা হয়। মুর্শিদাবাদের উত্তরাংশে জাফরাগঞ্জে উক্ত আলোকযান নির্মিত হইয়া থাকে। রাত্রি হইলে, মতিমহালদেউড়ী হইতে এক বৃহৎ জৌলুষ জাফরাগঞ্জাভিমুখে অগ্রসর হয়। সুসজ্জিত হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, অশ্বারোহী ও পদাতিকগণ সেই জৌলুষের সহিত গমন করে। স্বর্ণরৌপ্যমণ্ডিত নানাবিধ যান ধীরে ধীরে চলিতে থাকে; নিজামতের সুমধুর ব্যাণ্ড গুরুগম্ভীর রবে বাদ্য করিতে করিতে জৌলুষকে গাম্ভীর্যময় করিয়া তুলে; নবাববংশীয়গণ বহুমূল্য পরিচ্ছেদে ও মণিমাণিক্যখচিত অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া, তাহার শোভা বর্ধন করিতে থাকেন। মুর্শিদাবাদের ন্যায় এমন সমারোহপূর্ণ জৌলুষ বাঙ্গলায় কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

মুর্শিদাবাদের জৌলুষ এখনও ইহাকে বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যায় রাজধানী বলিয়া স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু ক্রমে সমস্তই মন্দীভূত হইতেছে। জৌলুষ ক্রমে ক্রমে আলোকযানের নিকটস্থ হইলে, ব্যাণ্ড ও কতিপয় সুসজ্জিত সিপাহী আলোকযানে আরোহণ করে। খেজেরের উদ্দেশে রুটি, ক্ষীর, পান ইত্যাদিও একটি প্রদীপ যানের

৩ ইলাইজা (Elijah), ইলায়াস (Elias)।

মধ্যস্থলে স্থাপিত করা হয়। পূর্বে সোনার প্রদীপ দেওয়া হইত। পরে সেই অগণ্য আলোকপূর্ণ যান ধীরে ধীরে ভাসিতে আরম্ভ করে। যানের অগ্র পশ্চাৎ অসংখ্য কর্পূরপূর্ণ মৃৎপাত্র প্রজ্বালিত করিয়া ভাসাইয়া দেয়। এই সময়ে অন্যান্য লোকেও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোকযান ভাসমান করে। চারিদিকে আলোক-পারিষদ লইয়া সেই সুবৃহৎ আলোকযান নিজামত ব্যাণ্ডের সুমধুর বাদ্যের সহিত অগ্রসর হইতে থাকে। কিয়দ্দূর গমন করিলে, তীর হইতে আতসবাজী আরম্ভ হয়।

পূর্বে আতসবাজীর অত্যন্ত ধূম ছিল। মুর্শিদাবাদের পশ্চিমতীরে রোশনীবাগ নামক স্থানে সুবৃহৎ আলোকগৃহ নির্মিত হইত। বংশনির্মিত ত্রিতল গৃহ নানাবিধ কাগজে মণ্ডিত হইয়া, শত শত প্রজ্বালিত দীপ ধারণ করিয়া, পরপারস্থ সহস্রদ্বার ভবনকে উপহাস করিয়া উঠিত। তাহার প্রতিবিম্ব ভাগীরথীবক্ষে পতিত হইলে বোধ হইত, যেন তাহার গর্ভ হইতে একটি উজ্জ্বল আলোকগৃহ ভাসিয়া উঠিতেছে। এই সময়ে নানাবিধ আতসবাজীর দ্বারা সাধারণের মনোরঞ্জন করা হইত। এক্ষণে আর সেরূপ আলোকগৃহ নির্মিত হয় না এবং আতসবাজীর ধূমও অনেক পরিমাণে লঘু হইয়াছে। এইরূপে ভাগীরথীর বক্ষে ও তীরে সর্বত্রই আলোকের সুন্দর দৃশ্য দর্শকগণের তৃপ্তি সম্পাদন করিত।

ভাদ্রমাসের মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকারময়ী রজনীতে এইরূপ আলোকের খেলা বাস্তবিক দেখিবার বিষয়। ভাগীরথী আপন হৃদয়ে আলোকের মালা পরিয়াছেন। তীর হইতে অসংখ্য দীপশিখা ও আতসবাজী নৈশ অন্ধকাররাশির মধ্যে হাসিয়া উঠিতেছে। দেখিলেই মনোমধ্যে আনন্দের উদয় হয়। বহুদূর ব্যাপিয়া আলোক—আলোক—কেবলই আলোক। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকে আলোকতরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে! সমগ্র ভাগীরথীর সলিল-তরঙ্গ যেন আলোক-তরঙ্গে পরিণত হইয়াছে! যেন একটি বিশাল আলোক-প্রবাহ অনন্তজ্যোতিঃসাগরে মিশিবার জন্য অবিরাম-গতিতে ছুটিয়া যাইতেছে।

এই উৎসবের দিন পূর্বে নবাবপ্রাসাদের এক বিরাট দরবারের অধিবেশন হইত। দেশীয় ও ইউরোপীয় সম্ভ্রান্ত জনগণ সেই দরবারে সমাগত হইতেন। বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব-নাজিম সুচারু পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া মসনদে উপবেশন করিলে, নিম্নে ইউরোপীয় ও দেশীয়গণ যথানিয়মে নজর প্রদান করিয়া, আপন আপন নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিতেন। সুকণ্ঠী গায়িকার মধুর সঙ্গীত দরবারস্থ সম্ভ্রান্ত লোকদিগের তৃপ্তি সম্পাদন করিত। সহস্রদ্বার ভবনের গোলগৃহে এই দরবারের নির্দিষ্ট স্থান ছিল। এক শত দশ শাখাযুক্ত একটি প্রকাণ্ড কাচের ঝাড় প্রজ্বালিত হইয়া, দরবারগৃহ আলোকময় করিয়া তুলিত। দরবারশেষে মাননীয় ব্যক্তিগণ এক একগাছি বাদলার মালা [৪] উপহার গ্রহণ করিয়া আসন পরিত্যাগ করিতেন। এই

[৪] সাচ্চা গোটানির্মিত মালাবিশেষ।

উৎসবে মুর্শিদাবাদস্থ শ্বেত প্রভুগণের অতি সমাদরে ভোজনক্রিয়া নির্বাহের কথা শুনা যায়। ঘন ঘন তোপধ্বনি উৎসবের গাম্ভীর্য বৃদ্ধি করিত।

এক্ষণে দরবারাদি আর কিছুই হয় না। যে দিন হইতে বাঙ্গলার শেষ নবাব-নাজিম ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের নিকট আপনার উপাধি বিক্রয় করিয়াছেন, সেই দিন হইতে মুর্শিদাবাদের শেষ গৌরবও বিলুপ্ত হইয়াছে। নবাব-নাজিমের মাতা রেইসউন্নেসা বেগমের একখানি স্বতন্ত্র ব্যারার বন্দোবস্ত ছিল; তাঁহার মৃত্যুর পর তাহারও শেষ হইয়াছে। বাঙ্গলার শেষ নবাব-নাজিমের সহিত মুর্শিদাবাদের দুই একটি উৎসবও লয় পাইয়াছে।

'নাওয়াড়া' নামে আর একটি সমারোহপূর্ণ উৎসবের উল্লেখ দেখা যায়। সিরাজউদ্দৌলা ইহার প্রবর্তক বলিয়া কথিত। এক্ষণে তাহার চিহ্নমাত্রও নাই। বর্ষার প্রারম্ভে নিজামতের নানা প্রকারের যাবতীয় নৌকা সংস্কৃত ও সুসজ্জিত করা হইত। ব্যারার পূর্ব বৃহস্পতিবার অপরাহ্নকালে সমুদায় সুসজ্জিত নৌকা একস্থলে সমবেত করার প্রথা ছিল। কর্ণধার ও নাবিকগণ সুরঞ্জিত পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া, নৌকাচালনার জন্য প্রস্তুত থাকিত। এই সময়েও সেই সুসজ্জিত তরণীবক্ষে দরবার বসিবার কথা শুনা যায়। দেবীচৌধুরাণীর বজরাস্থ দরবারের কথা অনেকের স্মরণ থাকিতে পারে।[৫] বাস্তবিকই পূর্বে মুর্শিদাবাদে নৌকাবক্ষে এইরূপ দরবারের অধিবেশন হইত। গাঁড়ামর্দন, হাতীমর্দন, রংমহাল, ময়ূরপঙ্খী, মৎস্যমুখী, মকরমুখী, হংসমুখী প্রভৃতি অনেক প্রকার সুন্দর সুসজ্জিত তরণী এই উৎসবের সময় ভাগীরথীকে শোভাশালিনী করিয়া তুলিত। একখানি সুবৃহৎ তরণীর চতুষ্পার্শ্বে অন্যান্য যাবতীয় তরণী মিলিত হইয়া, ভাগীরথীবক্ষে ভাসমান হইত। বৃহৎ তরণীতে দরবার বসিত, দরবারের সম্মুখে গায়িকাগণের সুস্বর সুদূর অম্বরপথ স্পর্শ করিবার নিমিত্ত ক্রমশঃ উত্থিত হইত। তরণী ভাসমান হইবার পূর্বে, অসংখ্য কদম্বপুষ্পের মালা ভাগীরথী হৃদয়ে ভাসাইয়া দেওয়ার রীতি ছিল। নীল মেঘের ছায়া ভাগীরথীকে নীলিমাময়ী করিয়াছে, সেই সময়ে কদম্বমালায় বিভূষিত হইয়া তিনি যমুনা বলিয়া ভ্রমোৎপাদন করিতেন। নাওয়াড়া উৎসব এক্ষণে আর সম্পন্ন হয় না।

ব্যারাপর্বের উৎপত্তি লইয়া মতভেদ দৃষ্ট হয়। বাবু ভোলানাথ চন্দ্র বলেন যে, বাঙ্গলার কোনও প্রাচীন রাজা সলিল-সমাধি হইতে রক্ষা পাওয়ায়, তাঁহার স্মরণোদ্দেশে এই উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। রাজার নৌকা জলমগ্ন হওয়ায়, তিনি সলিলগর্ভে প্রবেশের উপক্রম করেন। কোন্ স্থানে তিনি নিমগ্ন হইতেছিলেন, তাঁহার অনুচরেরা অন্ধকারে জানিতে পারে নাই, এমন সময়ে কতিপয় সুন্দরী রমণী নারিকেলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা পুষ্পমালায় সুসজ্জিত করিয়া, এক একটি প্রজ্বালিত প্রদীপের সহিত যুগপৎ জলে ভাসাইয়া দেওয়ায়, তাহাদের আলোকে রাজানুচরগণ রাজাকে দেখিতে পায়;

৫ বঙ্কিমচন্দ্র অনেক দিন মুর্শিদাবাদে ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি নাওয়াড়া-দরবার স্মরণ করিয়া, দেবীর বজরাস্থ দরবারের কথা লিখিয়া থাকিবেন।

পরে তাঁহার উদ্ধারসাধন করে।[৬] ইহা কেবল কাহিনীমাত্র, বিশেষ কোন প্রমাণ না থাকায় বিশ্বাস করা যায় না।

মুসলমানগণ বলিয়া থাকেন যে, জ্ঞানী খেজেরের উদ্দেশেই এই পর্বের অনুষ্ঠান। খেজের জীবন-নির্ঝর[৭] আবিষ্কার করিয়া নিজেই তাহা পান করায় অমরতা লাভ করেন। সেইজন্য তাঁহার 'চিরযৌবনাবস্থা' হইতে তাঁহার নাম খেজের[৮] হইয়াছে।

খেজেরের বিবরণ মুসলমানশাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে। একদিন মূসা ধর্মপ্রচার করিতেছিলেন। লোকে তাঁহার প্রচারে সন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করে যে, তাঁহার অপেক্ষা জ্ঞানী ব্যক্তি জগতে আছে কি না? তাহাতে মূসা, কেহ নাই বলিয়া উত্তর করেন। এই সময়ে ঈশ্বর তাঁহাকে প্রত্যাদেশ অবগত করান যে, আল খেজের তাঁহা অপেক্ষা জ্ঞানী। যেখানে দুই সমুদ্রের মিলন হইয়াছে, সেই খানের কোন পর্বতে তাঁহার স্থান। যেখানে মূসার পাত্র হইতে একটি মৎস্য জলে পতিত হইবে, সেই খানে খেজেরের সাক্ষাৎলাভ হইবে। মুসার অনুচর জসুয়া জীবন-নির্ঝরে মৎস্য ধৌত করিতে গেলে মৎস্য জলে পড়িয়া যায়। মূসা তাহা জানিতে পারিয়া, সেইখানেই খেজেরের সাক্ষাৎ লাভ করেন।[৯] জীবন-নির্ঝরের প্রভু বলিয়া মুসলমানগণ খেজেরের উদ্দেশে এই উৎসব করিয়া থাকেন।

খেজেরকে মুসলমানেরা ফিনিয়াস, ইলায়াস ও সেণ্টজর্জ বলিয়া অনেক সময়ে গোলযোগ করেন।[১০] তাঁহারা বলেন যে, খেজেরের আত্মা ক্রমান্বয়ে উক্ত তিন জনের দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। কেহ কেহ[১১] বলিয়া থাকেন যে, তাঁহার প্রকৃত নাম বাল্য আবু মলকান। তিনি পারস্যের প্রাচীন রাজা আফ্রিদুনের সময় আবির্ভূত হন।[১২] সাধারণতঃ খেজেরকে ইলায়াস বলিয়া নির্দেশ করা যায়।[১৩] খেজের যেরূপে জীবন-নির্ঝর পান করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত, ইলায়াসও সেইরূপ ঈশ্বরের আদেশে চেরিখ নামক নদী পান করিয়াছিলেন বলিয়া বাইবেলে লিখিত আছে।[১৪]

৬ Travels of a Hindoo, Vol. I, p. 82.

৭ Fountain of Life.

৮ Khaja Khizir literally means Green Lord.

৯ Moses. য়িহুদিদিগের বিধানকর্তা।

১০ Sale's Al Koran, pp. 222-223.

১১ Professor Garcin de Sassy ইহাই বলেন। Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol. IX, p. 70. Also Sale's Al Koran, p. 223. ফিনিয়াস মূসার ভ্রাতা হারুণের পুত্র। সেণ্টজর্জ ইংলণ্ডের রক্ষক বলিয়া কথিত।

১২ Sale's Koran, p. 223.

১৩ Smith's Dictionary of the Bible, p. 532.

১৪ "And it shall be that thou shalt drink of the brook" (Old Testament I Kings XVII. 4-7)

ইলায়াস বাতাবর্তে[১৫] স্বর্গে নীত হন। স্বর্গে নীত হইবার পূর্বে তিনি স্বীয় পরিচ্ছদের দ্বারা জর্ডন নদীতে আঘাত করিলে, নদীর জল বিভক্ত হইয়া যায় এবং তিনি তাঁহার শিষ্য ইলাইসা নদীগর্ভে প্রবেশ করেন। এই সময়ে অগ্নিময় রথ উপস্থিত হওয়ায় ইলায়াস, ইলাইসা হইতে পৃথক হইয়া পড়েন, পরে বাতাবর্তে স্বর্গে নীত হন।[১৬] সম্ভবতঃ জর্ডনগর্ভে প্রবেশকালে অগ্নিময় রথের আগমন স্মরণ করিয়া এইরূপ আলোকোৎসব হইয়া থাকিবে। গ্রীক ও লাটিন চার্চে ২০এ জুলাই ইলায়াসের স্বর্গারোহণের দিন বলিয়া উৎসব হয়।[১৭] কিন্তু ব্যারা পর্ব ভাদ্রমাসের শেষ বৃহস্পতিবারে হইয়া থাকে।

যতদিন হইতে মুর্শিদাবাদের প্রতিষ্ঠা, ততদিন হইতে এই আলোকোৎসব চলিয়া আসিতেছে। বাবু ভোলানাথচন্দ্র ভ্রমক্রমে লিখিয়াছেন যে, সিরাজউদ্দৌলা ইহার প্রবর্তনা করেন।[১৮] কিন্তু প্রচলিত ইতিহাসে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর সময় হইতে ইহার অনুষ্ঠানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যে সময়ে ঢাকায় রাজধানী ছিল, সে সময়েও তথায় ব্যারা পর্ব সম্পন্ন হইত। নবাব মকরম খাঁ ঢাকায় ইহার প্রবর্তন করেন বলিয়া কথিত আছে।[১৯] পূর্বে ইহা মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত, এক্ষণে ক্রমেই মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে। বাস্তবিক আলোকোৎসব এক্ষণে মুর্শিদাবাদের পক্ষে উপযোগী নহে। চিরান্ধকারে অবস্থান করিবার জন্য যাহার নিয়তি, আলোকোৎসব তাহার পক্ষে কখনও শোভা পায় না। যাহার পূর্ব-গৌরব না জানি বিস্মৃতির কত গভীর গর্ভে বিলীন হইয়া রহিয়াছে, তাহার আবার উৎসব কি? বিশেষতঃ আলোকোৎসব। নিবিড় অন্ধকাররাশির বিভীষিকাময়ী ক্রীড়াই তাহার একমাত্র উপযোগী।

---

১৫ Whirl Wind.

১৬ Old Testament II Kings, II. 8-11.

১৭ Smith's Dictionary of the Bible, p. 532.

১৮ Travels of a Hindoo, Vol. p. 82.

১৯ Stewart's History of Bengal (2nd. Ed.), p. 150.

একদিনের স্মৃতি

বর্ষার জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে পবিত্রসলিলা ভাগীরথীর অপূর্ব শোভা কেহ দেখিয়াছেন কি ? সেই রজতবিনিন্দিত কৌমুদীরাশিতে স্নাত সলিল-প্রবাহের অতুল সৌন্দর্য কাহারও দৃষ্টিপথে পড়িয়াছে কি ? লাবণ্যে ঢল ঢল যৌবনের সর্বাঙ্গীণ স্ফূর্তির ন্যায় সেই জ্যোৎস্নামাখা আতটপরিপূর্ণা কান্তি কাহারও নয়নগোচর হইয়াছে কি ? মরি মরি সেই অতুলনীয় রূপ না জানি কতই সুন্দর ! কতই মধুর ! তাহার উপমা ত জগতে খুঁজিয়া পাই না। যে রূপের মোহকর ভাবে লীলাময়ী চঞ্চলা কল্পনা আপনিই ঘুমাইয়া পড়ে, কে তাহার তুলনা আনয়ন করিবে ? কল্পনা ব্যতীত কে আর তুলনা খুঁজিতে পারে ? নীল জলোচ্ছ্বাসে পূর্ণদেহা পুণ্যস্রোতস্বিনী স্থির অচঞ্চল ভাবে, মন্থর গতিতে, কেমন গমন করিতেছেন। বায়ুর প্রবল ভাব নাই, কাজেই তরঙ্গিণীহৃদয়ে সেরূপ তরঙ্গ উঠিতেছে না। বিশ্ব যেরূপ স্থির, ভাগীরথীও সেইরূপ শান্ত। কেবল অস্ফুট কলকলরব দূরাগত বীণাধ্বনির ন্যায় কর্ণে অমৃত ঢালিয়া দিতেছে। কবির কথায় যে অনন্ত সঙ্গীত গ্রহ-উপগ্রহ হইতে মানব-আত্মারও তারে তারে বাজিতেছে, সেই সঙ্গীতই যেন ভাগীরথীহৃদয় হইতে উঠিয়া আবার অনন্তে মিশিয়া যাইতেছে। নীলাকাশে বসিয়া চন্দ্রদেব হাসির লহর তুলিতেছেন, তাঁহার সেই মধুর হাস্যরাশি দিগ্‌দিগন্তে বিকীর্ণ হইতেছে, মাঝে মাঝে হাস্য সংবরণ করিতে না পারিয়া, দুই একখানি শাদা মেঘাবরণে মুখখানি ঢাকিতেছেন, আবার হাসিয়া আকুল হইতেছেন। আকাশের তারাগুলি চন্দ্রের হাসির ঘটা দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিয়াছে !

সে দিবস বিষাদ-উৎসব মহরম। যে চন্দ্রদেবকে মহম্মদীয়গণ অধিকতর সম্মান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের বিষাদ-উৎসবে চন্দ্রদেবের হাসি ভাল লাগিল না ; অথবা ভারতে তাঁহাদের বর্তমান অবস্থায় রণোন্মত্তের ন্যায় বেশ দেখিয়া, হয়ত তাঁহার মনে হাসির উদয় হইয়া থাকিবে। কত সাধের তরণী ভাগীরথীর স্থির হৃদয়ে আঘাত করিয়া চলিয়া যাইতেছে। আঘাতে আঘাতে ভাগীরথীবক্ষে শত শত মাণিক জ্বলিয়া উঠিতেছে। তাঁহার সেই শান্তভাব ঈষৎ উচ্ছ্বসিত হওয়ায় আরও মধুর বোধ হইতেছে। যেখানে আঘাত লাগিতেছে, সেইখানে যেন চন্দ্রদেব সুধা ঢালিয়া বেদনা দূর করিতেছেন। বর্ষার জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর শোভা বাস্তবিকই প্রীতিপ্রদ। এরূপ মধুর শোভা দেখিতে কাহার না ইচ্ছা হয় ? বিশেষতঃ তরণীবক্ষ হইতে সেই শোভা আরও মধুর বলিয়া বোধ হইয়া থাকে।

পূর্বেই বলিয়াছি, সে দিন বিষাদ-উৎসব মহরম। বিষাদ-উৎসব কথাটি কেমন কেমন বোধ হয়। কিন্তু আজকাল সর্বত্রই বিষাদ-উৎসব। যে কিছু উৎসব হইয়া থাকে, তাহাতেই বিষাদের মাখামাখি। মহরম-উপলক্ষে নূতন মুর্শিদাবাদ উৎসবময়। নূতন মুর্শিদাবাদ বলিলাম, কারণ পুরাতন মুর্শিদাবাদ এক্ষণে মরুভূমির ন্যায় ধূ ধূ করিতেছে,—বিস্মৃতির অতলগর্ভে তাহার অস্তিত্ব ডুবিয়া গিয়াছে। শত শত

দীপালোকে সজ্জিত হইয়া মুর্শিদাবাদ রমণীয় রূপ ধারণ করিয়াছে। তাহাদের প্রতিবিম্ব ভাগীরথীবক্ষে পতিত হইয়া, তাঁহার গর্ভেও যেন উৎসবের তরঙ্গ ছুটাইতেছে। চন্দ্রালোকে ও দীপালোকে মুর্শিদাবাদের প্রান্তবাহিনী ভাগীরথী যেন শত শত মাণিক্য-খচিত হইয়া ঐশ্বর্যময়ী কান্তিতে শোভা পাইতেছেন। সমগ্র নগরব্যাপী কোলাহল প্রতিনিয়ত আকাশপানে উত্থিত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে ক্রীড়া-বাদ্য ও বিষাদ-সঙ্গীত সেই কলধ্বনিকে মধুরতর করিয়া তুলিতেছে। বহুসংখ্যক তরণী সেই উৎসব দেখিবার জন্য নদীবক্ষে অবস্থিত। প্রায় প্রত্যেক গৃহ আলোকমালায় সুসজ্জিত হইয়া, জ্যোৎস্না-লোককে ম্লান করিতেছে। অনেক গৃহে কাগজ ও বস্ত্রনির্মিত তাজিয়া শোভা পাইতেছে।

নবাববংশীয়দিগের এমামবারায় উৎসবের ঘটা অধিক। যেমন দীপমালায় সুসজ্জিত, সেইরূপ লোকে পরিপূর্ণ। তাহার অদূরে সিরাজউদ্দৌলার মদীনা দুই একটি ক্ষীণালোক বক্ষে ধরিয়া আছে। এমামবারার সম্মুখে সহস্রদ্বার-প্রাসাদ চন্দ্রালোকে উজ্জ্বলতর হইয়া, ইংরেজরাজত্বের গৌরবচিহ্নের ন্যায় মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান। সহস্রদ্বার-ভবন ইংরেজরাজত্বের সময়ে নির্মিত হয় এবং তাহা তাঁহাদেরই সম্পত্তি। নবাববংশীয়েরা তথায় বাস করিতে পান মাত্র। তাই বলি, তাহা ইংরেজ-রাজত্বের গৌরবের পরিচায়কস্বরূপ। উৎসবময় মুর্শিদাবাদের চিত্র দেখিয়া, একবার ভাগীরথীর পরপারে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলাম। নিকটে, দূরে, বহুদূরে সকল দিকেই চাহিলাম,—দেখিলাম ঘন বৃক্ষরাজি তট আবৃত করিয়া রহিয়াছে। পশ্চিম তীরে আঁধার ভিন্ন কিছুই দেখিলাম না। নিবিড় বৃক্ষরাজির ভিতর দিয়া জ্যোৎস্নালোক প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। সে স্থানের ভাগীরথীও আঁধারে চলিয়াছেন। গাছের ছায়া বুকে করিয়া যেন কিছু অলক্ষিত ভাবে গমন করিতেছেন। পূর্ব পারের সহিত তুলনায় পশ্চিম তীর ভিন্নরূপ। এপার যেরূপ কোলাহলময়, ওপার সেইরূপই নীরব। এপার যেরূপ আলোকমালায় সুসজ্জিত, ওপার সেইরূপ আঁধারে বিজড়িত। এপারে যেরূপ বহুসংখ্যক গৃহ দীপালোকে বিভূষিত, ওপারে সেইরূপ নিবিড় বৃক্ষরাজি দণ্ডায়মান হইয়া চন্দ্রালোকের গতি রোধ করিতেছে। যেন তাহারা আলোক ভালবাসে না, আঁধারেই থাকিতে ইচ্ছা করিয়াছে। ফলতঃ পূর্ব পারের তুলনায় পশ্চিম পার আঁধারময়।

কিছু দূরে দেখিলাম, একস্থানে কতিপয় বৃক্ষ কাছাকাছি দাঁড়াইয়া আঁধারের ঘটা কিছু বৃদ্ধি করিয়াছে। তখন সেই স্থানের কথা মনে হইল; মনে হইল, সেখানে যাহা আছে, তাহাকে আঁধারে রাখিতে বৃক্ষদিগের ইচ্ছা হওয়া সম্ভব বটে। সেই বীরশ্রেষ্ঠ আলিবর্দী ও হতভাগ্য সিরাজের সমাধি আঁধারে ঢাকাই উচিত। বিস্মৃতি-গর্ভে সমাহিত সুখস্বপ্নের ন্যায় তাঁহাদের সমাধি ঘনান্ধকারে লুকাইবে না ত কিসে ঢাকিবে? ঐতিহাসিকগণের কৃষ্ণচিত্রে সিরাজ যেরূপ চিত্রিত হইয়াছে, তাহার সমাধিও বৃক্ষান্ধকারে ঢাকিবে বৈ কি, নহিলে সামঞ্জস্য হইবে কেন? যে আলিবর্দীর বিশ্বত্রাস

প্রতাপে দুর্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়গণ বারংবার বঙ্গভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল ; বাঙ্গলার প্রজাগণ অত্যাচারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া যাঁহাকে লক্ষ লক্ষ আশীর্বাদ করিয়াছিল ; যাঁহার ন্যায়ানুমোদিত শাসনে বাঙ্গলার ইতিহাস অলঙ্কৃত হইয়া রহিয়াছে ; তিনিও আজ আঁধারে খোশবাগের বৃক্ষচ্ছায়ায় চিরনিদ্রিত। দুই একখানি সামান্য প্রস্তর, তাঁহার সমাধির উপর স্থাপিত না হইলে কেহ তাঁহাকে জানিতে পারিত না। একটি সামান্য অক্ষর পর্যন্ত তাঁহার পরিচয় দিতেছে না। আর সিরাজ—আলিবর্দীর পরম আদরের ধন, হতভাগ্য সিরাজ, সে ত আঁধারে থাকিবার উপযুক্তই বটে। কে তাহাকে চিনিতে চায়, কে তাহাকে জানিতে চায় ? 'আঁধারের কীটাণুর' ন্যায় তাহার আঁধারে মিশিয়া থাকাই উচিত। তাহার সমাধি ভূমির সহিত মিশিয়া আছে। একখানি সামান্য প্রস্তর বা ইষ্টক পর্যন্ত নাই, যে তাহার পরিচয় দেয় ! নামাঙ্কনের কথা দূরে থাকুক, কেহ না বলিয়া দিলে, সহসা তাহার সমাধি চিনিতে পারা যায় না ! সহোদর ও প্রিয়তমা মহিষী লুৎফ উন্নেসার সহিত হতভাগ্য ভূগর্ভে শায়িত। মহম্মদী বেগের তরবারি-আঘাতে যে দেহ বিখণ্ডিত হইয়া মুর্শিদাবাদের পথে পথে ঘুরিয়াছিল, এতদিন হয়ত তাহা মাটি হইয়া গিয়াছে ! ইংরেজ কোম্পানীর কণ্টক এতদিনে ধূলারাশিতে পরিণত হইয়াছে !

যে রূপের মত রূপ তৎকালে সমস্ত বাঙ্গলায় ছিল না, সেই সৌন্দর্যরাশি পৃথিবীর অঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। তাহার প্রতি সহানুভূতি করিতে কেহ নাই,—তাহার হইয়া দুই এক কথা বলিতে কাহাকেও দেখিতে পাই না। কেই বা তাহার প্রতি করুণাপরবশ হইয়া দুইচারি বিন্দু অশ্রুবর্ষণ করিবে ? যদি তাহার জন্য কাহারও সামান্যমাত্র দয়ার উদ্রেক হইত, তাহা হইলে তাহার সমাধি এরূপ অজ্ঞাত অবস্থায় বৃক্ষান্ধকারে মিশিয়া থাকিত না। অনেক দিন পরে তাহার সংস্কার হইয়াছে সত্য, কিন্তু যাহাতে লোকে সিরাজের সমাধি বলিয়া চিনিতে পারে, তাহার ত' কোনই নিদর্শন দেখিলাম না। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ যেমন তাহাকে অপদার্থ বলিয়া কত ব্যাখা করিয়াছেন, তাহার সমাধিও সেইরূপ সাক্ষ্য দিতেছে। সিরাজ অকর্মণ্য হউক, নিষ্ঠুর হউক, অত্যাচারী হউক, কিন্তু যাহার নাম বাঙ্গলাদেশে,—বাঙ্গলায় কেন, ভারতবর্ষে ও ইউরোপে প্রবাদবাক্যের ন্যায় প্রচলিত, তাহার একটা সামান্য চিহ্ন থাকাও কি উচিত নহে ? যাহার সহিত ইংরেজরাজত্বের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহার পরিচয়ের কি আবশ্যক নাই ? তাহার সমাধি কি ভূমির সহিত মিশিয়া থাকিবে ? কাহাকেও তাহার সংবাদ লইতে দেখি না। বৎসর বৎসর ভাগীরথী সমাধির নিকটস্থ হইয়া থাকেন ; যেন তাহাদের সংবাদ লইতে তাঁহার ইচ্ছা হইয়া থাকে। একদিন তাঁহার তীরে যাহারা ক্রীড়া করিয়াছিল, যে আলিবর্দী ও সিরাজ এক সময়ে তাঁহার তীরে বিজয়নিশান উড়াইয়াছিল, আনন্দ-কোলাহলে তাঁহার তরঙ্গরাশিকে উচ্ছ্বসিত করিয়াছিল, তাহাদের সংবাদ জানিতে ইচ্ছা করিয়াই যেন কেবল তিনিই অগ্রসর হইয়া থাকেন। কলকলরবে সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া আবার দূরে প্রস্থান করেন। হতভাগ্য

সিরাজ কখনও মনে করে নাই যে, তাহার অনন্ত জীবন আঁধারেই পর্যবসিত হইবে। যাউক, আঁধারে থাকিবার জন্য যখন তাহার জন্ম, তখন তাহাকে আঁধারেই থাকিতে দেওয়া হউক।

একটি কথা মনে পড়িল,—ইংরেজ ঐতিহাসিকের চক্ষে সিরাজ ঘোর অত্যাচারী। কিন্তু তাহার এমন কোন কি গুণ ছিল না যে, তাহার উল্লেখ করিয়া হতভাগ্যের প্রতি সহানুভূতি দেখান যায়? অনেক দিন হইল, সিরাজের রাজত্বের অবসান হইয়াছে; তাহার পর কোম্পানীর রাজত্ব গিয়াছে। এক্ষণে আমরা যে রাজত্বে বাস করিতেছি তাহার তুলনা নাই; শান্তিময়ী সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ও তাঁহার উদারহৃদয় পুত্র রাজরাজেশ্বরের আশ্রয়চ্ছায়ায় অবস্থিতি করিয়া এক্ষণে আমরা তাঁহার শান্তিপ্রিয় পৌত্রের আশ্রিত। আমাদিগকে শান্তিময় রাজত্বে বাস করিতে দেখিয়া, পৃথিবীর কত লোক হিংসা করিয়া থাকে। কিন্তু এই শান্তিময় রাজত্বে বাস করিয়াও রাজ-পুরুষগণের অদূরদর্শিতায় শান্তিচ্ছায়ার মধ্যেও কখনও কখনও আতপতাপ অনুভব করিতে হয়। সিরাজের রাজত্বে যাহাই হউক না কেন, বাস্তবিক সেইরূপ অত্যাচারপূর্ণ না হইলেও অনেকের মনস্তুষ্টির জন্য স্বীকার করিলাম যে, তাহার রাজত্ব ঘোর উপদ্রবময় ছিল; কিন্তু তাহার রাজত্বে আমরা যাহা ভোগ করিয়াছি, এখন তাহা পাই না কেন? সহস্র অত্যাচারময় হইলেও, হতভাগ্য সিরাজকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা হয়। সিরাজ মুসলমান হইয়া কখনও হিন্দুর গুণ অস্বীকার করিত না। সিরাজ বলিয়া কেন, যে দাম্ভিক সম্রাট আরঙ্গজেবের মত হিন্দুবিদ্বেষী কেহ দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হন নাই, সেই আরঙ্গজেবই হিন্দুদিগকে উচ্চপদ প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। আর সিরাজ, তাঁহার সময়, দুর্লভরাম প্রধান মন্ত্রী, মোহনলাল সেনাপতি, জগৎশেঠ রাজস্ববিষয়ে সর্বেসর্বা, নন্দকুমার হুগলীর ফৌজদার, আর কত নাম করিব? ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সিরাজের প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসী ছিলেন। সিরাজ তাঁহাদের পরামর্শ লইয়া অনেক কার্য করিতেন।

তাই বলিতেছি, সিরাজের অশেষ দোষ থাকিলেও তাহার যে সামান্য গুণ ছিল, তাহাও কেন আমরা বিস্মৃত হই, বুঝিতে পারি না। পাপীর জন্য করুণাপ্রকাশই পুণ্যধর্ম। বিশেষতঃ তাহার অন্ধকারময় জীবনের মধ্যে যদি একটু সামান্য আলোকও দেখা যায়, তাহা হইলে সে আলোকটুকু স্বীকার করিয়া তাহার প্রতি সহানুভূতি দেখান কি উচিত নহে? হতভাগ্য সিরাজের হিন্দু-মুসলমানের প্রতি সমভাব স্মরণ করিয়া তাহার অন্ধকারময় জীবনের মধ্যে একটু আলোক দেখিতে পাইয়া, তাহার প্রতি করুণার উদ্রেক হয়। সিরাজের রাজত্বের সময় হিন্দু-মুসলমানের সমান আধিপত্য ছিল; কিন্তু আজিও আমাদের শাদাকাল ঘুচিল না! তাহার পর সে সময় হিন্দু-মুসলমানে এরূপ প্রতিনিয়ত বিবাদ হইত না। পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও স্নেহ প্রকাশ করিত। আর এক্ষণে তাহাদের মধ্যে যে ঘোর বিবাদ হইতেছে, তাহার কারণ কি করিয়া বুঝিব? রাজকর্মচারীকে বিবাদ মীমাংসা করিতে দেখি না।

এই যে অন্তর্বিবাদে আমাদের সর্বনাশ হইতেছে, প্রজাহিতৈষী রাজপ্রতিনিধিগণের তাহার প্রতি দৃষ্টি আছে কি ? যে সিরাজ ইংরেজ ঐতিহাসিকগণের মতে ভয়ানক অত্যাচারী বলিয়া কথিত, তাহারও হিন্দুর প্রতি অনুরাগ দেখিলে অবাক হইতে হয় ; সুতরাং তাহার সময়ে এরূপ অন্তর্বিবাদের সম্ভাবনা ছিল না। যাহা হউক, সিরাজের রাজত্বের ভাল মন্দ বলিবার আবশ্যক নাই ; তাহা যখন বিস্মৃতি-সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে, তখন আর সে কথা তুলিয়া কাজ নাই। তবে ইংরেজ ঐতিহাসিক-বর্ণিত অত্যাচারী সিরাজের রাজত্বে যে একটু আধটু আলোক ছিল, ইংরেজরাজত্ব সর্বাংশে সুখকর হইয়াও, তাহাতে সেটুকুর কেন অভাব হয়, বুঝিতে পারি না। তাই স্বতঃই মনে উক্ত প্রশ্নের উদয় হইয়া থাকে।

মহরম-উপলক্ষে মুর্শিদাবাদ উৎসবময়। ধরণীগর্ভস্থিত সিরাজ সে উৎসব দেখিতেছে না। জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর কৌমুদীস্নাত ভাগীরথীশোভা তাহার নয়নপথে পতিত হইতেছে না। কেবল চারিদিকে ঘনীভূত অন্ধকার তাহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আঁধার ভিন্ন আর কিছুই তাহার নিকটে নাই। তাহার সেই বিখণ্ডিত দেহের পরিণাম কি হইয়াছে, কি করিয়া বলিব ? তবে এতদিন যে মাটি হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার আত্মীয়স্বজন এমন কেহ নাই যে, তাহার জন্য দুই এক বিন্দু অশ্রু বিসর্জন করে। সকলেই একে একে অনন্তনিদ্রায় অভিভূত। খোশ্‌বাগের বৃক্ষান্ধকারে চিরদিনই তাহাকে অবস্থিতি করিতে হইবে। কেহ দেখিতে আসিবে না,—কেহ কাঁদিতে আসিবে না। কেবল ভাগীরথীর কলধ্বনি ও ভ্রান্ত বায়ুচ্ছ্বাসের হু হু রব ব্যতীত আর কোনও শব্দ তাহার নিকটে পঁহুছিবে কি না জানি না। আঁধারের জন্য যাহার জন্ম, তাহাকে অনন্ত জীবন আঁধারেই থাকিতে হইবে।

পরিশিষ্ট

শেঠ মাণিকচাঁদের ফার্মান

পরমেশ্বরের নাম

(লাল কালীতে)

(গোল মোহর)

ঈশ্বরের নাম

১১ পুত্র মীরণ শাহ

১২ পুত্র আমীর তৈমুর সাহেব কেরান

১ পুত্র শাহ আলম বাদশাহ

২ পুত্র আলমগীর বাদশাহ

৩ পুত্র শাহজাহান বাদশাহ

৪ পুত্র জাহাঙ্গীর বাদশাহ

৫ পুত্র আকবর বাদশাহ

৬ পুত্র হুমায়ুন বাদশাহ

৭ পুত্র বাবর বাদশাহ

৮ পুত্র ওমর সেখ শাহ

৯ পুত্র সুলতান আবু সৈয়দ শাহ

১০ পুত্র সুলতান মহম্মদ শাহ

১১২৫

মুহম্মদ ফারখ সাএর পুত্র আজিমুশ্বান, আবুল মজঃফর মইনুদ্দীন আলমগীর সানী বাদশাহগাজী সন আহদ।

(দস্তখত লাল কালীতে)

মহম্মদ মইনুদ্দীন
আলমগীর সানী
ফারখ সাএর
বাদশাহ গাজী
ফার্মান আবুল
মজঃফর।

এই জয় ও মঙ্গলযুক্ত সময়ে এই মহামান্য ও বিশ্বাসযোগ্য আদেশপত্র দ্বারা মাণিকচান্দ, এই চিরস্থায়ী রাজ্য হইতে মাণিকচান্দ শেঠ খেতাব প্রাপ্ত হইলেন। অধিকৃত রাজ্যের সমুদয় বর্তমান ও ভাবী হাকিম, আমলা ও মুৎসুদ্দী প্রভৃতির উচিত যে, তাঁহারা উল্লিখিত ব্যক্তিকে শেঠ লেখেন। ইহাতে বিশেষ যত্ন লওয়া আবশ্যক এবং হুজুর আলি হইতে তাগিদ জানেন। ইতি তারিখ ৮ জিলহজ্জ। তৃতীয় সন জলুস।

(পরপৃষ্ঠায় লেখা)

যিনি মহামান্য রাজ্যের ন্যাসাধারস্বরূপ, যিনি সাম্রাজ্যের বিশ্বসনীয়, সম্ভ্রান্তবংশীয়, উচ্চপদস্থ ও ক্ষমতাপন্ন, যিনি রাজ্যের ও ধনের সুবন্দোবস্তকারী, যিনি তরবারী ও লেখনী পরিচালনে সুনিপুণ, যিনি পতাকার উন্নয়নে সমর্থ, যিনি সুবন্দোবস্তকারী নিরপেক্ষ উজীর, যিনি সাম্রাজ্যের দুরূহ ব্যাপারের অবলম্বনস্বরূপ, যিনি উজীরগণের মধ্যে বিশ্বাসী ও বন্ধু, সেই এমিনুদ্দৌলা বাহাদুর জাফর জঙ্গ সেপাহ সালারের সেনানিবেশ বরাবরেষু।

(মোহর)

মহম্মদ ফারখ
সাএর বাদশাহ গাজী
খালা দুম্বাহ সেপাহ সালার,
ইয়ার বাওফা ফিদবী কুতবল
মুল্ক এমিনুদ্দৌলা সৈয়দ
আবদ খাঁ বাহাদুর জাফর জঙ্গ।

জগৎশেঠ মহাতপচাঁদের ফার্মান

পরমেশ্বরের নাম

(লাল কালীতে)

(গোল মোহর)

ঈশ্বরের নাম

১২	১৩	১
পুত্র	পুত্র	পুত্র
মীরণ	আমীর তৈমুর	জাহান
সাহ	সাহেব কেরান	শাহ

১১ পুত্র সুলতান মহম্মদ শাহ

১০ পুত্র সুলতান আবু সৈয়দ শাহ

৯ পুত্র উমর সেখ শাহ

আহম্মদ শাহ বাহাদুর, পুত্র মহম্মদ শাহ, আবুল নাসীর মজাহেদ্দীন, সাহেবে কেরান, সানী বাদশাহ গাজী সন এক।

২ পুত্র শাহ আলম বাদশাহ

৩ পুত্র আলমগীর বাদশাহ

৪ পুত্র শাজাহান বাদশাহ

৫ পুত্র জাহাঙ্গীর বাদশাহ

৬ পুত্র আকবর বাদশাহ

৭ পুত্র হুমায়ুন বাদশাহ

৮ পুত্র বাবর বাদশাহ

(দস্তখত লাল কালীতে)

আহম্মদ শাহ বাহাদুর পুত্র মহম্মদ শাহ মজাহেদ্দীন সাহেবে কেরান সানী বাদশাহ গাজী।

এই জয়যুক্ত (শুভ) ও আনন্দযুক্ত সময়ে এই চিরস্থায়ী সাম্রাজ্যের জগন্মান্য ও জগদ্বশীভূতকারী আদেশ দ্বারা মহাতাব রায় বিশ্বাস ও গৌরবের মূলধনস্বরূপ জগৎশেঠ খেতাব প্রাপ্ত হইলেন। অধিকৃত রাজ্যের সমুদয় বর্তমান ও ভাবী হাকিম, আমলা ও মুৎসুদ্দী প্রভৃতির উচিত যে, তাঁহারা উল্লিখিত ব্যক্তিকে জগৎশেঠ মহাতাব রায় লেখেন। এ বিষয়ে বিশেষ যত্ন ও মনোযোগ প্রদান আবশ্যক। ইতি তারিখ ২৭ জেলহজ্জ।

এই পৃষ্ঠার মোহরাদি আবৃত থাকায় তাহার উল্লেখ করিতে পারা গেল না।

বঙ্গাধিকারী শিবনারায়ণের ফার্মান

পরমেশ্বরের নাম

(লাল কালীতে)

(গোল মোহর)

ঈশ্বরের নাম

১১	১২	১
পুত্র	পুত্র	পুত্র
মীরণ শাহ	আমীর তৈমুর সাহেব কেরান	শাহ আলম বাদশাহ

২ পুত্র আলমগীর বাদশাহ
৩ পুত্র সাজাহান বাদশাহ
৪ পুত্র জাহাঙ্গীর বাদশাহ
৫ পুত্র আকবর বাদশাহ
৬ পুত্র হুমায়ুন বাদশাহ
৭ পুত্র বাবর বাদশাহ
৮ পুত্র উমর শেখ শাহ
৯ পুত্র সুলতান আবু সৈয়দ শাহ
১০ পুত্র সুলতান মহম্মদ শাহ

আবুল ফতেহ নাসীর উদ্দীন মহম্মদ শাহ, পুত্র জাহান শাহ বাহাদুর সাহেবে কেরান বাদশাহ গাজী।

(দস্তখত লাল কালীতে)

ফরমান আবুল ফতেহ নাসীর উদ্দীন মহম্মদ শাহ, পুত্র জাহান শাহ বাহাদুর, সাহেবে কেরান বাদশাহ গাজী।

এক্ষণে মহামান্য আদেশপত্রে প্রকাশ পাইল যে, অর্ধ সুবাবগান কাননগো কর্ম ৺দর্পনারায়ণের মৃত্যু হওয়ায়, তস্য পুত্র শিবনারায়ণ দুই লক্ষ টাকা নজর ও তস্য পিতার নিকট যাহা পাওনা ছিল, প্রদান করায় পিতার স্বরূপ বাহাল থাকে। আর নিয়মানুসারে কার্যকরতঃ চাষ, আবাদবৃদ্ধির পক্ষে নিতান্ত পরিশ্রম করে। আর সুপথগামী থাকিয়া সরকারের ধনবৃদ্ধির কার্যে ত্রুটি না করিয়া কোন প্রকারের জুলুম বিদদত না করে, এবং জুলুম ও ক্ষতির নিকট না যায়। আর বাঁটয়ারের সেরেস্তা যে পরিমাণে নিযুক্ত আছে, সন সন জাবিদা দস্তুরমত সরকারী দফ্‌তরখানায় দাখিল করিতে থাকে। আর প্রজাগণকে তুষ্ট ও রাজি রাখিয়া প্রতি সন ৫০ হাজার টাকার নজর হুজুরে ও বক্সী বিমজ্জম কিস্তিবন্দী তথাকার সুবার নিকট দিতে থাকে। উচিত যে, বর্তমান ও ভাবী

হাকিম, আমলা, জায়গীরদার, করোরীগণ শিবনারায়ণকে অর্ধ সুবাবগনার কাননগো জানিতে থাকেন। আর প্রতি সন নূতন সনন্দ তলব না করেন। আর জমিদার, মণ্ডল ও প্রজাগণ সুবা মজকুর উপরোক্ত কাননগোর কথা ও পরামর্শে যাহা সরকারের লাভের পক্ষে থাকে তাহার বাহির না হয়। ইতি সন জলুস ৭ সফর।

(পরপৃষ্ঠায় লেখা)

যিনি মহামান্য রাজ্যের ন্যাসাধারস্বরূপ, যিনি সাম্রাজ্যের বিশ্বসনীয় সম্ভ্রান্তবংশীয়, উচ্চপদস্থ ও ক্ষমতাপন্ন, যিনি প্রাধান্য ও আদর্শবিষয়ে ক্ষমতাবান্, যিনি রাজধর্মের গূঢ়তত্ত্ব অবগত আছেন, যিনি রাজ্য ও রাজনীতির মহত্ত্ব ও গৌরব অবগত আছেন, যিনি সাম্রাজ্যের অবলম্বনস্বরূপ, রাজ্যের বিশ্বস্ত আদেশদাতা, বিচার-পতি, যিনি দিগ্বিজয়ী, রাজ্য ও ধনের সুবন্দোবস্ত-কারী, ভাগ্য ও ঐশ্বর্যের পথপ্রদর্শক সম্রাটের মনোনীত বন্ধু, যিনি রণস্থলে অগ্রগামী ও সৈন্যগণের পরিচালক, যিনি উচ্চপদস্থ মন্ত্রিগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, যিনি মহামান্য আমীরগণের মধ্যে সর্বপ্রধান, যিনি তরবারি ও লেখনীপরিচালনে সুনিপুণ, যিনি পতাকা উন্নয়নে সমর্থ, যিনি উপযুক্ত পরামর্শদাতা, যিনি সম্রাটের নিরপেক্ষ উজীরসমূহের মধ্যে বিশ্বস্ত বন্ধু, যিনি সমস্ত রাজ্যের দুরূহ ব্যাপারের অবলম্বনস্বরূপ, যিনি দরবারের বিশ্বাসী, সেই কামরুদ্দীন হোসেন বাহাদুর নসরত জঙ্গের সেনানিবেশ বরাবরেষু।

(মোহর)
ফিদবী মহম্মদ
শাহ বাদশাহ গাজী
জুমলতুল মুল্ক মহারুল
মহান, এতমাদুদ্দোলা
কামার উদ্দীন খাঁ
বাহাদুর নসরত
জঙ্গ।

জগৎশেঠদিগের বংশক্রম
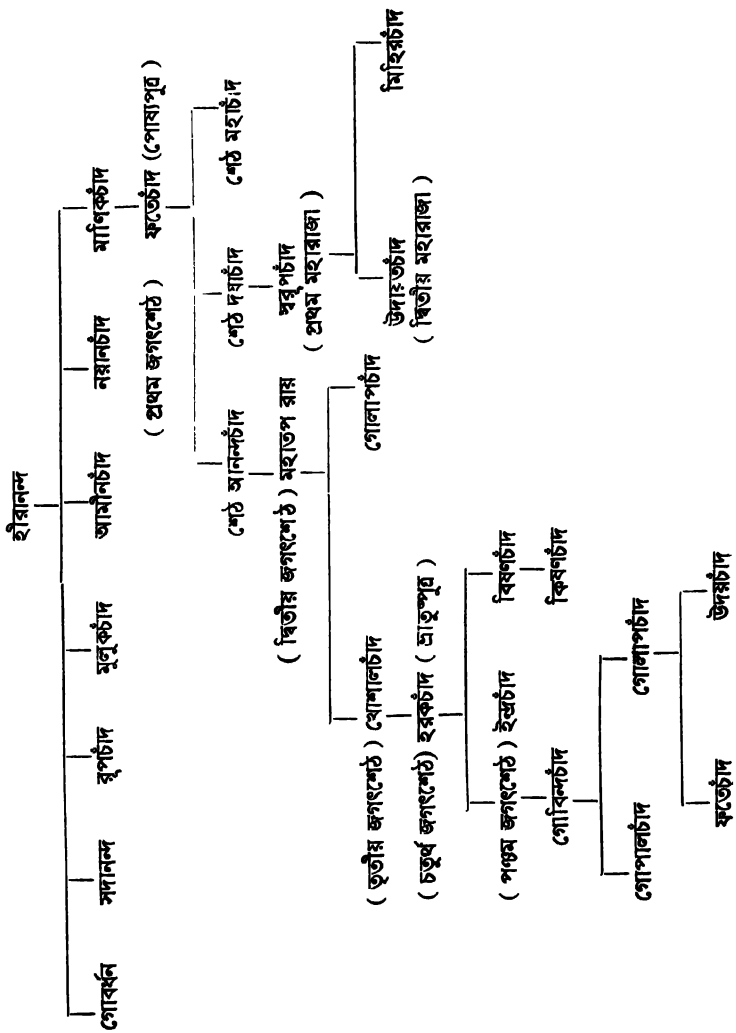
বঙ্গাধিকারীদিগের বংশক্রম

ভট্টবাটীর কানুনগোগণের বংশক্রম

মহারাজ নন্দকুমারের বংশক্রম

দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত নন্দীর বংশক্রম

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বংশক্রম
হরকৃষ্ণ সিংহ
মুরলীধর
নারায়ণ সিংহ
গৌরাঙ্গ সিংহ
বিহারী সিংহ
দীনদয়াল
রাধাকান্ত
রাধারমণ
গঙ্গাগোবিন্দ
প্রাণকৃষ্ণ
কৃষ্ণচন্দ্র (লালাবাবু)
(রাণী কাত্যায়নী)
শ্রীনারায়ণ
প্রতাপচন্দ্র
ঈশ্বরচন্দ্র
ইন্দ্রচন্দ্র
অরুণচন্দ্র
গিরিশচন্দ্র
পূর্ণচন্দ্র
কান্তিচন্দ্র
শরৎচন্দ্র

রাজা দেবীসিংহের বংশক্রম
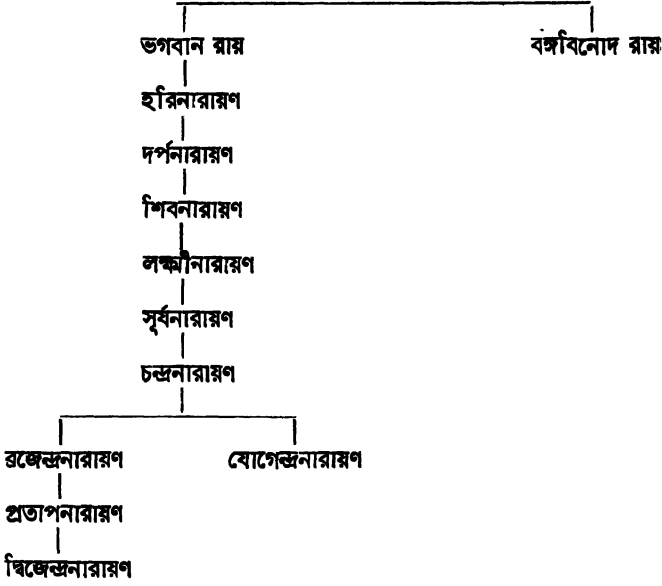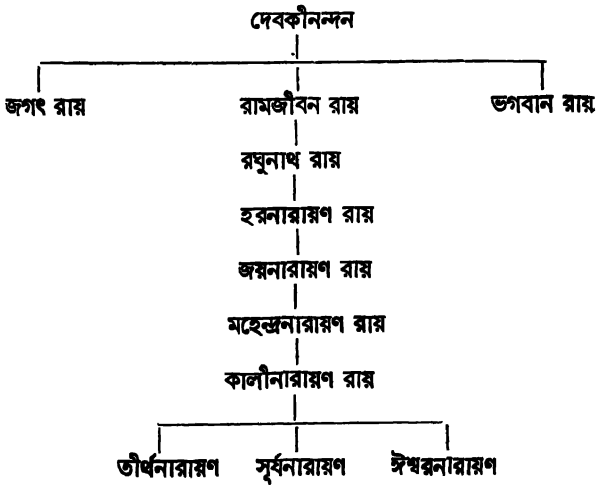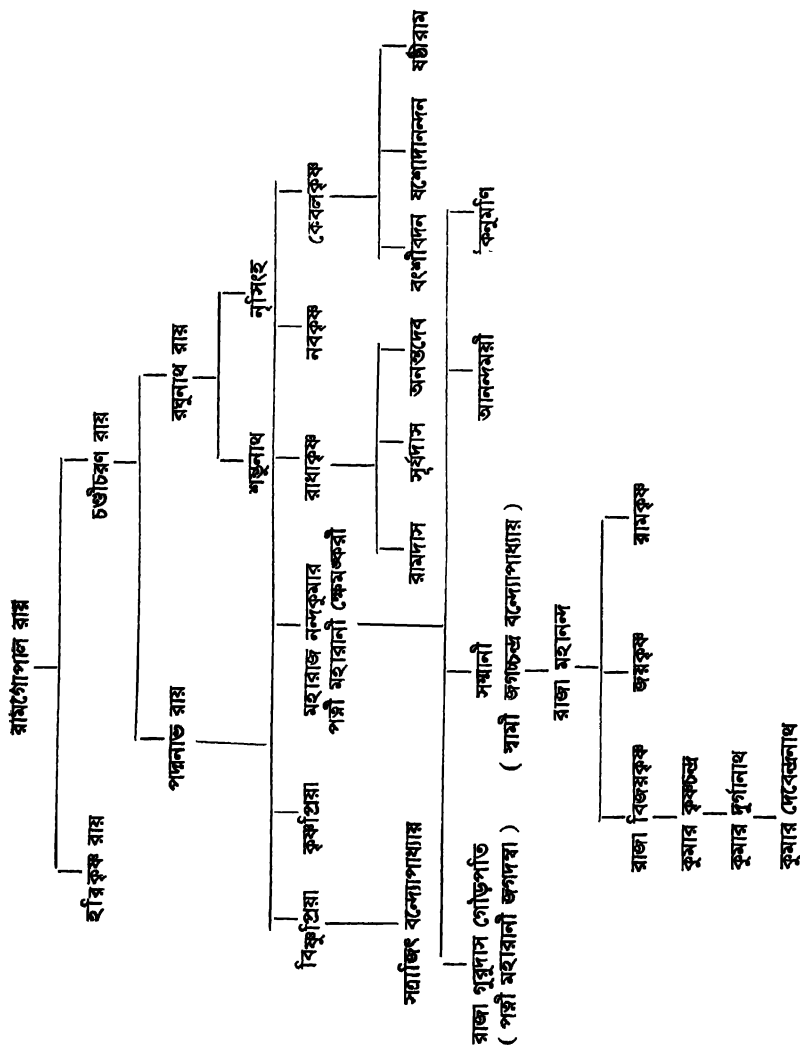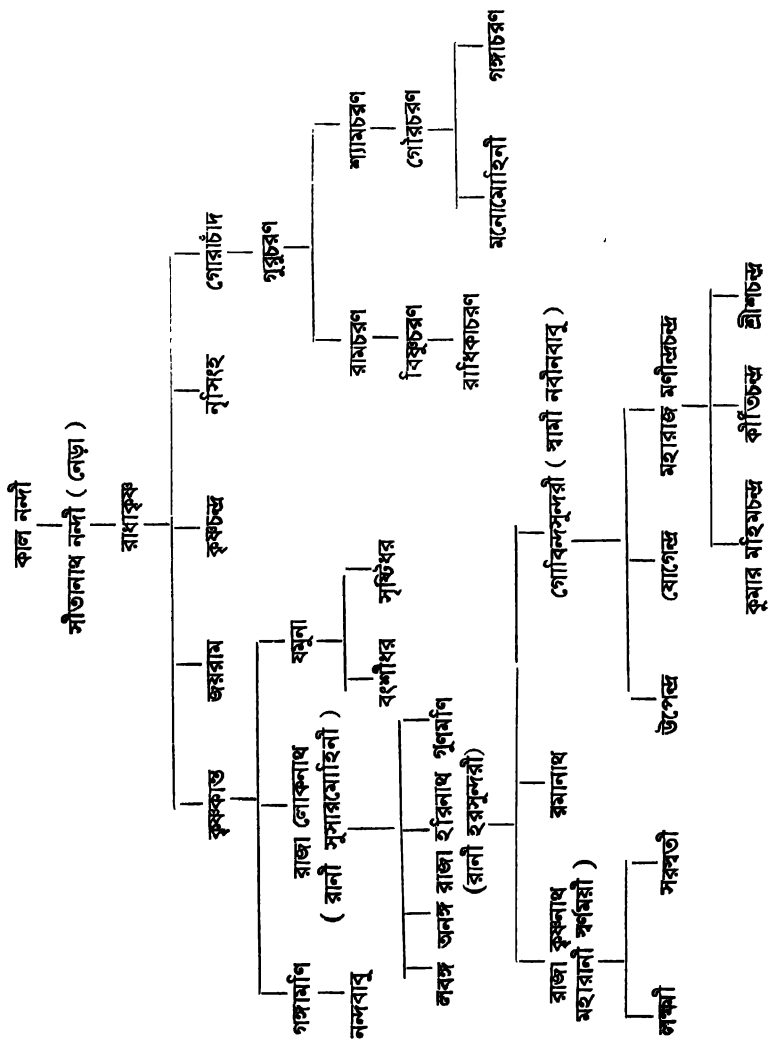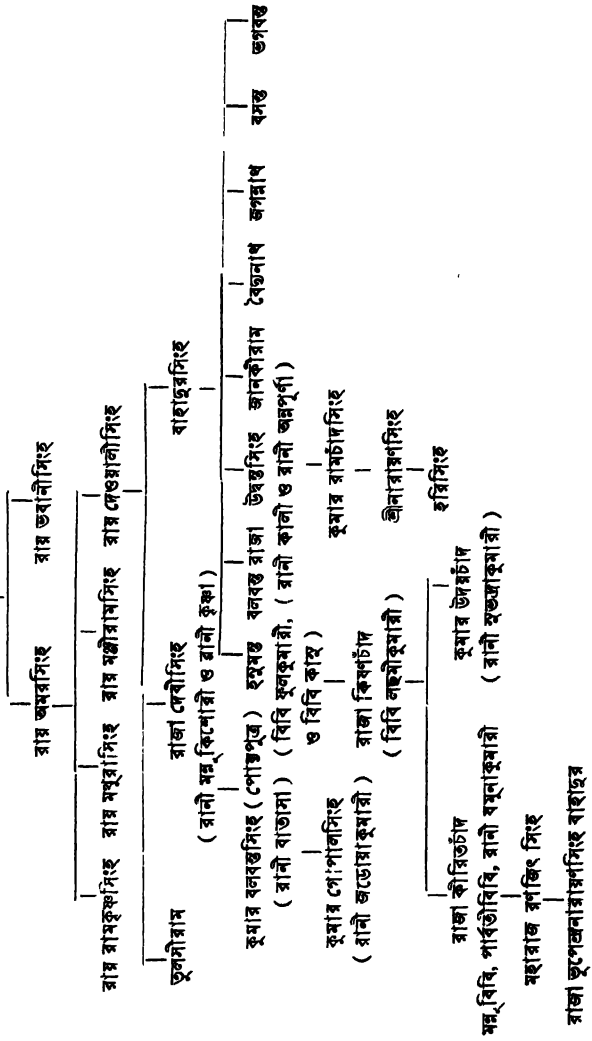
গিরিয়ার প্রথম যুদ্ধের গ্রাম্য কবিতা

সহর হইতে বাহির হইল নবাব সহর করে খালি,
দিনে দিনে সোনার বরণ হয়ে গেল কালী।
মার লাগিল রে গিরিয়ার ময়দানে,
বাঁকে বাঙ্গলার সুবা গিরিয়ার ময়দানে। (ধূয়া)
পূর্ব্বেতে করিল মানা নানা জাফর খাঁ,
ভাল মন্দ হলে নবাব[১] সহর ছেড় না।
নবাবের তাম্বু পড়িল ব্রাহ্মণের স্থলে,[২]
আলিবর্দীর তাম্বু তখন পড়িল রাজমহালে।
নবাবের তাম্বু যখন পড়িল দেয়ানসরাই,
আলিবর্দীর তাম্বু তখন আইল ফরক্কায়।
নবাবের তাম্বু আইল খামরা সরাইতে,
আলিবর্দীর তাম্বু তখন সূতীর দরগাতে।
নবাবের তাম্বু পড়িল গিরিয়ার মাঠেতে,
আলিবর্দীর তাম্বু তখন পড়িল পিপিলাতে।
গোয়াসখাঁ বলিল তখন শুন নবাব তুমি,
আলিবর্দীর শির এনে দিব আমি।
শুন শুন ওরে গোয়াসখাঁ তুমি পাঠানের জাতি,
ময়দানে পড়িল যেন মার আর কাটি।
শুন শুন ওরে গোয়াসখাঁ বলি যে তোমাকে,
ভাই জান মিলিতে আসে লড়াই দিব কাকে।[৩]
খোজাবসন দুই ভাই ইমানের পোয়া,
জলদী করে খবর নেহ সূতীর দরগা গিয়া।
লাখ টাকার সিন্নি পেয়ে মর্ত্তুজা[৪] দিল বর,
তোমার মহিম[৫] ফতে হবে কাল সওয়া প্রহর।

---

১ নবাব সরফরাজ খাঁ।

২ বামনিয়া।

৩ আলিবর্দী চতুরতাপূর্ব্বক সরফরাজকে লিখিয়াছিলেন, আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি। এখানে তাহারই উল্লেখ হইয়াছে।

৪ সুতীতে মর্ত্তুজা নামে এক প্রসিদ্ধ ফকীরের সমাধি ছিল, তথাকার দরগা মুসলমানদিগের বিশেষ পূজ্য ছিল। মর্ত্তুজার বিবরণ মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

৫ যুদ্ধ।

জলদী করে হুকুম দেরে নবাব জলদী করে,
ঘোড়া চড়ে যাব আমি সূতীর দরগাতে।
সওয়া সের আটার নোয়া পোওয়া ভর ঘী,
একা লবে গোয়াসখাঁ সকলের জী।
গোয়াসখাঁর ঘোড়া দেখে পান তৈয়ার করিল,
সওয়া শত টাকার সিন্নি গোয়াসখাঁরে দিল।
হায়গো আল্লা বারিতালা, খোয়াব[৬] দিল রেতে,
গোয়াসখাঁর হবে লড়াই আলিবর্দীর সাথে।
মার মার করে গোয়াসখাঁ লড়াই করিল,
কলার বাগান যেন ঝুড়িতে লাগিল।
তীরে পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি পড়ে রহে,
একেলা করিল লড়াই গোয়াসখাঁ ঢাল মুড়ি দিয়ে।
ভাল ভাল কামান সাজায়ে কামান করিল বিলি,
নবাবের কামানে ভরে ইট আর বালি।[৭]
কালিয়া মেঘের আড়ে যেন মেঘ চিকচিকে,
গোয়াসখাঁর তরবার যেন বিজলী ছটকে।
দশ কাঠা নিয়ে গোয়াসখাঁর ঘোড়া ফিরে,
হাজার হাজার পল্টন কাটে এক এক চক্করে।
হাজার হাজার পল্টন কেটে ময়দান করিল,
ভাল ঘোড়ায়[৮] চড়াইয়া নবাবকে বিদায় দিল।
হাতী পড়িল দুলদুলিতে ঘোড়া পড়িল রণে,
পাঙ্ক্ষাদার ডুবাইল সাহস বিলের ঘোনে।[৯]

---

৬ স্বপ্ন।

৭ সরফরাজের কোন কোন কর্মচারী বাবুদের ও গুলির পরিবর্তে যে ইট ও বালি কামানে পুরিয়াছিল, তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে।

৮ ইতিহাসে কিন্তু নবাবের হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণের কথা দেখা যায়।

৯ কবিতাটি যেন অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ অংশের সংগ্রহের আর উপায় নাই।

জালিমসিংহ[1]

১

উদিলা ভাস্কর এবে পূরব গগনে
তরুণ অরুণ-বিভা,
জাহ্নবী-জীবনে কিবা,
খেলিতেছে শত শত তরঙ্গের সনে,
রবির প্রশান্ত মূর্তি,
শতধা পাইল স্ফূর্তি,
গঙ্গার বিমল বক্ষে সমীর-তাড়নে,
হাসিল প্রকৃতি-বালা উষা-আগমনে।

২

প্রকৃতির হেন শান্তি করিয়া ভঞ্জন,
গর্জিল নবাবসেনা,
অশ্ব, গজ অগণনা,
ভানুর উজ্জ্বল করে জ্বলে প্রহরণ,
নিষ্কোষিত তরবার,
কিরিচ, বল্লম আর,
শতেক কামান উঠে করিয়া গর্জন,
বিশাল মুখেতে করি অগ্নি-উদ্গিরণ।

৩

গিরিয়ার রণস্থলী কাঁপিল তখনি,
কাঁপিল জাহ্নবীতট,
কাঁপিল অশ্বত্থ, বট,
চমকি গোঠের গাভী ছুটিল অমনি
বালকের ক্রীড়ারঙ্গ,
আতঙ্কে হইল ভঙ্গ,
বারিকক্ষে চমকিয়া উঠিল রমণী,
দ্বিগুণ দ্বিগুণ রবে ধায় প্রতিধ্বনি।

১ আমার "একটি ক্ষুদ্র কাহিনী" নামক প্রবন্ধে জালিমসিংহের সম্বন্ধে আক্ষেপোক্তি পাঠে আমার প্রিয়বন্ধু বাবু প্রসন্ননাথ রায়, বি. এল. এই কবিতাটি উপহার পাঠাইয়াছিলেন।

৪

উঠিল সমরক্ষেত্রে ভীম কোলাহল,
করিপৃষ্ঠে সরফরাজ,
সমরে পশিল আজ,
সাজিল তাহার সনে চতুরঙ্গদল,
অকস্মাৎ হায় হায়,
ভীমবেগে গুলি ধায়,
শায়িত নবাব তাহে হস্তীর উপর,
গর্জিল বিজয়োল্লাসে অরাতিনিকর।

৫

ছুটিল বিজয়সিংহ অশ্ব আরোহিয়া,
শাণিত বল্লম করে,
প্রভুর সাহায্য তরে,
অরি-সাগরের মাঝে পড়ে আস্ফালিয়া ;
আলিবর্দী লক্ষ্য করি,
হানিতে মাতঙ্গোপরি,
প্রচণ্ড মার্তণ্ডকরে উঠে ঝলসিয়া,
আতঙ্কে উঠিল কাঁপি আলিবর্দী-হিয়া।

৬

গোলন্দাজদল হতে গুলি এক হায়,
বিদ্যুতের বেগে ধায়,
বিন্ধি বিজয়ের গায়,
মুহূর্তেকে মৃতদেহ পড়িল ধরায়,
আলিবর্দী-যোদ্ধৃচয়,
উল্লাসে উৎফুল্ল হয়,
লইতে শত্রুর দেহ ধাওয়া ধাই ধায়,
রণমদে মাতোয়ারা জ্ঞানহারা প্রায়।

৭

নববর্ষবয়ঃক্রম শিশু একজন,
ক্ষুদ্র তরবারি করে,
ক্ষুদ্র অঙ্গে স্বেদ ঝরে,
জনকের মৃত দেহ করিতে রক্ষণ,

শবের নিকটে থাকি,
কহে উচ্চৈঃস্বরে ডাকি,
"শোনরে শোনরে ওরে পাপিষ্ঠ যবন,
পিতার ও দেবদেহ,
কভুনা ছু'ইও কেহ,
ছুইলে তোদের কিন্তু নিকট মরণ,
ক্ষত্রিয়শিশুর শুন প্রতিজ্ঞা ভীষণ।"

৮

অপার সাগরসম যবনের সেনা,
তুচ্ছ করি শিশুবীর,
সমরে রহিলা স্থির,
ধন্যরে ক্ষত্রিয়শিশু ধন্য বীরপণা,
যে শোণিতকণাচয়,
তোর ধমনীতে বয়,
চিরকাল রণক্ষেত্রে ঢালেরে আপনা,
নাহি সহে অপমান অথবা লাঞ্ছনা।

৯

স্তম্ভিত যবনসেনা বীরত্ব নেহারি,
আলিবর্দী অগ্রসরি,
বালকে সম্ভাষ করি,
অবাক্ যবনবীর বীরশিশু হেরি,
নিবারিল সৈন্যগণে
মৃতদেহপরশনে,
লইল তাহারা পুনঃ শিশু স্কন্ধে করি,
ধন্যরে বীরের পূজা যাই বলিহারি !

১০

বিজয়ের মৃতদেহ তীরস্থ হইল,
যত সব হিন্দু-বীর,
বহি লয়ে গঙ্গাতীর,
চিতানলে পূত দেহ ভস্মে নিঃশেষিল।
গঙ্গার পবিত্র বারি,
সে ভস্ম হৃদয়ে ধরি,
অধিক পবিত্রতর আপনা মানিল।

বালকের অশ্রুধার
যেন মুকুতার হার,
সাদরে জাহ্নবী দেবী গলায় পরিল।
হৃদয়ের আশাঙ্কুর,
হৃদয়ে হইল চূর,
আঁধার ভবিষ্যগর্ভে শিশু ঝাঁপ দিল,
জীবনের যবনিকা অকালে পড়িল।

১১

ধন্যরে জালিমসিংহ বীরত্ব তোমার,
এহেন পিতায় ভক্তি,
কে দেখাবে কার শক্তি,
সত্যই সিংহের শিশু সিংহ-অবতার,
যতদিন ইতিহাস,
করিবেক পরকাশ,
ভারতের গৌরবের বীরত্ব-সম্ভার,
ততদিন তব কথা,
জ্বলন্ত অক্ষরে গাঁথা,
হবে তার হৃদয়ের রত্ন-অলঙ্কার।
এ ক্ষুদ্র কাহিনী তেঁই,
যে পড়িবে হবে সেই,
মাতৃভূমিপ্রেমে মত্ত মায়ের কুমার,
হইবে হৃদয়ে তার বীরত্ব-সঞ্চার।

১২

ধন্যরে ভারতমাতা বীরের প্রসূতি,
তোমার অনন্ত কক্ষে,
কত যে মা লক্ষে লক্ষে,
জালিম, বাদল, অভিমন্যু মহামতি,
বিস্মৃতির অন্ধকারে,
কভু জীয়ে, কভু মরে,
কত ক্যাসাবিয়াঙ্কার জ্বলন্ত মূরতি,
তোমার ও ক্রোড়ে হায়,
জন্মিল, পাইল লয়,
সংখ্যা করে কার হেন আছে মা শকতি,
ধন্যরে ভারত-মাতা বীরত্ব প্রসূতি।

পলাশীর স্মৃতিস্তম্ভ

(নির্মাণাব্দ ১৯০৮ জুলাই—১৯০৯ মার্চ)

চারিপার্শ্বের লিপি।

I

'BATTLE FIELD OF PLASSEY

June 23rd, 1757.

II

This monument was erected by the Government of India
By order of
Lord Curzon Viceroy and Governor General.

1905.

III

On this site
The British Forces
Numbering 3200
Under the Command of
Colonel Robert Clive
Defeated the Army of Surajud dowla.

IV

Council of war, Plassey
Colonel Robert Clive. In Command.
Major Eyre Coote, 39th Regiment,
Major James Kilpatrick, Madras Army,
Major Archibald Grant. 39th Regiment,
Capt. W. Jennings, Command Royal Artillery.
Capt. R. Waggener, 39th Regiment Capt. C. F. Gaupp
Madras Army.

Capt.	J. Cornville	,,	,,	,,	T. Rumbold ,,
,,	C. Fischer, Bengal Army			,,	R. Campbell ,,
,,	Le Beaume	,,	,,	,,	C. Palmer Bombay Army.
,,	Alexander Grant		,,	,,	Molitore ,,
,,	J. Cudmore	,,	,,	,,	F. Parshaw ,,
,,	G. Muir	,,	,,	,,	A. Armstrong ,,

P. Carstairs, Bengal Army.

পলাশীযুদ্ধের গ্রাম্য গীত

কি হলোরে জান।[১]
পলাশীময়দানে নবাব হারাল পরাণ।
তীর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে, গুলি পড়ে রয়ে,
একলা মীরমদন বল কত নেবে সয়ে।
ছোট ছোট তেলেঙ্গাগুলি লাল কুর্তি গায়,
হাঁটু গেড়ে মারছে তীর মীরমদনের গায়।
কি হলোরে জান,
পলাশীময়দানে নবাব হারাল পরাণ।
নবাব কাঁদে সিপুই কাঁদে আর কাঁদে হাতী,[২]
কল্‌কেতাতে বসে কাঁদে মোহনলালের বেটী।
কি হলোরে জান,
পলাশীময়দানে উড়ে কোম্পানীনিশান।
মীর্জাফরের দাগাবাজী নবাব বুঝতে পাল্লে মনে,
সৈন্যসমেত মারা গেল পলাশীময়দানে।
নবাব বড় শোহ্দা[৩] ছিল আর লম্পটে,
ইতিমধ্যে গালেব[৪] এসে পৌঁছিল সে ঘাটে।
কি হলোরে জান,
পলাশীময়দানে উড়ে কোম্পানীনিশান।
ফুলবাগে মল নবাব খোসবাগে মাটী,
চাঁদোয়া টানায়ে কাঁদে মোহনলালের বেটী।[৫]
কি হলোরে জান,
পলাশীময়দানে উড়ে কোম্পানীনিশান।

---

১ কেহ কেহ "নবাব কি হলোরে জান" এই ধুয়াও গাহিয়া থাকে।

২ বাবু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের বালকে লিখিত নদীয়াভ্রমণ নামক প্রবন্ধে 'হস্তিশালে হস্তী কাঁদে ঘোড়ায় খায়না পাণি' এইরূপ একটি চরণ আছে, কিন্তু তিনি ইহার পরবর্তী চরণ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।

৩ দুষ্ট, লম্পট।

৪ শত্রু।

৫ মোহনলালের বেটী সম্বন্ধে একটু ব্যাখ্যান প্রয়োজন। লুৎফ উন্নেসা প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, মোহনলালের ভগিনীকে সিরাজ স্বীয় অন্তঃপুরবাসিনী করিয়াছিলেন। সাধারণ লোকে সেই ভগিনীকে বেটী করিয়া লইয়াছে। অনেকে ভ্রমক্রমে সিরাজের অন্যতম বেগম লুৎফ উন্নেসাকে মোহনলালের ভগিনী বলিয়া থাকেন। যখন তাঁহাদের মধ্যে এরূপ বিশ্বাস, তখন অশিক্ষিত লোক যে ভ্রম করিবে তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? সম্ভবতঃ এখানে লুৎফ উন্নেসাকে মোহনলালের বেটী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

কাটোয়া ও পলাশীর নিকট ইংরাজ ও মীর কাসেম-সৈন্যের যুদ্ধের গ্রাম্য কবিতা

শুন সবে এক ভাবে কাব্যরসের কথা,
নবাবে লুটিল কুঠী সহর কলিকাতা।[১]
জবরের খবর শুনি দুধে ধোওয়া কোম্পানী কহিছে,
তয়ের কর দেখি ফিরিঙ্গি কত তেলেঙ্গা আছে।
বিলাতী জাহাজ পূরে, চলো ঠেলে বানের সহর দিয়ে,
মধ্যেকার নদী পার হব হর্কৃসিদ্ধ হয়ে।
জাটযো আজার করে।
জাটযো আজার করে, পানসীভরে দেখতে লাগে ভয়।
যত তেলেঙ্গা গোরা, কোর্তা লালে লাল।
মোকাম তার পলাশীতে,
মোকাম তার পলাশীতে সঙ্গে আছে তুড়ুকসোয়ার,
আগুন পানী নাহি মানি করে মার মার।
সাম্‌নে শুঙ্কি গেড়ে,
সাম্‌নে শুঙ্কি গেড়ে ধর্‌লে তেড়ে, যত তেরেঙ্গা গোরা,
লড়াই দিতে পালিয়ে গেল মামুদ তকীর ঘোড়া।
তলওয়ার আপনি ধরে,
তলওয়ার আপনি ধরে, মহিম করে, পেতনী কাঁপে ডরে,
ঝিম্ তরাতর মার লেগেছে, কেউ নাইকো ঘোড়ে।
ঘেরলে মামুদ তকী,
ঘেরলে মামুদ তকী, তা দেখি দাঁতে কাট্‌লে ঘাস,
বাবুজান একটি চাকর তেরা নফর মুজো করে কর।
আমলা বলে বাঙ্গলা মুলুক ছেড়ে দিব কাশীমবাজার,
রাতারাতি মেরে নিল সূতীর বাজার।[২]

---

১ মীর কাসেম কলিকাতা লুটেন নাই, সিরাজ লুটিয়াছিলেন। এখানে সিরাজের সহিত মীর কাসেমের গোল হইয়াছে।

২ সূতীর বাজার এখানে গিরিয়ার দ্বিতীয় যুদ্ধের বা সূতীর যুদ্ধের কথা বলা হইয়াছে। গিরিয়া প্রবন্ধ দেখ। এই কবিতাটি বিধুপাড়া হইতে শ্রীযুক্ত বাবু কালীদাস পাল পাঠাইয়াছেন। ইহার সঙ্গে আমার প্রিয়বন্ধু বসন্তকুমার রায়ের সংগৃহীত কবিতার কিছু কিছু পার্থক্য আছে। নিম্নে সেটিও প্রদত্ত হইল।

শুন সবে একভাবে কাব্যরসের কথা,
নবাবে লুটিল কুঠি সহর কলিকাতা।

শুন ভাই লড়ায়ের কথা,
শুন ভাই লড়ায়ের কথা আইল কলিকাতার চিঠি।
দিবানিশি বহরমপুরের গড়ে,[৩]
সাত সাহেবে, মুখোমুখি বিজির বিজির করে।

জবরের খবর শুনি তুরৎমুনি কোম্পানী কহিছে,
তয়ের কর দেখি গোরা কত ফিরিঙ্গি আছে।
সামনে শুল্কি গেড়ে তুল্লে তেড়ে বাগের মুলুক দিয়ে
কাঁকলে নদী আসছে যেন হীরে শত হয়ে
বাঙ্গলা মুখে করে।
বাঙ্গলা মুখে করে পানসী ভরে দেখ্‌তে লাগে ভাল,
সাজিল তেলেঙ্গা গোরা কুর্তি লালে লাল।
মোকামপুর পলাশীতে।
মোকামপুর পলাশীতে সিপুই সাতে সঙ্গে তুড়ুকসোয়ার,
আগুন পানী নাহি মানি করে মার মার
পড়িল মামুদ তকী,
পড়িল মামুদ তকী দোনের আঁখি ছুড়ছে মনের আশ
তা দেখে সয়ান খাঁ খাতে কাটে ঘাস।
বাবুজান পেটের চাকর।
বাবুজান পেটের চাকর তেরা নফর হামকো কাহে মারো,
হাম বাঙ্গলা ছোড় দেয়া হ্যায় তোমলোক আমল কর।
সাহেবেরই দোহাই ফিরুক,
সাহেবের দোহাই ফিরুক এমন কালে তাঁতীর বাড়ি বাড়ি,
খ্যাক্‌শিয়ালীর বাচ্চা যেন বইলে ঘানি ধরি।
ফিরিঙ্গি আলা বাঁশি।
ফিরিঙ্গি আলা বাঁশি পইলে আসি তেলেঙ্গার হল জ্বালা,
দাড়ী ফেল্লে মোচ ফেল্লে গলায় দিলে মালা।
তারা বৈরাগী হলো।
তারা বৈরাগী হল কতক গেল নিজ নিজ দেশ,
ম্যায়সা কা হামারা বাবু চিন্‌কে হল শেষ।

উপরে সংগৃহীত কবিতা পাঠে বোধ হয় যেন মামুদ তকী (মহম্মদ তকী খাঁ) কিছু কাপুরুষতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু নিম্নের সংগৃহীত কবিতায় তাহার উল্লেখ নাই, এবং তাহাতে সয়ান খাঁ নামে এক ব্যক্তির দাঁতে ঘাস কাটার কথাই দেখা যায়। ইতিহাস মহম্মদ তকী খাঁর পক্ষ। মুতাক্ষরীন প্রভৃতি গ্রন্থে মহম্মদ তকী খাঁর অসমসাহসিকতা ও প্রভুভক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে। দুঃখের বিষয় বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর মহম্মদ তকীকে ভিন্নরূপে চিত্রিত করিয়াছেন।

৩ বহরমপুরের গড় বা ক্যান্টনমেন্ট মীর কাসেমের সময় হয় নাই। ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দে ইংরাজদিগের সহিত মীর কাসেমের যুদ্ধ হয়। ১৭৬৫ হইতে ১৭৬৭ পর্যন্ত বহরমপুর

তা কেউ বুঝতে নারে,
তা কেউ বুঝতে নারে, বলবো কারে মগ্ন করে ভয়,
পেচকাওয়ায়[৪] জোনাবালি তারা পিছে কয়।
সিপাই সব গুপ্তে আছে,
সিপাই সব গুপ্তে আছে ঘেড়ের মাঝে বন্দীখানার পরে,
লুটেছে নবাবের মুলুক দাগাবাজী করে।
জবরের ভেড়া দাগা,
জবরের ভেড়া দাগা বাগা ভেড়া, পলাশীর ময়দানে,
পাট ভরে দাগলে গোলা ফিরিঙ্গি না জানে।
মোরা তার উপর পানে,
মোরা তার উপর পানে, গোলা খানি বৃক্ষের উপরে,
চাকর হয়ে মুনিব মারে মারে তলওয়ার ছেড়ে।
হায় হায় বিধির ফেরে,
হায় হায় বিধির ফেরে বলবো কিরে কাঁদছে নবাব আলি,
বাইশ শ ফৌজ থাকতে আমার, জবরে লুটালি।
কিন্তু বুঝবো তোরে,
কিন্তু বুঝবো তোরে তারাকপুরে[৫] করবে গুলি খাড়া,
বাম হলো বিধাতা বুঝি নবাব গেল মারা।[৬]
সাহেবের ঊঁদ বাজে,
সাহেবের ঊঁদ বাজে নিশান উড়ে বহরমপুরের গড়ে,
বাঙ্গলাতে মরদ নাই ফিরিঙ্গিতে আমল করে।
লুটিল চাঁটগাঁয়ের বাজার আনাড়ি মরদ মেরে,
তা ভাইরে ভাই পলায়ে যাই কলিকাতার ভিতরে
টাকা কড়ি নেয় না তারা মানুষ মেরে ফেলে[৭]
তাদের ভাই দাসুকে

ক্যাণ্টনমেণ্টের নির্মাণ হয়। ইহাতে বোধ হইতেছে কবিতাটি বহরমপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট নির্মিত হইবার পরে রচিত হইয়াছে।

৪ পশ্চাতে।

৫ তারাকপুরে নবাবদিগের সৈন্যাদিবাস ছিল, সহররক্ষার জন্য সৈন্যসকল তারাকপুর ও আমানিগঞ্জে অবস্থিতি করিত। তারাকপুর বহরমপুরের পূর্বে ও আমানিগঞ্জ লালবাগের দক্ষিণ।

৬ এই কয়েক চরণ যেন সিরাজ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

৭ তৎকালে সাধারণের কোম্পানীর অত্যাচারে কেমন ভয় হইত, এই চরণ হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়।

তাদের ভাই দাসুকে বলে দে, কহিছে সুবেদার,
থানায় থানায় চাপরাশ, না যায় সমাচার।
কাণে খর্সান, মাথায় লেঙ্গটী ফেরে গিরিন্দি হয়ে,
মাছরাঙ্গা ধুমসো * * হাতীর মত নেড়ে।
সেই বেটারা খবর দিল অমরপুরে যেয়ে।
শুনরে হাওয়ালদার,
শুনরে হাওয়ালদার, সুবেদার কাপ্তেন্ নারাঙ্গ সাহেব বড়,
লিখেছে ইংরাজের খত সেটাম এনে ধর।
ধরে ডাকে ধরে তোবরায় ভরে দিলে বৃন্দাবনের পথে,
মথুরাতে কতক গোরা পাণ্ডব হয়ে আছে।
গোরার সব তলব হচ্ছে,
গোরার সব তলব হচ্ছে লড়াই দিতে আমবাজার গড়ে,
আণ্ডা গুর গুর কালা পল্টন দিপাং দিপাং করে।
শুনেছি অমর পালোয়ান,
শুনেছি অমর পালোয়ান গোরা ধরে খায়।
শুনি কম্পবান মারে টান করে খান খান,
সাড়ে সাত সের, মাথা আঠার সের কাণ।
বাপরে বাপ খায় ছেরাদ,
বাপরে বাপ খায় ছেরাদ, খায় জঙ্গির মাথা,
তাদের সঙ্গে লড়াই দিবার হয়ে গেল কথা।
কারুর ভাঙ্গল মাথা, দালান কোঠা কুচুর মুচুর করে,
একদমে চল্লো গিয়ে সর্বাঙ্গপুরের বনে।
বোলাও থানেদার,
বোলাও থানেদার চার পগার করে দৌড়াদৌড়ি,
কে পলায় কার গলি দিয়ে গাড়ি বলদ তার পান্তভাগে,
গাড়োয়ান ভাগে বাঁশ আড়ির ভিতরে।
পেটো পলায় ঢাকি ফেলে ঝাড়ে রেখে কেদে,
মাথায় চন্দুর কি,
মাথায় চন্দুর কি বলবো কি, লোকে ভাবে বসে,
রোজের পলু পাত পেলে না কোয়া হবে কিসে ?
বিকোবে কি আমড়ার আঁটি,
সুধন মোল্লা পালিয়ে গেল দুয়ারে দিয়ে টাটি।[৮]

৮ এই কবিতাটি সম্পূর্ণ কিনা বলা যায় না, এবং ইহার স্থানে স্থানে অর্থবোধও হয় না।

নন্দকুমারের পত্র

১

শ্রীশ্রীহরি। শরণম্।

প্রাণাধিক শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ রায় ভায়া চিরঞ্জীবেষু পরম শুভাশীর্বাদ শিবঞ্চ আগে তোমার মঙ্গল সর্বদা শ্রীশ্রী৺ স্থানে প্রার্থনা করিতেছি তাহাতে প্রাণ রক্ষা পাইতেছে পরং সকল সমাচার শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ মজুমদার দ্বারায় পূর্ব পত্রে লিখিয়াছি তাহাতে জ্ঞাত হইয়া থাকিবা। অদ্য চারি রোজ এথা পৌঁছিয়াছি ইহার মধ্যে একটি অন্ন যদি দেখিয়া থাকি তবে সে অভক্ষ্য মুখ প্রক্ষালনাদি কিছুই করিতে পারি নাই নাসাগ্রে প্রাণ হইল ফজীহৎ যত যত পাইলাম তাহা কত লিখিব তবে যে প্রাণ ধারণ করিয়া আছি সে কেবল তোমার রোকা খোসবাগে পাইয়াছিলাম সেইক্রমে জীবিত আছি সংপ্রতি যদি আমার প্রাণরক্ষা করা থাকে তবে পত্র পাঠ করিবামাত্র শ্রীসূর্য-নারায়ণ মজুমদারের নিকট তুমি এবং শ্রীযুক্ত পিতৃব্যঠাকুর ও শ্রীযুক্ত দিননাথ সামন্ত ও শ্রীরামকান্ত মজুমদার সকলে যাইয়া শ্রীযুক্ত সেখ হিদাতুল্লা জিউকে তাহার লিখন করিয়া পাঠাবা এই ধারাতে যে নন্দকুমারের ভাই ও উকিল সকলে এইখানে এক রফা করিয়া শ্রীযুক্ত ৺সাহেবের পরওয়ানা করিয়া পশ্চাৎ পাঠাইবে সম্প্রতি নন্দ-কুমারকে তসৃদি না দিবে যদি এরূপ লিখন নাগাদি ৩রা ভাদ্র এথা পৌঁছে তবে যে আমার প্রাণ বাঁচিতে পারে নতুবা ব্যজ হইলে এ জন্মের মতন বিদায় হইলাম ইহা নিশ্চয় জানিবা যদি দুর্ভাগ্যবশত বাগহানিতে ঠেকিয়াছি তবে কমোবেশেতে তথাতে রক্ষা করিবা আমি তথায় পৌঁছিয়া তাহার জায়দাদ করিয়া দিব অতএব এসময় তুমি কমর বাঁধিয়া আমার উদ্ধার করিতে পার তবেই যে হউক নচেৎ আমার নাম লোপ হইল ইহা মকর্‌রর জানিবা নাগাদি ৩রা ভাদ্র তথাকার রোয়দাদ সমেত মজুমদারের লিখন সম্বলিত মনুষ্য কাসেদ এথা পৌঁছে তাহা করিবা এ বিষয় এক পত্র লক্ষ হইতে অধিক জানিবা আমার দিব্য দিব্য আর এক পত্র আমি শ্রীযুক্ত সূর্যনারায়ণ মজুমদারকে লিখিলাম ইহা তাঁহাকে দিবা এবং লিখনের জওয়াবও সে জিউকে লিখন লইয়া রাতি বিরাতি এথা পাঠাইবা ইহাতে যদি কদাচিৎ গাফিলি কর তবে আমার হত্যার ভাগী হইয়া এবং আমার অনাহুত অপমৃত্যু হইবে ইহা নিজস নিজস জানিবা আর সেখানে যে যে বড় মানুষ মুরুব্বী আছেন তাঁহাদিগের নামের ফর্দ পাঠাই তাহাতে ওয়াকিব হইয়া যেখানে যেমত ধারায় হয় সর্বত্র যাতায়াত করিয়া আমার উদ্ধারের চেষ্টা করিবা তোমাকে যে পুনশ্চ পুনঃ লিখি সে অধিক কেবল অতিক্রমে লিখিলাম শ্রীযুক্ত৺ মহাশয়কে আমার সমাচার নিবেদন লিখিবে এবং শ্রীল শ্রীযুক্ত কেবলকৃষ্ণ রায় ভায়াকে আমার জবানী আশীর্বাদ অনেক অনেক লিখিবে অধিক কি লিখিব ইতি তারিখ ৩১ শ্রাবণ।

কাসীদরা যেমন তথায় পৌঁছে তাহার সমাচার লিখিবা এবং যে সময় বাহির হয় সে সময়ের সমাচার লিখিবা ও অতিশীঘ্র মজুমদারের লিখন সমেত এ কাসীদ জোড়িকে রাহি করিবা যদি পার তবে ২৷৷০ আড়াই টাকা আড়কাট কাসীদকে তথায় দিবা ইতি।

ইং বন্দনীয় শ্রীযুক্ত দিননাথ সামন্ত জিউ তথা সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত মজুমদার জী প্রণামা নিবেদনঞ্চ ও পরম শুভাশীর্বাদ শিবঞ্চ বিশেষ সকল সমাচার মূল পত্রে জ্ঞাত হইবে এ যাত্রা যেরূপে রক্ষা হয় তাহা করিবা রাতি বিরাতি সমাচার লিখিবে প্রথমতঃ পত্র পাঠ মাত্র শ্রীযুক্ত সূর্যনারায়ণ মজুমদারের দ্বারা সুচেষ্টা করিয়া তাহার লিখন রাতি বিরাতি নাগাদি ৩রা ভাদ্র এথা পৌঁছে তাহা করিবা তেসরা রোজ লিখন না পৌঁছিলে আমি মারা পড়ি এখানে কেহ জিজ্ঞাসিবার পাত্র নাই অতএব মজুমদারের লিখন রাতি বিরাতি পাঠাইবা আমার দিব্য আমার দিব্য যেখানে যে বিহিত চেষ্টা করিবা জমাদারকে সেলাম কহিবা অবশ্য ইতি।

ইং পরম বন্দনীয় শ্রীযুক্ত পিতৃব্য ঠাকুর চরণেষু তথা মহামহিম শ্রীযুক্ত শতঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় জীউ দণ্ডবৎ প্রণামা ও নমস্কারা নিবেদনঞ্চ আগে সকল সমাচার মূলপাত্রে জ্ঞাত হইয়া যে যে বিষয় লিখিলাম চিত্ত দিয়া করিয়া করিয়া পাঠাইবেন ইহাতে গৌণ হয় তবে আমার নামে হাত ধুইবেন ইহা নিষ্কর্শ জানিয়া যে বিহিত তাহা করিবেন নাগাদি ৩রা ভাদ্র যাহাতে সকল জওয়াব আইসে তাহা করিবেন নিবেদন ইতি।"

সন ১১৭৮ সাল
২৯ পৌষের খত।[১]

শ্রীশ্রীহরিঃ
শরণং

২

সাবশেষ পত্রার্থে· জ্ঞাত হইবে ১১ মাঘে রটন্তি চতুর্দশীতে শ্রীশ্রী৺ দুই প্রতিমার[২] স্থাপন করাইবে তাহার পরে শ্রীযুত দিননাথ রায়কে এথা পাঠাইবে ফিতরত আলি খাঁ এথা পঁহুচে নাঞি দাখিল হইলে তাঁহার চলন মাফিক ব্যববার হবেক শ্রীযুত মিস্তর মেদলটীন সাহেবকে জে খত এ পত্রের মধ্যে লিখিয়া পাঠাইতেছি তাহাতে গোন্ধ না দিয়া মহুর করিয়া পাঠাইলাম পাঠ করিয়া গোন্ধ দিয়া বন্ধ করিয়া তাহাকে দিয়া তথাকার রোয়দাদ লিখিবা আপনার মঙ্গল বার্তা লিখিয়া স্থির রাখিবা কিমধিক ইতি।

---

১ মহারাজ নন্দকুমারের এই পত্রখানি তাঁহার পুত্র রাজা গুরুদাসকে লিখিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ সে সময়ে নন্দকুমার কলিকাতায় ও গুরুদাস মুর্শিদাবাদে ছিলেন। পত্রে ২৯শে পৌষ তারিখ আছে কিন্তু সাল লেখা নাই। কুঞ্জঘাটা রাজবংশের দপ্তরে এই পত্রখানি আছে। তাহার শিরোভাগে ১১৭৮ সালের ২৯শে পৌষের খত বলিয়া লিখিত আছে। তাহা হইলে ১৭৭২ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারি হইতেছে। সে সময়ে ওয়ারেন হেস্টিংসের কর্তৃত্ব আরম্ভ হয় নাই। রাজা গুরুদাসও নিজামতের দেওয়ান হন নাই। ইহার অব্যবহিত পরে এপ্রিল মাসে ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃত্ব আরম্ভ করেন।

২ গুহ্যকালী ও গৌরীশঙ্কর নামক প্রতিমাদ্বয়। এই দুই প্রতিমা আকালীপুরের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রাণপ্রতিমেষু পরমশূভাশীর্বাদশিবঙ্ঘ বিশেষ ঃ—

তোমার মঙ্গল সর্বদা বাসনাকরনক অত্র কুশল পরন্তুঃ ২৫ তারিখের পত্র ২৭ রোজ রাত্রে পাইয়া সমাচার জানিলাম শ্রীযুত ফেতরত আলি খাঁ-এর এখানে আইসনের সম্বাদ জে লিখিয়াছিলে এতক্ষণতক পঁহুচেন নাই পঁহুচিলেই জানা জাইবেক শ্রীযুত রায় জগৎচন্দ্র বিষ রোজের পর বাটী হইতে আসিয়াছেন যেমত ২ কুচেষ্টা পাইতেছেন তাহা জানাই গেল তিনি যথা ২ জাউন ফলত কার্যের দ্বারাতেই বুঝিবেন স্পষ্ট হইয়া আপনারি মন্দ করিতেছেন সে সকল লোকেও অবশ্য বুঝিবেক[৩] তুমি শ্রীযুত মেস্ত্র মেদলটিন সাহেবের[৪] নিকট যাতায়াত করিবে এক খত তাঁহাকে লিখিলাম দিয়া নিরালা সকল কহিবে ও সুনিবে যখন যেরূপ কথোপকথন হয় তাহার মত করিবে তিঁহ চিত্তে জানেন জে আমার কথা ক্রমেই ইঁনি কার্য করিতেছেন সুন্দররূপ তাঁহার সহিত মিলিবে কোন বিশএ উদ্বিগ্ন নহিবে শ্রীযুত লালা সুবংশ রায় শয়ং জানাইতেছেন ঞিহার স্থানে বিস্তারিত জ্ঞাত হইয়া কার্য করিবে শ্রীযুত লালা ডোমন রায়[৫] লিখিয়াছেন ফীলখানার দারোগা শ্রীযুত হাজি মুস্তফা[৬] তাঁহার সহিত বিপক্ষতা

---

৩ রায় জগচ্চন্দ্র বর্তমান কুঞ্জঘাটা রাজবংশের আদিপুরুষ ; ইনি মহারাজ নন্দকুমারের জামাতা। মহারাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা সম্মানীর সহিত জগচ্চন্দ্রের বিবাহ হয়। মহারাজ নন্দকুমার গুরুদাসের উন্নতির জন্য চেষ্টা করায় জগচ্চন্দ্র তাঁহাদের প্রতি বিরুদ্ধ হন। এমন কি অবশেষে মহারাজের প্রধান শত্রু মোহনপ্রসাদের সহিত মিলিত হইয়া জগচ্চন্দ্র মহারাজের বিরুদ্ধে সেই জাল-করা মোকর্দমার অনেক কার্যও করিয়াছিলেন। মহারাজ অনেকস্থলে জগচ্চন্দ্রের বিরুদ্ধভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই পত্র হইতে তাহা আরও স্পষ্টীকৃত হইতেছে।

৪ মেস্ত্র মেদলটীন = মিস্টার মিডল্‌টন। মিডল্‌টন সেই সময়ে মুর্শিদাবাদ দরবারের চীফ ছিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের আদেশে তিনি মহম্মদ রেজা খাঁকে ধৃত করিয়া কলিকাতায় পাঠান। এই পত্রে লেখার অব্যবহিত পরেই মহম্মদ রেজা খাঁ বিচারার্থে কলিকাতায় প্রেরিত হন। মহারাজ নন্দকুমারের সহিত রেজা খাঁর ভয়ানক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। মহম্মদ রেজা খাঁর পদচ্যুতির পর রাজা গুরুদাস নিজামতের দেওয়ান হন। ওয়ারেন হেস্টিংসের আগমনের পূর্বেই রেজা খাঁর নামে অভিযোগ উপস্থিত হয়, এবং ডিরেক্টারগণ তাঁহাকে ধৃত করিয়া আনয়নের জন্য হেস্টিংসকে আদেশ দেন। হেস্টিংস কর্মভার গ্রহণ করিয়াই রেজা খাঁর বিচার আরম্ভ করেন। এই পত্রে মিডল্‌টনের সহিত যে পরামর্শের কথা লিখিত হইয়াছে, সম্ভবতঃ তাহা রেজা খাঁ ঘটিত কোন বিষয় হইবে। অবশ্য অন্য কোন রাজনৈতিক ব্যাপারেও হইতে পারে।

৫ নন্দকুমারের জাল-করা অভিযোগে লালা ডোমনসিংহ নামে এক ব্যক্তি মহারাজের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিল। লালা ডোমনরায় ও লালা ডোমনসিংহ এক ব্যক্তি কিনা বলিতে পারা যায় না।

৬ হাজি মুস্তফা সায়র মুতাক্ষরীন নামক ফার্সী গ্রন্থে ইংরেজী অনুবাদক। ইনি একজন ফরাসী। ইঁহার পূর্ব নাম রেমণ্ড, পরে ইনি মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিয়া হাজি মুস্তফা উপাধি ধারণ করেন। মুতাক্ষরীনের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় লিখিত আছে যে, ইনি জীবিকার জন্য নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া পরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারিগণের অনুকম্পায় মুর্শিদাবাদে একটি কার্যে নিযুক্ত হন। কিন্তু কি কার্য, তাহা ইনি স্বয়ং গ্রন্থে উল্লেখ করেন নাই। এই

করিতেছেন এবং কটুকশা কহিয়াছেন এ কেমত ধারা ইহাতে আশ্চর্য বোধ হইল একারণ আমি এক খত হাজি মুস্তফাকে লিখিলাম এবং তাহার বিষয় মেস্তর মেদলটীন সাহেবকেও এক খত আলাহিদা লিখিলাম কহিবে পঁহুচাইয়া দেন হাজি মুস্তফাকে তুমি সাক্ষাতে ডাকিয়া কহিবে ঞিহ আমাদিগের বেরাদরির মধ্যে ইহার সহিত অন্যমত ব্যবহার না করেন দুই জনকে মিলজুল করিয়া দিবে শ্রীযুত কালীনাথ রায় আজিতক পঁহুচিয়াই থাকিবেন শ্রীশ্রী৺ঠাকুরাণি রটন্তির দিবস মন্দিরে স্থাপন করাইবে[৭] তাহার সঙ্গে জা জাওর সকলের গিয়াছে পঁহুচিয়া দেয়াইবে তুমি আপনার লইবে ৭ সাত মন ভাল গঙ্গাজলি গহমের কারণ মধ্যে এক পত্র লিখা গিয়াছে শ্রীচৈতন্য-নাথের[৮] পলওয়ারে কাশীনাথ রায় গিয়াছেন সেই পলওয়ারে পাঠাইয়া দিবে। যাতায়াতে নিজ মঙ্গলাদি বার্তা লিখিয়া তুষ্ট রাখিবে। কিমধিকং ইতি তারিখ ২৯ পৌষ রবিবার রাত্রিই ডাকে বাহি হইল।

পত্র হইতে জানা যাইতেছে যে, ইনি ফীলখানার দারোগা হইয়াছিলেন। মুশুফা মুর্শিদাবাদ হইতে পরে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন।

৭ মহারাজ নন্দকুমার তাঁহার জন্মভূমি ভদ্রপুরের সংলগ্ন আকালীপুর-নামক গ্রামে ব্রাহ্মণী নদীতীরে এক ইষ্টক-নির্মিত মন্দির নির্মাণ করাইয়া গুহ্যকালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। এই পত্রে তাহাই উল্লিখিত হইয়াছে। গুহ্যকালীমূর্তির সহিত গৌরীশঙ্করমূর্তিও উক্ত মন্দিরে স্থাপিত হয়। রটন্তী তিথিতে উহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া আজিও প্রতি বৎসর রটন্তীতে ধূমধামে দেবীর পূজা হইয়া থাকে। এই মন্দির অসম্পূর্ণ অবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছে; ইহার নির্মাণের পর মহারাজের দুর্ঘটনা ঘটায় তদ্বংশীয়েরা আর সম্পূর্ণ করেন নাই। উক্ত মন্দির ও দেবতার সহিত নানারূপ প্রবাদ বিজড়িত আছে। গুহ্যকালীর এমন সুন্দর মূর্তি আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। আকালীপুরের মন্দির মহারাজের একটি প্রসিদ্ধ কীর্তি। এই পত্রের সহিত তাহার সম্বন্ধ থাকায় পত্রখানি ঐতিহাসিকগণের নিকট যে বিশেষ আদরের সামগ্রী তাহাতে সন্দেহ নাই।

৮ এই চৈতন্যনাথ মহারাজের জাল-করা মোকর্দমায় তাঁহার পক্ষের একজন বিশিষ্ট সাক্ষী।

বাহারবন্দ

বাহারবন্দ রঙ্গপুর জেলার একটি প্রসিদ্ধ পরগণা,—কেবল রঙ্গপুর কেন, সমগ্র বঙ্গরাজ্যের এরূপ বিস্তৃত ও উর্বর পরগণা অতি অল্পই আছে বলিয়া বোধ হয়। ব্রহ্মপুত্র, ধরলা ও ত্রিস্রোতার সলিলসিক্ত হইয়া শ্যামল শস্যরাজিপরিপূর্ণ বাহারবন্দ বহুকাল হইতে বঙ্গদেশে স্বীয় নাম ঘোষণা করিতেছে। মুসলমানরাজত্বের বহুপূর্ব হইতে ইহার নাম শ্রুত হওয়া যায়। বাহারবন্দ বাঙ্গলাদেশে প্রবাদবাক্যের সহিত জড়িত। ইহার পুরাতত্ত্ব জানিতে হইলে, রঙ্গপুর প্রদেশের কিঞ্চিৎ বিবরণ জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক ; কারণ বাহারবন্দ রঙ্গপুরের অনেক অংশ অধিকার করিয়া আছে। রঙ্গপুর পূর্বে প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল ; প্রাগ্‌জ্যোতিষ কামরূপের নামান্তর। প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত রঙ্গপুর স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভগদত্ত কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং অর্জুন-কর্তৃক নিহত হন। ভগদত্তের বংশীয়েরা অনেক দিন কামরূপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পর রঙ্গপুর প্রদেশে পৃথু নামে একজন পরাক্রান্ত রাজার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বোদা ও বৈকুণ্ঠপুরের মধ্যে তাঁহার রাজধানীর ভগ্নাবশেষ লক্ষিত হয়। তিনি কীচকগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া সরোবরসলিলে জীবন বিসর্জন দেন। পৃথুরাজের পর বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী সুপ্রসিদ্ধ পালবংশীয়গণের রাজত্বের কথা আমরা অবগত হই। দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানে পালবংশীয়দিগের অশেষ কীর্তির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। রঙ্গপুর ও কামরূপ পর্যন্ত তাঁহাদের রাজ্যের বিস্তার ছিল। সর্বপ্রথমে ধর্মপালের নাম শ্রুত হওয়া যায়। ধর্মপালের পর গোপীচন্দ্র তাঁহার সিংহাসন অধিকার করেন। গোপীচন্দ্রের মাতা মীনাবতী ধর্মপালের সৈন্যদিগকে পরাস্ত করায় ধর্মপাল যে কোথায় অন্তর্হিত হন, তাহা কেহই জানিতে পারে নাই। গোপীচন্দ্র তৎপরে শূন্য সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাহারবন্দের প্রধান স্থান উলিপুরের পূর্বে ওয়ারী নামক স্থানে গোপী-চন্দ্রের ভবনের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাইত। গোপীচন্দ্রের পর ভবচন্দ্র রাজা হন ; ইনিই বাঙ্গলার প্রবাদকাহিনীতে হবচন্দ্র বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। ভবচন্দ্র ও তাঁহার মন্ত্রী গবচন্দ্রের বুদ্ধিমত্তার কাহিনী সমস্ত বাঙ্গলায় প্রচলিত ; ভবচন্দ্র উক্ত গোপীচন্দ্রের পুত্র। ভবচন্দ্রের উত্তরাধিকারী হইতে পালবংশের অবসান হয়। তাহার পর কোচ প্রভৃতি জাতি-কর্তৃক রঙ্গপুর ও কামরূপ বারংবার আক্রান্ত হয়। পালবংশের পর অন্য একটি বংশের উল্লেখ আছে ; সেই বংশে নীলধ্বজ, চক্রধ্বজ ও নীলাম্বর নামে রাজা জন্মগ্রহণ করেন। নীলাম্বর গৌড়ের বাদশাহ হোসেন শার সময় মুসলমান-কর্তৃক পরাজিত হন। মুসলমানদিগের হস্ত হইতে কামরূপ ও রঙ্গপুর প্রদেশ কোচগণ-কর্তৃক অধিকৃত হয়। কোচবংশের স্থাপয়িতা হাজোর হীরা ও জীরা নামে দুই কন্যা ছিল ; হীরার গর্ভে বিশু ও জীরার গর্ভে শিশুর জন্ম হয়। বিশু কোচবিহার রাজবংশের এবং শিশু জলপাইগুড়ি রাজবংশের আদিপুরুষ। বিশু স্বীয়

পুত্র শুক্লধ্বজ ও নরনারায়ণকে আপনার রাজ্য বিভাগ করিয়া দেন। শুক্লধ্বজের পৌত্র পরীক্ষিৎ প্রথমে মুসমলমানদিগের বশ্যতা স্বীকার করেন। খ্রীস্টীয় ১৬০৩ অব্দে রাজস্ব অনাদায়ের জন্য পরীক্ষিতের রাজ্য মোগলগণ-কর্তৃক আক্রান্ত হয়; পরীক্ষিৎ অতি অল্পমাত্র ভূভাগের অধীশ্বর থাকেন, তাঁহার অবশিষ্ট রাজ্য ঢাকার মোগল শাসনকর্তার অধীন হয়। এই অধিকৃত রাজ্য চারি সরকারে বিভক্ত হয় এবং ১৬৬২ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত মোগলদিগের অধীন থাকে। উক্ত চারি সরকারের মধ্যে বাঙ্গলাভূম একটি; বাহারবন্দ ও ভিতরবন্দ লইয়াই বাঙ্গলাভূম। খ্রীঃ ১৬৬২ অব্দে আরঙ্গজেবের প্রধান সেনাপতি মীরজুম্লা আসাম অধিকার করিতে গিয়া পরাজিত হইলে, উক্ত চারি সরকারের মধ্যে তিন সরকারের অধিকাংশ ভূভাগ মুসলমানদিগের হস্তচ্যুত হয়; কেবল সরকার বাঙ্গলাভূম তাঁহাদের অধীন থাকে; সুতরাং ১৬০৩ খ্রীঃ অব্দ হইতে বাহারবন্দ মুসলমান রাজত্বের অন্তর্ভূত হয়। বাঙ্গলাজয়ের সঙ্গে ইহা ইংরেজাধিকারে প্রবেশলাভ করে।

মোঘলগণ-কর্তৃক বাহারবন্দ অধিকৃত হইলে, ইহা অন্যান্য পরগণার ন্যায় রাজস্ব-আদায়ের জন্য জমিদারদিগের হস্তে অর্পিত হয়। তৎকালে জমিদারগণ রাজস্ব-সংগ্রাহকের কার্য করিতেন। বাহারবন্দ জমিদারগণের হস্তে অর্পিত হইলে অনেক সময়ে ইহা জায়গীররূপে নির্দিষ্ট হইত। চাঁদরায় নামক একব্যক্তি ইহার প্রথম জমিদার বলিয়া উল্লিখিত হন। তাঁহার পর রঘুনাথরায় বাহারবন্দের জমিদারী প্রাপ্ত হন। রঘুনাথের পর তাঁহার পত্নী পুণ্যশ্লোকা রানী সত্যবতী বাহারবন্দের অধিকার লাভ করেন। রানী সত্যবতীর অগণ্য কীর্তি অদ্যাপি বাহারবন্দ অলঙ্কৃত করিতেছে; তাঁহার স্থাপিত দেবমন্দিরাদি আজিও তাঁহার পবিত্র নাম প্রচার করিয়া থাকে। রানী সত্যবতীর জীবনকালে বাহারবন্দ নাটোরাধিপ রাজা রামকান্তের হস্তে অর্পিত হয়। রামকান্তের পত্নী ভারতপ্রসিদ্ধা দীনপালিনী রানী ভবানী সত্যবতীর আত্মীয়া ছিলেন। সত্যবতী সংসার পরিত্যাগ করিয়া কাশীধামে গমন করায়, ভবানীকে বাহারবন্দ অর্পণ করিয়া যান। এই সময়ে বাহারবন্দ নবাব আলিবর্দী খাঁ মহাবৎ জঙ্গের আদেশে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা সৈয়দ আহম্মদ খাঁ সালৎজঙ্গের নামে জায়গীররূপে নির্দিষ্ট হয়; কিন্তু সেরেস্তায় নাটোররাজের নামেই লিখিত থাকে। রাজা রামকান্তের মৃত্যুর পর রানী ভবানী স্বীয় জামাতা রঘুনাথরায়কে বাহারবন্দ প্রদান করেন। রঘুনাথের মৃত্যুর পর বাহারবন্দ পুনর্বার নবাব নজমউল্লা দৌলত সৈয়দ নজাবত আলি খাঁর নামে জায়গীররূপে নির্দিষ্ট হইয়া মুর্শিদাবাদের অধীন হয়; কিন্তু রানী ভবানীর সম্বন্ধ একেবারে দূর হয় নাই। রাজা গৌরীপ্রসাদ কিছুকাল ইহার জমিদার নিযুক্ত হন; কিন্তু পুনর্বার ইহা রানী ভবানীর হস্তে আগমন করে। কোম্পানীর দেওয়ানীগ্রহণের পর বাঙ্গলা ১১৭৬ অব্দ হইতে ১১৭৮ অব্দ পর্যন্ত ঘনশ্যাম সরকার নামে এক ব্যক্তি ইহার ইজারা লয়। ১১৭৯ সালে ইহা রঙ্গপুর কালেক্টরীর অন্তর্ভূত হয় ও সেই

বৎসর বিষ্ণুচরণ নন্দী ইহার ইজারা লই। ১১৮০ অব্দ পর্যন্ত নিজ অধিকারে রাখে। ১১৮১ অব্দে কান্তবাবুর পুত্র লোকনাথকে প্রথমে ইজারা দেওয়া হয়; পরে ১১৮৬ সাল হইতে তাঁহাকে ৮২,৬৩৯ টাকায় চিরস্থায়িরূপে প্রদান করা হয়। আমরা ইতিপূর্বে কান্তবাবু শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়া আসিয়াছি যে, রানী ভবানী বাহারবন্দের জমিদার ছিলেন; কিন্তু হেস্টিংসসাহেব বলপূর্বক তাঁহার নিকট হইতে লইয়া উক্ত পরগণা বিষ্ণুচরণ ও লোকনাথকে প্রদান করেন। বিষ্ণুচরণ কান্তবাবুর বেনামদার ও লোকনাথ তাঁহার পুত্র। মহারাজ নন্দকুমার কাউন্সিলে ইহার জন্য হেস্টিংসের প্রতি দোষারোপ করেন এবং কাউন্সিলের সভ্যরা তজ্জন্য হেস্টিংসসাহেবকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত করিয়াছিলেন। লোকনাথকে চিরস্থায়িরূপে বাহারবন্দ প্রদান করায়, ডিরেক্টরগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার হস্ত হইতে পুনর্বার লইবার জন্য লিখিয়া পাঠান; কিন্তু হেস্টিংস সে বিষয়ে কর্ণপাত করেন নাই। বাহারবন্দ এক্ষণে কাশীমবাজার রাজবংশের সম্পত্তি। দানশীলা মহারানী স্বর্ণময়ী মহোদয়া ইহার অগাধ আয় প্রতিনিয়ত পুণ্যকার্যে ব্যয় করিয়া বাহারবন্দকে দেশমধ্যে আরও স্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন এবং বাহারবন্দের পুরাতন নামের সহিত তাঁহার পবিত্র নাম মিশিয়া বঙ্গবাসীর হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব আনন্দের সঞ্চার করিতেছে। মহারানীর উপযুক্ত বংশধর মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রও মহারানী মহোদয়ার অনুকরণ করিতেছেন।

বাহারবন্দের সহিত আর একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বিজড়িত রহিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণীর ভবানী পাঠক কাহারও নিকট অবিদিত নাই। ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভে রঙ্গপুর অঞ্চলে ভবানী ও দেবী কিরূপে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন, এবং কিরূপে ইংরেজ-শাসনে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন, যাঁহারা দেবী চৌধুরাণী পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা বিশেষরূপে অবগত আছেন। খরবেগা ত্রিস্রোতার সলিলরাশি ও তীরভূমি আলোড়িত করিয়া পাঠক ও দেবীর অনুচরগণ যে ইংরেজ-হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত করিয়াছিল, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। পাঠকের আর একজন বন্ধু ছিল, তাহার নাম মজনু শাহা। তিনজনের উপদ্রবে অস্থির হইয়া রঙ্গপুরের তৎকালীন কালেক্টর গুডল্যাডসাহেব লেপ্টেনান্ট ব্রেনানকে একদল সিপাহীর সহিত তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। বাহারবন্দেই ভবানী পাঠকের সহিত ব্রেনানের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পাঠক ও তাঁহার তিন জন অধীন সেনাপতি নিহত, আটজন আহত এবং ৪২ জন বন্দী হয়। এইরূপে তাহাদের উপদ্রবের উপশম হইয়াছিল। উপরিলিখিত যাবতীয় বিবরণ আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, প্রাচীন কাল হইতে বাহারবন্দ বাঙ্গলার মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ ভূভাগ বলিয়া কথিত হইয়া আসিতেছে। ইহার সহিত হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান ও ইংরেজ রাজত্বের অনেক ঐতিহাসিক বিবরণ বিজড়িত রহিয়াছে।